মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য

শ্রীসরোজমোহন মিত্র, এম-এ, পি-এইচ-ডি
অধ্যাপক, শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়, হাবড়া

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ
১১-এ, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক—
শ্রীসঞ্জীবন চক্রবর্তী,
১১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, ২৪শে বৈশাখ, ১৩৭৭

শ্রীসরোজমোহন মিত্র।

মুদ্রক—
শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
লিটারারী প্রেস প্রাঃ লিঃ
১১৩বি, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩
ও
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ,
বাসন্তী আর্ট প্রেস,
৬/১, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

মূল্য—১২.৫০ টাকা



যে মত ও পথের পথিক ছিলেন
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
সেই মত ও পথের অতীত, বর্তমান ও
অনাগত কালের
সংগ্রামী মানুষের উদ্দেশ্যে—

নিবেদন

যখন কোন কালজয়ী প্রতিভা আপন সৃজন মানসেই পুরানো পথ পরিহার করে নতুন পথ কেটে চলে তখন তাঁকে নিয়ে তর্ক বিতর্কের অন্ত থাকে না। বাঙলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও আলোচনার অন্ত নেই। তাঁর সম্বন্ধে নানা সমালোচক নানা কথা বলেছেন। কেউ বলেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সব চাইতে বিতর্কমূলক ব্যক্তিত্ব'; কেউ বলেছেন, 'কল্লোলের উত্তর পুরুষ'; কেউ বলেছেন, 'একেবারে ঐতিহাসিক, একেবারে মৌলিক'; কেউ বলেছেন, একটি বিস্ময়কর প্রতিভা'; কেউ বলেছেন, তিনি 'বাঙলা সাহিত্যে একলব্য'; কেউ তাঁর উপন্যাসে 'সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ' দেখতে পেয়েছেন; আবার কেউ বা বলেছেন, 'বাংলা কথা সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠায় তিনি অদ্বিতীয়'। এমনি নানা মত তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। এই আলোচনার এখনো ইতি হয় নি। অভিব্যক্তির ভিন্নতার কারণ সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে বিচার করেছেন। কিন্তু সকলেই স্বীকার করেছেন মানিকের অসাধারণ প্রতিভা। বাঙলা উপন্যাসে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের পরেই মানিকের নাম করতে হয়।

মানিক প্রতিভা নিয়ে বিতর্কের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে আমার নেই। বরং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে যত পড়েছি, যত জেনেছি ততই মনে হয়েছে মানিক সম্পর্কে সমস্ত মতামতই আংশিক এবং আপেক্ষিক। কারণ কেউ-ই মানিকের জীবন ও সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয়ের খবর রাখেন না। সেজন্য মানিকের সাহিত্য কৃতিত্বে অনেক সময় সমালোচকেরা বিমূঢ় হয়েছেন। তাঁর নতুন নতুন সৃষ্টি অভ্যস্ত পথের নায়কদের মনে নানা প্রশ্ন ও সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। এই সমস্ত বিতর্কের যথাযথ ...রের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন মানিকের জীবন ও সাহিত্যকে সামগ্রিকভাবে পরিবেশন করা। সমালোচনার তাতেই হবে যোগ্য উত্তর।

বর্তমান গ্রন্থ তারই ফলশ্রুতি। এ কাজে প্রবৃত্ত হয়ে উপলব্ধি করেছি মানিকের ...ভীর জীবন অনুসন্ধিৎসা। আশৈশব একটি খাপছাড়া প্রতিভা গতানুগতিক পথে ...লতে অস্বীকার করেছেন; যত দুরূহই হোক নিত্য নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার দুর্বহ ক্লেশ ... করেছেন। শূন্যগর্ভ মধ্যবিত্ত জীবন থেকে শ্রমজীবী মানুষের বিচিত্র জীবন ... সঙ্গে সুগভীর একাত্মতা তাঁর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। নির্মোহ গাণিতিক ... দিয়ে সেই অভিজ্ঞতায় মানিক দেখেছেন একের পর এক নানা সমস্যা। রোমান্টিক

ভাবালুতার প্রতি চরম বিরূপতা নিয়ে জাত বৈজ্ঞানিকের মত সেই সমস্যাকে তুলে ধরেছেন বাংলা সাহিত্যে। একের পর এক জীবনসত্যকে উন্মোচিত করে বাঙালী পাঠককে করেছেন চমৎকৃত। মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধ তাঁকে নিয়ে গেছে নিঃস্ব মেহনতী মানুষের মধ্যে। তাদের জীবনের বাস্তবতায় তিনি মুগ্ধ। মধ্যবিত্তসুলভ খোকামি আর ন্যাকামি পরিহার করে জীবনজয়ী সাধনায় তিনি যুক্ত হলেন শোষিত নিপীড়িত মানুষের গণঅভ্যুত্থানে। জীবন ও প্রতিভার পরিপূর্ণতার সন্ধান পেলেন সেখানে। উত্তর চল্লিশের ব্যাপক ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক বিক্ষোভে তাঁর লেখনী এক আশ্চর্য দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। বিপ্লবী জীবন ও ঘটনাকে রসোত্তীর্ণতার চরম শিখরে তুলে বাঙলা সাহিত্যে তিনি নতুন পথের নির্দেশ দিয়ে গেলেন। ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাইরেও যে সত্য অবশ্যম্ভাবী সেই সত্যকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন বাংলার পথে-প্রান্তরে-কারখানায়। সেজন্য যত দিন ঘনিয়ে আসছে তত মানিকের মূল্যায়ণে স্বচ্ছতা দেখা দিচ্ছে। আমি কেবল মানিক-জীবনের উপাদানগুলো এগিয়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করছি। আমি সেই মূল্যায়ণের নিমিত্ত মাত্র।

মানিকের মত সত্য না ভ্রান্ত সে বিচার আমার নয়, আগামীকালের। সেই পথে যখন তিনি এগিয়ে চলেছেন তখন তিনি একা মাত্র। আগামী দিনের স্বচ্ছ দৃষ্টি তাঁকে সেই পথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি। পরিবেশ অনুকূল হলে, দারিদ্র্য প্রধান বাধা না হলে হয়ত তাঁর সার্থকতা অধিকতর হতো। তা নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। মানিক যা ছিলেন এবং যা তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ছিল আমরা তাকেই সংগ্রহ করে আজ ও আগামীকালের পাঠকের কাছে তুলে ধরছি।

এ কাজ সহজসাধ্য নয়। মানিকবাবুর মৃত্যুর পর অনেক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অনেক উপাদান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নির্ভরযোগ্য অনেক মানুষের পরলোকগমন ঘটেছে। তবু বহু দূর নিকটের মানুষের দোরে দোরে গিয়ে, বহু মানুষের সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়ে এ কাজ সম্ভব করে তুলেছি। এর দ্বারা মানিক সম্পর্কে সব ভুল ধারণার অবসান হবে এ দাবী না করতে পারলেও মানিক সম্পর্কে একটি সামগ্রিক পরিচয় লাভে নতুন চেতনার উদ্রেক হবে এ প্রত্যাশা অস্বাভাবিক নয়।

অনেক চেষ্টা করেও মানিকের 'ভিটে মাটি' নাটিকাটি যোগাড় করতে পারিনি। বহু রচনাও নানা পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলোর সন্ধান পাই নি। পরিশিষ্টে তার তালিকা দিয়েছি। এ ছাড়া আমার অজ্ঞাতেও কিছু কিছু উপাদান ছড়িয়ে থাকতে পারে। ভবিষ্যতে সেগুলোর সন্ধান পেলে এ গ্রন্থ আরো পূর্ণতা লাভ করবে। সহৃদয় পাঠকদের নিকট সেই সহানুভূতি অবশ্যই প্রত্যাশা করছি।

নানা মত ও পথের মানুষের কাছে এই গ্রন্থ রচনায় সাহায্য পেয়েছি। তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক ডঃ সুকুমার সেনের নাম। তিনি অশেষ স্নেহ ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। কমরেড মুজফ্ফর আহমদ, শ্রীসুনীল বসু, শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ, শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকিরণ কুমার রায়, অধ্যাপক রণবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুনীতিকুমার ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ ধর, শ্রীনন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুগান্তর চক্রবর্ত্তী, শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুপ্রকাশ রায়, শ্রীশিবশঙ্কর মিত্র, শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীমিহির সেন এবং আরও অনেকে আমাকে সক্রিয় সাহায্য করেছেন। রামমোহন লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, ন্যাশনাল লাইব্রেরী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে অনেক সাহায্য নিয়েছি। সকলকেই আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সুরেন্দ্রনাথ সমবায় আবাস, ফ্ল্যাট নং ৫০
২৩৮ মানিকতলা মেইন রোড,
কলিকাতা-৫৪
২৪ বৈশাখ, ১৩৭৩

বিনীত
সরোজমোহন মিত্র

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

জীবন ও সাহিত্যকৃতি

"পদ্মায় যে ডিঙ্গি চালায়, মেদনীপুরের শক্ত মাটি চষে,
বোম্বে থেকে কলকাতাতে লাখো চাকা ঘোরায়,
উদয়াস্ত লাখো কলম পেশে,
বুঝতে যেন পারছি
তাদের ফাঁসে আটক গলার ঐক্যতান,
অনুভব করছি ব্যাহত জীবন-কামনার উজ্জ্বলতাপ,
সূর্যালোকের মত।
তুলনা পাইনি রাজকীয় কাব্য ইতিহাসে,
এমন সহজ সরল বিরাট সুন্দরের।"[১]

এই 'সহজ সরল বিরাট সুন্দরের সাধনা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যকৃতির গোড়ার কথা। এখানেই তিনি অনন্য। বাংলা সাহিত্যে তাঁর পূর্বেও নেই আজ পর্যন্ত উত্তরেও নেই তাঁর সার্থক স্রষ্টা। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব প্রকাশ দেখে রাজকীয় কাব্য-ইতিহাসের মানুষ বিমূঢ় হয়েছে। সেজন্য বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই। তাঁর সাহিত্যের ন্যায় ব্যক্তিজীবনেও দেখা যায় এক বেপরোয়া জিদ। গতানুগতিকতা তাঁর স্বভাবে ছিল না। নতুন চিন্তার অস্থিরতায় নতুন পথ তিনি নিজেই বের করে নিয়েছেন।

মানিকের জন্ম দুমকায়। সাঁওতাল পরগণার রাজধানী দুমকা সহর। তাঁর পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় তখনকার দিনের বি.এ। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে এরকম ডিগ্রীধারী মানুষ ছিল দুর্লভ। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নিবাস ছিল ঢাকা বিক্রমপুরের এক গণ্ড গ্রাম মালপদিয়া। তিনি যখন বি.এ. পাশ করেন তখন গ্রাম গ্রামান্তর থেকে কাতারে কাতারে লোক এল তাঁকে দেখতে। এমন শিক্ষিত মানুষ ত তারা পূর্বে কখনো দেখেনি। কিন্তু বি.এ. পাশ করার চেয়েও তখন শক্ত

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'প্রথম কবিতার কাহিনী'।

ছিল চাকুরী পাওয়া। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পেলেন কিন্তু সহজে চাকুরী পেলেন না। অবশেষে সুদূর দুমকায় এসে তিনি পেলেন সেটেলমেণ্ট দপ্তরে একটি সামান্য চাকুরী। সারা জীবন তিনি এই চাকুরীই করেন। শেষ-জীবনে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বপূর্ণ পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

১৯০৮ সালের ১৯শে মে মঙ্গলবার ; বাংলা ১৩১৫, ৬ই জ্যৈষ্ঠ মানিক জন্মগ্রহণ করেন।[২] মাতা নীরদাসুন্দরী দেবী। মানিকের মামাবাড়ি ছিল মালপদিয়ার অদূরে গাওদিয়া গ্রামে। মানিকের কোন কোন লেখায়[৩] এই গাওদিয়ার নাম পাওয়া যায়। মানিকের ভালো নাম ছিল প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। "কিন্তু বোধহয় তার গায়ের উজ্জ্বল কালো রং ও সুন্দর মুখশ্রী দেখেই সেই যে আঁতুড় থেকেই তার নামকরণ হল কালোমানিক—সেই মানিক নামটিই রয়ে গেল আজীবন।"[৪] মানিকেরা ছিল চৌদ্দ ভাই বোন। আট ভাই এবং ছয় বোন। এক ভাই এক বোন অতি শৈশবেই মারা যায়। জন্ম পত্রিকায় মানিকের নাম ছিল অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চম পুত্র।

মানিক শিশুকাল থেকেই ছিল অতি মাত্রায় দুরন্ত—'হাসিখুশি-চঞ্চল-নির্ভীক প্রাণবন্ত শিশু।' হাঁটতে শেখার পর থেকেই এই দুরন্তপনার শুরু। মানিকের বড়দা সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এম. এস. সি., পি. আর. এস., ডি-এস-সি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত কৃতী ছাত্র। প্রথম জীবনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরবর্তীকালে ভারত সরকারের আবহ বিভাগের সর্বময় কর্তা। একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তাঁর স্ত্রী অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মানিকের এই দুরন্তপনা সম্পর্কে লিখেছেন :

"কুটনোকোটা ফেলে প্রকাণ্ড বঁটিখানা বারান্দায় কাত করে রেখে মা ছুটে গেলেন রান্নাঘরে। মস্তবড় ভাতের হাঁড়ির জল টগবগিয়ে ফুটে পড়ে জলন্ত উনুন নিভে যাওয়ার দাখিল,—দশটির মধ্যে পাঁচটি ছেলেমেয়ের স্কুলের ভাত চাই,—মা অনন্যমনা হয়ে সেই চিন্তায় মগ্ন। কোথা থেকে তিন বছরের (মানিক

২। মানিকের জন্ম সন অনেকে (সজনীকান্ত দাস, গোপাল হালদার প্রমুখ সাহিত্যিকগণ) ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন (পরিচয়, মানিক স্মৃতি সংখ্যা, পৌষ, ১৩৬৩)। কিন্তু তা সত্য নয়। মানিকের জন্ম পত্রিকা বা কোষ্ঠি দেখে এই জন্ম তারিখ প্রামাণ্যভাবে লাভ করেছি।

৩। পুতুল নাচের ইতিকথা।

৪। 'স্মরণ করি'—অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় বৌদি)।

কিন্তু লিখেছেন, হাঁটতে শিখেই[৫]) অতি চঞ্চল দামাল ছেলেটি এসে মা-র অবর্তমানে মনের আনন্দে কাত-করা বঁটির বাঁটের ওপর দাঁড়িয়ে খলখলিয়ে হাসে আর নাচে। মুহূর্তে ঘটে গেল অঘটন! বঁটি যেমন সোজা হয়ে উঠল, শিশুটিও সোজা আছাড় খেয়ে পড়ল তার বুকে।

তারপর? তারপর শিশুর পেটখানা নাভির এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত কেটে দু'খানা,—নাড়িভুঁড়ি প্রায় দেখা যায়। মা শব্দে আকৃষ্ট হয়ে রান্না ফেলে এসেই চীৎকার: কি সর্বনাশ হল রে,—মানিকের পেট কেটে দু'খানা!

পাশের ঘরে বিদেশাগত কলেজের ছাত্র জ্যেষ্ঠপুত্র পাঠে মগ্ন—মায়ের চীৎকারে বাইরে এসে ঐ দৃশ্য দেখে হতভম্ব। কিন্তু মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে দু'হাতের তালুর উপরে তাকে নিয়ে একছুট দুমকার ছোট হাসপাতালটিতে। ভাগ্যক্রমে ডাক্তারবাবুকে পাওয়া গেল। তিনি তড়িৎবেগে পেটটি দিলেন সেলাই করে। ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দেবার পর দম নিয়ে বললেন—এক চুলের জন্য রক্ষা পেল ছেলেটি। কাটল এক নিদারুণ ফাঁড়া।

কান্নাকাটি অথবা ভয় ডর ছিল না তার ধাতে।...হাসপাতালের ডাক্তার পঁচিশটি 'স্টিচ' দিয়ে পেট জুড়ে দিলেন, তখনও সে কাঁদেনি একফোঁটা। ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে বলেন—এ অদ্ভুত ছেলে! অন্য ছেলে হলে চীৎকার করে পাড়া মাৎ করে দিত।"[৬]

এই দুরন্তপনা সম্পর্কে মানিক পরবর্তীকালে নিজেই লিখেছেন,[৭] "এমনি আরও অনেক দুরন্তপনার চিহ্নই সর্বাঙ্গে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। শোনা যায়, আমার নাকি একটা উদ্ভট স্বভাব ছিল, দারুণ ব্যথা পেলেও কিছুতে কাঁদতাম না। সুর করে (কালোয়াতি নয়) গান (আবোল তাবোল) ধরতাম, ব্যথা বাড়লে সুর চড়ত আর দু-চোখ দিয়ে জল পড়ত ধারা-স্রোতে। মা-রে বাপ-রে বলে, হাউ মাউ করে, শুধু চেঁচিয়ে, ভ্যাঁ করে প্রভৃতি যে নানা পদ্ধতি আছে সাধারণ কান্নার, তার একটাও আমি শিখিনি। এদিকে আবার যখন-তখন আপন মনে নিজের খাপছাড়া সুরে যে-কোন কথা বা শব্দ নিয়ে গানও আমি গাইতাম—সব সময় তাই বোঝা কঠিন ছিল আমি কাঁদছি না গাইছি। একদিন দুপুরে মা ও বড়দি বারান্দায় খেতে বসে শুনছেন রান্নাঘরে আমি গান ধরেছি। খানিক পরে সুরটা কেমন কেমন ঠেকায় আর পোড়া মাংসের গন্ধ পাওয়ায় তাঁরা উঠে এসে দেখেন

৫। আমার কান্না (ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প)।
৬। স্মরণ করি।
৭। আমার কান্না।

উনোনের সামনে বসে আমি গান করছি মুখখানা বিকৃত করে, চোখের জলে মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে। কী হয়েছে বুঝতে তাঁদের মিনিটখানেক সময় লেগেছিল। তারপর চোখে পড়ল, আমার বাঁ পায়ের গোড়ালির খানিক উপরে মস্ত একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা পুড়ছে, বেশ খানিকটা গর্ত হয়েছে। কাঠের উনোন, চিমটে দিয়ে গনগনে কয়লাগুলি নিয়ে খেলতে গিয়ে এই বিপদ।"

ফলে মানিকের শরীরে প্রায় এক ইঞ্চি পোড়া দাগ স্থায়ী হয়েছিল। তীব্র যন্ত্রণায় মানিক সেদিন একেবারে বোকা হয়ে গিয়েছিল। কয়লাটা ফেলে দিতে বা কাউকে ডাকতে পর্যন্ত সে পারেনি।

"আরেকদিন মা রসগোল্লার কড়াই নামিয়ে অন্য কাজে মন দিয়েছেন, আমি সুযোগের প্রতীক্ষা করছি। আমার ভাগ্য ভাল যে, রান্নাঘরেই অন্য কাজে মা-র বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল। নয়ত রসগোল্লার কড়াই নামিয়েই কোন কাজে মা বাইরে গেলে হয়ত সারা জীবন আমাকে হাত-পোড়া আর মুখ-পোড়া হয়ে থাকতে হত। সুযোগ যখন পেলাম, কড়াইয়ের রসটা তখন আর ফোস্কা পড়াবার অবস্থায় নেই তবে মজা টের পাইয়ে দেবার মত গরম আছে। খাবলা দিয়ে কতকগুলি রসগোল্লা তুলেই মুখে পুরে দিয়ে সেটা টের পেলাম।

সেই মুহূর্তে মা আর মেজদা ঘরে ঢুকলেন। মা উঠলেন চেঁচিয়ে। মেজদা তিন লাফে এগিয়ে এসে কড়ায় আঙুল ডুবিয়ে দেখে নিলেন রসটা কত গরম।

তারপর বললেন—ঠিক সাজা হয়েছে রাক্ষসের। আর খাবি?

যন্ত্রণায় কান্না আসছিল। আমার কচি চামড়ায়, মেজদা বোধহয় সেটা হিসাব করেন নি, যে তাঁর গরম বোধের চেয়ে আমার গরম বোধ কত বেশি, তাহলে হয়ত মায়া হত।...মুখের রসগোল্লা ফেলাও যায় না, কাঁদাও যায় না। এতক্ষণে দিদিরাও এসে পড়েছে, মেজদার কথা শুনে ওদের মুখে কৌতুকের হাসি। চিবিয়ে চিবিয়ে রসগোল্লা গিলে ফেললাম।

আর খাবি?

সকলের মুখে ধীরে ধীরে চোখ বুলিয়ে নিলাম। কড়াই থেকে আরো কয়েকটা—আগের বারের চেয়ে সংখ্যায় কম মুখে পুরলাম। হাত মুখ আগেই জ্বলছিল, এবার যেন পুড়ে গেল। কাঁদলাম না, রসগোল্লাও চিবোতে লাগলাম কিন্তু দমটা আটকে রইল আর চোখে জল এসে গেল।"[৮]

৮। আমার কান্না।

মানিকের বয়স তখন চার কিংবা পাঁচ চলছে। তার ছোট ভাইটির বয়স আড়াই কি তিন। অতি শৈশব থেকেই মানিকের ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। তাদের দুমকার "বাড়ির পেছনে বেশ বড় একটা বাগান ছিল, কপি বেগুন আর নানারকম তরকারিও হত বাগানে। জল দেবার জন্য বড় একটা কাঁচা কুয়ো ছিল বাগানে। পরিধি খুব বড় কিন্তু বেশী গভীর নয়।...

এই কুয়োটির একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল আমার কাছে। কুয়োর মধ্যে বড় বড় ব্যাঙ বাস করত অনেকগুলি। দুপুরবেলা সকলে বিশ্রাম নিতে ব্যস্ত থাকার সময় চুপি চুপি কোনদিন একা, কোনদিন ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে কুয়োর ধারে গিয়ে উঁচু হয়ে ঝুঁকে ব্যাঙ দেখতাম, ঢিল ছুঁড়ে চেষ্টা করতাম ব্যাঙ শিকারের। বাগান তখন একান্ত নির্জন থাকত। ধারে-কাছেও কেউ আসত না।

শরৎকালে কুয়োটার জল তখন মাঝামাঝি নেমেছে। ভাইকে সঙ্গে করে একদিন ব্যাঙ দেখতে গিয়েছি। ভাইটি আমার বেশি ঝুঁকতে গিয়ে ধুপ করে কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল। আমি বাড়ির দিকে ছুটলাম। ঘরের মধ্যে মেঝেতে পাটি বিছিয়ে মা আর দিদিরা কথা বলছেন পাড়ার আর এক বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে, পাশের ঘরে শুয়ে আছেন বড় জামাইবাবু আর মেজদা। দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালাম। কেমন একটা ভয় হল মনে। সবাই যদি ভাবে, আমি ঠেলা দিয়ে ফেলে দিয়েছি ভাইকে কুয়োর মধ্যে, মেজদা যদি শাসন করেন। বাড়ির মধ্যে মেজদাকেই ভয় করতাম। তাঁর শাসন ছিল বড় কড়া।...

ভয় হল, কিন্তু ওদিকে ভাইটা কুয়োয় পড়ে গেছে। তাই মা-র কাছে গিয়ে চুপি চুপি কানে কানে বললাম—মা, লালু কুয়োয় পড়ে গেছে। মা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন।...মা চেঁচিয়ে সবাইকে ডাকতে ডাকতে ছুটলেন। তাঁর পিছনে ছুটলেন বড়দি। অন্য সবাই ছুটল কয়েক হাত পিছনে।"[১]

তারপর দড়ি বালতি এল, বাঁশ এল, মই এল। লালুর জন্য কুয়োতে মানিকের মা আর বড়দি ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কুয়োতে অবশ্য তাঁদের ডুববার মত জল ছিল না। তারপর সবাই কুয়ো থেকে উঠে এলেন। এইটুকু ছেলে মানিকের ত ভয় পাওয়া উচিত ছিল, সে পালিয়েও যেতে পারত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানিক খবর দেওয়ায় সেদিন তার ছোট ভাই বেঁচে গিয়েছিল। তাঁর

১। আমার কান্না।

মেজদা তাকে বকুনি দিলেও এই সাহসিকতার জন্য মানিক সেদিন পুরস্কার পেল তাঁর বড় ভগ্নীপতির কাছে।

মানিক সেদিন ভয় পায়নি। পরেও তার ভয় ডর ছিল না। তার দুষ্টুমি একের পর এক বেড়েই চলে। মানিকের বয়স তখন ৫।৬ বৎসর। কিন্তু দুষ্টুমিতে সে পাকা। দুষ্টুমি করতে গিয়ে একের পর এক বিপদকেও সে ডেকে আনে। এই বয়সে মানিক একবার আলমারি চাপা পড়ে। আলমারির ওপরে ছিল ইঁদুরের বাসা। রোজই দেখে ইঁদুরগুলো সেখান থেকে লাফিয়ে আসে আর যায়। একদিন মানিকের মাথায় চাপল এক অদ্ভুত খেয়াল। ভাই সুবোধকে ডেকে বলে ওখানে যখন ইঁদুরের বাসা আছে তখন নিশ্চয়ই সেখানে তাদের বাচ্চাও আছে। 'চল আমরা ইঁদুরের বাচ্চা ধরে এনে পুষি!' ছোট ভাই তখুনি রাজী হয়ে গেল। কিন্তু আলমারীর মাথায় উঠবে কি করে? মানিক বলল, 'তুই আমার কাঁধে চড়, তারপর আলমারীর উপর তুই উঠে যা। বাচ্চাগুলো তুই আমার হাতে দে, আমি নামিয়ে রাখি'। তারপর সুবোধ ত আলমারীর উপরে উঠে গেল। কিন্তু একটুপরেই সুবোধ সহ আলমারী পড়ল উপুড় হয়ে। মানিক পড়ল চাপা। জখমও হল খুব। প্রায় মাসখানেক তাকে সেবার অসুস্থ থাকতে হয়েছিল।

মানিকের এরকম কুবুদ্ধি ছিল খুব। সেজন্য তাকে শাস্তিও পেতে হয়েছে। দাদাদের হাতে মারও কম খায়নি। তবু মানিকের স্বভাব বদলায়নি। মানিক কখনো কারুর কাছে আত্মসমর্পণ করত না। যতই উৎপীড়ন হোক নিজে তা সহ্য করেছে। মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করত। তবু হার স্বীকার করত না।

দু'চারজন ছাড়া তখন সকলে মনে করত, মানিক বোকা হাবা। আসলে সে তা ছিল না। মাঝে মাঝে তার অদ্ভুত তেজ আর জিদ, ধারালো বুদ্ধি আর পাকামির পরিচয় দিত। আসলে ছেলেবেলা থেকে তার মধ্যে ভাবাবেগের বন্যা থই-থই করত।

মানিকের ছেলেবেলার ধাত ছিল অদ্ভুত। যেমন প্রাণমনে ছিল তার আনন্দ-উল্লাস, যেমন সে ছিল দুরন্ত আর ছোটলোক ছেলেদের সঙ্গে একাকার হয়ে মিলেমিশে, ড্যাংগুলি খেলা থেকে যাচ্ছেতাই কথা বলায় কাটখোট্টা, তেমনি গভীর ছিল তার আবেগ, হতাশা ও বেদনা বোধ।

শুধু মোটা বোধ নয়। মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত দুর্বোধ্য একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি তাকে উদাস বিভোর করে রাখত। আর মনে হত তার সমস্ত 'কেন?'-র মানে যেন সে বুঝতে পেরেও একটুর জন্য বুঝতে পারছে না।

॥ ২ ॥

মানিকের প্রথম শিক্ষারম্ভ হয় কলকাতায়। বড়দার তত্ত্বাবধানে তাঁকে ভর্তি করা হল মিত্র ইনস্টিটিউশনে। তখন মিত্র ইনস্টিটিউশন ছিল কলকাতার নামকরা ভাল স্কুল এবং এখানে মানিক ভাল ছাত্র বলেই গণ্য হয়েছিল। পাঁচ ছয় বৎসর মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষালাভ করার পর তার দাদা চাকুরী নিয়ে বহুদূরে চলে যাওয়ায় মানিক পিতার কাছে টাঙ্গাইলে যায় এবং সেখান থেকেই আরম্ভ হয় তার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন।

এই টাঙ্গাইলেই মানিকের আরেকটি ফাঁড়া দেখা দেয়। তার বয়স তখন তেরো চৌদ্দ বৎসর। মানিক ছিল অকুতোভয়, সদাচঞ্চল, ডানপিটে, পাঠ্যপুস্তকে অমনোযোগী কিন্তু মেধাবী ছেলে। এই সময়কার তার জীবনসংশয়ের গল্প মানিক নিজেই লিখেছেন ১৩৫১-এর ভাদ্র সংখ্যা 'আগামী' পত্রিকায়। গল্পের নাম 'বড় হওয়ার দায়'।

"বাবা তখন টাঙ্গাইলে, ময়মনসিংহ জেলার একটা মহকুমা শহর।...

তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। সেবারের বর্ষার পর ম্যালেরিয়া ধরেছিল। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসায় ক'দিন স্কুল যাওয়া বন্ধ, ঘুরে বেড়ানো বন্ধ, কানে একটানা চলেছে কুইনিনের ভোঁ ভোঁ। কি করা যায়? কালীপূজা আসছে, বাজীই বানানো যাক।

একটা মোটা বেঁটে শিশিতে (?) বারুদ রেখে ঘরের বারান্দায় উবু হয়ে বসে পটকা বানাবার অন্য ব্যবস্থাগুলি সারছি, কাছে ঘেঁষে বসে আছে ছোট দুটি ভাই। সেই যে লালু নামে ভাইটিকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েও বাঁচিয়ে দেওয়ায় রসগোল্লা পুরস্কার পেয়েছিলাম, সে তার পরের ভাই।

আমি এদিকে একমনে ন্যাকড়ার ফালি, পাথরের কুঁচি ঠিক করছি; ওদিকে লালু করেছে কি, শিশি থেকে একটু বারুদ নিয়ে শিশিটার কাছে মাটিতে ফেলে ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে দেখতে গেছে জ্বলে কিনা।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজে শিশিটার বিস্ফোরণ এবং ছর্‌রাগুলির মতই টুকরো টুকরো কাঁচের আমাদের তিন ভায়ের অঙ্গে প্রবেশ। রক্তে বারান্দা ভেসে যাওয়া।

ঠিক সেই সময় বাবা কোথা থেকে বাড়ী ফিরছিলেন।

রাস্তা থেকেই শিশি ফাটার শব্দ আর বাড়ীর লোকের চীৎকার শুনে 'আমার সর্বনাশ হল রে' বলতে বলতে ছুটে ভিতরে এলেন এবং একজনকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে আমাদের রক্তপাত ঠেকাবার চেষ্টা করতে লেগে গেলেন।

প্রত্যেকের শরীরে আট দশটা করে ফুটো হয়েছে গভীর, সহজে কি রক্ত বন্ধ হয়। অতিরিক্ত রক্তপাতের জন্য আমরা খুব কাবু হয়ে পড়ছিলাম—সবচেয়ে বেশী কাবু হয়েছিল ছোট ভাইটি।

উবু হয়ে বসার জন্য হাত আর পায়েই কাঁচ ফুটেছিল—পায়েই বেশী।

তারপর ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। তিনজনে বিছানা নিলাম।

পরদিন কাঁচ বার করার পালা।

সরু ফুটো করে কাঁচ শরীরে ঢুকেছে, শলা ঢুকিয়ে আগে ঠিক করতে হবে কাঁচের টুকরোর অবস্থান, তারপর মাংস কেটে মুখ বড় করে বার করতে হবে।

ডাক্তারবাবু আমায় বললেন—তুমি বড়, প্রথমে তোমায় ধরব। একটা কথা মনে রাখতে হবে। তুমি বারুদ বানিয়েছ, বোকার মত কাঁচের শিশিতে বারুদ রেখেছ। তোমার জন্য ছোট ভাই দুটির এত কষ্ট। কাঁচ বার করার সময় তুমি যদি বেশী চেঁচামেচি কাঁদাকাটা কর, ওরা দু'জন ভয় পেয়ে ভড়কে যাবে। তুমি বড়—ব্যথা লাগলেও চেঁচানো চলবে না। বুঝতে পেরেছ?

সোজা কথাটা না বুঝে উপায় কি। অগত্যা দাঁতে দাঁত লাগিয়ে চোখ বুঝলাম। ক্ষতের মধ্যে শলা ঢুকিয়ে ডাক্তার যখন আস্তে আস্তে ভিতরে নেড়ে কাঁচ কোথায় আছে খোঁজেন, কাঁচ বার করার জন্য ছুরি কাঁচি চালান; তখন একটু চেঁচাবার অধিকার না থাকা যে কি ব্যাপার সেদিন খুব ভাল করেই টের পেয়েছিলাম।

কয়েকটা টুকরো অবশ্য বার করা গিয়েছিল সহজেই।

তবু সময় লেগেছিল অনেকক্ষণ।

শেষ ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে ডাক্তার বাবাকে বলেছিলেন—এ ত আশ্চর্য ছেলে, একটু শব্দ করল না!

ডাক্তার বা আত্মীয়স্বজন বোঝেন নি ব্যাপারটা, তাই তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। বীরত্ব বা অসাধারণ সহ্য শক্তির কোন পরিচয়ই আমি সেদিন দেইনি।

...আহত রক্তমাখা ভাই দুটির চেহারা, যন্ত্রণায় বিকৃত কাতর তাদের মুখ মনের চোখের সামনে রাখার জন্য, আমি কেন, ভাই দুটি ভয় পাবে ভড়কে যাবে জেনে ওই অবস্থায় কেউ চেঁচাতে পারে না।"

দুষ্টুমি ছাড়াও মানিকের মধ্যে এ সময়ে দেখা দিল আরেক ধরনের খেয়াল। "কিশোর মানিক টাঙ্গাইলের মাঠে ঘাটে ধান খেতের আলে-আলে ঘুরে বেড়াত উদভ্রান্তের মত, সঙ্গী হাতের বাঁশী। দরাজ গলায় যেমন গান গাইতে পারত, তেমনি বাঁশীও বাজাত চমৎকার। তার মন ছিল অতিরিক্ত ভাব ও কল্পনাপ্রবণ এবং দরদী।

এরপর তার মাথায় চাপে আর এক নেশা। ১৪।১৫ বৎসরের (বয়সটা ঠিক নয়, সম্ভবত ১৩।১৪ বৎসর হবে—লেখক) ছেলে স্কুলের ছাত্র মানিককে দু-তিনদিন খুঁজে পাওয়া যায় না। যায় কোথায়! জননী কেঁদেকেটে অস্থির, খোঁজ নিয়ে জানা যায় টাঙ্গাইলের নদীর ধারে যে নৌকাগুলি নোঙর করা থাকে, তাদের মাঝি মাল্লার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের মধ্যে সে দু'চারদিন থেকে আসে। নৌকার মধ্যে তাদের অন্ন খায় পরম তৃপ্তিতে। এ তার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। অদ্ভুত পাগলামি।...

"মাঝে মাঝে তাকে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের মধ্যেও দেখা যেত। তার মনে ছিল না ভয়-ডর, ছিল না পিতামাতার শাসন-ভীতি। গাড়োয়ানদের গল্প-গুজবে রাত বেশি হয়ে গেলে, একটি গাড়ির ভেতর ঢুকে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে থাকত,—বাড়ি ফিরে যাবার কথাটিও মনে পড়ত না। তার কৈশোরের এই বেপরোয়া ভাব—নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা—শাসন শৃঙ্খলার গণ্ডীতে না আসা ছিল তার পরবর্তী জীবনের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য।"[১]

টাঙ্গাইলে থাকবার সময়েই মানিকের জীবনে এক প্রচণ্ড আঘাত আসে। মানিক তখন সপ্তম/অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। ডবল নিমোনিয়ায় মানিকের মায়ের মৃত্যু হয় ১৯২২ সালের ২২ মে। মায়ের মৃত্যুর পর তাদের টাঙ্গাইলের বাস উঠে যায়। সকলেই চলে আসে কাঁথিতে। মানিকের মেজদা সন্তোষবাবু তখন সবে ডাক্তারি পাস করে সেখানে প্র্যাকটিশ আরম্ভ করেছেন। মানিক ভর্তি হয় কাঁথি মডেল হাইস্কুলে। কিন্তু বেশীদিন তার সেখানে পড়া হয়নি। মানিক হঠাৎ আক্রান্ত হয় কালাজ্বরে। সেই অবস্থায় মানিককে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মেদিনীপুরে তার বড়দির কাছে। দীর্ঘকাল রোগভোগের পর মানিক মেদিনীপুর জিলা স্কুলেই লেখাপড়া আরম্ভ করে। এই স্কুল থেকেই মানিক ১৯২৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে। আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক গণিতে লেটার পেয়ে মানিক প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ছাত্র হিসাবে মানিকের খুব সুনাম ছিল। সেজন্য প্রধান শিক্ষকসহ সকলেই তাকে ভালবাসতেন। কিন্তু মানিকের ধাত ছিল আলাদা। সে স্কুলের ভাল ছাত্র হয়েও ভাল ছেলের মত স্বভাব তার মোটেই ছিল না।

তখনকার স্কুল জীবনের এক সুন্দর কাহিনী মানিক পরবর্তীকালে 'অলৌকিক লৌকিকতা' গল্পে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

১। স্মরণ করি।

"অথচ বাংলায় বাবার বদলির চাকরি—ছ'মাস বা দু-এক বছর পরে পরেই এক মুল্লুক থেকে আর-এক মুল্লুকে ছুটতেন। হয়ত কুমিল্লা থেকে ময়মনসিংহ এবং সেখান থেকে একেবারে সাঁটাল অথবা মেদিনীপুরে।

সেবার একটানা বেশ কিছুদিন মেদিনীপুর সদরে ছিলেন। সহরের পাশেই কাঁসাই নদী—বর্ষাকালে ঘোলা জলে ফুলে ওঠে, শীতকালে বেরিয়ে পড়ে বালির চর, এখানে ওখানে পুকুর বা বিলের মত অগভীর জল।

সারা জেলাতে শালের বন। সহর ছেড়ে একটু পাড়ি দিলেই বনের নাগাল পাওয়া যেত। রেল লাইনের পাশে প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠ—ঝোপ ঝাড়, কাঁটাবন আর জামের গাছে ভরা।

আমার স্বভাব ছিল ভারি মন্দ। একদিকে যেমন ভালবাসতাম লাল ধুলোভরা সহরের নোংরা পুরানো ঘিঞ্জি লোকালয়, মোটেই হিসাব থাকত না যে যাদের সঙ্গে মিলছি-মিশছি, খেলাধুলো হৈ-চৈ করছি, তারা বয়সে বড় অথবা ছোট, সংসারের মাপকাঠিতে ভদ্র অথবা ছোটলোক—তেমনি ভালবাসতাম সহরের আশেপাশে শুধু কয়েকটা কুঁড়েঘর নিয়ে গড়া ছোট-ছোট গ্রাম, বর্ষায় ভরা আর শীতের শুকনো নদী, ফাঁকা মাঠ আর বুনো গাছের জাম এবং ছড়ানো সবুজ শালের ঐ বন।"

মানিক স্কুল পালানো পছন্দ করতেন, ইচ্ছে হলে কামাই করতেন। "ইচ্ছা হলে দু'একদিন স্কুল কামাই করতাম, স্কুলে হাজিরা দিয়ে পলায়ন করাটা আমার বরদাস্ত হত না।" মানিক এক একদিন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে চলে যেতেন ঐ গভীর বনের অনেক ভেতরে। তার ত ভয়-ডরের বালাই ছিল না। সেজন্য তার কোন পরোয়া থাকত না। ফিরতে অনেকদিন রাত হয়ে যেত। তবু ভ্রূক্ষেপ করত না। এই শালবনে বেড়ানোটা ছিল তার খুব পছন্দ।

মানিক তার স্কুল জীবন সম্বন্ধে পরবর্তীকালে[২] বলেছেন :

"প্রথম শিক্ষা কোথায়ও বাঁধাবাঁধি নিয়মে হয়নি। কখনও মহিষাদলে, কখনও টাঙ্গাইলে, কখনও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। সমস্ত স্কুল-জীবনটাই যেন ছন্নছাড়া। ক্লাসের পড়া খুব ভাল লাগত না। খেলায় ঝোঁক ছিল বেশী। মন মাঝে মাঝে দুর্দান্ত হয়ে উঠত। কখনও বা একা বসে বসে চিন্তা করতাম।"

২। ১৯৪৪ সালে ১১৩ ধর্মতলা ষ্ট্রীটে বসে পরিমল গোস্বামীর কাছে মানিক তার জীবনকথা বলেছিল (রবিবারের যুগান্তর, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬)।

মানিকের পিতার বদলির চাকরী ছিল বলেই দীর্ঘকাল তিনি একস্থানে থাকতে পারতেন না। তাঁর সঙ্গে পরিবারের লোকজনকেও ঘুরতে হত। মানিকও পিতার সঙ্গে ঘুরেছেন নানা জায়গায়—তমলুক, মহিষাদল, কাঁথি, গুইয়াদা, শালবনী, নন্দীগ্রাম, টাঙ্গাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানে। কোন জায়গায় তারা বেশীদিন থাকেন নি।

মানিক ছিল খুব ডানপিটে। সে আখড়ায় নামকরা কুস্তিগীরের সঙ্গে কুস্তী লড়ত। মারপিটেও মানিক ছিল খুব ওস্তাদ! একবার তার ছোট ভাই সুবোধকে দুদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে জানা গেল এক গুণ্ডা প্রকৃতির লোক তাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মানিক তাকে ডেকে বললেন, অমুক দিন তুই তোর দলবল নিয়ে মাঠে আসিস। আমি তোকে মজা দেখাব। নির্দিষ্ট দিনে সেই বদলোক তার দল নিয়ে হাজির। মানিক একলা। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানিক সেই লোকটাকে এমন মার মেরেছিল যার ফলে তাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল।

মানিকের এই বেপরোয়া ভাব তাকে অনেক সময় অনেক ভাল কাজেও উদ্যোগী করেছিল। তখন গ্রামে প্রায়ই আগুন লাগত। স্কুলের নিয়ম ছিল সে সময় কোন ছেলে স্কুলের বাইরে যেতে পারবে না। কিন্তু মানিক কোন শাসন মানে না। সে ঠিক ফাঁক বুঝে পালিয়ে যেত। পালিয়ে এসে ঐ আগুন নেভানোর কাজে লেগে যেত। ছোটবেলা থেকেই মানিকের ভয়-ডর ছিল না, ছিল না জীবনের প্রতি কোন মায়া।

মানিক ভাল গান গাইতে পারত। তার গলা ছিল দরাজ। ডি.এল. রায়ের গান: 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে কি মহাসঙ্গীত ভেসে আসে।' কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' প্রভৃতি গান মানিক খুব গাইত। মেদিনীপুরের অনেক হরিসভায়ও মানিককে গান গাইতে নিয়ে যাওয়া হত। নজরুলের 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল' গানটিও মানিকের খুব প্রিয় ছিল।

ম্যাট্রিক পাশের পর মানিককে ভর্তি করে দেওয়া হল বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ন মিশন কলেজে (Bankura Weslyon Mission College)। এই কলেজ থেকেই মানিক আই-এস-সি পাস করে প্রথম বিভাগে। এই কলেজে পড়ার সময়েই মানিক খুব স্মার্ট ছেলে। লম্বায় ছয় ফুটের বেশী। চোখে কাল ফ্রেমের চশমা। মানিক থাকত Ronaldsay Hostel-এ। এই সময়কার মানিকের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তার এক ক্লাস নীচে পড়া শ্রীজগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন—"মানিক অসম্ভব রকমের

কাঁচি Cigarette খেত। আমিও খেতাম, কম। মানিক বলত—কাঁচি সিগারেটের মত ভাল সিগারেট বোধ হয় আর নেই, মনে হয় কোকো দিয়ে mixture করা। মানিক Mathematic এবং Physics-এ অসম্ভব রকমের strong ছিল। মানিকের strong personality ছিল। একটু রিজার্ভ থাকত, খুব বেশী কারুর সঙ্গে মিশত না। প্রায়ই একলা থাকার চেষ্টা করত। বিকেলে আমি খেলাধুলা করতাম। আর মানিক দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যেত। আমার দু' একটি হিন্দুস্থানী বন্ধু ছিল, তারা গান বাজনা করত। মানিক তাদের সঙ্গেও মিশত। এই রকম কয়েক মাস যাবার পর মানিকের এক বন্ধু জুটল ওরই ক্লাসের একটি ছেলে, বোধ হয় পুরুলিয়ায় বাড়ি। তখন আমাদের মধ্যে অনেক রকমের Political Party ছিল— অনুশীলন, যুগান্তর ইত্যাদি।[৩] মানিক বিকেলে প্রায়ই সেই ছেলেটির সঙ্গে বেড়াত ও অনুশীলন পার্টিকে খুব support করত। এই ছেলেটির সঙ্গে গোপনে বেড়াত ও সামান্য সামান্য drink করত, অবশ্য regular খেত না। যখন আমি drink করার জন্য charge করলাম তখন পড়ার জন্য রাত্রি জাগার কৈফিয়ৎ দিত।"

মানিক ভাল কুস্তি লড়ত। সেজন্য মানিক ছিল খুব দুঃসাহসী। কোন ভয়-

৩। স্বেচ্ছাচারী বিদেশী শাসন, অর্থনৈতিক দুর্দশা, জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও কংগ্রেস নেতৃত্বের আপসনীতি—এই চারটি কারণের ফলে ভারতের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। বিদেশী শাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণা তাদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত করে তোলে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে 'অনুশীলন সমিতি' নামে প্রথমে স্থায়ীভাবে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের ব্যায়াম, লাঠিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত করে তোলা। আর লক্ষ্য ছিল ইংরেজ বিতাড়ন। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ, বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রচার কার্যের উপরেও জোর দিতেন। এই প্রচারবাদী দলের উদ্যোগে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই যুগান্তর পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি নতুন দল গড়ে ওঠে তার নাম যুগান্তর সমিতি। কেবল বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতে এমন কি খাস লণ্ডনেও এই সন্ত্রাসবাদীদের দুঃসাহসিক কাজে ইংরেজ শাসকদের চোখের ঘুম দূর হয়ে গিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় এই বৈপ্লবিক সংগ্রাম ব্যাপকতা লাভ করে। সরকারের প্রচণ্ড আক্রমণে বৈপ্লবিক সংগ্রাম মাঝে মাঝে স্তিমিত হয়ে পড়লেও সংগ্রামের জ্বালা সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে কখনো কমেনি। মাঝে মাঝে তা প্রবলাকার ধারণ করেছে। মানিক যখন কলেজের ছাত্র তখন এই বৈপ্লবিক উন্মাদনা ছাত্রদের মধ্যেই ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

ভয় তার জীবনে ছিল না। পরবর্তী কালে নানা ঘটনায় তার এই দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঁধাধরা রীতি-নীতি মেনে চলা মানিকের কোনদিন ভাল লাগত না। বাঁধন ছেঁড়ার দিকেই তার নেশা। বাঁকুড়া কলেজটি ছিল মিশনারীদের কলেজ। নিয়মের মস্ত কড়াকড়ি। সন্ধ্যা সাতটার পর ছাত্রদের হোষ্টেলের বাইরে থাকা ছিল অপরাধ। মানিক খেয়ালী। একদিকে কুস্তি লড়ে। অন্যদিকে বাঁশী হাতে ঘন্টার পর ঘন্টা রেল লাইনের ধারে বিরাট মাঠের একপাশে বসে বাজিয়ে যেত। ঘরে ফেরার কথা খেয়ালই থাকত না। ফলে প্রায়ই হত নিয়মভঙ্গ। ইংরেজ অধ্যক্ষের কাছে তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হত। রাতেও অনেক সময় তার বাঁশীর আওয়াজ সকলের কানে যেত। পরবর্তীকালে মানিকের অনেক গল্প উপন্যাসে এই বাঁশী বাজানোর কথা আছে। 'চালচলন' উপন্যাসে খামখেয়ালী সুনীল গভীর রাতে বাঁশী বাজায়। এই সুনীল যেন মানিক নিজে।

মানিক ১৯৪৪ সালে শ্রীপরিমল গোস্বামীর নিকট নিজের জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"বাঁকুড়া কলেজে 'জ্যাকসন' নামক এক অধ্যাপক আমার উপর খুব প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি আমাকে বাইবেল পড়ান। সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স কোরে ভর্তি হই এবং কাজ শিখি ও ডিপ্লোমা পাই। বাইবেল আমি খুব যত্ন করে পড়েছিলাম, এই সময়ে আমার মন থেকে ধর্ম বিষয়ে সকল রকম গোঁড়ামি দূর হয়ে যায়।"[৪]

এই বাঁকুড়া কলেজ থেকে মানিক ভালভাবে প্রথম বিভাগে আই.এস.সি পাশ করে। তখন ১৯২৮ সাল। পিতা খুশি হয়ে মানিককে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে Mathematics-এ অনার্স সহ B.Sc-তে ভর্তি করিয়ে দিলেন। তার পিতা তখন অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় এসে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বালীগঞ্জের হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে সকলকে নিয়ে বাস করেন।

৪। যুগান্তর, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬।

॥ ৩ ॥

১৯২৮ সাল মানিকের জীবনে এবং বাংলা সাহিত্যেও একটি স্মরণীয় বৎসর কলকাতায় এসে মানিক পাঠ্য-অপাঠ্য নানা পুস্তক পড়তে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের কল্পনার জাল বোনে। এই সময়ের কথা মানিক নিজেই লিখেছেন তার 'গল্প লেখার গল্প'তে :

"বাংলা তেরোশ' পঁয়ত্রিশ সাল। কলেজে পড়ছি বি.এস.সি। অনার্স নিয়েছি অঙ্কে। অঙ্কের মত এমন আর কি আছে? এত জটিলতায় এমন চুলচেরা নিয়ম! রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা ত অভিনব কাব্য—ছ্যাবলামি, নেকামি, হাল্কা ভাবপ্রবণতার চিহ্নও নেই।

ক্লাসে বসে মুগ্ধ হয়ে লেকচার শুনি, লেবরেটরিতে মশগুল হয়ে এক্সপেরিমেন্ট করি; নতুন এক রহস্যময় জগতের হাজার সঙ্কেত মনের মধ্যে ঝিকমিকিয়ে যায়! হাজার নতুন প্রশ্নের ভারে মন টলমল করে। ছেলেবেলা থেকে 'কেন?' নামক মানসিক রোগে ভুগছি, ছোট বড় সব বিষয়ের মর্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ যে রোগের প্রধান লক্ষণ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানা চাই। বিষয় তুচ্ছ হোক, জ্ঞান হিসাবে বিশেষ দাম না থাক, ছেলেমানুষেরও সেটা জানা থাকে—যতক্ষণ সেটিকে তুলোধুনো করে না ঘাঁটছি, হজম করা খাদ্যকে রক্তে মাংসে পরিণত করার মত পরিণত না করছি উপলব্ধিতে, আমার শান্তি নেই। ক্লাস এগিয়ে যায় বহুদূর, আমি মেতে থাকি দু'মাস আগে পড়ানো বিদ্যুতের এক অদ্ভুত ব্যবহার নিয়ে। স্বভাব আজও আমার যায়নি। একটু যা পড়ি আর একটু যা শুনি তাই নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করে আমার সময় যায়—রাশি রাশি পড়া আর শোনার রীতি-মাফিক পড়াশোনা আর হয়ে ওঠে না।

জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে একটি উপলখণ্ড কুড়িয়েই গিলে ফেলে আরেকটির দিকে হাত বাড়াতে পারি না—গেলার আগে পরে অনেকরকম প্রক্রিয়া করতে হয়। পাথর হজম করা ত সহজ নয়!

বিজ্ঞান প্রায় সুয়োরাণী হয়ে বসেছিল আমার উপর, শুধু আমার এই স্বভাবের জন্য আমাকে আয়ত্ত করে উঠতে পারল না। বৈজ্ঞানিকও হতে পারলাম না, পণ্ডিত ব্যক্তি হওয়াও ঘটে উঠল না—জীবনটা কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হল উপন্যাস লিখে।"

এই উপন্যাস লেখার প্রবণতাও মানিকের মধ্যে দেখা দিল আকস্মিকভাবে।

তার জন্য মানিকের কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না। ছিল না লেখক হবার কোন গোপন আকাঙ্ক্ষা। এমন কি, বি.এস.সি পড়বার সময়েও সেই দিকে খেয়াল হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য তবু তিনি লেখক হলেন। সে কথা মানিক নিজেই লিখেছেন:

"লিখতে শিখে লেখক হবার সাধ কবে জেগেছিল মনে নেই—বোধ হয় ছেলেবেলাতেই লুকিয়ে লুকিয়ে যখন নিষিদ্ধ বই পড়তাম, তখন। বারো-তেরো বছর বয়সের মধ্যে বিষবৃক্ষ, গোরা, চরিত্রহীন পড়া হয়ে গিয়েছে। আর সে কি পড়া! এ রকম একখানা বই পড়তাম আর তার ধাক্কা সামলাতে তিন-চারদিন মাঠে-ঘাটে, গাছে-গাছে, নৌকায়-নৌকায়, হাটে-বাজারে, মেলায় ঘুরে আর হৈ-চৈ মারামারি করে কাটিয়ে তবে সামলে উঠতাম। বড় ঈর্ষা হত বই যাঁরা লেখেন তাঁদের উপর। হয়ত সেই ঈর্ষার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল একদিন লেখক হবার চেষ্টা করার সাধ।

লেখক হবার ইচ্ছে সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইনি। স্কুল-জীবনের শেষের দিকে ইচ্ছেটা অল্পে অল্পে নিজের কাছে ধরা পড়েছিল। কিন্তু সে ইচ্ছে হাত মেলেছিল বহুদূরের ভবিষ্যতে—সঙ্গে সঙ্গে লেখবার তাগিদ যোগায়নি। অধিকাংশ স্কুল কলেজে হাতে-লেখা মাসিক পত্র থাকে। সারা বাংলায় ছড়ানো গোটা-দশেক স্কুলে আর মফঃস্বল ও কলকাতায় গোটা-তিনেক কলেজে আমি পড়েছি। লিখব? —এই বয়স আমার! বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা কিছু আমার নেই। কোন্ ভরসায় আমি লিখব? লেখা ত ছিনিমিনি খেলা নয়! বাড়িতে লুকিয়ে লেখার চেষ্টাও আমি কখনও করিনি। আমার অধিকার নেই বলে।

১৩৩৫ সালেও, যে বারে আমি প্রথম লেখা লিখি—আমার এ মনোভাব বদলায়নি। বরং আরও স্পষ্ট একটা পরিকল্পনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বয়সের সীমা ঠিক করেছি। তিরিশ বছর বয়সের আগে কারো লেখা উচিত নয়—আমি সেই বয়সে লিখব। এর মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে সব দিক দিয়ে। কেবল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় নয়। নিশ্চিন্ত মনে যাতে সাহিত্যচর্চা করতে পারি তার বাস্তব ব্যবস্থাগুলিও ঠিক করে ফেলব।"[১]

মানিকের মন ছিল বৈজ্ঞানিকের। সেজন্য কল্পনার রঙীন ফানুস ওড়াতে তিনি চাননি। হৃদয়াবেগের চেয়ে সহজ যুক্তি-বিজ্ঞানের উপর তিনি নির্ভর করতেন বেশী। বৈজ্ঞানিকের মতই তিনি জীবনকে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ করে তার থেকে একটা সামান্য সূত্র আবিষ্কার করতেন। একটা ছক কেটে, তৈরি হয়ে, পরিকল্পনা

১। গল্প লেখার গল্প।

অনুযায়ী কাজ করার দিকেই ছিল তার ঝোঁক। এমনকি মানিক যখন রেস খেলার মাঠে যেতেন তখনও তিনি সাধারণ জুয়াড়ীর মত ছিলেন না। ছক কেটে, অঙ্ক কষে তবেই তিনি কোন ঘোড়ার ওপর বাজী ধরতেন। তার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে শ্রীপরিমল গোস্বামী ১৯৫৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের যুগান্তর পত্রিকায় লিখেছেন :

"একদিন শুনলাম সে রেস খেলে। এ সম্পর্কে তার সঙ্গে একদিন আলোচনা করতে গিয়ে দেখি এখানেও তার নিজস্ব একটি থিওরি আছে।

আমি নিজে রেস খেলা সিনেমায় ভিন্ন অন্য কোথাও দেখিনি, ও সম্পর্কে আমার ধারণাও স্পষ্ট ছিল না, তবে এইটুকু জানা ছিল যে, ও একটি প্রচণ্ড নেশা, ওতে জেতা নিতান্তই দৈবের ব্যাপার এবং যতই যেতা যাক্ শেষ পর্যন্ত পরাজয় হবেই।

মানিককে সেইভাবেই বলতে গিয়েছিলাম, উপদেশ দিতে নয়, আরও জানতে। কিন্তু মানিক আমার কথা দু-এক মিনিট শুনেই খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে লাগল, 'রেস খেলা আমার কাছে আর চান্সের খেলা থাকবে না'।

হাতে একখানা খাতা ছিল, সেখানা দেখিয়ে বলল—'অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছি এর মধ্যে থেকে একটা নিয়ম আবিষ্কার করতে। জানেন, দিনের পর দিন আমি অঙ্ক কষে চলেছি আগের সব খেলার ফলাফল মিলিয়ে। এর মধ্যে একটা 'ল' আছেই, এবং সেটি আমি আবিষ্কার করবই। কার্য কারণ সম্পর্ক সব কিছুর মধ্যেই আছে, হিসেবে যতই এগোচ্ছি, ততই আমার মনে হচ্ছে পথ পাব নিশ্চয়'।

জোরের সঙ্গে বলল—'এ খেলা আর চান্সের খেলা থাকবে না। চান্সের খেলা সবার কাছেই মনে হয়, কিন্তু অনেক বছরের খেলা তুলনামূলক বিচার করে কেউ কি এর মধ্যেকার 'ল' আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে? কেউ করেনি, তাই আমি করছি। চান্স এণ্ড প্রোব্যাবীলিটিরও একটা নির্দিষ্ট অনুপাত আছে, কার কতবার সফল বা বিফল হওয়ার সম্ভাবনা, তাও ত বলে দেওয়া যায়। দেখবেন, আমিও পেয়ে যাব পথ'।"

কিন্তু অঙ্ক কষে রেস খেলায় জেতা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তেমনি সম্ভব হয়নি পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহিত্য রচনা করা। নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্যচর্চা শুরু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার পূর্বেই আকস্মিক ঘটনার ঝড়ে তাঁর পরিকল্পনার সব স্বপ্ন ভেঙে গেল। মানিক বাংলা সাহিত্যে লেখনী ধারণ করলেন। কেউ ভাবেনি

তার পক্ষে এ কাজ সম্ভব হবে। মানিক নিজেও মনে করতেন না সম্ভব। তবে তখন কলেজে বিজ্ঞান-প্রেমের সঙ্গে লেখার সঙ্কল্পও দৃঢ়তর হতে লাগল। তার তখনকার মুখর অনুভূতি সম্বন্ধে মানিক লিখেছে, "কলেজ থেকে তখনকার বালিকা বালিগঞ্জের বাড়িতে ফিরতাম, আলোহীন পথহীন অসংস্কৃত জলার মত লেকের ধারে গিয়ে বসতাম—চেনা অচেনা কোন একটি প্রিয়ার মুখ স্মরণ করে একটু চলতি কাব্যরস উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে। ভেসে আসত নিজের বাড়ির আত্মীয়-স্বজন আর পাড়াপড়শীর মুখ, জীবনের অকারণ জটিলতায় মুখের চামড়া যাদের কুঁচকে গিয়েছে। ভেসে আসত স্টেসনে ও ট্রেনে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মুখ—তাদের আলাপ আলোচনা, ভেসে আসত কলেজের সহপাঠীদের মুখ—শিক্ষার খাঁচায় পোরা তারুণ্য-সিংহের সব শিশু, প্রাণশক্তির অপচয়ের আনন্দে যারা মশগুল। তারপর ভেসে আসত খালের ধারে, নদীর ধারে, বনের ধারে বসানো গ্রাম—চাষী, মাঝি, জেলে, তাঁতিদের পীড়িত ক্লিষ্ট মুখ। লেকের জনহীন স্তব্ধতা ধ্বনিত হত ঝিঁঝিঁর ডাকে, শেয়াল ডেকে পৃথিবীকে স্তব্ধতর করে দিত, আবার চোখ ঠারত আকাশের হাজার ট্যারা চোখের মত, কোনদিন উঠত চাঁদ। আর ওই মুখগুলি—মধ্যবিত্ত আর চাষাভুষো—ওই মুখগুলি আমার মধ্যে মুখর অনুভূতি হয়ে চ্যাঁচাত—ভাষা দাও—ভাষা দাও।"[২]

ভাষা দেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে মানিক তখনো সচেতন ছিলেন না। প্রেসিডেন্সী কলেজে সাহিত্য বিষয়ে বিতর্কে শুধু যোগ দিতেন। বাংলা দেশে তখনো তিনি মানিক নামে পরিচিত হননি। বন্ধু বান্ধবরা তাকে তার অফিসিয়াল নাম প্রবোধকুমার নামেই জানত। এই বন্ধু বান্ধবের তর্ক-বিতর্কে একদিন বাজি রেখে মানিক লিখলেন তার প্রথম গল্প।

"একদিন কলেজের কয়েকজন বন্ধু সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছে। শৈলজানন্দ, প্রেমেন, অচিন্ত্য, নজরুল—এদের নিয়ে সম্প্রতি হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে—সাহিত্যের দুর্গরক্ষী সিপাইরা কাঠের বন্দুক উঁচিয়ে দুর্দাম চীনা পটকা ফাটিয়ে লড়াই শুরু করেছে। আলোচনা গড়াতে গড়াতে এসে ঠেকল মাসিকপত্রের সম্পাদকদের বুদ্ধিহীনতা, পক্ষপাতিত্ব, দলাদলি প্রবণতা ও উদাসীনতায়।

নামকরা লেখক ছাড়া ওরা কারুর লেখা ছাপায় না। দলের লেখক হলে ছাপায়

২। লেখকের কথা।

—ব্যস। অন্য কেউ পাত্তা পাবে না।

একজনের তিনটি লেখা মাসিকের আপিস থেকে ফেরত এসেছিল। সে সম্পাদকদের কুৎসিত একটা গাল দিল—কলেজের ছেলেরা যা দেয়। সম্পাদকদের না হোক অন্যদের আমিও যে ধরনের গাল গায়ের জ্বালায় কম বয়সে দিয়েছি।

তর্কে আমার চিরদিনের বিতৃষ্ণা। অবিবেচক ছেলেটার অন্যায় মন্তব্যে বড় রাগ হল।

বললাম, 'কেন বাজে কথা বকছো? ভাল লেখা কি এত সস্তা যে হাতে পেয়েও সম্পাদকেরা ফিরিয়ে দেবেন? মাসিকগুলি ত পড়, মাসে ক'টা ভাল গল্প বেরোয় দেখেছ? সম্পাদকেরা কি পাগল যে, ভাল গল্প ফিরিয়ে দিয়ে বাজে গল্প ছাপবে? ভাল দূরে থাক, চলনসই একটা গল্প পেলে সম্পাদকেরা নিশ্চয় সাগ্রহে সেটা ছেপে দেয়।'

...অনেক কথা কাটাকাটির পর বাজি রাখা হল।.. বাজি হল এই: আমি একটি গল্প লিখে তিন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ, প্রবাসী বা বিচিত্রায় ছাপিয়ে দেব। যদি না পারি—সে কথা আর কেন?

আমি জানতাম পারব। কোনদিন এক লাইন লিখিনি, কিন্তু গল্প ত পড়েছি অজস্র। সাহিত্য হবে না, সৃষ্টি হবে না, কিন্তু সম্পাদক ভুলান গল্প নিশ্চয় হবে। আমি কেন, যে কেউ চেষ্টা করলেই এরকম গল্প লিখতে পারে।" ৩

গল্প লেখা ঠিক হল কিন্তু কী নিয়ে গল্প লিখবেন তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। চিরাচরিত পথে যেতে তাঁর মন উঠল না। এ বিষয়ে মানিক নিজেই যা লিখেছেন তাতে মানিকের দৃষ্টিভঙ্গীর একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাবে:৪

"ভাবতে লাগলাম কি নিয়ে গল্প লিখব! প্রেমের গল্প? হ্যাঁ, প্রেমে গল্পই লিখতে হবে। বাংলা মাসিকের প্রায় সব গল্পই একরকম প্রেম নি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা হয়। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে, তাদে প্রেম হল, বিয়েতে বাধা পড়ল, বাধা কেটে মিলন হল, এই রকম গ একটা লিখব ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে! মন সায় দিল না। মন বলল, প্রেমে গল্প লিখতে চাও লেখ, কিন্তু পচা দুর্গন্ধ হ্যাবলামির গল্প লিখ না—বাংলার ছেলে মেয়েগুলো যে গোল্লায় গেল এরকম গল্প পড়ে পড়ে।

৩। গল্প লেখার গল্প।
৪। ঐ

…তখন মনে পড়ল পূর্ববঙ্গের এক স্বামী-স্ত্রীর কথা। বাস্তব জীবনে নাটকীয় প্রেমের চরম অভিজ্ঞতা ওদের দেখেই আমি পেয়েছিলাম। স্বামী বাঁশী বাজাতেন। বাঁশের বাঁশী নয়, ক্ল্যারিওনেট। প্রায় পায়ে ধরে তাঁকে আসরে বাজাতে নিয়ে যেতে হত—গিয়েও খুশী হলে বাজাতেন। নইলে বাজাতেন না। বাড়িতে বাজাতেন—শুধু স্ত্রীকে শ্রোতা রেখে। বছরখানেক আমি শুনেছিলাম। বেশিক্ষণ বাজালে তাঁর গলা দিয়ে রক্ত পড়ত।

এদের অবলম্বন করে এক ঘোরাল ট্র্যাজিক প্লট গড়ে তুলে গল্প লিখলাম। নাম দিলাম 'অতসীমামী'। ভাবলাম, এই উচ্ছ্বাসময় গল্প, নিছক পাঠকের মন ভুলান গল্প, এতে নিজের নাম দেব না। পরে যখন নিজের নামে ভাল লেখা লিখব, তখন এই গল্পের কথা তুলে লোকে নিন্দে করবে। এই ভেবে বন্ধু ক'জনকে জানিয়ে, গল্পে দিলাম ডাক নাম—মানিক।"[১]

এই গল্প তিনি দিয়ে আসেন বিচিত্রা আপিসে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের হাতে। মানিক বাজী জিতে গেলেন। তাঁর গল্প শুধু ছাপাই হল না, বিচিত্রার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং গল্পের জন্য পারিশ্রমিক দিয়ে গেলেন পনেরো টাকা আর এক খণ্ড বিচিত্রা এবং দাবী জানিয়ে গেলেন আরো গল্প চাই।

১। গল্প লেখার গল্প।

॥ ৪ ॥

হঠাৎ একটা গল্প লিখে মানিক লেখক হয়ে গেলেন। সাধারণত লেখক হতে গেলে "হাত মক্স করতে হয়—কঠিন সাধনায় জীবনপাত পরিশ্রমে মক্স করতে হয়। কেরানীর বেশী খেটে লিখতে না শিখে জগতে আজ পর্যন্ত একটি ছোটখাটো লেখকও লেখক হতে পারেন নি।...সাহিত্য সাধনার জিনিস।"[১] কিন্তু মানিক তা কখনো করেন নি। এমন কি অধিকার নেই বলে কখনো বাড়িতে লুকিয়ে লেখার চেষ্টা করেন নি। তবু তিনি লেখক হলেন। হলেন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে। বাংলা সাহিত্যে এরকম আকস্মিকভাবে আরেকজন যুগন্ধর মহাকবির আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, "একদিন রত্নাবলীর অভিনয়াভ্যাস (Rehearsal) দেখিতে দেখিতে মধুসূদন গৌরদাসবাবুকে বলিলেন, 'দেখ কি দুঃখের বিষয় যে, এই একখানা অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন।' গৌরদাসবাবু শুনিয়া বলিলেন, '...ভাল নাটক পাইলে আমরা রত্নাবলী অভিনয় করিতাম না; কিন্তু ভাল নাটক বাঙ্গালা ভাষায় কোথায়?' মধুসূদন বলিলেন, 'ভাল নাটক? আচ্ছা, আমি রচনা করিব।' গৌরদাসবাবু শুনে হেসেছিলেন। কারণ যিনি কিছুদিন পূর্বে বাংলা রচনায় পৃথিবী লিখতে প্র-থি-বি লিখে এসেছিলেন তিনি লিখবেন নাটক! কিন্তু কয়েকদিন পরেই যখন মধুসূদন তাঁকে শর্মিষ্ঠার পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ দেখতে দিলেন তখন গৌরদাস বিস্মিত না হয়ে পারেন নি।

বিখ্যাত ছোট-গল্পকার গী দ্য মোপাসাঁ 'ব্যুল দ্য সুইফ' (Boul De Suif)—এই একটি মাত্র গল্প লিখেই এমন খ্যাতি অর্জন করলেন, প্রতিষ্ঠালাভ করলেন, যা অন্য কোন লেখকের ভাগ্যে জোটেনি। এই একটি গল্প ফরাসী সাহিত্যে অতুলনীয় আলোড়ন সৃষ্টি করে মোপাসাঁকে বিখ্যাত করে দিয়েছিল। তেমনি 'অতসীমামী' এই একটিমাত্র গল্প মানিককে বাংলা সাহিত্যে লেখকরূপে প্রতিষ্ঠিত করল।

এই প্রসঙ্গে আরেকজন বিশ্ববিখ্যাত লেখকের নাম করা যায়। তিনি হলেন রাশিয়ার ম্যাকসিম গোর্কী। তিনিও জীবনে লেখার কোনও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া একটি মাত্র গল্প লিখে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছেন। ১৮৯২ সালে গোর্কী

১। গল্প লেখার গল্প।

প্রথম লিখলেন তাঁর বিখ্যাত গল্প 'মাকার চুদ্রা'। এই গল্প থেকেই গোর্কীর সাহিত্য জীবনের শুরু। মানিকেরও সাহিত্য জীবন শুরু হল একটি মাত্র গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। মানিকের জীবনের গতি গেল বদলে।

মানিকের মন তখন কল্পনার জাল বোনে। তাঁর দৃষ্টি যায় দেশ-বিদেশের পাঠ্য অপাঠ্য নানা বইয়ের দিকে। মানিক ছিলেন মেধাবী ছাত্র। বেশি পড়বার দরকার হয় না। তবু তাঁর পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আর তেমন আকর্ষণ নেই। সেখানে দেখা দিল অবহেলা। মানিক গোপনে গল্প লিখতে আরম্ভ করলেন। ফলে B.Sc পরীক্ষায় ফেল করলেন। মানিকের বন্ধু-বান্ধব তাঁর পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় বিস্মিত হল।

তারপর থেকে মানিক কেমন উদাসীন হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তিনি যেন কী গভীর চিন্তা করতেন। হয়ত লেখক হবার স্বপ্ন! পরের বছর মানিক আবার পরীক্ষা দিলেন। সীট পড়ল City College-এ। মানিক পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তরে আবোল তাবোল লিখে বেরিয়ে যেতেন। ফলে আবার তিনি ফেল করলেন।

পরীক্ষায় ফেল করায় মানিককে তাঁর পরিবারে দিতে হল কৈফিয়ৎ। তাঁর বৈজ্ঞানিক দাদা তখন বম্বের কোলাবা অবজারভেটরীর ডিরেক্টর। তিনিই নিয়মিত পাঠান ভাইয়ের পড়ার খরচ। পরপর দু'বার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় তিনি চেয়ে পাঠালেন কঠোর কৈফিয়ৎ—কেন তিনি পাঠ্য-পুস্তকে মন না দিয়ে পরীক্ষায় ফেল করলেন।

"মানিক অকুতোভয়ে জানান—তাঁর পাঠ্যপুস্তক পড়ার সময় নেই—তার বদলে সমস্ত বৎসর পড়েন রাশিকৃত বিদেশী লেখকের লেখা গল্প ও উপন্যাস। তার মধ্যে রাশিয়ার লেখকই বেশী। সেই সব লেখক ও তাদের পুস্তকের এক বিরাট তালিকা পাঠিয়ে দেন বিস্মিত দাদাটির নিকট—যিনি জীবনে পাঠ্যপুস্তক ও বৈজ্ঞানিক কেতাব ভিন্ন কোন গল্প উপন্যাসের পাতা উল্‌টিয়ে দেখেছেন কিনা সন্দেহ।

বিপরীতধর্মী দাদা ও ভাইয়ের মধ্যে সে সময় হয় বহু পত্র বিনিময়। দাদা লেখেন—আগে মন দিয়ে পাঠ্যপুস্তক পড়ে পরীক্ষায় পাশ কর, তারপর তোমার ইচ্ছামত যত খুশি গল্প লিখো ও পড়ো।

মানিক লেখেন—গল্প উপন্যাস লেখা ও পড়া আমি ছাড়তে পারব না। কাজেই কলেজের পড়াই আমায় ছাড়তে হবে। তবে আপনি দেখে নেবেন, কালে এই লেখার মাধ্যমেই আমি বাংলার লেখকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান করে নেব।

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সমপর্যায়ে আমারও নাম ঘোষিত হবে।"[২]

মানিক নিজেই শ্রীপরিমল গোস্বামীর কাছে স্বীকার করেছিলেন, "১৯৩০ সালের কোন সময়ে আমার জ্যেষ্ঠের সঙ্গে লেখা নিয়ে আমার কিছু মনান্তর ঘটে, তিনি এ সময় আমার লেখায় যেতে থাকার বিরোধী ছিলেন এবং এ নিয়ে আমাকে একখানা চিঠি লেখেন। আমি এজন্য বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে মেসে[৩] চলে আসি। এরপর বছর দুই আমাকে ভাগ্যের সঙ্গে খুব লড়াই করতে হয়।"[৪]

মানিকের আর শেষ পরীক্ষা দেওয়া হল না। অবশ্য তৃতীয়বারও মানিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। মানিকের ছোট ভাই সুবোধবাবু তাঁদের পিতাকে নিয়ে মুঙ্গেরে চলে যান। তিনি তখন মুঙ্গেরে ব্যবসা করেন। দ্বিতীয়বার ফেল করায় বড় দাদা মানিকের খরচ দেওয়া বন্ধ করেছেন। তখন সুবোধবাবুই পিতার আদেশে মানিককে মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য করতেন।

মানিক পরীক্ষা পাশের ব্যর্থ চেষ্টা পরিত্যাগ করে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন।

২। স্মরণ করি। অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। আমহার্স্ট স্ট্রীটের এক মেস।

৪। রবিবারের যুগান্তর, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬।

॥ ৫ ॥

মানিক নিজেই লিখেছেন, "ছাত্র বয়সে আমি যখন লেখা শুরু করি তার কয়েক বছর আগে কল্লোল যুগ আরম্ভ হয়েছে।"[১] "ভারতীর আসর ভাঙিয়া আসিলে, দলভাঙা কয়েকজন তরুণ-অতরুণ লেখক ঢাকা গ্রুপের সহযোগিতায় কলিকাতায় 'কল্লোল' পত্রিকা বাহির করিলেন (১৯২৩)। কল্লোলের বীজ বোনা হইয়াছিল ঢাকায়,—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের বার্ষিক পত্রিকা 'বাসন্তিকা'য় (১৯২২)। স্বভাবতই বিদ্যালয় ও ছাত্র নিবাসের আওতায় এ-বীজ সতেজে প্ররূঢ় হইতে পারে নাই। কল্লোলের প্রবাহ কিয়দ্দূর গড়াইলে পর ইহার একটি শাখা বাহির হইয়াছিল ঢাকায়—প্রগতি (১৯২৭)। কলিকাতায় আগেই হইয়াছিল—'কালি কলম' (১৯২৬)। তখন সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক শরৎচন্দ্রের গল্পে মশগুল ও কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার ভক্ত পাঠক।"[২] এই কল্লোল যুগের লেখকরা রবীন্দ্রনাথকে পরিহার করে সাহিত্যে বাস্তবতার প্রধান উদ্গাতা হলেন। তারা কল্পনার ঘোড় দৌড় ছেড়ে জীবনের চারিপাশের দিকে দৃষ্টি দিলেন। "অর্থাৎ মোগলাই ভারতবর্ষ ও বঙ্কিমী বাঙ্গালা ও গার্হস্থ্য কলিকাতা ছাড়িয়া সমাজের দরিদ্র কুৎসিত অবজ্ঞাত ও ছায়াচ্ছন্ন অংশের দিকে নজর দিলেন।"[৩]

তখনকার পত্র পত্রিকার মধ্যে 'প্রবাসী' ছিল শ্রেষ্ঠ ও অভিজাত। তারপরেই আছে 'ভারতী'। কন্টিনেন্টাল উপন্যাসের অনুবাদ ও সাহিত্যে বাস্তব প্রবণতা এই পত্রিকায়ই প্রথম দেখা দিল। তাছাড়া তখন সবুজপত্রের যুগও চলছে। আসলে এই সবুজপত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীই গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে তিনিই প্রথম সরে আসা মানুষ। বিষয়ের দিক থেকে না হোক মনোভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে। আর দ্বিতীয় মানুষ হলেন কবি নজরুল।

নজরুল সৈনিক কবি, বিদ্রোহী কবি এবং বিদ্রোহীর কবি। নজরুল লিখলেন, "আমি ইন্দ্রাণী সুত, হাতে চাঁদ ভালে সূর্য; মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য।...আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন; আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।" এই নজরুল বের করলেন

১। সাহিত্য করার আগে (লেখকের কথা)।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)—ডঃ সুকুমার সেন।

৩। ঐ

'ধূমকেতু' পত্রিকা (১৯২২)। এই কাগজে থাকত কালির বদলে রক্তে ডুবিয়ে ডুবিয়ে লেখা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ।

ধূমকেতুর পূর্বে বাংলা দেশে শ্রমজীবীদের প্রথম মুখপত্র 'সংহতি' বের হল কল্লোলের সমসাময়িক কালে। 'লাঙল', 'গণবাণী' ও 'গণশক্তি' এসেছিল অনেক পরে। সংহতির সম্পাদক হলেন জ্ঞানাঞ্জন পাল ও মুরলীধর বসু। এই পত্রিকায় নারায়ণ ভট্টাচার্য লিখলেন 'দিন-মজুর' গল্প। আর শৈলজানন্দ লিখলেন 'কয়লাকুঠি' আর 'বাঙ্গালী-ভাইয়া'; পরে পুস্তকাকারে এর নাম হল 'মাটির ঘর'। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখলেন 'পাঁক'। নোংরা পুকুর ঘেরা দু-একটা ভাঙা খোলায় ছাওয়া গরীবদের বস্তী-জীবনকে কেন্দ্র করে।

অন্যদিকে তখন বের হল দীনেশরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় কল্লোল (প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৩৩০)। একে কেন্দ্র করে যে লেখকগোষ্ঠি জড় হলেন তাঁরা হচ্ছেন—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, গোকুলচন্দ্র নাগ প্রভৃতি। এই পত্রিকায় প্রধান হয়ে উঠল রোমান্টিক ভাববিলাস। কল্লোল যুগের অন্যতম শরিক অচিন্ত্য সেনগুপ্ত লিখেছেন, "বস্তুত কল্লোল যুগে এ দুটোই প্রধান সুর ছিল, এক প্রবল বিরুদ্ধবাদ, দুই বিহ্বল ভাববিলাস। একদিকে আনিয়াছিল দক্ষতা, অন্যদিকে সর্বব্যাপী নিরর্থকতার কাব্য। একদিকে সংগ্রামের মহিমা, অন্যদিকে ব্যর্থতার মাধুরী। আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারিত হচ্ছে—এই যন্ত্রণাটা সেই যুগের যন্ত্রণা। শুধু বন্ধ দরজায় মাথা খুঁড়ছে, কোথাও আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না, কিংবা যে জায়গায় যাচ্ছে তা তার আত্মার আনুপাতিক নয়—এই অসন্তোষে, এই অপূর্ণতায় সে ছিল ছিন্নভিন্ন বাইরে যেখানে বা বাধা নেই সেখানে বাধা তার মনে, তার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অবনিবনায়। তাই একদিকে যেমন তার বিপ্লবের অস্থিরতা, অন্যদিকে তেমনি বিফলতার অপবাদ।

যাকে বলে 'ম্যালাডি অব দি এজ' বা যুগের যন্ত্রণা তা কল্লোলের মুখে স্পষ্ট রেখায় উৎকীর্ণ।[৪] তখন স্কুল-কলেজের শিক্ষা প্রসারে ইংরেজ সৃষ্ট মধ্যবিত্ত সমাজে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু সে অনুপাতে চাকরী জুটল না। অথচ পল্লীকেন্দ্রিক মানুষ এই ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে আর পল্লী গ্রামে ফিরে যেতে পারল না, পরিত্যক্ত পল্লী বাংলায় বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়া বিস্তারলাভ করল। গ্রাম বাংলার কুটিরশিল্প নষ্ট

৪। কল্লোল যুগ।

হয়ে যাওয়ায় এবং শহরের কলকারখানা প্রসারের ফলে অশিক্ষিত মানুষও শহরে এসে ভীড় করল। শহরেও চাকরীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে উঠল। আর্থিক অবস্থা দ্রুত অবনতি লাভ করল। তার মধ্যে আবার দেখা দিল প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধের রসদ এবং কর[৫] যোগাতে গিয়ে এদেশের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। সকলে আশা করেছিল যুদ্ধ শেষে রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব হবে। কিন্তু ইংরেজ সরকার সেই আশা নির্মূল করে দিয়ে প্রবর্তন করল ১৯১৯ সালের মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার আইন, যাকে ভারতীয়রা মনে করল 'অপর্যাপ্ত, অসন্তোষজনক এবং নৈরাশ্যকর।' ভারতের জনমত তখন মুক্তির সন্ধানে আকুল। ফলে বিপুল রাজনৈতিক উত্তেজনা দেশকে প্লাবিত করে তুলল। এই উত্তেজনাকে খর্ব করার জন্য ইংরেজ সরকার ১৯১৯ সালের শুরুতেই চালু করেন রাউলাট আইন। কিন্তু ফল হল উল্টো। সারাভারত জুড়ে গণবিক্ষোভ শুরু হয়ে গেল। ওদের বাঁধন এবং অত্যাচার যত তীব্র হতে লাগল বাঁধন ছেঁড়ার নেশাও তত উগ্রতা লাভ করল। ১৯২০ সালের প্রথম ছয় মাসে ধর্মঘটের উপর ধর্মঘট হতে লাগল। উত্তেজনা এত তীব্র আকার ধারণ করল যে, তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি লাজপৎ রায় বিশেষ অধিবেশনে ঘোষণা করলেন:

"It is no use blinking the fact that we are passing through a revolutionary period........we are by instinct and tradition averse to revolutions. Traditionally, we are a slow-going people; but when we decide to move, we do move quickly and by rapid strides. No living organisation can altogether escape revolutions in the course of its existence." (India to-day & to-morrow. গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)।

জনতার এই ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ অবশেষে অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলনে পরিণতি লাভ করল। আন্দোলনের তীব্রতা দেখে গান্ধীজীর মত 'অহিংস'

৫। "মধ্যপ্রাচ্যে মেসোপটেমিয়া ও প্যালেষ্টাইন এবং পূর্ব আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করা ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় আইনসভা বিলাতের রাজকীয় কোষাগারে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেড়শো কোটি টাকা "স্বেচ্ছাকৃত দান" হিসাবে দিয়েছিল। ভারতবর্ষের অর্থ ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ তখন পড়েছিল, কারণ কলিকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী নিয়ে যেতে প্রায় নয় কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল, আর তাছাড়া যুদ্ধের খরচ কুলোতে গিয়ে দেশবাসীর উপর করভার চরমে উঠেছিল। ভারতবর্ষ থেকে ছয় লক্ষেরও বেশী যোদ্ধা বিদেশে যায়, ৫৩০০০ যোদ্ধার প্রাণহানি ঘটে।" (ভারতবর্ষের ইতিহাস—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)।

মানুষও ঘোষণা করেছিলেন, ১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে 'স্বরাজ' লাভ করবেন। নানাভাবে দেশের বিভিন্ন অংশে জনতার বিক্ষোভ ফেটে পড়ল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট, মেদিনীপুরের ট্যাক্স-বিরোধী আন্দোলন, মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ, পাঞ্জাবের আকালী আন্দোলন। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকরা জেলগুলো ভরে ফেলল। ১৯২১ সালের শেষের দিকে ত্রিশ হাজার মানুষ স্বেচ্ছায় কারাবরণ করল। বিপ্লব ভারতের ভিৎ কাঁপিয়ে তুলল। এই বিপ্লবের অগ্রভাগে তখন ছিলেন গান্ধীজী। তিনি কিন্তু এই বিপ্লব-পরিণতির কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তুলে ধরলেন না। তিনি এক মাস চুপ করে রইলেন। অবশেষে বিপ্লবের রাশ টেনে ধরলেন। এমন সময় বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে চৌরীচোরা থানা পুড়ে গেল। গান্ধীজী বিপ্লবের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। পর্বত প্রমাণ বিপ্লব মুষিক প্রসব করে শেষ হয়ে গেল। গান্ধীজীর এই ঘোষণায় সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, লাজপৎ রায়, মতিলাল নেহরু প্রভৃতি সকলেই বিক্ষুব্ধ হলেন কিন্তু তখন আর কোন উপায় ছিল না। গান্ধীজী নিজের মতে অটল রইলেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের হিংসা দারুণ ভাবে নেমে এল। সকলের মনে দেখা দিল সীমাহীন হতাশা। এই হতাশা অনেকদিন জিইয়ে রইল। ১৯৩০ সালের পূর্বে আর জাতীয় আন্দোলনে উৎসাহ সৃষ্টি হল না।

জাতীয় আন্দোলনের এই ব্যর্থতা সর্বব্যাপী হলেও শ্রমিকদের মধ্যে এ নৈরাশ্য তত দৃঢ়মূল হয়নি। ১৯২০ সালের বিরাট বিক্ষোভের মধ্যে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঢেউ এদেশেও এসে লাগে। তাদের আদর্শে সাম্যবাদী চেতনা এদেশে দেখা দেয়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার এদিকে খুবই সতর্ক ছিল। তারাও কালক্ষয় না করে তখনকার চারজন বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতার বিরুদ্ধে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে তাদের চার বছরের জন্য কারারুদ্ধ করে। তখন সকলের দৃষ্টিই এই মামলায় প্রতি পড়ে। কিন্তু এই নিপীড়ন সত্ত্বেও শ্রমিক আন্দোলনে ভাটা পড়েনি। এতে নতুন সমাজ-তান্ত্রিক চেতনা প্রসার লাভ করে এবং রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে শ্রমিক কৃষকের উপর দৃষ্টি পড়ে। তারই ফলে ১৯২৬ সালে বাংলাদেশে প্রথম কৃষক মজদুর পার্টি গঠিত হয়।

কল্লোল যুগের উল্লিখিত বিরুদ্ধবাদ এবং ভাবালুতার জন্ম হল এই যুগ পট-ভূমিকায়। তার উপর এসে দেখা দিল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কন্টিনেন্টাল সাহিত্য। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত জীবনে নতুন কোন আশার আলো এ যুগের লেখকরা

দেখতে পেলেন না। তাদের দৃষ্টি পড়ল শ্রমিক কৃষকের জীবনের প্রতি। কিন্তু তাদের সংগ্রামী জীবনের পরিবর্তে তাদের বস্তী-জীবনের বেআব্রু যৌন জীবনের প্রতিই দৃষ্টি গেল বেশী।

এ সময়ে নজরুলের 'বিষের বাঁশী' নিষিদ্ধ হল। এই বইয়ের জন্য কল্লোলের আপিস ও দোকান খানাতল্লাসী হল। সরকার তখন ভীত সন্ত্রস্ত। ব্যর্থ জাতীয় আন্দোলনের নৈরাশ্যের মধ্যে দেখা দিল বাঙালী যুবকদের সন্ত্রাসবাদ। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত লিখেছেন ১৩৩১ সালে, "সকলের মধ্যেই একটা প্রচণ্ড আশংকা ভীতি এসে গেছে। সি আই ডি-র উপদ্রবও সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড রকম বেড়ে গেছে। কলকাতা সহরটাই তোলপাড় হয়ে গেছে। যেখানে যাও চাপাগলায় এই আলোচনা। যারা ভুলেও কখনও রাজনীতির চিন্তা মনে আনে নাই তাদের মধ্যেও একটা সাড়া পড়ে গেছে—সেই সাড়াটা কল্লোলের মধ্যেও এসে গেল। চিন্তায় ও প্রকাশে এল এক নতুন বিরুদ্ধবাদ। নতুন বিদ্রোহবাণী। সত্য ভাষণের তীব্র প্রয়োজন ছিল যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে, তেমনি ছিল অচল প্রতিষ্ঠ স্থবির সমাজের পক্ষে।" (কল্লোল যুগ)।

সেজন্য এই যুগের অনেক লেখকের মধ্যেই আছে রাজনীতি চিন্তার প্রতিফলন। কিন্তু কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের সম্বন্ধে তা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়। কারণ, তাঁরা তাঁদের পথের সম্বন্ধেই সচেতন ছিলেন না। তার মধ্যে ভাবালুতা এবং রোমান্টিসিজম যতটা ছিল সত্যভাষণের বলিষ্ঠতা এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ততটা ছিল না। সেজন্য এই রোমান্টিসিজম হল নিষ্ক্রিয় রোমান্টিসিজম। অর্থাৎ জীবনকে বর্ণময়রূপে প্রকাশ করে মানুষ যাতে সেই জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে তারই চেষ্টা এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তব থেকে তার মনকে বিচ্ছিন্ন করে নিষ্ফল অন্তঃসমীক্ষায় প্রবৃত্ত করবার প্রবণতা।

কল্লোল যুগের লেখকদের মধ্যে বিরুদ্ধবাদের অহমিকা ছিল কিন্তু পারিপার্শ্বিক জীবনের দৈন্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। সেজন্য তারা বাস্তব জীবন থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে নিষ্ফল অন্তঃসমীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আর সাহিত্যে বাস্তবতা বলতে যৌন এবং বস্তীজীবনকেই সার করে তুললেন।

ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই লিখেছেন, "বয়সের বৃদ্ধিতে ও অভিজ্ঞতার গভীরতায় 'তরুণ' সাহিত্যিকদের এই যে দৃষ্টি আবিলতা তাহা নিঃশব্দে কাটিয়া যাইত যদি না বিরুদ্ধবাদী কোন কোন লেখকগোষ্ঠী (যেমন 'শনিবারের চিঠি') তাঁহাদের পত্রিকায় ইঁহাদের রচনার টুকরা সাধারণ পাঠক সমাজে

রুচিকর অপথ্য হিসাবে মাসে মাসে পরিবেশন না করিত। আসল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া 'শনিবারের চিঠি'র মত কাগজ প্রকারান্তরে এই রোচক 'বাস্তব' সাহিত্যেরই বাজার দর বাড়াইয়া দিয়াছিল।"[৬]

এই "আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, ইউরোপেরই মনের প্রাণের একটা বিপর্যয়ের ফলে। ইউরোপের চেতনার ধারার সহিত তাহার রহিয়াছে জীবন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। আমাদের দেশের চেতনায় সে সকল জিজ্ঞাসা সজীব সার্থক হইয়া দেখা দেয় নাই—এখনও তাহারা অনেকখানি আমাদের খোসখেয়ালের কথা। জীবনের প্রয়োজন হইতে বা অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি হইতে তাহারা উঠিয়া দাঁড়ায় নাই। তাই দেখি আমাদের মধ্যে অধিকাংশের হাতে আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে, একটা ঢঙে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে।"[৭]

এই আধুনিক পর্বেই বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। কল্লোল কালি কলমের ব্যর্থতা সত্বেও একথা স্বীকার্য, শরৎচন্দ্র-শৈলজানন্দের সৃষ্টি অনুসরণ করে বাঙালী লেখকের চোখ বাস্তবের দিকে ফিরেছিল। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুরের মিল নেই। বিষয়বস্তু নির্বাচনে, চরিত্র রূপায়ণে, কাহিনী রচনে তারা রবীন্দ্র-সুর অতিক্রান্ত। এই যুগের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র তাঁর মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনীর অভিভাষণে বলেছেন, "...পূর্বের মত রাজা-রাজড়া জমিদারের দুঃখদৈন্যদ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপসোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই উত্তরাধিকারকেই আরো বলিষ্ঠরূপে নিয়ে এলেন বাংলা সাহিত্যে। তাঁর প্রথম গল্প 'অতসীমামী' ছাপা হল 'বিচিত্রা'য়। বহুবিশ্রুত সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় "বিচিত্রার" সম্পাদক। তখন বিচিত্রা ছিল উঁচুকপালে পত্রিকা—"যার শুনেছি বিজ্ঞাপনের পোষ্টার সহরের

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)।
৭। ১৩৩৪ সালের বিচিত্রা পত্রিকায় নলিনীকান্ত গুপ্তের প্রবন্ধ, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

দেয়ালে ঠিক ঠিক লাগান হয়েছে কিনা দেখবার জন্যই ট্যাক্সি-ভাড়া লেগেছিল একটা স্ফীতকায় অঙ্ক।” (কল্লোল যুগ)। এই পত্রিকায় মানিকের প্রথম আবির্ভাব সম্পর্কে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত লিখেছেন :

“একদিন দুপুরবেলা বসে আছি—বা বলতে পারি, কাজ করছি—একটি দীর্ঘকায় ছেলে ঢুকল এসে বিচিত্রা আপিসে। দোতলায় সম্পাদকের ঘরে।

উপেনবাবু তখনো আসেন নি। আমিই উপনেতা।

‘একটা গল্প এনেছি বিচিত্রার জন্যে’—হাতে একটা লেখা, ছেলেটি হাত বাড়াল। প্রখর একটা ক্ষিপ্রতা তার চোখে মুখে, যেন বুদ্ধির সন্দীপ্তি। গল্প যেন সে এখুনি শেষ করেছে আর যদি কাল বিলম্ব না করে এখুনি ছেপে দেওয়া হ তাহলেই যেন ভাল হয়।

‘এই রইল—’

ভঙ্গিতে এতটুকু কুণ্ঠা বা কাকুতি নেই। মনোনীত হবে কি না-হবে . সম্বন্ধে এতটুকু দ্বন্দ্ব নেই। আবার কবে আসবে ফলাফল জানতে, কৌতূহল নেই একরতি।

যেন, এলুম, লিখলুম আর জয় করলুম—এমনি একটা ভাব।

লেখাটা নিলুম হাত বাড়িয়ে। গল্পটির নাম ‘অতসীমামী’। লেখক মানি বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখাটা অদ্ভুত ভাল লাগল। উপেনবাবুও পছন্দ করলেন গল্প ছাপা হল ‘বিচিত্রা’য়। একটি লেখাতেই মানিকের আবির্ভাব অভ্যর্থি হল।” (কল্লোল যুগ)

॥ ৬ ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর যুগ এবং সাহিত্য করার আগে তাঁর মানস প্রস্তুতি সম্পর্কে লিখেছেন:[১]

"ছাত্র বয়সে আমি যখন লেখা শুরু করি তার কয়েক বছর আগে কল্লোল যুগ আরম্ভ হয়েছে।

আমার সাহিত্য করার আগের দিনগুলি দু-ভাগে ভাগ করা যায়। স্কুল থেকে শুরু করে কলেজে প্রথম এক বছর কি দু'বছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রভাবিত সাহিত্যই ঘেঁটেছি এবং তারপর কতদিন খুব সোরগোলের সঙ্গে বাংলায় যে 'আধুনিক' সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছিল তার সঙ্গে এবং সেই সাথে হ্যামসুনের 'হাঙ্গার' থেকে শুরু করে শ-র নাটক পর্যন্ত বিদেশী সাহিত্য এবং ফ্রয়েড প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছি।

স্কুল জীবনেই অনেক নভেল পড়েছি। বোধ হয় ফোর্থ ক্লাস কিম্বা থার্ড ক্লাস থেকে মানসী ও মর্মবাণী, ভারতবর্ষ এবং প্রবাসী প্রায় নিয়মিত পড়তাম। ভারতবর্ষ এবং প্রবাসীই তখন প্রধানত ছিল বাংলা সাহিত্যের মুখপত্র।

ছেলেবেলা থেকেই গিয়েছিলাম পেকে। অল্প বয়সে 'কেন' রোগের আক্রমণ খুব জোরাল হলে এটা ঘটবেই। ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মাচ্ছিল নীচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সঙ্গে। উভয় স্তরের জীবনের অসামঞ্জস্য, উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট ও জোরাল করে তুলত। ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে, গরীব অশিক্ষিত খাটিয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসে ওই বাস্তবতা উলঙ্গরূপে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতার আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেত। মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের শত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকায়, শত শত প্রয়োজন না মেটার চরম রূপ দেখতে পেতাম নিচের তলার মানুষের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনে।

গরীবের রিক্ত বঞ্চিত জীবনের কঠোর উলঙ্গ বাস্তবতা আমার মধ্যবিত্ত ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করত—জিজ্ঞাসা জাগত, তাহলে আসল ব্যাপারটা কি?

ছাড়া ছাড়া জিজ্ঞাসা—বাস্তবতাকে সমগ্রভাবে দেখবার বা একটা জীবনদর্শন খোঁজার মত সমগ্র জিজ্ঞাসা খাড়া করবার সাধ্য অবশ্যই তখন ছিল না।

১। লেখকের কথা

সাহিত্যে কিছু কিছু ইঙ্গিত পেতাম জবাবের। বড়দের জীবন আর সমস্যা নিয়ে লেখা গল্প উপন্যাসে। সেই সঙ্গে সাহিত্য আবার জাগাত নতুন নতুন জিজ্ঞাসা। জীবনকে বুঝবার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তাম গল্প উপন্যাস। গল্প উপন্যাস পড়ে নাড়া খেতাম গভীরভাবে, গল্প উপন্যাসের জীবনকে বুঝবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তল্লাস করতাম বাস্তব জীবন।

স্কুল জীবনেই কয়েকবার 'শ্রীকান্ত' পড়েছিলাম। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে বালক শ্রীকান্তের অ্যাডভেঞ্চার আমায় বিশেষভাবে নাড়া দেয়নি। আমিও ভয়ানক দুরন্ত আর দুঃসাহসী ছিলাম, অনেক অ্যাডভেঞ্চারের চিহ্ন সর্বাঙ্গে আছে। বইখানার নরনারীর চরিত্র আর সম্পর্ক আমাকে অভিভূত করে দিয়েছিল। অভিভূত করেছিল কিন্তু আমি ছেড়ে কথা কইনি—অ.মার একটা বড় জিজ্ঞাসার জবাব আদায় করে ছেড়ে ছিলাম। পরে শরৎবাবুর চরিত্রহীনেও যার সমর্থন পেয়েছিলাম। আমার জিজ্ঞাসা ছিল প্রেম আর দেহ সম্পর্কিত সমস্যাটা নিয়ে, সাহিত্যের প্রেম আর বাস্তব জীবনের প্রেম নিয়ে। সাহিত্যের ছাঁকা প্রেম খুঁজে পেতাম না মধ্যবিত্তের জীবনে অথবা নিচের তলায়। মধ্যবিত্তের বাস্তব জীবনের প্রেমে যেটুকু ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য দেখতাম তার সন্ধান পেতাম না নিচের তলার জীবনে। আবার নিচের তলার প্রেমে ভাবৈশ্বর্যের রিক্ততা সত্ত্বেও যে সহজ বলিষ্ঠ উন্মাদনা দেখতাম, মধ্যবিত্তের জীবনে তার অভাবটা ধরা পড়ত।

রাজলক্ষ্মীকে দেখলাম, মধ্যবিত্ত সংসারের সেবাময়ী স্নেহময়ী রসময়ী নারীত্বের প্রতিমূর্তি, শুধু সংসারের নিয়ম নীতি বাধা নিষেধ পরাধীনতার কবল থেকে সে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। নায়িকাকে গৃহের সংকীর্ণতা আর বন্ধন থেকে মুক্ত করে নতুন পরিবেশে আনার জন্যই যে তাদের প্রেমের নতুনত্ব, আসলে এও সাহিত্যের ওই ছাঁকা অবাস্তব প্রেম—দেহ নিয়ে ওরা বিব্রত হয়ে না পড়লে, দেহকে এত সমারোহের সঙ্গে বাতিল করা না হলে, ওই বয়সে কথাটা খানিক আঁচ করাও হয়ত আমার পক্ষে সম্ভব হত না। মনটা খুঁত খুঁত করেছিল। বাংলা সাহিত্যে নারীত্ব অভিনব মর্যাদা পেল, কিন্তু বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে কেন? ঘরের দেওয়াল খসে পড়লে আর সতর্ক পাহারা সরে গেলেও নারী অমানুষ হয়ে যায় না, এই সত্যের সঙ্গে কি বিরোধ আছে বাস্তবের? অথবা এটাই সাহিত্যের রীতি?

চরিত্রহীন আমাকে অভিভূত, বিচলিত করেছিল। বোধহয় আট-দশবার বইখানা পড়েছিলাম তন্ন-তন্ন করে। বাংলা সাহিত্যের কত দৃঢ়মূল সংস্কার আর

গোঁড়ামি যে চুরমার হয়ে গিয়েছিল এই উপন্যাসে। গল্প উপন্যাসের নৈতিক আড়ষ্টতা বর্জনের চেষ্টা আরও কয়েকজন নামকরা লেখকও করেছিলেন। সাহিত্যে নীতি ও দুর্নীতির প্রশ্ন বিচার করার সাধ্য তখনও ছিল না, কিন্তু মানসিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেটা খুব স্পষ্টভাবেই সম্পন্ন হত এবং সেদিনকার সেই ছেলেমানুষী বিচার আজও আমার কাছে অভ্রান্ত হয়ে আছে। শরৎচন্দ্রের বই পড়ে মনে হত তিনি অন্যায় আর গোঁড়ামিকে আঘাত করেছেন কিন্তু অন্য কোন লেখক সম্পর্কেই এ রকম ভাবা সম্ভব হত না। মনে হত, তারা যেন অনুচিত জেনেও গায়ের জোরে সেটা উচিত বলে সমর্থন করছেন।

...শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে পতিতা ও অসতীরা চরিত্র হয়েছে, বড় হয়ে উঠেছে তাদের মনুষ্যত্ব, অনুচিত প্রেমও হয়েছে প্রেম। তখনকার অন্য কোন লেখক এটা পারেন নি।

যাই হক, ছোট-বড় লেখকের বই ও মাসিকের লেখা পড়তে পড়তে এই প্রশ্নটাই ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট জোরাল হয়ে উঠতে লাগল যে, সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন? মানুষ হয় ভাল, নয় মন্দ হয়, ভাল-মন্দ মেশানো হয় না কেন? শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিও হৃদয় সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যবিত্তের হৃদয়ে।

ভদ্রজীবনের বিরোধ, ভণ্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার, অনাচার, বিকার-গ্রস্ততা, সংস্কার-প্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ মিথ্যা কেন প্রশ্রয় পায় যে, ভদ্রজীবন শুধু সুন্দর ও মহৎ? ভদ্রসমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষী-মজুর, মাঝি-মাল্লা, হাড়ি-বাগ্দিদের রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এই বিরাট মানবতা—যে একটা অকথ্য অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে মানুষের জগতে—সাহিত্যে স্থান পায় না?

ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা, বাস্তব জীবন ও সাধারণ বাস্তব মানুষের অভাব বড়ই পীড়ন করত। সংঘাতের পীড়ন।

আমার নিজের জীবনে যে সংঘাত ক্রমে ক্রমে জোরাল হয়ে উঠছিল, সাহিত্য নিয়েও ক্রমে ক্রমে অবিকল সেই সংঘাতের পাল্লায় পড়েছিলাম।

ভদ্র পরিবারে জন্মে পেয়েছি তদনুরূপ হৃদয় আর মন, অথচ ভদ্র জীবনের কৃত্রিমতা, যান্ত্রিক ভাবপ্রবণতা ইত্যাদি অনেক কিছুর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে বিদ্রোহ মাথা তুলেছে আমারই মধ্যে! আমি নিজে ভাবপ্রবণ অথচ ভাবপ্রবণতার নানা অভিব্যক্তিকে ন্যাকামি বলে চিনে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি। ভদ্রজীবনকে

ভালবাসি, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্রঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য ও মুখোস পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে।

এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকেই মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটলোক চাষা-ভুষোদের মধ্যে গিয়ে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। আবার ওই ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁফ ছাড়ি।

বাড়তে বাড়তে এই সংঘাত প্রথম যৌবনে অবর্ণনীয় প্রচণ্ডতা লাভ করে—লিখতে আরম্ভ করার পর বাস্তবকে স্বীকৃতিদানের ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে এই সংঘাতের তীব্রতা কমে আসে।

...সাহিত্য নিয়েও এই রকম সংঘাতের যাঁতাকলে পড়েছিলাম। বাংলা সাহিত্যকে ভালবাসি, বাস্তবতার উর্ধ্বে তোলা মধ্যবিত্তের হৃদয় মনও ভাবপ্রবণতার প্রতিফলন বলেই এ সাহিত্যকে ভালবাসি। আমার ভাবকে সরস করে ফেনিয়ে তুলে, কল্পনা স্বপ্নকে আরও রঙদার করে আমাকে মুগ্ধ ও মশগুল করে রাখে বাংলা সাহিত্য। আবার বাস্তবকে না পেয়ে মধ্যবিত্ত জীবনে কৃত্রিমতা, বিকৃতি ইত্যাদির মুখোস খুলে না দেওয়ার উদাসীনতা পরোক্ষ প্রশ্রয় হয়ে দাঁড়ানোয় এবং বাস্তব ঘেঁষা সতেজ ও বলিষ্ঠ জীবনের অধিকারী মানবতার বিরাট অংশকে ঠাঁই না দেওয়ায়, বড়ই আপসোষ আর রাগ হত।

সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ যেমন দিন দিন বাড়তে থাকে এই আপসোষও তেমনি তীব্র হতে থাকে। একদিকে যে সাহিত্য আমাকে অভিভূত করে ফেলে, আমার চেতনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে, অন্যদিকে সেই সাহিত্যই প্রবল নালিশ জাগায়, তীব্র জ্বালার সঙ্গে ভাবি—এর কি প্রতিকার নেই!

এই সংঘাত থেকে সাধ জাগত যে, আমি একদিন লেখক হব। নিজেই প্রতিকার করব।

সাধ ক্রমে ক্রমে পণ হয়ে দাঁড়ায়। লেখক আমি হবই। কিন্তু যতই হোক, মধ্যবিত্তের মন ত। স্কুল-জীবনের লেখক হবার কল্পনা কলেজ জীবনে ক্রমে ক্রমে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় পরিণত হলেও—সেটা কাজে পরিণত করার কোন চেষ্টাই করতাম না। ভাবতাম এখন নয়, সাহিত্যচর্চা ছেলেমানুষের কাজ নয়। বয়স বাড়ুক, জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা বাড়ুক, পাশ-টাশ করে চাকরি-বাকরি নিয়ে জীবনটাকে

গুছিয়ে নিই, তারপর সিরিয়াসলি শুরু করা যাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিযান।

রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করিনি। রবীন্দ্র-সাহিত্যও পড়তাম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস পড়েও আমার মনে তেমন প্রশ্ন বা নালিশ জাগত না। কবি বলে রবীন্দ্রনাথকে সত্যই আমি রেহাই দিয়েছিলাম।...

সাহিত্য করার আগেই দিনের দ্বিতীয় ভাগটা প্রধানত প্রথম ভাগটারই জের ও পরিণতি।

বাংলা সাহিত্যে কল্লোল, কালি কলমীয় ধারা অর্থাৎ যাকে বলা হত 'আধুনিক সাহিত্য' এবং যাকে আধুনিক সাহিত্যিকেরা 'বস্তুপন্থী' বলে দাবি করতেন—এই ধারাকে আমি কিভাবে গ্রহণ করেছিলাম এটাই প্রধান কথা।

প্রসঙ্গক্রমে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, আমি ছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র এবং যেমন আগ্রহ নিয়ে বিজ্ঞান পড়তাম তেমনি আগ্রহ নিয়েই আরম্ভ করেছিলাম যৌন-বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব আর বিশ্ব-সাহিত্য পড়া।

সাহিত্যে ওই 'আধুনিক' মার্কা ধারাটা এসেছিল প্রচণ্ড সোরগোল তুলে, প্রায় বিপ্লব মার্কা বিদ্রোহের রূপ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যের অন্যান্য দিক্‌পালেরা সচকিত হয়ে উঠেছিলেন তারুণ্যের এই বলগাহীন সাহিত্যিক অভিযানে, বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক আত্মসমর্পণ করেছিলেন এই দুরন্ত বন্যার কাছে, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আশীর্বাদ করেছিলেন এবং সাহিত্যে 'আধুনিকতা'র কচি-কাঁচ নেতাকে নিমন্ত্রণ করে আলাপ ও ভাব করেছিলেন—পাছে এরা বাংলা সাহিত্যের অনেক কিছু ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁকেও ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে দেয়। দু'একজন তাল ঠুকেছিল। একজন কবি রবীন্দ্রনাথকে 'ডোন্ট কেয়ার' করার কবিতা পর্যন্ত লিখেছিলেন।

কোন দেশে কোন কালে খ্যাতনামা কবি বা সাহিত্যিককে গুণ্ডার মত সোজাসুজি আক্রমণে ঘায়েল করে যেন কেউ কবি বা সাহিত্যিক হতে পেরেছে।

বন্ধু-বান্ধবেরা খ্যাতি দিয়ে কি কোনো কবি বা সাহিত্যিককে খ্যাতনামা করতে পারে? খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিক মানেই জনসাধারণ সমগ্র বা আংশিকভাবে, স্থায়ীভাবে অথবা সাময়িকভাবে তাকে তারিফ করছে। এদের ভূমিসাৎ করে কাব্যসাহিত্যের মোড় ঘুরান যায় না। কাব্যসাহিত্যের মোড় ঘুরিয়েই এদের ভূমিসাৎ করতে হয়।

বাংলা সাহিত্যে এই আধুনিকতা একটা বিপ্লবের তোড়জোড় বেঁধেই এসেছিল

কিন্তু বিপ্লব হয়নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না—সাহিত্যের চলতি সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যের বিক্ষোভ বিপ্লব এনে দিতে পারে না। জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল যে, আমরা বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করছি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল, কালি-কলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের পিছনে ছিল না।

সচেতনভাবে বস্তুবাদের আদর্শ অবলম্বন করে নয়, বাস্তবতাই মধ্যবিত্তের জীবনে ও চেতনায় ভাববাদ ও বস্তুবাদের যে সংঘাত সৃষ্টি করেছিল, যে সংঘাত আমার জীবনে ও চেতনায় প্রকট হয়েছিল, সাহিত্যে তারই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছিল এই বিদ্রোহ।

১৩৩৩ সালের 'কালি কলমে' সাহিত্যের নতুন অভিযানের স্বপক্ষে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি চিঠি ছাপা হয়। তিনি লিখছেন, "জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হ্যামসুন-গোর্কীর পাঠশালায় গিয়ে থাকি তাতে দোষ কি···গোর্কী-হ্যামসুনের জগতে এলে ইউক্লিডেরা ফাঁপরে পড়ে। এ যে একেবারে মগের মুলুক! এ যে জীবনের জটিল দুর্বোধ্য জগৎ।"

চিঠিখানায় আরও কয়েকবার 'হ্যামসুন-গোর্কী'র নামোল্লেখ আছে! প্রেমেনবাবুর ছোট একখানা চিঠিতে সাহিত্যে নতুন বিদ্রোহের স্বরূপ যেন ধরা দিয়েছে, বেশিদূর হাতড়াতে হয় না। বাংলা সাহিত্যে জীবন নেই, সবকিছুই গণিতের নিয়মে ছকে বাঁধা প্রাণহীন ব্যাপার। হ্যামসুন-গোর্কীর মগের মুলুকে পরিণত করতে হবে বাংলা সাহিত্যকে!

হ্যামসুনের দু'একখানা বই পড়েছিলাম। প্রেমেনবাবুর এই চিঠি পড়ে গোর্কীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় করতে যাই। মনে আছে, 'মাদার' পড়তে পড়তে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম—হ্যামসুন আর গোর্কীকে প্রেমেনবাবু মেলাবেন কি করে?

আমার তখন হ্যামসুনেও আপত্তি ছিল না, গোর্কীতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভাবের আকাশে ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যার পার্থক্য কি ধরা না পড়ে পারে?

অসীম আগ্রহ নিয়ে আধুনিকদের লেখা পড়ি। ভাষার তীক্ষ্ণতা, ভঙ্গির নতুনত্ব, নতুন মানুষ ও পরিবেশের আমদানী, নরনারীর রোমান্টিক সম্পর্ককে বাস্তব করে তোলার দুঃসাহসী চেষ্টা আশা ও উল্লাস জাগায়—তারই পাশাপাশি হালকা নোংরা রোমান্টিক ন্যাকামি তীব্র বিতৃষ্ণা জাগায়।

বিতৃষ্ণা জাগাত কিন্তু খুব বেশি বিচলিত হতাম না। জীবনে কতগুলি বাস্তব নিয়মে আমার বিশ্বাস ছিল। তখনই আমি জানতাম যে, সমাজে যেমন

সাহিত্যেও তেমনি বড় একটা আলোড়ন দেখা দিলে সেই সুযোগে কতকগুলি চ্যাংড়া কিছু ফাজলামি জুড়বেই—আসল আন্দোলনটা যদি ঠিক থাকে এই সব হাল্‌কা ছ্যাবলামির জন্য বিশেষ কিছু আসবে যাবে না।

শনিবারের চিঠির 'হায়, হায়, সব গেল' আর্তনাদ অকারণ এবং হাস্যকর মনে হত। সুযোগ পেয়ে কয়েকজন বাজে মানুষ খানিকটা নোংরামি এবং ন্যাকামি করেই যদি একটা দেশের সাহিত্যকে গোল্লায় পাঠাতে পারে, তবে সে সাহিত্যের গোল্লায় যাওয়া উচিত।

'আধুনিকতা'র আন্দোলন যদি শৈলজানন্দের খাঁটি গ্রামের মানুষ আর কয়লাখনির কুলিদের সাহিত্যে আশা সম্ভব করে থাকে, বস্তির জীবনকে অন্তত সাহিত্যে প্রবেশের পথ করে দিয়ে থাকে,—শুধু এই জন্যই রাশিকৃত জঞ্জালের আবির্ভাবটা ক্ষমা করা চলে।

আশা করেছিলাম অনেক কিন্তু ক্রমে ক্রমে টের পেলাম সাহিত্যে যে অভাব, যে অসম্পূর্ণতা আমাকে তীব্রভাবে পীড়ন করছে তার পূরণ হচ্ছে না। শৈলজানন্দের গ্রাম্য জীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ—কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আসেনি। বস্তি-জীবন এসেছে কিন্তু বস্তি-জীবনের বাস্তবতা আসেনি—বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসেনি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম বাতিল হয়নি, ওই একই রোমান্স শুধু দেহকে আশ্রয় করে খানিকটা অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে।

শৈশব থেকে সারা বাংলার গ্রামে সহরে ঘুরে যে জীবন দেখেছি, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ দেখেছি—সাহিত্যে কি তা আসবে না? এই বাস্তব জীবন যাদের—সেই সাধারণ বাস্তব মানুষ?

অথচ প্রথম গল্পই আমি লিখি 'অতসীমামী'—রোমান্সে ঠাসা অবাস্তব কাহিনী। কিন্তু এ গল্প সাহিত্য করার জন্য লিখিনি—লিখেছিলাম বিখ্যাত মাসিকে গল্প ছাপান নিয়ে তর্কে জিতবার জন্য। এ গল্পে তাই নিজের আসল নাম দিইনি, ডাক নাম 'মানিক' দিয়েছিলাম।...

যে সংঘাতের কথা বলছি—এও তারই প্রমাণ। যদি একেবারে বর্জন করতেই

পারতাম—তবে আর সংঘাত থাকত কিসের?"[২]

এই ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ নিয়েই মানিক বাংলা সাহিত্যে লেখনী ধারণ করে।

২। সাহিত্য করার আগে (লেখকের কথা)।

॥ ৭ ॥

১৩৩৫ সালে অপ্রত্যাশিতভাবে মানিকের প্রথম গল্প প্রকাশিত হলেও মানিকের যথার্থ সাহিত্যজীবন শুরু হয়েছিল ১৯৩৫ সালে। এ বছরে তার দুখানি উপন্যাস এবং একখানি গল্প সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে বহু গল্প উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশ হতে লাগল। অতসীমামী যেমন তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প, তেমনি জননী (১৯৩৫) তাঁর গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। গত ১৯২৮ থেকে ১৯৩৫ এ ক'বছর মানিকের সাহিত্য সাধনার প্রস্তুতিকাল। অবশ্য ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তাঁকে পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সেদিক অসমাপ্ত রেখেই শেষ করে দিতে হল। বি. এস. সি পাশ করা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না।

মানিকের তখন দারুণ সংগ্রামের জীবন। অর্থকরী জীবিকার্জনের ধারে না গিয়ে লেখাকেই তিনি পেশারূপে গ্রহণ করলেন। মানিক তখন থাকেন আমহার্স্ট স্ট্রীটের এক মেসে আর লিখে কোনমতে নিজের খরচা নির্বাহ করেন। তখনকার মানিকের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভবানী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

"দীর্ঘায়ত দেহ, চোখে চশমা, পায়ে চটি জুতো আর প্রতিভাদীপ্ত মুখচ্ছবি আজো মনে আছে। গায়ের রঙ ময়লা হলেও যেন সাঁওতালী ছেলের লাবণ্য। আলাপ ঘনিষ্ঠ হল কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় আর্য পাবলিশিং-এর আড্ডায়। তখনকার কালে বৃহস্পতিবার বিকেলে ছোট বড় অনেক সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক সেই মজলিসে যোগ দিতেন। মানিকও আসত। মনে আছে শ্রদ্ধেয় শচীন সেনগুপ্ত একদিন প্রেমেন্দ্রকে প্রশ্ন করছেন, কার লেখা এখন বেশী সম্ভাবনাময়? প্রেমেন তৎক্ষণাৎ মানিকের নাম করল। মানিক তখন মাত্র কয়েকখানি গল্প লিখেছে। কিছু পরেই সে এসে পড়ল, প্রেমেন শচীনদার সঙ্গে মানিকের পরিচয় করিয়ে দিল। মানিকের কী সলজ্জ মুখভঙ্গি, প্রশংসা গ্রহণে তার কী অপরিসীম কুণ্ঠা।

সেই সময় মানিকের কলকাতা সহরের যান্ত্রিক সভ্যতার কোন জ্ঞানই ছিল না। অনেক সময় অনেক শিশুসুলভ প্রশ্ন করত এবং সকলের অট্টহাসিতে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ত। যেমন হঠাৎ সে হাজির হত তেমনই হঠাৎ আবার উঠে পড়ত। সব সময়েই সে ব্যস্ত, অনেক কাজ পড়ে আছে, এতটুকু সময় নেই—এই তার ভাব। একটু সুস্থির হয়ে বসতে পারত না।

একদিন তখনকার গ্লোব সিনেমার উপরতলায় সস্তার টিকিটে তিনটের শোতে

ছবি দেখছি, পিছন থেকে কে কাঁধে হাত রাখল, পিছন ফিরে দেখি মানিক। হাতে তার একখানি কালো একসারসাইজ বই। সিনেমা ভাঙতে মানিক আমাকে টেনে নিয়ে কার্জন পার্কের একপাশে বসে তার নতুন লেখা পড়ে শোনাল। তখন সেটি একটি গল্প ছিল, পরে বঙ্গশ্রীতে যখন প্রকাশিত হয় তখন সজনীকান্তের উপদেশানুসারে সে আরো কয়েকটি অনুচ্ছেদ রচনা করে। এবং পরে এই কাহিনীগুলো 'দিবারাত্রির কাব্য' নামে প্রকাশিত হয়।"[১]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে মানিকের প্রথম ভাসা-ভাসা আলাপ সদ্যোজাত এক সাপ্তাহিক পত্রিকার অফিসে। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন তার সম্পাদক। সেই কাগজ অল্পদিনেই উঠে যায়। মানিকের সঙ্গে আলাপ বেশী না হলেও মানিকের চেহারাটা প্রেমেন্দ্র মিত্র কখনো ভুলতে পারেন নি। "ঢালাও ছাদের নিঃসঙ্গ অফিসঘরের একটি মাত্র বেশ উঁচু দরজা পূব দিকে খোলা। প্রথম প্রবেশের সময় সেই দরজার মাথা পর্যন্ত ছোঁয়া তাঁর সুদীর্ঘ সুঠাম বলিষ্ঠ চেহারা আমার মনে কেমন করে মুদ্রিত হয়ে গেছে। বিকেলের ধূলিমলিন আকাশের পশ্চাৎপটে সেই নিঃসঙ্গ মূর্তির সঙ্গে নিচের বাজারের হট্টগোলটুকুও।"[২] তারপর একদিন মানিক গেল প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে গুটি ছয়-সাত গল্পের পাণ্ডুলিপি দেখাতে। মানিকের আগেই প্রেমেন্দ্র মিত্র কলম ধরেছেন। নতুন লেখকেরা অগ্রজদের কাছে অনেক সময় লেখা যাচাই করতে নিয়ে যায়। মানিকও সেজন্য গিয়েছিলেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই গল্পগুলো পড়ে বিস্মিত হয়েছিলেন। অবশ্য বিস্ময়, কৌতূহল এবং প্রশংসার সঙ্গে যন্ত্রণাও ছিল মেশানো। "বিস্ময়, আশ্চর্য অসামান্য একজন লেখকের আকস্মিক আবিষ্কারে, কৌতূহল তার লেখার অদ্ভুত ব্যতিক্রমের মূল সম্বন্ধে, প্রশংসা তাঁর সহজাত অনায়াসে রচনা-কৌশলের জন্যে, আর যন্ত্রণা তাঁর স্রষ্টা মনের সেই দুর্বোধ বিফলতার আভাসে জীবনের গভীর প্রতিচ্ছবিও যাতে কেমন একটু বাঁকা হয়ে ছাড়া দেখা দেয় না।"

১৯৩৩-৩৪ সালে মানিক কী রকম ছিল সেই সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন শ্রীপরিমল গোস্বামী :

"মানিকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বঙ্গশ্রী অফিসে ১৯৩৩-৩৪ সালে। ধর্মতলা স্ট্রীটে অবস্থিত সেই অফিসটি আকারে যেমন ছিল

১। নতুন সাহিত্য। সপ্তম বর্ষ, ১৩৬৩।

২। ১৯৫৬ সালের ৮ই ডিসেম্বর সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় মুদ্রিত প্রবন্ধ : 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

প্রশস্ত, আতিথেয়তায় তেমনি ছিল উদার। সেটি ছিল যেমন একটি সাহিত্য, শিল্পী ও গুণীজনের মিলন ক্ষেত্র, সপ্তদশ শতাব্দীতে খ্যাত বিলিতি কফি-হাউস।

মানিক তখন নিতান্ত তরুণ, আমার তুলনায় ত বটেই। বয়সে প্রায় বার বছরের ছোট। ব্যবহারে নম্র, কিন্তু ব্যক্তিত্বে কঠোর। চেহারায়, ব্যবহারে, কথায় একেবারে স্বতন্ত্র। আপন ক্ষমতা বিষয়ে সচেতন নয়, কিন্তু আত্মশক্তি তার সমস্ত সত্তায় প্রতিফলিত।

প্রথমেই তার সম্পর্কে যেটি অনুভব করেছিলাম সেটি হচ্ছে তার ঐ স্বাতন্ত্র্য। সব বিষয়ে সজাগ, বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি, অথচ সব বিষয়ে কেমন যেন একটা রহস্যপূর্ণ সুদৃঢ়তা। একটা অবর্ণনীয় ঔদাসীন্য, অথচ তা মধুর এবং মহা আকর্ষক। যা প্রীতিকর, প্রসন্নকর এবং যার প্রতি উদাসীন থাকা অসম্ভব।

যে তরুণ যুবক আপন ক্ষমতা বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নয়, শিল্পবর্জন যার সহজাত ধর্ম এবং সে বিষয়ে যার দাম্ভিকতার বা আত্মপ্রেমের অস্বস্তিকর প্রকাশ নেই, তাকে সাধারণের দলে দেখা যায় না। তাই মানিক আমাদের ভাষায় উন্মাদ আখ্যা পেলেও একমাত্র সেই বৈশিষ্ট্যেই সে ছিল আমাদের প্রীতিভাজন।"[১]

মানিকের পিতা তখন সমগ্র পরিবার নিয়ে থাকেন মুঙ্গেরে। মানিকের পরের ভাই সুবোধবাবুর সেখানে ব্যবসা ছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের প্রবল ভূমিকম্পে মানিকের পরিবারও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হল। সে এক প্রবল ভূমিকম্প। মুহূর্তে বাড়ি-ঘর-মানুষ-পশু একসঙ্গে সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। একটি বাড়ীও তখন মুঙ্গেরে আস্ত ছিল কিনা সন্দেহ। মানিকের পরিবারেও এই ধাক্কায় অনেক ওলট-পালট হয়ে যায়; দু'একটি কচি-কাঁচা ভিন্ন পরিবারের সকলেই প্রাণে বেঁচে চলে এল মানিকের মধ্যম ভ্রাতা সন্তোষকুমারের নিকটে রাঁচীতে।

সন্তোষবাবু অনেকদিন আগে রাঁচীতে ডাক্তার হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। মুঙ্গেরের ভূমিকম্পে বাড়ি চাপা পড়ে তাঁরই একটি শিশু-কন্যা প্রাণ হারায় এবং পরিবারের অনেকের সঙ্গে অন্য কন্যাটিও আহত হয় দারুণভাবে। রাঁচীর মনোরম আবহাওয়া এবং ডাক্তার ভ্রাতার চিকিৎসা ও যত্নে ক্রমে ক্রমে সকলেই সুস্থ হয়ে উঠে।[২]

খবরের কাগজে ভূমিকম্পের সংবাদ দেখে মানিক পরিবারের লোকজনদের সম্বন্ধে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুঙ্গেরে চলে যান। মুঙ্গেরে নেমে তিনি শহরে যে অবস্থা দেখেন তাতে তিনি আপন পরিবারের লোকজনদের

১। ১৯৫৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের যুগান্তর পত্রিকায়।

২। স্মরণ করি (অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়)।

সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েন। তাঁর ধারণা হল, হয়ত কেউ বেঁচে নেই। মানিক তাই সারাদিন ধরে ভগ্নস্তূপগুলো দেখে দেখে বেড়াতে লাগলেন। পরে রাত্রির অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর ভ্রাতা সুবোধকুমারের সঙ্গে তাঁর হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। পরিবারের লোকজনদের খবর শুনে তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। আহত এবং নিহত ভাইঝিদের জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ করেন। মানিকের মন ছিল খুব সরল এবং সহৃদয়। তিনি সন্তোষবাবুর ছেলেমেয়েদের খুবই ভালবাসতেন। দাদাদের মধ্যে সন্তোষবাবুর পরিবারের সঙ্গেই তার সম্পর্ক ছিল মধুর। তারপর মানিক সুবোধবাবুর সঙ্গে পরিবারের আহত লোকজনদের নিয়ে রাঁচী যান এবং সেখানেও বেশ কিছুদিন কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন।[১]

১৯৩৫ সালে মানিকের সঙ্গে সজনীকান্ত দাসের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। তখন মানিক প্রায়ই সজনীকান্তের বাড়িতে আড্ডা দিতে যেতেন। সে সময়কার ঘটনা সম্পর্কে শ্রীপরিমল গোস্বামী লিখেছেন :

"২৫/২, মোহন বাগান রো-তে সজনীকান্ত থাকতেন দোতলায়, আমি একতলায়। তারিখটা ঠিক মনে নেই, কিন্তু এটুকু মনে আছে সজনীকান্ত কয়েকদিন অপরিবার ছিলেন। সে অবস্থায় মাত্র কয়েকদিনের জন্য দোতলায় একটা ঘরে আড্ডা জমত। মানিকও আসত। রাত ১১টার নিচে ওঠা হত না। সজনীকান্ত, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক ও আমি (আরও কেউ হয়ত আসতেন, মনে নেই।) বাজি ধরে তাস খেলেছিলাম ক'দিন। হঠাৎ খেয়ালের ব্যাপার। স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা। বাজির পরিমাণও চার-পাঁচ টাকার বেশি নয়। যতদূর মনে পড়ে এ পরিকল্পনাটা মানিকের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল।

এই সামান্য ঘটনা থেকে মানিকের পরিচয় আরও খানিকটা আমার কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। ওর বাজি ধরার ধরণ ছিল বেপরোয়া। তার মধ্যে সতর্কতার কোন বালাই ছিল না, সবটাই চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়া। সমধর্মী সজনীকান্তকেও সে এ বিষয়ে চমকিয়ে দিয়েছিল। বোধহয় দিন সাতেক খেলা হয়েছিল এবং এটি মনে আছে যে, প্রতিদিনই মানিককে ঘরে ফেরার বাস ভাড়া দিয়ে দিতে হত যাবার সময়।"[২]

১। সুবোধবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

২। যুগান্তর ১৬।১২।৫৬।

১৯৩৫এর ৭ই মার্চ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স মানিকের 'জননী' উপন্যাস প্রকাশ করেন। নতুন লেখক মানিকের পক্ষে তখন প্রকাশক পাওয়া সহজ ছিল না। এ সম্পর্কে ভবানী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "মানিকের জননী উপন্যাসখানি একটি ফুলস্কেপ সাইজের বিরাট খাতায় লেখা ছিল। ছোট অক্ষরে লেখা সেই উপন্যাসখানি হাতে করে অনেক ঘুরতে হয়েছে।" (নতুন সাহিত্য, ১৩৬৩)।

জননীর পাঁচ মাস পরে প্রকাশিত হল 'অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প'। মানিকের প্রথম গল্প সংগ্রহ। মোট দশটি গল্পের সঙ্কলন। অতসীমামী গল্পের নামেই সঙ্কলনের নাম রাখা হয়েছে। এই অতসীমামী গল্পের সম্বন্ধে মানিক পরবর্তী-কালে তাঁর উপন্যাসের ধারা প্রবন্ধে বলেছে, "অতিজানা অতিচেনা মানুষকে করেছিলাম 'অতসীমামী'র নায়ক-নায়িকা। সত্যই চমৎকার বাঁশী বাজাতেন চেনা মানুষটি, বেশি বাজালে মাঝে মাঝে সত্যই তাঁর গলা দিয়ে রক্ত পড়ত এবং সত্যই তিনি ছিলেন আত্মভোলা খেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। ভদ্রলোকের বাঁশী বাজানো সত্যই অপছন্দ করতেন তাঁর স্ত্রী, মাঝে মাঝে কেঁদে কেটে অনর্থ করতেন।

শুধু এটুকু নয়। সত্যই দু'জনে তাঁরা একেবারে মশগুল ছিলেন পরস্পরকে নিয়ে। এঁদের দেখেছিলাম খুবই অল্প বয়সে, সেই বয়সেও শুধু এঁদের কথা বলা, চোখে চোখে চাওয়া দেখে টের পেতাম অন্যান্য অনেক জোড়া চেনা স্বামী-স্ত্রীর চেয়ে এঁদের মধ্যে বাঁধনটা ঢের বেশি জোরাল, সাধারণ রোগে ভুগে ভদ্রলোক মারা গেলেও কিছু কালের জন্য তাঁর স্ত্রী পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

অতসীমামী লিখবার সময় এঁদের দুজনকে আগাগোড়া মানস চোখের সামনে রেখেছিলাম। শুধু তাই নয়। সোজাসুজি কাহিনীটা লিখে না গিয়ে নিজে আমি অল্প বয়সী একটি ছেলে হয়ে গল্পের মধ্যে ঢুকে তাঁর মুখ দিয়ে গল্পটা বলেছিলাম।

আমার এই প্রথম গল্পের কাহিনী হাস্যকর রকমের রোমান্টিক কল্পনা। আজও যখন ট্রেন দুর্ঘটনার রাত্রে প্রতি বছর অতসীমামীর রেললাইনের ধারে নির্জন মাঠে একাকিনী সারারাত মৃত প্রিয়ের সঙ্গ অনুভব করতে যাওয়ার কথা ভাবি, আমার নিজেরই হাসি পায়। এমনি ভাবতে গেলে হাসি পায়, কিন্তু আজও গল্পটি প্রথম থেকে পড়ে গেলে আর মনে মনে হাসবার সাধ্য হয় না।

কারণ, কাহিনী রূপকথা হলেও নায়ক-নায়িকা জীবন্ত মানুষ, উদ্ভটভাবে হলেও

কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে মাটির পৃথিবীর দুটি মানুষের বাস্তব প্রেম।"[১] এই গ্রন্থের অন্যান্য গল্পেও আছে মানিকের রোমান্টিক ভাবনার পরিচয় আর তার সঙ্গে আছে ফ্রয়েডিয় মনোবিকলনের প্রভাব।

'অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের চার মাস পরে প্রকাশিত 'দিবারাত্রির কাব্য'। অধুনালুপ্ত 'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্রিকায় এই উপন্যাস ১৩৪১ সালে ক্রমশ প্রকাশিত হয়। পুস্তক আকারে এই গ্রন্থের প্রকাশকাল ডিসেম্বর, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ। প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিসিং কোং লিঃ নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬২।

লেখকের নিবেদনে মানিক লিখেছেন, "দিবারাত্রির কাব্য আমার একুশ বছর বয়সের রচনা। শুধু প্রেমকে ভিত্তি করে বই লেখার সাহস ওই বয়সেই থাকে। কয়েক বছর তাকে তোলা ছিল। অনেক পরিবর্তন করে গত বছর (১৩৪১ বঙ্গাব্দ) বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ করি।

দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয়, বইখানি খাপছাড়া, অস্বাভাবিক —তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনী। রূপকের এ একটি নূতন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায় সেইগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের projection—মানুষের এক-এক টুকরো মানসিক অংশ।"

এই উপন্যাসের হেরম্ব চরিত্রের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে মানিক লিখেছেন, "ফুলের বেঁচে থাকবার চেষ্টার সঙ্গে কীটের ধ্বংস পিপাসার দ্বন্দ্ব, এই রূপকটাই ছিল এত কালের হেরম্ব।" মানিকের জীবনেও ছিল এই দ্বন্দ্ব। একদিকে জীবনের প্রতি, বেঁচে থাকবার জন্য প্রবল আগ্রহ অন্যদিকে মধ্যবিত্ত জীবনের বিকৃতি ও কৃত্রিমতা তার কাছে মনে হত অসহ্য। তিনি চাইতেন এর ধ্বংস। কিন্তু এই বিকৃতিকে ধ্বংস করে কি করে নতুন করে জীবন গড়া যায় সেই চিন্তা তার মনে এখনো আসেনি! সেজন্যই বোধ হয় মানিক তার এই দ্বন্দ্বের পরিণামে ধ্বংসের মাহাত্ম্যই রূপায়িত করেছেন। আনন্দকেও শেষ পর্যন্ত এই কাব্যে আত্মাহুতি দিতে হল। মৃত্যুর মধ্যেই সে তার জীবনের শ্রেয়বোধকে অনুভব করল।

তখনকার বঙ্গশ্রীর সম্পাদক, সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে এ

১। উপন্যাসের ধারা (লেখকের কথা)

উপন্যাস সম্বন্ধে লিখেছেন, "শ্রীমান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গল্প (সরীসৃপ-আশ্বিন, ১৩৪০) লইয়া (বঙ্গশ্রীর) আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষে একটি বিচিত্র উপন্যাস হস্তে তাঁহার শুভাগমন ঘটিল। এই উপন্যাসের ক্রম পরিণতির কাহিনীও বিচিত্র।...লেখাটির পরিণতি সম্বন্ধে তখনও অব্যবস্থিতচিত্ত মানিক 'একটি দিন' নামদিয়ে একটি সম্পূর্ণ আকারে এই উপন্যাসটি উপস্থিত করিলেন। পড়িয়াই বলিলাম, করিয়াছ কি? একটা উপন্যাসের সম্ভাবনাকে এমনভাবে হত্যা করিবে? বিচলিত মানিক বিদায় লইলে আমি 'একটি দিন' সম্পূর্ণ গল্পাকারে ছাপিয়া দিলাম (বৈশাখ, ১৩৪১)। অনতিবিলম্বে মানিক 'একটি দিন'-এর উপসংহার 'একটি সন্ধ্যা' লইয়া উপস্থিত হইলেন। 'একটি সন্ধ্যা'তেও শেষ হইল না, দুই সন্ধ্যা পরে সন্ধ্যা রাত্রিতে গড়াইল এবং আরও দুই সংখ্যা পরে 'রাত্রি' 'দিবারাত্রির কাব্য' হইল।"

দিবারাত্রির কাব্য তিন ভাগে বর্ণিত। প্রথম ভাগে আছে 'দিনের কবিতা', দ্বিতীয় ভাগে 'রাতের কবিতা' আর তৃতীয় ভাগে 'দিবারাত্রির কাব্য'। প্রত্যেক ভাগের মুখবন্ধে একটি করে কবিতা দেওয়া আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যচর্চার এখানেই প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। অবশ্য বঙ্গশ্রী পত্রিকায় প্রকাশ কালে এই কবিতাগুলি ছিল না।

দিবারাত্রির কাব্য একটি রোমান্টিক উপন্যাস। পূর্বসূরী এবং সমসাময়িকদের রোমান্টিক চিন্তাধারার প্রভাব মানিক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, তবে দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসের সঙ্গেই সেই স্তর শেষ হয়ে যায়।

॥ ৯ ॥

১৯৩৬ সালে মানিক লিখলেন তিনটি উপন্যাস—'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং 'জীবনের জটিলতা'। এদের মধ্যে প্রথম দু'খানি মানিকের কালজয়ী এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত উপন্যাস।

এ দু'খানি উপন্যাসেই তিনি বিশ্ব সাহিত্যে নিজের স্থান সুনির্দিষ্ট করে নিলেন। মানিকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে অনেকেই পল্লীজীবনকে আশ্রয় করে গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু মানিকের রচনা তাঁদের চেয়ে পৃথক। এখানে নেই পল্লীজীবনের মাধুর্যপূর্ণ আর ভাবপূর্ণ চিত্র। আছে রূঢ় বাস্তবের মর্মস্পর্শী পরিচয়। মানিকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে পিয়ের ফালোঁ এস. জে. লিখেছেন:

"এখানে (পদ্মানদীর মাঝি) পেলাম বাংলার সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনের একটি বাস্তব ছবি, যে ছবির আতিশয্যহীন ও মর্মস্পর্শী পরিচয় আমার দেশের লোকের কাছে, আমার ভাষাভাষীদের কাছে দেবার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। পড়া শেষ করে সেই রাত্রেই বইখানির কয়েকটি জায়গা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে ফেললাম। আমার এক ভাইকে সেই অনুবাদ পাঠিয়ে মানিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। উত্তরে ভাই আমার এই অপরিচিত বিদেশী শিল্পীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সমস্ত বইটির অনুবাদ তাকে পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কি কারণে জানি না—সম্ভবত সময়ের অভাবে তাঁর সেই অনুরোধ আমি রাখতে পারিনি।...

কুবের মাঝির দুঃসাহসিক জীবনের চিত্রাঙ্কন বইয়ের প্রধান আকর্ষণ নয়; পূর্ববঙ্গের সেই ধীবর-পল্লীর জীবনযাত্রার অকৃত্রিম বর্ণনা ও গ্রামবাসীদের সরল কথ্যভাষার অতি সার্থক প্রয়োগ উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণও নয়। সাধারণ মানুষের আদিম ও অমার্জিত মানবতা, অশিক্ষিত ও কষ্টনিপীড়িত মানুষের চিরন্তন হৃদয় বেদনা ও গভীরতম প্রবৃত্তির অশান্ত সংঘাত, ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ জীবন পরিধির মধ্যেও অপরিচিত ও অনিশ্চিত পরদেশের অনিবার্য আকর্ষণ 'পদ্মানদীর মাঝি' বইখানিতে নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে বলেই এই উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যের ভূমিকায় সার্থকতা অর্জন করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট চরিত্রগুলি রূপক নয়। কুবের, গণেশ, রাসু, মালা, কপিলা ইত্যাদি মানুষগুলি রক্তমাংসেরই মানুষ। বাস্তব ও জীবন্ত মানুষ। তবে লেখক সত্যকার স্রষ্টা ও শিল্পী বলে ঐ চরিত্র সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়েছে।

তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি অতিক্রম করে বাস্তবতার সঙ্গে এক গভীর ও সার্বজনীন সাংকেতিকতার সফল সংমিশ্রণ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। লেখক দার্শনিক না হয়েও প্রকৃত দ্রষ্টা ছিলেন; তাঁর সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির গুণে তিনি ঐ সকল মাঝি মানুষের অন্তরতম সত্তায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যেখানে তারা আর কেবল পূর্ববঙ্গের দরিদ্র ধীবর ত নয়, বিশ্বজগতের শ্রমকাতর ক্ষুধার্ত পদদলিত নর-নারীর প্রতিনিধি।

ফরাসী লেখক মোপাসাঁর কথা আপনা-আপনি মনে পড়ছে। মানিকের সঙ্গে মোপাসাঁর সুনিপুণ শৈলী ও বাস্তবধর্মী চিত্রাঙ্কন প্রণালী তুলনীয় বটে। বাস্তবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও সাধারণ মানুষের চরিত্র রূপায়ণে দু'জনে সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবুও তফাৎ অনেকখানি। মোপাসাঁর মধ্যে কি একটা উপেক্ষাপূর্ণ আভিজাত্যের ভাব রয়েছে, তিনি সাধারণ মানুষকে হয়ত চিনতেন কিন্তু ভালবাসতেন না। তাঁর বর্ণনা কতকটা নিষ্ঠুর, নিজেকে তিনি তাঁর চরিত্রগুলির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলে বোধ করতেন না। মানিকের মধ্যে সেই নিষ্ঠুরতার লেশমাত্র নেই। অন্তত পক্ষে 'পদ্মানদীর মাঝি' বইখানির মধ্যে ত নেই-ই। রুশ লেখক গোর্কীর সঙ্গে মানিক এদিক থেকে তুলনীয়। গোর্কীর মত তাঁর বাস্তবধর্মী মনে মমতার অন্ত নেই। মানিক সত্যই কুবের, গণেশ, মালা, কপিলাকে ভালবেসেছিলেন। ভালবেসেছিলেন বলে তিনি শরৎচন্দ্রের ন্যায় তাঁর চরিত্রগুলিকে ভাবমণ্ডিত করে তোলেন নি, কিন্তু সেই অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা ও পরম আত্মীয়তার গুণে তিনি তাদের রূঢ় অসভ্যতা ও নৈতিক দুর্বলতা দর্শনে একটুও অবজ্ঞা করেন নি।

মানিক তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র হোসেন মিয়ার মত ধীবর পল্লীর সকল নর-নারীকে আপন বলে গ্রহণ করেছিলেন। হোসেন মিয়া চরিত্রটি 'পদ্মানদীর মাঝি' বইখানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তার মধ্যে মনে হয় মানিকের আত্মপরিচয়ের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।"[১]

'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসখানিকে পিয়ের ফালোঁ বলেছেন, 'নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানিকের 'শিল্পীমনের উৎকৃষ্টতর ও গভীরতর অভিব্যক্তির নিদর্শন'। তিনি লিখেছেন, "হোসেন মিয়া চরিত্রের মারফতে মানিকের যেটুকু পরিচয় পেয়েছিলাম, শশী ডাক্তারের চরিত্রে সেই পরিচয় আরও ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছে। গাওদিয়া গ্রামের জীবনযাত্রা সেই ধীবরপল্লীর জীবনযাত্রার চাইতে আরও জটিল ও সমস্যাবহুল। স্রষ্টা ও দ্রষ্টা মানিকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নৈপুণ্য ও বাস্তব চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতা এখানে

১। পরিচয়, পৌষ, ১৩৬৩।

পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

বিদেশী সাহিত্যে যদি এই উপন্যাসের সমতুল্য ও সমজাতীয় কোন সার্থক উপন্যাসের সন্ধান করতে হয়, তাহলে কেবল মোপাসাঁ কিংবা গোর্কী নয়, হয়ত ফ্লোবের কিংবা বালজাক-এর নাম উল্লেখ করতে হবে। মানিক পরবর্তী কতক-গুলি উপন্যাস ও গল্পের পাঠেই এমিল জোলা ও গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে তাঁর শিল্পগত সহধর্মিতার কথা ভাবতে হয়েছে, কিন্তু 'পুতুল নাচের ইতিকথা' বই-খানিতে বাস্তবতার সঙ্গে চিন্তাশীল দার্শনিকতার সমন্বয় স্থাপন এবং গ্রাম্যজীবন-যাত্রার ধূসর সঙ্কীর্ণতার বর্ণনার সঙ্গেই শিক্ষিত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের মানসিক অস্থিরতার রূপায়ণ যেভাবে সাধিত হয়েছে উচ্চশ্রেণীর ঔপন্যাসিক ছাড়া আর কেউ সেইভাবে তা করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।...

"শশী ডাক্তারের চরিত্র উপন্যাসটির প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কীর্তি। শশী কোন আদর্শ পুরুষ নয়, গল্পের নায়ক হলেও তার জীবনে কিংবা তার ব্যক্তিত্বে কোন অসাধারণ গুণ বা মাহাত্ম্য আছে বলা যায় না। 'হৃদয় ও মনের গড়ন আসলে তাহার গ্রাম্য', তার জীবন পাড়াগাঁয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ, বড়ো এক-ঘেয়ে। এই বৈচিত্র্যহীন জীবনের তিক্ততায় তার মনে কী যেন এক নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের ভাব স্থান পেয়েছে। নিছক কর্তব্যের তাগিদে তার নিরানন্দ ও নির্জন পথে এগিয়ে যায় সে বিতৃষ্ণাপূর্ণ মন নিয়ে। তবু শশীর গভীর ও অস্থির ভাবুকতা তাকে বড় অশান্ত করে তোলে। গ্রাম ত্যাগের ইচ্ছাও মাঝে মাঝে তার মনকে আলোড়িত করে। তার আশেপাশে গাওদিয়ার যে সকল নরনারীর অনাড়ম্বর ও ঘটনাবিহীন 'গন্ধময়' জীবনযাত্রা সে উদাস দৃষ্টিতে লক্ষ্য ক'রে বেড়ায়, শশী তাদের প্রতি অগাধ মমতা ও অনুকম্পা অনুভব করে। তাদের জীবনের শ্রীহীনতা তাকে ব্যথিতও করে। তার ছাত্রজীবনের নানান স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা, ব্যাপকতর জীবনের আকর্ষণ, জীবন-মরণ সমস্যার চিন্তা তার আলোক-হীন জীবনের মধ্যে এনে দেয় এক তীক্ষ্ণ বেদনা ও গভীর নৈরাশ্য। শশী শত কাজকর্মে ব্যতিব্যস্ত হয়েও আসলে বড় নিষ্ক্রিয় ও নিরুৎসাহ। জীবনের রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার ভূমিকা তার নয়। সে কেবল দর্শক হিসাবে পুতুল নাচের চিরাভ্যস্ত দড়ি টানার খেলা দেখে মুগ্ধ হয়। বিরক্তও হয়।

এই উপন্যাসে মানিক সাহিত্যের সূক্ষ্ম বাস্তবধর্মিতা ও তাঁর অসাধারণ চরিত্রাঙ্কন শক্তির আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৃদ্ধ গোপালের চরিত্র বালজাকেরই তুলিতে আঁকা হয়েছে বিশ্বাস হচ্ছে।

যাযাবর ও বিশৃঙ্খল শিল্পী কুমুদের যে ছবি ফুটে উঠেছে, সেটিও অত্যন্ত বাস্তব ও মর্মস্পর্শী। কিন্তু কুসুম ও মতির চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক আরও দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। নারীহৃদয়ের এইরূপ বাস্তব বিশ্লেষণ খুব কম লোকের দ্বারা ইতিপূর্বে সাধিত হয়েছিল। বিন্দুর চরিত্রাঙ্কনে মানিকের পরবর্তী গল্প ও উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যের কিছু পাওয়া যায়।”

উপন্যাসের ধারা প্রবন্ধে মানিক তাঁর 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন, “লিখতে শুরু করেই আমার উপন্যাস লেখার দিকে ঝোঁক পড়লো। কয়েকটি গল্প লেখার পরেই গ্রাম্য এক ডাক্তারকে নিয়ে আরেকটি গল্প ফাঁদতে বসে কল্পনায় ভিড় করে এল 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র উপকরণ এবং কয়েকদিনে একটি গল্প লিখে ফেলার বদলে দীর্ঘদিন ধরে লিখলাম এই দীর্ঘ উপন্যাসটি—এ ব্যাপারের সঙ্গে সাধ করে বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সম্পর্ক অনেকদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। মোটামুটি একটা ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে বর্তমান যুগে, কারণ তাতে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ চিনে সেগুলি কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়।”

অবশ্য মানিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাহিনী রচনা করলেও প্রথম দিকে ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদের চোরা মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এমন কি পুতুল নাচের ইতিকথায়ও নয়। আসলে মানিক তখনো নিজের পথ খুঁজে পান নি। তাঁর নিজস্ব 'জীবন-দর্শন' তখনো ঠিক গড়ে উঠেনি। আরম্ভ হয়েছে “সব সময় জীবনকে দর্শন করার বিরামহীন শ্রম”। এই জীবনকে দেখার দৃষ্টি তার বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি। কারণ মানিক নিজেই লিখেছেন। “প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান-প্রভাবিত মন উপন্যাস লেখার জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন যুগের যে কোন উপন্যাস ধরে বিশ্লেষণ করলে লেখকের এই বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে এই বিশেষ ধরণের মানসিক মমতা খুঁজে পাওয়া যাবে।” (উপন্যাসের ধারা)

মানিকের পিটোপিটি ছোট ভাই সুবোধবাবু বলেন, ১৯৩৩ সালে বিখ্যাত **King's Carnival** কোলকাতায় এসেছিল। সেখানে নানা ধরণের পুতুলনাচ দেখানো হোত। মানিক এই কার্নিভাল-এ নাচ দেখে অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং মানবজীবনকে অবলম্বন করে তা লিখবার মনস্থ করেন। তারই ফলে দেখা দিল 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাস।

মানিকের দাদা হিমাংশুবাবুর বিয়ে হয় ১৯৩৬ সালে। তার পাত্রী দেখবার

জন্য মানিক পূর্ববঙ্গের নানা জায়গায় মাসখানেক কাটিয়ে দিয়ে এলেন। বিয়ের পরেও মানিক সকলের সঙ্গে ফিরলেন না। দিন পনের পরে ফিরলেন। তার কিছু পরেই বেরুল তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস। এই মাঝিদের সঙ্গে তিনি অনেক দিন বাস করেন। তাদের সঙ্গে তিনি কি করে দিন কাটাতেন আত্মীয় স্বজনদের কাছে তার গল্প বলতেন। অতএব এই উপন্যাস তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল।[১]

'পদ্মানদীর মাঝি' মানিকের সর্বাধিক প্রচারিত উপন্যাস। দেশবিদেশের নানা ভাষায়—হিন্দী, ইংরেজী, রাশিয়ান, সুইডিস, চেক এবং চীনা ভাষায় এই উপন্যাস অনূদিত হয়েছে।

এ উপন্যাসে মানিক সমাজের নীচুতলার মানুষদের কাহিনী রচনা করেছেন। এখানে তিনি পদ্মানদীর জেলে ও মাঝিদের শরিক। তিনি অখ্যাতজনের নির্বাক মনের কবি। রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্খিত মানুষ। এই উপন্যাসেই মানিক তার প্রস্তুতি পর্বকে অতিক্রম করে স্বকীয়তা অর্জন করেছেন। মেহনতী সর্বহারা জীবনের বাস্তব কাহিনী রচনা করে বাঙলা সাহিত্যে তিনি বিশিষ্টতা লাভ করলেন।

১৯৩৬ সালের শেষদিকে প্রকাশিত হয় 'জীবনের জটিলতা' উপন্যাস। প্রকাশ করেন ফাইন আর্ট' পাবলিশিং হাউস। মধ্যবিত্ত জীবনে প্রেমের জটিলতার অভিব্যক্তি।

১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হল মানিকের একমাত্র গল্প সংকলন। 'প্রাগৈতিহাসিক।' প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। 'অতসীমামী' গল্প মানিককে সাহিত্য জগতে স্বীকৃতি দিয়েছে আর প্রাগৈতিহাসিক তাঁকে করেছে রীতিমত বিখ্যাত। এই গল্পে মানিকের তির্যক রচনাভঙ্গী বলিষ্ঠ প্রকাশ লাভ করেছে। এই গ্রন্থেও ফ্রয়েডের প্রভাব অনুভূত হয়। দিবারাত্রির কাব্যে মানিক প্রেমকে অবাস্তব, অপ্রাকৃত এক কল্পলোকের সামগ্রী বলে মনে করেছেন। কিন্তু তারপর তিনি নেমে এসেছেন যৌনক্ষুধার মধ্যে। প্রেম এখানে এক অন্ধ যৌনক্ষুধা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাগৈতিহাসিক, মিহি ও মোটা কাহিনী, সরীসৃপ, ভেজাল, চতুষ্কোণ প্রভৃতি গ্রন্থে তা স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। অবশ্য দুটো চিন্তাই অসত্য। পরবর্তীকালে তিনি প্রেমকে জীবনের সকল কর্ম ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত নর-নারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের এক বলিষ্ঠ প্রকাশ রূপে চিত্রিত করেছেন।[২]

১। শ্রীসুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
২। দর্পণ, পরাধীন প্রেম, চিন্তামণি প্রভৃতি উপন্যাস।

মানিকের সাহিত্য-জীবন শুরু হওয়ার দু বছরের মধ্যে তিনি সাতখানা উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ লিখে ফেললেন। এর জন্য তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ফলে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে এবং তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত হন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখেছেন, "প্রথম দিকে পুতুল নাচের ইতিকথা প্রভৃতি কয়েকখানা বই লিখতে গিয়ে যখন আমি নিজেও ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার একটা শরীর আছে এবং পরিবারের মানুষরাও নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন হয়ে গিয়েছিল তখন একদিন হঠাৎ আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। এক মাস থেকে দু তিন মাস অন্তর এটা ঘটতে থাকে।

তখন আমার বয়স ২৮|২৯—৪|৫ বছরের প্রাণান্তকর সাহিত্য সাধনা হয়ে গেছে।"[১]

মানিকের প্রথম মৃগী রোগ দেখা দেয় ১৯৩৬ সালের অক্টোবর/নভেম্বর মাসে। তাঁরা তখন থাকেন কোলকাতায় বেলগাছিয়া অঞ্চলে। মুঙ্গেরের বাস উঠে যাওয়ায় এরা আবার কোলকাতায় বসবাস করতে থাকেন। বেলগাছিয়ার এই বাড়িতে একদিন দুপুরবেলা মানিক হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। পরে জানা যায় ইহা মৃগী রোগ। এই রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে মানিক নিজেই দুটো কারণ দেখিয়েছেন, এক, তাঁর প্রাণান্তকর পরিশ্রম আর দুই, পরিবারের মানুষের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য। মানিকের যখন অল্পবয়স তখন তাঁর মাতা মারা যান। মাতৃহীন সংসারে মানিকের ভাগ্যে বেশী স্নেহ-মমতা কোনদিনই জোটেনি। মানিক ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন দুরন্ত, চঞ্চল এবং বেপরোয়া। এই খাপছাড়া প্রকৃতিকে সংযত করে তার প্রতিভাকে লালনের জন্য যে স্নেহ-মমতার প্রয়োজন; মানিকের জীবনে ছিল তার একান্ত অভাব। মানিকের প্রতি তার পরিবার ছিল উদাসীন। কারণ, মধ্যবিত্ত পরিবারে সকলেই ভাল পাস এবং ভাল চাকরীর প্রত্যাশা করে। মানিকের দাদারাও তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু মানিক তাঁদের পরামর্শ মত চলতে পারেননি। সেজন্য তারাও মানিককে উপেক্ষা করে চলত। মানিকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত এবং বড় চাকুরে। তিনি থাকেন বাইরে। মধ্যম ভ্রাতা ডাক্তার তিনিও রাঁচীতে। তারপরে যিনি সংসারে বড় তার এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে মানিকের ছিল সবচেয়ে বেশী অবনিবনা। একমাত্র বৃদ্ধ পিতা অবসর গ্রহণ করে কোলকাতায় আছেন। তিনি অবসর গ্রহণ করেন

১। শারদীয়া পরিচয়, ১৩৭২ পত্রিকায় প্রকাশিত অতুল চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কাছে মানিকের ৯|২|১৯৫৫ তারিখের লেখা চিঠি।

১৯২৮ সালে। মানিকের প্রতি একমাত্র তাঁরই দুর্বলতা ছিল। তিনি মানিককে খুব ভালবাসতেন এবং সস্নেহ উৎসাহ দিতেন। কিন্তু তার দাদা বৌদির নিষ্ঠুর ব্যবহার মানিককে মানসিক পীড়া দিত। কোন কোন আত্মীয় স্বজন মনে করেন মানিকের মৃগীরোগের কারণ তার বৌদির সঙ্গে তীব্র মনোমালিন্য এবং বাদানুবাদ।

বিশ্ব সাহিত্যে আর একজন মৃগী রোগাক্রান্ত বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের নাম জানা যায়। তিনি হলেন দস্তয়েভস্কি। দস্তয়েভস্কি ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং পড়বার সময় থেকেই তিনি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। আর তার পিতা ছিলেন নিঃস্ব রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট এক হাসপাতালের ডাক্তার। তিনি স্ত্রীকে প্রায়ই নির্যাতন করতেন। স্ত্রীর চরিত্রে তিনি সন্দেহ করতেন। তারপর তার এক ভূমিদাসের উপর অত্যাচার করায় তার প্রতিশোধ হিসেবে তিনি শোচনীয় ভাবে নিহত হন। তার কিছুদিন পর থেকে দস্তয়েভস্কির মৃগী-রোগের আক্রমণ হয়। দস্তয়েভস্কি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে লাগলেন। দস্তয়েভস্কির মৃগীরোগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফ্রয়েড বলেছেন: "মাকে কষ্ট দেবার জন্য শিশুকাল থেকেই বাবার প্রতি দস্তয়েভস্কি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। হয়ত অবচেতন মনে তাঁর গোপন কামনা ছিল, এমন অত্যাচারী পিতার মৃত্যু হক। কিন্তু শোচনীয় ভাবে পিতার যখন মৃত্যু হয় তখন তিনি ভাবলেন, আমি পিতৃহন্তা ; আমার গোপন কামনাই তার হত্যার কারণ হয়েছে। সুতরাং আমি অপরাধী। এই অপরাধ বোধ মনের উপর যে চাপ দিয়েছে তার ফলে তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।"

মানিকের পরিবারে এই রোগ আর কারো ছিল না। তবে শোনা যায় মানিকের এক বাল-বিধবা পিসীর মৃগীরোগ ছিল। তিনি জলে ডুবে মারা যান।

১৯৩১ সালের বৈশাখ মাসে তাঁরা টালিগঞ্জে বাসা করে চলে যান পরে ঐ বছরের শেষের দিকেই টালিগঞ্জে নিজেদের বাড়ি তৈরি করে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। এই বাড়ি ছিল মানিকের পৈতৃক।

এই বছরেই মানিক বঙ্গশ্রী পত্রিকায় চাকরী গ্রহণ করেন। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের তখনকার মালিক সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য-এর মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং নামে এক প্রতিষ্ঠান ছিল। এখান থেকে 'উপাসনা' নামে এক পত্রিকা বের হত। সজনীকান্ত দাস যখন সম্পাদক হিসেবে এ কাগজে যোগ দেন তখন তিনি উপাসনা নাম বদলে 'বঙ্গশ্রী' রাখেন এবং ১৯৩২ এর নভেম্বর থেকে ১৯৩৫ এর ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত একই সঙ্গে সম্পাদক এবং মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং এর কর্মাধ্যক্ষ হন। সজনীকান্ত দাসের পরে শ্রীকিরণকুমার রায় ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। তখন মাসিক পত্রিকার সঙ্গে বঙ্গশ্রী সাপ্তাহিকও বের হত। এই সাপ্তাহিক কাগজের জন্যই বিশেষভাবে সহকারীর প্রয়োজন হয়। মানিকের ইচ্ছা ছিল তিনি কখনো কারো চাকরি করবেন না। কিন্তু সে ইচ্ছাও রাখতে পারলেন না।

এই চাকুরী গ্রহণের মধ্যেও মানিক-চরিত্রের দুটি বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম, মানিক আবেদনপত্রটি রচনা করেছিলেন বাঙলায়। বর্তমানে বাংলা ভাষা সরকারী ভাষা রূপে স্বীকৃতি হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় দরখাস্ত রচনা করার প্রচলন বিরলদৃষ্ট। মানিক কিন্তু আজ থেকে বত্রিশ বছর পূর্বে বাংলা ভাষায় দরখাস্ত রচনা করে আপন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করলেন। দ্বিতীয়, মানিকের তখন আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হওয়া সত্ত্বেও শ্রীপরিমল গোস্বামীর চাকুরীর প্রয়োজন বেশী বলে মানিক তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চান নি। চাকুরির ক্ষেত্রে বেকার যুবকের এই উদারতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বঙ্গশ্রী পত্রিকায় মানিকের চাকুরীর দরখাস্তটি এখানে সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হল :

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সম্প্রতি অবগত হইলাম যে মহাশয়ের পরিচালিত বঙ্গশ্রী নামক মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদটি খালি হইয়াছে। উক্ত পদপ্রার্থী হইয়া আমি এই আবেদন প্রেরণ করিলাম। বাংলা পত্রিকা সংক্রান্ত ব্যাপার বলিয়া বাংলাতে আবেদন করিলাম।

১। আমার প্রকৃত নাম শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে আমি সাহিত্য সেবা করিয়া থাকি। আমার বর্তমান বয়স

২৬ বৎসর। ঈশ্বরেচ্ছায় ইতিমধ্যে আমি লেখক হিসাবে কিছু সুনাম অর্জন করিয়াছি। আমার সম্বন্ধে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত মন্তব্য এই সঙ্গে পাঠাইলাম।

২। আমি ১৯৩০ (ইং) সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে গণিতে অনার্সসহ বি. এস. সি. পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা দিতে পারি নাই। তৎপরে সাহিত্যসেবা আরম্ভ করিয়া বি. এস. সি. পরীক্ষা দিলে আমার জীবনের উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে কোনরূপ সাহায্য হইবে না মনে করিয়া আমি আর কোনরূপ চেষ্টা করি নাই।

৩। আমি এ পর্যন্ত বহু ছোট গল্প রচনা করিয়াছি। গল্পগুলি সাহিত্য-বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে ও পূর্বাশায় আমার দুইটি উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে। "জননী" শীর্ষক একটি উপন্যাস গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন। ডাকযোগে আমার লেখার নমুনা পাঠাইলাম।

৪। আমি কয়েকমাস নবারুণ নামক একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। কাগজটির আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় সে কাজ ছাড়িয়া দিতে হয়।

৫। আমি পূর্ববঙ্গে সদ্বংশসম্ভূত। আমার পিতৃদেব অবসরপ্রাপ্ত সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পুনার মেটিওরলজিষ্ট—তিনি কিছুকাল ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের আবহাওয়া বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল হইয়াছিলেন। তাহার পূর্বে কোন বাঙালী এই পদ পায় নাই।

৬। আমি ৪।৫ বৎসর নানা পত্রিকার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থাকিয়াছি।

৭। প্রয়োজন হইলে আমি কলিকাতার বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রশংসাপত্র উপস্থিত করিতে পারিব, যথা আচার্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার।

পরিশেষে নিবেদন এই, আমি অবগত আছি শ্রীপরিমল গোস্বামী এই পদটির জন্য আবেদন করিবেন। আমার চেয়েও তাঁহার চাকুরীর প্রয়োজন বেশী। মহাশয় যদি ইতিমধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে অনুকূল বিবেচনা করিয়া থাকেন তবে অনুগ্রহপূর্বক আমার এই আবেদন প্রত্যাহার করা হইল বলিয়া ধরিয়া লইবেন। কারণ, শ্রীপরিমল গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আমি প্রতিযোগিতা করিতে ইচ্ছুক নহি।"

মানিকের সঙ্গে বঙ্গশ্রীর মালিকের চুক্তি হয় তিনি ঐ কাগজে তাঁর অমৃতস্য পুত্রাঃ উপন্যাসটাও ক্রমশঃ বের করবেন। সেজন্য মানিক মাসিক দশ টাকা করে বেশী

পাবেন। আর তার মূল বেতন ছিল ৬৫৲ (পঁয়ষট্টি টাকা)। অতএব মানিক বঙ্গশ্রী পত্রিকা থেকে সর্বসাকুল্যে পেতেন ৭৫৲ টাকা। তখনকার দিনে এই টাকা নেহাৎ কম ছিল না। মানিকের মৃত্যুর পর অনেক পত্র পত্রিকায় বেরিয়েছিল মানিক বঙ্গশ্রীতে ২৫০৲ টাকা বেতন পেতেন। কিরণবাবু বললেন, সে কথা সত্য নয়। তখন কিরণবাবুই পেতেন মাত্র ১৫০৲ টাকা। বঙ্গশ্রীতে যোগ দিবার পূর্বে বঙ্গশ্রীর পাতায় মানিকের 'দিবারাত্রির কাব্য' এবং 'সরীসৃপ' গল্প প্রকাশিত হয়েছিল।[১]

তখনকার দিনে প্রায় সব সাহিত্যিক ছিলেন সাংবাদিক। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, সকলেই সাংবাদিকতা করেছিলেন। মানিক সংবাদ পত্রে কাজ করলেও সাংবাদিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন জাত সাহিত্যিক। সাংবাদিকের লেখা তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়ে উঠত না। কিরণবাবু বলেন, তিনি শালগ্রাম শিলা দিয়ে বাটনা বাটিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি সেজন্য এখনো দুঃখ প্রকাশ করেন। কিরণবাবু ছিলেন hard task master. সকলকে ঠিক দশটায় আসতে হত আর পাঁচটায় ছিল ছুটি। মানিককেও আসতে হয়েছিল। বাঁধা কাজের বাইরে মানিককে এই পত্রিকায় যা কিছু লিখতে হত তা তিনি তাঁর আসল নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামে লিখতেন। মানিক বঙ্গশ্রীতে বছর দুই কাজ করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে মানিকের বিশেষ কোন সাহিত্য সৃষ্টি ছিল না। বঙ্গশ্রীর বাঁধা সময়ে কাজ করার পর হয়ত তাঁর দ্বারা আর কিছু করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

বঙ্গশ্রীতে তখন কাজ করতেন বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, সুধাংশু প্রকাশ চৌধুরী এবং রমেন গঙ্গোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তখন এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি বিচিত্র জগৎ নামে feature লিখতেন।

মানিকের ছিল তীব্র পর্যবেক্ষণ শক্তি। অফিসে কোন লোক এলেই তিনি কলম বন্ধ করে চুপ করে তার কথাবার্তা, হাবভাব সব নিরীক্ষণ করতেন। বঙ্গশ্রীর মালিক সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য আসলেও মানিক একঠায় তাকে লক্ষ্য করতেন। এতে কিরণবাবু এবং সচ্চিদানন্দবাবু দুজনেই অস্বস্তিবোধ করতেন কিন্তু মানিকের তাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। পরবর্তীকালে মানিক তাঁর সহরতলী উপন্যাসে এই সচ্চিদানন্দ বাবুকে অবলম্বন করেই সত্যপ্রিয়-র চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্দবাবুর লেখার বাতিক ছিল। তিনি 'ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্যা ও তাহার প্রতিকারের উপায়' এই শিরোনামে দীর্ঘকাল ধরে প্রবন্ধ রচনা করেন। বঙ্গশ্রীর পাতায় তাঁর লেখাই অনেক জায়গা জুড়ে থাকত। কারণ তিনি ছিলেন বঙ্গশ্রীর প্রধান লেখক। সহরতলী

১। কিরণকুমার রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

উপন্যাসের জ্যোতির্ময় হলেন কিরণকুমার রায়। সহরতলী উপন্যাসে বিয়েতে যে জড়োয়া সেট-এর উল্লেখ আছে আসলে সেই সেট সচ্চিদানন্দবাবু মানিকের বিয়েতে দিয়েছিলেন। তখন ১২৫৲ টাকায় এই জড়োয়া সেট পাওয়া যেত। সচ্চিদানন্দবাবু প্রত্যেকের বিয়েতে ঐ সেট দিতেন। কিরণবাবুর বিয়েতেও অনুরূপ সেট উপহার দিয়েছিলেন।

মানিকের পর্যবেক্ষণের এক অদ্ভুত গল্প বললেন কিরণবাবু। এক রাতে কিরণবাবু, সুধাংশুবাবু এবং মানিক বাড়ী ফিরছিলেন ট্রামে করে। এসপ্লানেড থেকে গড়ের মাঠ ঘুরে যে ট্রাম আসে কালিঘাট ডিপোয় সেই ট্রামে করেই তারা ফিরছিলেন। তখন রাত প্রায় দশটা। কনডাক্টর ট্রামের টিকিট চাইতেই কিরণবাবু এবং সুধাংশুবাবু বলে উঠলেন, মান্থলি। সত্যি সত্যি মান্থলি ছিল তাদের পকেটে। মানিকও সেই সঙ্গে বলে দিলেন, মান্থলি। তাঁর পকেটে কিন্তু মান্থলি ছিল না। কনডাক্টরের কি রকম সন্দেহ হল। সে মানিকের টিকিট দেখতে চাইল। মানিক উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, আমি বললাম, তোমার বিশ্বাস হল না বুঝি। আর সঙ্গে সঙ্গে কনডাক্টরের গালে এক চড় কসিয়ে দিলেন। সঙ্গী কিরণবাবু এবং সুধাংশুবাবুর ভদ্রতায় আঘাত লাগল। তারা এ ঘটনায় ব্যথিত হলেন এবং তার পরের ষ্টপেজেই নেমে গেলেন। মানিকও দ্রুত চলতি গাড়ী থেকে তাদের পিছনে পিছনে নেমে এলেন। তাঁদের কাছে এসে বললেন, 'কিরণদা, সত্যি আমার বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে। এতটা হবে আমি ভাবতে পারি নি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি দেখছিলাম কনডাক্টরের re-action কী হয়।' কিরণবাবু উত্তেজিত ভাবে বললেন, 're-action! অন্যের re-action দেখবার জন্য তুমি মানুষ খুন করতে পার?' মানিক অনায়াসে বললেন, 'পারি'। কিরণবাবু সুধাংশুবাবু অবাক হয়ে গেলেন। এই ছিল মানিক। সাধারণ মানুষ সে নয়। সাধারণের মত ব্যবহারও তার ছিল না। তার সব কিছুতে ছিল বাড়াবাড়ি। একটুতে নিবৃত্ত হওয়া ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ। অদ্ভুত তার খেয়াল।

আরেকটি ঘটনা যা তখন কিরণবাবুকে খুব উত্তেজিত করেছিল। কিন্তু পরে বুঝলেন তাও ছিল মানিকের পাগলামো আর অদ্ভুত খেয়াল। কিরণবাবু এক মাসের ছুটিতে সপরিবারে গেলেন পুরী বেড়াতে। মানিক তখন বঙ্গশ্রীর দায়িত্বে। পরের সংখ্যা বঙ্গশ্রী প্রকাশ করে মানিক সচ্চিদানন্দবাবুকে বললেন, 'এই দেখুন কাগজ। কিরণদাও বের করত আর আমিও করেছি। আপনি কেন কিরণদাকে অতগুলো টাকা দেন! আমাকে আর ২৫৲ টাকা দিন। আমিই সব দায়িত্ব

নিচ্ছি। কিরণবাবু ফিরে এলে সচ্চিদানন্দবাবু কথাটা বলে দিলেন। মানিক কিন্তু কিরণবাবুকে সহজ ভাবেই বলল, আমি জানতুম কিরণদা, সচ্চিদানন্দবাবু আপনাকে ছাড়তে পারেন না। তবু বললাম, দেখি মালিক ৫০৲ টাকার লোভে এই কাজ করেন কি না। তার re-actionটা দেখছিলুম।'

কিরণবাবু বললেন, 'মানিক ছিল খুবই ill-read. পড়াশুনা সে বেশী করত না। কিন্তু তার শক্তি ছিল অসাধারণ। 'দিবারাত্রির কাব্য'ই ধরুন। হোক রোমাণ্টিক কাব্য। কিন্তু ঐ রকম কাব্য বাঙলা সাহিত্যে পূর্বেও ছিল না পরেও নেই। অদ্ভুত সেই সৃষ্টি আর অদ্ভুত ছিল মানিকের ক্ষমতা।'

মানিককে বাঁধা ধরা নিয়মের মধ্যে কখনই বেঁধে রাখা যেত না। তার লেখা ছিল খুবই অনিয়মিত। 'অমৃতস্য পুত্রা'র কিস্তি লিখে দেবার জন্য তাকে সাতদিন ছুটি দেওয়া হোত। কিন্তু সাতদিন পরে ফিরে এসে বলত, 'আমার হয় নি কিরণদা'। আবার জোর করে তার কাছ থেকে লেখা আদায় করে নিতে হোত। সেজন্য অমৃতস্য পুত্রা উপন্যাসখানিও হয়েছে খাপছাড়া। মানিকের এ অভ্যাস পরবর্তীকালেও শোধরায় নি। পরিচয়ে ধারাবাহিক উপন্যাস লেখার সময় একই অবস্থা হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে লেখার কিস্তি যোগাড় করে আনা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকেও কখনো চুক্তিমত লেখা পাওয়া যেত না। বাড়িতে গেলে বাড়িতে থেকেও বলে পাঠাতেন, বাড়ি নেই। কিরণবাবু তখন 'বিজলী' পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। শরৎচন্দ্রও লিখতেন ঐ কাগজে। শেষকালেত শরৎচন্দ্রের নামে অন্য লোকের লেখাই ছাপিয়ে দিতে হয়েছিল।

বঙ্গশ্রীর আমলে মানিক মদ খেত খুবই কম। তখন সকলেই মদ খেত। এটাই ছিল ফ্যাসন। এ সম্বন্ধে ভবানী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "তিরিশ দশকের সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের মধ্যে অনেকের সুরাসক্তি ছিল, এ কথা অনেকেই জানেন। গোপনতার প্রয়োজন নেই। এদিকে মানিকও ক্রমশঃ আকৃষ্ট হয়। 'জননী' যখন প্রকাশ হয় তখনই তার হাতে খড়ি, তারপর সেই সুরা তাকে একদিন গ্রাস করলো, হয়তো শান্তিও দিয়েছে। তার জ্বালা মিটিয়েছে।" (নতুন সাহিত্য ১৩৬৩)।

কিরণবাবু মাত্র একদিন মানিককে পানাসক্ত অবস্থায় দেখেছিলেন। তিনি বলেন, মানিক মদ খেলেও মদ সে ভালবাসত না। দু রকমের পানাসক্ত লোক দেখা যায়। এক ধরণের লোক মদ খেয়ে তৃপ্তি বোধ করে, তাদের মেজাজ খোলে, আর এক ধরণের লোক মদকে ঘৃণা করে তবু খায়। যেমন মাইকেল, নজরুল, মানিক। তারা জীবন যন্ত্রণাকে ভুলবার জন্যই এ বিষ গ্রহণ করে। মানিকের

গল্প উপন্যাসের পুরুষ এমন কি নারী চরিত্রও তাদের জীবন-যন্ত্রণাকে ভুলবার জন্য সুরার আশ্রয় নিয়েছে।

মানিক বঙ্গশ্রীতে বছর দুই চাকরী করেন। এই চাকরী জীবন তাঁর নিকট প্রীতিপ্রদ হয় নি। ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে তিনি এই চাকরীতে ইস্তফা দেন। মানিক জুন মাসেই এই ইস্তফা পত্র পাঠিয়ে দেন।[১] বঙ্গশ্রীর এই চাকরী ছাড়া সম্পর্কে মানিক তাঁর দাদা সুধাংশুবাবুর নিকট ১৯।১।৩৯ তারিখের চিঠিতে লেখেন : "আমি ১লা জানুয়ারী হইতে বঙ্গশ্রীর চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছি। ইহা losing concern এবং management অত্যন্ত খারাপ। ২ বৎসরে আমার মাহিনা বাড়ায় নাই, ভবিষ্যতে কোন প্রকার উন্নতিরও আশা নাই। প্রত্যহ ১০।১২ ঘণ্টা করিয়া খাটিতে হইয়াছে। চারিদিক বিবেচনা করিয়া এখানে কাজ ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল মনে করিলাম।"

তা ছাড়া বঙ্গশ্রীর মালিক সচ্চিদানন্দবাবুর সঙ্গে মানিকের বনিবনা ছিল না। মানিক কোনদিন তোষামুদে ছিলেন না। সচ্চিদানন্দবাবুর বাগান বাড়িতে সাহিত্যের আসর বসত। তিনি সেখানে নিজের প্রবন্ধ পড়ে শোনাতেন। মানিকের ভাল না লাগলে তিনি কখনোই ঐ প্রবন্ধের প্রশংসা করতে পারতেন না বরং সমালোচনা করতেন। ফলে দু জনের মধ্যে মনোমালিন্য গড়ে উঠে। মানিকের চাকরী যাওয়ার পিছনে এ মনোমালিন্যও অন্যতম কারণ।[২]

১। মানিকের পদত্যাগ পত্র :

To Shri Sachidananda Bhattacherjee
Secretary, the M.P.P.H. Ltd.

Sir,

I am very sorry to inform you that I wish to resign at the end of September, 1938. I will explain the reasons as to why I am taking this step in a private letter to you.

I remain sir,

Dated — Calcutta.
The 13th June, 1938.

Your most obedient servant
Manik Banerjee
Assistant Editor, Bangasree.

২। শ্রীরমেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

'অমৃতস্য পুত্রাঃ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে। প্রকাশক ছিলেন কাত্যায়নী বুক ষ্টল। এরা তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৩৫৭ সালে। এই উপন্যাসের লিখন শৈলীর মধ্যে অসংলগ্নতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে ৬,৪২,৪৬,৪৮,৪৯ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় বহু জায়গায় শঙ্করের পরিবর্তে জহর ছাপা হয়েছে। আবার একই পৃষ্ঠায় শঙ্কর এবং জহর লেখা হয়েছে। এগুলো কি ছাপার ভুল? মানিকের শেষ জীবনেও এরকম ভুল অনেক দেখা যায়। অনেকে মনে করেন অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে চিন্তার এককেন্দ্রিকতার অভাবে এগুলো সম্ভব হয়েছে।

মানিক মৃগীরোগের আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য এবং শক্ত হয়ে যাতে অনেকক্ষণ একঠায় বসে লিখতে পারেন তার জন্য তিনি সুরাপান করতেন। অবশ্য মৃগীরোগাক্রান্ত হবার পূর্বেও তিনি সুরাপান করতেন তবে লিখতে শুরু করে অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য এর প্রতি বেশী আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। মানিক তখন অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজেকে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরবর্তী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকরূপে পরিগণিত করে তুলছেন এবং international fame এর কথা সারাক্ষণ চিন্তা করছেন। পুণা থেকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুধাংশুবাবুর ৫.১১.৩৭ তারিখের চিঠি থেকে তা জানা যায়। লেখা ছাড়াও তার সুরাপানের আরেকটি কারণ ছিল তা হল তার মানসিক অশান্তি।

এই মৃগীরোগের জন্য মানিককে তখনকার দিনে বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে দেখান হয়। তিনিও বলেন, ঔষধে এ রোগের নিরাময় হবে না। তার জন্য প্রয়োজন মানসিক শান্তি। সেজন্য তিনি মানিককে বিবাহের পরামর্শ দেন। ১১৩৭ সালের শেষ দিকে (সম্ভবত অগ্রহায়ণ মাসে) ময়মনসিংহের গভর্ণমেন্ট গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কমলাদেবীর সঙ্গে মানিকের বিয়ে হয়।

"কমলার দিদি অমিয়া দেবী প্রখ্যাত সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র সাহিত্যিক প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী। বরানগরে আমরা সাহিত্যিকেরাই এই বিবাহে মোড়লি করিয়াছিলাম।" (সজনীকান্ত দাস-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচয়, পৌষ, ১৩৬৩)

আমরা দস্তয়েভস্কির জীবনেও দেখেছি, তাঁর দ্বিতীয়বার বিয়ের পর যখন গৃহে এবং জীবনে সুখ ও শান্তি স্থাপিত হয়েছে তখন তার মৃগীরোগের নিরাময় হয়।

তার অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলো তৃপ্ত হওয়ায় আর তাকে রোগাক্রান্ত হতে হয় নি। মানিককে নিরাময় করে তোলা তার বিবাহের প্রধান কারণ হলেও এই বিবাহের ফলে মানিকের রোগ সারে নি। হয়ত বিবাহ সত্ত্বেও তার মানসিক কোন পরিবর্তন হয় নি।

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে মানিকের 'মিহি ও মোটা কাহিনী' নামে একটি ছোট গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে: "মানিকবাবুর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্র যে কিরূপ বিস্তৃত সাহিত্য রসিকের তাহা অজানা নাই। পদ্মানদীর মাঝিরা সমাজের যে স্তরে বাস করে, চোর ডাকাত ভিখারীর জীবনে প্রাগৈতিহাসিক দুর্দান্ত জীবন যাপন প্রণালীর যে অভিব্যক্তি আজও সুস্পষ্ট ধরা পড়ে, মধ্যবিত্ত সমাজের জননীর জীবন নিজস্ব আবেষ্টনীর মধ্যে সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করে আবার কালচার নামক ব্যারামটি এক শ্রেণীর মানুষের জীবনের আনন্দ-বেদনার উপর যে কৃত্রিম যবনিকা টানিয়া দেয়—সমাজের সকল স্তরের সকল শ্রেণীর মানুষের জীবন হইতে মানিকবাবু তাঁহার রসসৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করেন। এই সকল মানুষের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে মানিকবাবুর লেখায় যে রসসৃষ্টি হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই।" যতদূর জানা যায় মানিক নিজেই এই বিজ্ঞাপনের খসড়া লিখে দিয়েছিলেন।

১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয় আরেকটি ছোট গল্পের সংকলন। নাম 'সরীসৃপ'। মানিক ছিল মুখচোরা লাজুক ছেলে। কিন্তু 'সরীসৃপ' গল্পেই তাঁর পোক্ত পরিণত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সে মন সরল সাধারণ নয়, কুটিল জটিল অসাধারণ। মানিকের সাহিত্য সাধনার প্রথম পর্বে ফ্রয়েডিয় মনোবিকলন তত্ত্বের প্রভাব ছিল খুব বেশী। আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে যে অসংগতি, আচরণে যে পরস্পর বিরোধিতা, সভ্যতার মধ্যে যে বিকৃতি, বাহ্যিক সৌন্দর্যের অন্তরালে যে কুৎসিত রূপ প্রচ্ছন্ন আছে মানিক তাকেই অতি বলিষ্ঠ ভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন। ফ্রয়েডিয় প্রভাবে যৌন ইন্দ্রিয় বৃত্তিই যে জীবনের সবচেয়ে প্রবল শক্তি তাও তিনি সচেতন ভাবে বহুক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তবে মানিক অল্পদিনেই সেই প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন। কারণ তিনি ছিলেন জীবনশিল্পী, মনোবিকলনের দ্বারা মানুষের এই খণ্ডাংশকেই আবিষ্কার করা যায়, সমগ্র জীবনকে নয়। স্বভাবতই মানিক এ চিন্তার দ্বারা বেশীদিন আকৃষ্ট থাকতে পারেন নি। তার চিন্তাধারা ছিল বৈজ্ঞানিক। জীবনের সামগ্রিক চিন্তাই সেখানে প্রধান। এই

চিন্তার জন্যই তিনি পরবর্তীকালে মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন। মার্কসবাদ বাস্তব জগৎকে বাদ দিয়ে নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। মার্কসীয় সমালোচকেরা সামগ্রিকতার দ্বারাই বিচার করেন।

॥ ১৩ ॥

১৯৩৮-৩৯ সালে মানিকের ছোট ভাই সুবোধকুমার এবং মানিক দুজনে মিলে 'উদয়াচল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস' নামে দক্ষিণ কলিকাতায় (১০বি, জনক রোড, কালীঘাট) একটি ছাপাখানা ও প্রকাশন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল ছোট করে আরম্ভ করে ছাপাখানা ও পুস্তক প্রকাশনের ব্যবসা ধীরে ধীরে গড়ে তুলবেন। একটি মাসিক পত্র বের করবারও কথা ছিল। এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে রমাপতি বসুর সম্পাদনায় '১৩৪৫-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামে এক কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়; এই সংকলনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উত্তর-দক্ষিণ' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের মুখবন্ধে সম্পাদকীয় বক্তব্যে বলা হয়েছে:

"প্রতিভাবান কবি আমাদের দেশে অল্প। কবিতা লিখবো বলেই কবির সৃষ্টি। কবিতা লিখে কবি হওয়াকে শ্রদ্ধা করা যায়, কিন্তু কবি হবো বলে কবিতা লেখাকে শ্রদ্ধা করা যায় না। সেখানে সচেতনতার অভাব হয়, অভাব হয় কবিত্বের। যাঁরা কবি হবেন বলে কবিতা লেখেন বা ছাপার হরফে নাম ছাপিয়ে আনন্দ পান বলে কবিতা লেখেন, সে সমস্ত কবির কবিতা আমার এই সংকলনে স্থান পায় নি। যাঁদের প্রতিভা শুধু প্রচার ও ছাপার হরফে নাম দেখবার জন্য নিকৃষ্টতম পত্রিকা থেকে শ্রেষ্ঠতম পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ ক'রে আনন্দ পান এবং যাঁদের মধ্যে নূতনত্বের এতটুকু ক্ষীণ আলোরও সন্ধান পাওয়া যায় না, শুধু যে কোন কবির কবিতা অনুকরণ করে কবিতা সৃষ্টি করেন, তাঁদের কবিতা এই সংকলনের উপযুক্ত নয়। ...এই সমস্ত কবিদের বাদ দিয়ে ১৩৪৫ সালের শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন।"

সম্পাদকের এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় মানিক কেবল কবি হবেন বলে কবিতা লেখেন নি। বা নিজের কবিতা ছাপার হরফে দেখবেন বলে কবিতা লেখেন নি। তাঁর কবিতায় মৌলিকত্ব আছে বলেই সম্পাদক মানিকের কবিতা চয়ন করেছেন। এখানে মানিকের কবিতার কিছু নিদর্শন দেওয়া যাক:

অবজ্ঞার খোয়া-তোলা যত্নে-গড়া সাধারণ পথে
প্রতি পদক্ষেপে
টলে' পড়ি উত্তর দক্ষিণে—
দক্ষিণের বিজার্ভ-জমিতে
ভবিষ্যের শব সমারোহ, সমাধি-ফলক, পুষ্পিত শ্রদ্ধার্ঘ্য,
উত্তরের ছোট-ছোট নিষ্কর জমিতে
ভদ্র গৃহস্থের
একতলা দোতলা বন্দীশালা।

এর আগে মানিকের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসে। এই উপন্যাসের তিনটি পর্বের মুখবন্ধে তিনি তিনটি কবিতা লিখেছিলেন।

॥ ১৪ ॥

মানিক সাহিত্য জীবনের প্রস্তুতি পর্বকে অতি অল্পকালের মধ্যেই অতিক্রম করে গিয়েছেন। কিন্তু তখনো নিজের জীবনদর্শনকে সঠিক ভাবে জেনে নিতে পারেন নি। একের পর এক তাঁর বিখ্যাত গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হলেও মানিক নিজের অন্তরে ছিলেন অতৃপ্ত। ভাববাদ আর বাস্তববাদের সংঘাতে বিচলিত। সেই সংঘাতের সুস্পষ্ট কোন কারণও যেন খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এই সন্ধানের অন্তিম পর্বেই সূচিত হোল মানিকের আরেকখানি বিখ্যাত উপন্যাস 'সহরতলী'।

বঙ্গশ্রী পত্রিকা ছাড়বার পর ঐ পত্রিকা এবং বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের মালিককে অবলম্বন করে গড়ে তুললেন এক অপূর্ব সৃষ্টি—সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী। তার চেয়েও অদ্ভুত চরিত্র যশোদা। বাংলা সাহিত্যে নারী-চরিত্রে প্রথম বিস্ময়। এই সহরতলী উপন্যাস দুই ভাগে বিভক্ত। অবশ্য এই উপন্যাস যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তার মধ্যে কোন পর্ব বা কাল উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু পরে যখন 'সহরতলী' দ্বিতীয় পর্ব নামে প্রকাশিত হোল কেবলমাত্র তখনই পাঠক বুঝতে পারেন পূর্বে প্রকাশিত উপন্যাসটি সহরতলীর প্রথম পর্ব। প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে এবং দ্বিতীয় পর্ব ১৯৪১ সালে। দুই পর্বেরই প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

মানিকের বহু গল্প উপন্যাস সহরতলীর মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত। শহর থেকে সহরতলীর প্রতি মানিকের আকর্ষণ বেশী। তাঁর প্রথম উপন্যাস

জননীও সহরতলীর মানুষেরই কাহিনী। মানিক নিজেও থাকতেন সহরতলীতে। তার সহর বাসের সমস্তটাই কেটে ছিল সহরতলীতে। কখনো কোলকাতার দক্ষিণে কখনো উত্তরে। এই সহরতলীর মানুষ ও জীবনের সঙ্গে ছিল তার গভীর সম্পর্ক।

...মানিক তাঁর সাহিত্য-চর্চার অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন, দেশ পত্রিকার প্রফুল্লকুমার সরকারের এক চিঠি থেকে তার একটা প্রমাণ পাওয়া যাবে। মানিককে প্রফুল্লকুমার লিখেছেন: "আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড কর্তৃক পরিচালিত সাপ্তাহিক পত্র 'দেশ' অষ্টম বর্ষে পদার্পন করিয়াছে। যাহাতে 'দেশ' আরও জনপ্রিয় হয় তাহার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। আপনি বাংলা সাহিত্যে প্রথিতযশা কথা সাহিত্যিক। আপনি যদি 'দেশ' পত্রের জন্য শীঘ্রই একটা উপন্যাস পাঠান তবে বিশেষ আনন্দিত হইব। আশা করি আপনার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইব না।"

১৯৪১ সালে (১৩৪৮ শ্রাবণ) ডি. এম. লাইব্রেরী থেকে মানিকের এক বিতর্কিত উপন্যাস অহিংসা প্রকাশিত হল। অহিংসা প্রথমে 'পরিচয়' পত্রিকায় ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসে আছে এক আশ্রমিক ব্যবসার কাহিনী।

অহিংসা উপন্যাসের পর উদয়াচল পাবলিশিং হাউস থেকে মানিকের 'বৌ' নামে এক গল্প সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে প্রকাশের কোন তারিখ দেওয়া নেই। প্রাপ্তিস্থান লেখা আছে ভারতীভবন, ১১ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। সম্ভবত ১৯৪৩ সালে ইহা প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে মানিক সাহিত্যিক, কুষ্ঠরোগী, দোকানী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় মানুষের বৌদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এখানে মানিকের কল্পনায় অভিনবতা, তীক্ষ্ণতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৩৪৭ সালের ১০ই চৈত্র তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার সমালোচনায় এই বই সম্পর্কে বলা হয়েছে: "কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানিকবাবুর স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর অনন্যতাও সুস্পষ্ট। এই বইয়ের গল্পগুলির মধ্যেও তাঁহার সেই দৃষ্টি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় আছে। প্রত্যেক বৌই তাঁহার বিশিষ্টতার জন্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের নরনারীর জীবন ও মনস্তত্ব সম্বন্ধে লেখক যে সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।"

১৯৪৩ সালে আরো দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে একটি গল্প সংকলন গ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বাদ' এবং অপরটি উপন্যাস 'প্রতিবিম্ব'। সমুদ্রের স্বাদ গ্রন্থটি প্রকাশ করে বেঙ্গল পাবলিশার্স। গ্রন্থে প্রকাশের কোন তারিখ নেই।

১৩৫২ সালের ফাল্গুন মাসে দি বুকম্যান কর্তৃক প্রকাশিত সমুদ্রের স্বাদ-এর নতুন সংস্করণে লেখকের কথায় মানিক লিখেছেন, "ভাবের আবেগে গলে যেতে ব্যাকুল মধ্যবিত্তদের নিয়ে 'সমুদ্রের স্বাদের' গল্পগুলি লেখা। প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে, একদিকে চেনা চাষী মাঝি কুলি মজুরদের কাহিনী রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্চ্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার। মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মরমর এই সমাজের কাতরানি গভীর ভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মত মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙে দিতে পারি, সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে। তখন জানা ছিল না যে ওগুলি জীবনযুদ্ধের ক্ষত নয়, জরার চিহ্ন, ভাঙনের ইঙ্গিত; জানা ছিল না যে স্বাভাবিক নিয়মেই এ সমাজের মরণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী এবং তাতেই মঙ্গল—সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙ্গে বিরাট জীবন্ত সমাজে আত্মবিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা। জানা না থাকলেও সত্যই কি মনে প্রাণে বিশ্বাস ছিল যে নিজেকে জানতে পারলে এ সমাজ আবার নিজের গণ্ডীর মধ্যেই নতুন করে নিজেকে গড়তে পারবে—বিকার কেটে ফেলে সুস্থ হয়ে উঠবে? আজ নিজের লেখাগুলি আবার পড়ে বুঝতে পারি, সে রকম জোরালো বিশ্বাস ছিল না। আমি যে মধ্যবিত্ত, পথ খুঁজে না পাওয়ার আতঙ্কে বিহ্বল ও উদভ্রান্ত বলেই নির্মম আত্ম-সমালোচক, এর প্রমাণটাই বড় হয়ে আছে বিশ্বাসের চেয়ে।

মধ্যবিত্ত ভদ্রদের পরিণাম জানতাম না বটে, তবে পচা ভদ্রতার মিথ্যা খোলস খুলে সবাই ছোটলোক হোক এ পরিণাম যে কামনা করতাম আমার অনেক গল্পেই তা ঘোষণা করার চেষ্টা করেছি। পথ খুঁজে না পাই, পথের ইঙ্গিত জেনেছিলাম। তাই দরদ দিয়ে নির্মম আত্মসমালোচনার মূল্যে আমি আজও বিশ্বাসী।"

মানিক বঙ্গশ্রী পত্রিকার চাকরী ছাড়বার পর সম্ভবত ১৯৩৯ সালেই ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টে চাকরী পান। ১৯৪৩ সালের মে জুন মাস পর্যন্ত তিনি এই চাকরী করেন। ভবানী মুখোপাধ্যায় বলেন, "তখন তার মনে এক রাজনৈতিক চেতনা জেগেছে। মানবেন্দ্র রায়ের র‍্যাডিকেল ডেমোক্রাটিক দলের সঙ্গে তার যোগাযোগ হওয়ার ফলেই মানিক ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টের কাজটা গ্রহণ করেছিল।

পরবর্তীকালে সে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল কিন্তু তার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের কাজ করার সময়। এই সময়েই সে প্রথমে প্রগতি লেখক সংঘে যোগদান করে এবং ক্রমে পুরোপুরি ভাবে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করে।"[১]

ঢাকায় তরুণ লেখক সোমেন চন্দের ফ্যাসিস্ত ঘাতকদের হাতে মৃত্যু হয় ৮ই মার্চ, ১৯৪২। ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কোলকাতায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ২৮ সে মার্চ এক ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোল। এই সম্মেলনেই ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক সংঘ-এর প্রতিষ্ঠা হয়। পরে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ওর নাম ছিল ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। ১৯৪৫ এর পরে সর্বভারতীয় সংঘের সঙ্গে মিলিয়ে এর নতুন নামকরণ হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ'।

এ সময়ে মানিকের নতুন উপন্যাস 'প্রতিবিম্ব' প্রকাশিত হয়। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। উপন্যাসে অবশ্য গ্রন্থ প্রকাশের কোন তারিখ নেই। এ উপন্যাসকে নিয়ে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে মানিক লিখেছেন, "তেরশ' পঞ্চাশের যুগান্তর পূজাবার্ষিকীতে 'প্রতিবিম্ব' প্রকাশিত হবার পর অনেকের কাছ থেকে অনেক রকম মন্তব্য ও অভিযোগ শুনতে হয়েছে। বলাই বাহুল্য, লেখাটির নিছক সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কে অভিযোগ নয়। কারণ, তাহলে বই-এর গোড়ায় আমার এই মন্তব্য জুড়ে দেবার প্রশ্নই উঠত না।

প্রতিবিম্বে রাজনৈতিক পার্টি বা প্রতিষ্ঠান ও মতবাদের বিরুদ্ধে আমার আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রতিবিম্বিত হয়েছে ধরে নিয়ে তারই ভিত্তিতে অভিযোগগুলি দাঁড় করানো হয়েছে।—শুধু অভিযোগ নয়, সমর্থনও। কোন পার্টি বা সংঘ বা প্রতিষ্ঠান বা আদর্শবাদকে খোঁচা দেবার বা সমর্থন করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিবিম্ব লেখা হয় নি। একক ভাবে কোন বিশেষ পার্টিকেতো নয়ই—সমগ্রভাবে রক্ষণশীল, প্রগতিবাদী, জাতীয়তাবাদী ইত্যাদি পর্যায়ের বিজ্ঞানকে পর্যন্ত নয়। কিন্তু উদ্দেশ্য না থাকলেও লেখার মধ্যে খোঁচা—সোজা বা তেরচা যেমন হোক —থেকে যেতে পারে। এবং সে খোঁচা যে সব সময় অবান্তর হবে এমন কথাও নেই।

বিশেষ যত্নের সঙ্গে তন্নতন্ন করে খুঁজেও এমন কিছুই প্রতিবিম্বে খুঁজে পেলাম না যা কোন পার্টি বিশেষের প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে। অবশ্য এ কথা স্বীকার করি যে প্রতিবিম্বের কোন কোন অংশকে ভিত্তি করে কারো কারো পক্ষে

১। নতুন সাহিত্য, ১৩৬৩।

কল্পনা করে নেওয়া সম্ভব যে অমুক পার্টির সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাল্কা কল্পনার গতি যথেচ্ছ এবং অনির্দিষ্ট নির্ভর হলেই তার চলে।

ভুল ধারণা থেকেই যে অভিযোগের উৎপত্তি সেটা আমার কাছে আরও স্পষ্ট হয়েছে অভিযোগগুলির বিভিন্নতায় ও পরস্পর বিরোধিতায়। এক একজন এক এক রকম কথা বলেছেন। এক একজন এক একটি পার্টি বা প্রতিষ্ঠানের নাম করে বলেছেন লেখাটি সেই পার্টিকেই ব্যঙ্গ করেছে, আঘাত করেছে, লেখায় পার্টি সম্বন্ধে ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে। কেউ সাধারণভাবে ধরে নিয়েছেন আমি প্রগতিপন্থীদের বিরুদ্ধে লিখেছি, কেউ বলেছেন রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদীদের বর্তমান নীতির বিরোধী প্রচার আমার উদ্দেশ্য; অপর পক্ষে, অনেকে অনুযোগ দিয়েছেন, প্রতিবিম্ব নিছক পার্টির পক্ষে প্রচারের উদ্দেশ্যে লেখা। কোন পার্টি? এক একজন এক একটি পার্টির নাম করলেন।

যাই হোক, এ রকম ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়াও গুরুতর কথা। তাই গোড়াতেই আপনাদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া কর্তব্য মনে করছি যে প্রতিবিম্বের মধ্যে কোন বিশেষ পার্টির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন ইঙ্গিত খুঁজবার চেষ্টা করবেন না, কল্পনা করবার চেষ্টা করবেন না যে প্রতিবিম্বে যে পার্টির কথা আছে সেটা 'অমুক পার্টি'।

বিশেষ একটা পার্টিকে কেন্দ্র করে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাহিনী রচনা করবার ইচ্ছা যদি আমার থাকত সেটা সোজাসুজি স্পষ্টভাবেই করতাম।

লেখা হিসাবে 'প্রতিবিম্ব' কেমন হয়েছে সেটা আমার বলার কথা নয়, নিজেকে সমর্থন করে একথা বলার অধিকার আমার আছে যে প্রতিবিম্ব পড়ে ভুল ধারণা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকার কারণ লেখার ত্রুটি নয়। বইখানা যে-মনের বিব্রত দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনার আপেক্ষিক সঞ্চরণশীলতার প্রান্তবাহী প্রতিবিম্ব, সেই চেতনাশ্রয়ী মনই এজন্য দায়ী। পরিবেশের দ্রুত আবর্তনশীল আকর্ষণ ও বিকর্ষণের চাপ মনকে এই অবস্থায় এনে দেয়। অতিক্রান্ত মনের সংখ্যা বেশী নয়।

আমার 'অহিংসা' বইখানা নিয়ে এরকম অভিযোগ উঠেছিল। দেশে অহিংস নীতিতে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে। বইখানার নাম অহিংসা। সুতরাং যদিও বইখানাতে রাজনৈতিক কোন ব্যাপার নেই, তবু ধরে নিতে হবে অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে কাহিনীর সংশ্রব আছে। সোজাসুজি যোগসূত্র খুঁজে না পাওয়া যাক্, কাহিনীকে 'সিম্বলিক' ধরে নিয়ে—

'কি বলতে চাচ্ছেন ঠিক ধরতে পারছি না মানিক বাবু।'

'যা বলিনি তা ধরতে চাইছেন কেন ?'

প্রশ্নকারী তিনঘণ্টা ধরে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন আমার লেখা বইয়ে আমি কি বলেছি আর কি বলিনি। নীতি বা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করেও সাধারণ মানুষ যে অজ্ঞাতসারেই অনেক অহিংস কাজ করে, হিংসার সঙ্গে অহিংসাও যে মানুষের মধ্যে থাকে এবং এই সাধারণ অহিংসাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ নিয়ে যে উপন্যাস লেখা যায়, এটা তাঁকে কোনমতেই বুঝিয়ে দিতে পারলাম না।

মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত জাতীয়তাবাদী সাধারণ কর্মী যুবকের মনে নবযুগের নতুন ভাবধারার প্রভাবে কি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, ভাবপ্রবণতা ও বাস্তববোধের দ্বন্দ্ব কি রূপ নিয়েছে, সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা উচিত এই নিয়ে যে দ্বিধা ও সংশয়ের ভারে সে ব্যাকুল হয়েছে, ভবিষ্যৎকে—

সোজা ভাষায় বলি। তারকের মত ছেলেদের মধ্যে যুগ পরিবর্তনের সূচনা কি রূপ নিয়েছে 'প্রতিবিম্ব' তারই একটা দিককে রূপ দেবার চেষ্টা।

বলা বাহুল্য, তারক বদলে যাবে। ইতিমধ্যেই কিছুটা বদলেছে। কিছুকাল পরে 'প্রতিবিম্ব' হয়ে যাবে 'পুরানো ছবি'।"

তবু এই উপন্যাসের সূত্র ধরেই মানিকবাবুর সঙ্গে ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের ব্যক্তিদের যোগাযোগ ঘটে। অবশ্য মানিকবাবু এই সংঘে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ দেন ১৯৪৩ এর গোড়ায়। এ সম্পর্কে চিন্মোহন সেহানবিশ লিখেছেন, "এর কিছুদিনের মধ্যেই একদিন একান্তে পেয়ে তাঁকে সভয়ে জানিয়েছিলাম প্রতিবিম্ব-সম্পর্কে আমাদের মতামত। 'সভয়ে' কারণ বড় লেখকের উত্তুঙ্গ আত্মাভিমানের পরিচয় তখন আমরা পাচ্ছি পদে পদেই। মানিকবাবু কিন্তু আমাকে দ্বিতীয়বার অবাক করলেন এই বলে : 'অর্থাৎ গল্পটা কিছুই হয়নি এই বলতে চান ত'। তা কি করে হবে বলুন ? কতটুকু জানি আপনাদের ? যখন আপনাদের ঠিক মত চিনব দেখবেন তখন গল্প উতরোয় কি উতরোয় না।" (চিন্মোহন বাবু এখানে দ্বিতীয়বার লিখেছেন এই কারণে যে, মানিকের মত জটিল ও সূক্ষ্ম মানব মনের কারবারী যে সন্ত প্রতিষ্ঠিত 'রাজনীতি-ঘেঁষা' 'ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের' ধারে কাছে আসতে পারেন এমন 'অঘটনের' প্রত্যাশা তিনি করেন নি। সেজন্য তিনি প্রথম অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।)

"এক মুহূর্তে আমরা মানিকবাবুর নাগাল পেয়ে গেলাম। কারণ তাঁর কথায় সেদিন সহজ আত্মাভিমানশূন্যতার পাশাপাশি যে প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের সুর বেজে

বেজে উঠল আমাদের বুঝতে এতটুকু দেরি হল না যে সেই সুরই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।”

“এ হেন মানুষের প্রতি আত্মীয়তাবোধ সহজেই গভীর হয়ে দাঁড়ায়। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই চারিদিক থেকে গুঞ্জন উঠল—মানিকবাবু একেবারে দলীয় হয়ে গেছেন। এর জবাব দিয়েছিলেন মানিকবাবুই ১৩৫৪ সালের ফাল্গুন মাসে ‘পরিচয়ে’:

“...দুটো দল হয়ে গেছে, উপায় কি? ব্যক্তিগতদের ব্যক্তি প্রীতির দল এবং জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতি প্রীতির দল। দ্বিতীয় দলে গত না হলে প্রগতি হয় না।”

অর্থাৎ অভিযোগ অস্বীকারের চেষ্টা নয়। দ্বিধাহীন সাফ জবাব।”[১]

১৯৪৩ সালেই মানিক অনেকগুলো রেডিও ভাষণ দেন। তার হিসাব পত্রের নোট থেকে এখবর সংগ্রহ করেছি। অল ইণ্ডিয়া রেডিও বর্তমানে আকাশবাণী পুরানো নথি সংরক্ষণ করে রাখেনি বলে সেগুলোর হদিশ পাওয়া যায়নি। এ বছরের বিভিন্ন তারিখে তার রেডিও ভাষণের হিসেব হল:

13th Aug - on ‘David Copperfield’.
16th „ - Bankim through modern eyes.
Oct - চাওয়ার শেষ নেই
„ - মেজাজের গল্প।

তাঁর এই লেখাগুলো উদ্ধার করতে পারলে মানিকের সাহিত্য বিচারের তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন পাওয়া যেত। কিন্তু তা আর হবার নয়।

॥ ১৫ ॥

মানিকের মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল ১৯৪৪ সালে তা পূর্ণতা লাভ করেছে। ‘প্রতিবিম্ব’ উপন্যাসে তার সন্ধিক্ষণটি চিহ্নিত হয়েছে। তার পরেই সাম্যবাদের নিশ্চিত প্রতীতি নিয়ে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করতে লাগলেন।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর জীবন ও মানবতায় গভীর বিশ্বাস স্থাপন করলেন। সৃষ্টি করে চললেন নবজীবনবাদের ভিত্তি মূল। তাঁর বিদ্রোহী প্রতিভা রূপান্তরিত হোল বিপ্লবী প্রতিভায়। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন তিনি।

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন ‘পরিচয়’, পৌষ ১৩৬৩

মহাসম্ভাবনাময় আগামী বিপ্লবের সাহিত্য শিল্পে তিনি হলেন তার ধাত্রী। তিলে তিলে গড়ে তুলতে লাগলেন বিপ্লবের তিলোত্তমাকে। বড় কঠিন বড় দুর্জয় সে সাধনা। আমৃত্যু অক্লান্ত সংগ্রামে মানিক জীবনজয়ী সাধনায় রত ছিলেন। তারপর একদিন সহজ ভাবে লাভ করলেন এক মহান বীরের মৃত্যু।

১৯৪৪ এর শেষের দিকে মানিক ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। এবং আমৃত্যু তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পার্টির নির্দেশে তিনি সাংস্কৃতিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তিনি সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কর্মী হিসেবে জেলা পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। তিনি যে কমিউনিষ্ট একথা তিনি গর্বের সঙ্গেই স্বীকার করতেন। শেষ জীবনে যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন তখন তিনি কিছু করতে পারতেন না বলে আক্ষেপ করতেন এবং শীঘ্রই সেরে উঠে তিনি উদ্যমে পার্টির কাজ করবেন বলে প্রকাশ করতেন। কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান অনেকের কাছে 'অঘটন' মনে হলেও মানিকের পক্ষে কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। লেনিন বলেছেন, মানুষ তাদের 'নিজেদের রক্তেমাংসে'ই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। জীবনের গভীরতম আবেগগুলোর মধ্য দিয়েই মানুষ অত্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপে রাজনৈতিক ধারণার দিকে এগিয়ে যায়।

মানিক প্রথম থেকেই মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতা, ন্যাকামি এবং ভণ্ডামির প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং চাষী মজুরের জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ভাবাবেগের প্রতি ছিল তার স্বভাব-বিদ্বেষ, সেজন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নির্মোহ ভাবে বাস্তববাদকে অবলম্বন করে তিনি লেখনী ধারণ করেন। তার ভ্রাতা সুবোধবাবু বর্তমানে সদানন্দ ব্রহ্মচারী এবং বন্ধু রমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানা যায় তিনি বঙ্গশ্রীতে চাকরী করার সময়েই কমিউনিষ্ট মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েন এবং সাম্যবাদ সংক্রান্ত বইপত্র পড়াশুনা আরম্ভ করেন। তিনি সুবোধবাবুকেও সেগুলো পড়বার জন্য বলতেন কিন্তু কমিউনিজমের প্রতি সুবোধবাবুর কোন আকর্ষণ ছিল না, এখনো নেই। সেজন্য তিনি কখনো সেগুলো পড়েন নি। রমেনবাবু বলেন ১৯৩৮ সালেই তার হাতে বুখানিনের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ গ্রন্থখানি দেখে মানিক মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে আগ্রহী হন এবং তারপর লিয়নটিয়েভের মার্ক্সীয় অর্থনীতি গ্রন্থ পাঠ করে উৎসাহী হয়ে উঠেন।

মানিক 'সাহিত্য করার আগে' শীর্ষক আত্মকথনমূলক প্রবন্ধে তাঁর জীবনে মার্কসবাদের প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন :

"লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আগেও ঘটেছে, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে

সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি। আমার লেখায় যে অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আগে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিক ভাবে জানবার সাধ্য হয় নি। মার্কসবাদ যেটুকু বুঝেছি তাতেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে যে, আমার দৃষ্টিতে কত মিথ্যা, বিভ্রান্তি আর আবর্জনা আমি আমদানি করেছি—জীবন ও সাহিত্যকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভালোবেসেও, জীবন ও সাহিত্যকে এগিয়ে দেবার উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও।

সে তো বটেই। মার্কসবাদই যখন মানবতাকে প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক পথ বাতলাতে পারে, অতীত কি ছিল, বর্তমান কি হয়েছে এবং কি ভাবে কোন্ ভবিষ্যৎ আসবে জানিয়ে দিতে পারে তখন মার্কসবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে সাহিত্য করতে গেলে এলোমেলো উল্টোপাল্টা অনেক কিছু তো ঘটবেই।

মার্কসবাদই আবার আমাকে এটাও শিখিয়েছে যে, এজন্য আপশোষ করলেও নিজেকে ধিক্কার দেবার প্রয়োজন নেই। মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে কেন সাহিত্য করতে নেমেছিলাম ভেবে আত্মগ্লানি বোধ করলে সেটা মার্কসবাদের শিক্ষার বিরুদ্ধেই যাবে, যান্ত্রিক একপেশে বিচারে সৃষ্টি হবে আরেকটা বিভ্রান্তির ফাঁদ।

সদিচ্ছা ছিল, নিষ্ঠা ছিল, জীবন ও সাহিত্য থেকেই নতুন দৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলাম, কিন্তু মার্কসবাদ না জানায় কিছুই করতে পারিনি—এই গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেওয়া মার্কসবাদকে অস্বীকার করারই সমান অপরাধ। নিজের সাহিত্য সম্পর্কেও এ কথা ঘোষণা করার অধিকার আমি পাইনি। জগতে আমি একা মার্কসবাদ না জেনে সাহিত্য চর্চা করিনি—আমার সামান্য লেখার সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যে এঁদের বিপুল সৃষ্টিকে ব্যর্থ আবর্জনা বলে উড়িয়ে দেবার স্পর্ধা আমি কোথায় পাবো?

প্রকৃত পক্ষে, মার্কসবাদ ঘাঁটতে ঘাঁটতে যখন আমার এতদিনের লেখার ত্রুটি আর দুর্বলতাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, আমার সাহিত্য সৃষ্টি মানুষকে এগিয়ে যেতে এতটুকু সাহায্য করার বদলে আরও বিভ্রান্ত করেছে কি না সন্দেহ জেগেছিল এবং সোজাসুজি নিজেকে প্রশ্ন করতে হয়েছিল যে, আমার অর্ধেক জীবনের সাধনা কি বাতিল গণ্য করতে হবে? তখন ওপরের ওই সূত্র ধরেই আমি অকারণ আত্মগ্লানির হাত থেকে রেহাই পাই, অনেক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমার লেখার মূল্য কতটুকু এবং কিসে তা যাচাই করা সম্ভব হয়।

কথাটা বুঝে দেখুন। সূত্রটা কি? বাংলা সাহিত্যে আমি যেটুকু দিয়েছি

সেটুকু বাতিল করার প্রশ্নে আমি ভাবছি বাংলা সাহিত্যকে উড়িয়ে দিতে চাওয়ার স্পর্ধার কথা। এ যেন বিনয়ের ছলে আরেকটা স্পর্ধা প্রকাশ যে, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র ও পরবর্তী বাংলা সাহিত্য বলতে আমার দানকেও বোঝায়।

কথাটা আমারও মনে হয়েছে বৈকি। কারণ, এটাই তো আসল কথা। বিচার করতে গিয়ে প্রথম প্রশ্নই তাই দাঁড়িয়েছে: আমি নিজের প্রয়োজনে অথবা বাংলা সাহিত্যের প্রয়োজনে সাহিত্য করতে নেমেছিলাম? সাহিত্য করার তাগিদ আমার কি ভাবে আর কেন এসেছিল? সাহিত্যের আদর্শ জানা ছিল না, সমাজ জীবন ও সাহিত্যের সম্পর্ক বুঝতাম না—তবু, জীবন সম্পর্কে একটা দৃষ্টিভঙ্গি আমার নিশ্চয়ই ছিল। সেই দৃষ্টিভঙ্গি কি আমায় সন্ধান দিয়েছিল কিছু নতুন বক্তব্যের—বাংলা সাহিত্যে যা বলা হয় নি?

নেহাত সখের খাতিরে, নাম করা লেখক হবার লোভে সাহিত্য করতে নামিনি সেটা বলাই বাহুল্য। এটুকু সম্বল করে নামলে সাহিত্যিকের বেশি দিন হালে পানি পাবার সাধ্য থাকে না।"[১]

মার্ক্সবাদের প্রতি গভীর আকর্ষণ মানিকের জীবনে আকস্মিক ভাবে দেখা দেয়নি। মার্কসীয় মতবাদে মধ্যবিত্তের স্থান নেই। ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থায় অপজাত এই ভুঁইফোড় সমাজ একদিন ঐতিহাসিক নিয়মেই আত্মবিরোধে জর্জরিত হয়ে অনিবার্য অবক্ষয়ের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে এই সত্য মানিক 'পুতুলের' সমাজ দেখেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যেই তিনি এই মধ্যবিত্তের জীবনের কৃত্রিমতা এবং বিকার প্রত্যক্ষ করেছিলেন অতএব মার্কসবাদ যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছিল। এই মধ্যবিত্তদের দেখেই তিনি ধনবাদের স্বরূপ দর্শন লাভ করতে পেরেছিলেন।

১৯৪৪ সালের ২৫,২৬ এবং ২৭শে আগষ্ট পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলার প্রথিতযশা নট ও নাট্যকার এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সভাপতি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। সভাপতির ভাষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন:

"মানুষের ভিতরের কুসংস্কার ও বর্বরতাকে তৃপ্তি দেবার জন্য আমাদের সাহিত্য নয়। আমাদের কাজ সভ্যতার দিকে মানবজাতিকে এগিয়ে নেয়া।

এই কাজে সাহিত্যিককে হতে হবে সংঘবদ্ধ। বৃহৎ কাজের ভার তাদের কাঁধে—

১। সাহিত্য করার আগে (লেখকের কথা)।

তাই তারা সংঘবদ্ধ হবেন। আজকের সাহিত্যিককে বুঝতে হবে তিনি একা কিছু করতে পারেন না ; তাঁর চারিদিকের মানব সমাজ থেকে, জনগণের ভিতর থেকে তাঁর লেখনীর খোরাক নিয়ে—তবে তাঁর সাহিত্য রচনা করতে হবে।

সাহিত্যিক আকাশ থেকে, ভগবানের কাছ থেকে উদ্ভট ক্ষমতা নিয়ে নেমে আসেন নি। একজন ভাল কাঠের মিস্ত্রী তার দক্ষতা পায় তার আবেষ্টনীর ভিতর থেকে। ঠিক তেমনিভাবে ভাল সাহিত্যিকও গড়ে উঠছেন। সুসাহিত্যিক তাঁর আবেষ্টনীকে অস্বীকার করতে পারেন না বলেই আজকে প্রগতি সাহিত্যিক হচ্ছেন সংঘবদ্ধ।" (ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'প্রতিরোধ' পত্রিকা। শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৫১।)

১৯৪৪ সালে মানিক প্রথম দুটো প্রবন্ধ লেখেন। একটি 'কেন লিখি' এবং অপরটি হোল 'ভারতের মর্মবাণী'। দুটো লেখাই মানিকের 'লেখকের কথা' পুস্তকে সংকলিত হয়েছে। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ থেকে 'কেন লিখি' নামে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাস, অন্নদাশংকর রায়, বিষ্ণু দে প্রমুখ পনেরো জন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের জবানবন্দী হিসেবে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয় তাতেই মানিক এ নিবন্ধটি লেখেন। এই প্রবন্ধের মূল কথা হোল—মানিক জন্মগত প্রতিভায় বিশ্বাস করেন না। ছেলেবেলা থেকেই তার অভিজ্ঞতা অনেকের চেয়ে বেশি। তিনি লিখেছেন, 'জীবনকে আমি যে ভাবে ও যত ভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি।' লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সে ভাগ দেওয়া সম্ভব নয় বলেই তিনি লেখেন। আসলে তার অভিজ্ঞতা পাঠককে পাইয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাকুলতা আছে বলেই তিনি না লিখে পারেন না। "পাইয়ে দিতে পারলে পাঠকের চেয়ে লেখকের সার্থকতাই বেশি। লেখক নিছক কলম পেষা মজুর। কলম পেষা যদি তার কাজে না লাগে তবে রাস্তার ধারে বসে যে মজুর খোয়া ভাঙে তার চেয়েও জীবন তার ব্যর্থ, বেঁচে থাকা নিরর্থক।

কলম-পেষার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই, এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধ করি বলে আপশোস জাগে যে, খাঁটি লেখক কবে হবো!"

দশ বছর ধরে ষোলখানা গ্রন্থ লিখেও মানিকের মধ্যে আত্মতুষ্টি দেখা দেয়নি। তাঁর মনে হয়েছে তিনি এখনো খাঁটি লেখক হতে পারেন নি। মাটির কাছাকাছি চাষী-মজুরের জীবনকে তিনি হয়তো এখনো নিজের ইচ্ছেমত রূপ

দিতে পারেন নি। সেজন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি নেই। মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তিনি নতুন করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুললেন। এই যে ছাত্র সুলভ জিজ্ঞাসা, অজানাকে জানবার দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা, বাংলা সাহিত্যে অনন্যসাধারণ সৃষ্টির খ্যাতি এবং প্রশংসা তার থেকে মানিককে বিচলিত করতে পারেনি। সবিনয়ে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি নতুন করে সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত হলেন।

এরপর তিনি লিখলেন 'ভারতের মর্মবাণী'। ঐতিহাসিক ঘটনার ধারাবাহিক বাস্তবতাকে আশ্রয় করে ভারতের দেড়শ' দুশ' বছরের জাতীয় জীবনের মর্মকথা ভারতীয় গণ-নাট্যসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় বাহিনী নৃত্যনাট্যের স্বল্প পরিসরে 'ভারতের মর্মবাণী' নামে সাধারণের নিকট উপস্থিত করেছেন। মানিকের লেখাটি সেই নৃত্য-নাট্যেরই প্রশস্তিমূলক আলোচনা। মানিক লিখেছেন :

"পল্লী-চারণের গাথা, লোক-নৃত্য ও লোক-সঙ্গীতের ছন্দ, সুর এবং ধ্বনি, ভঙ্গি, আলোকপাত ও অপূর্ব অভিনয় নৈপুণ্যের সমন্বয়ে 'ভারতের-মর্মবাণী' হয়েছে মর্মস্পর্শী।...গোড়ায় পল্লীচারণের গাথায় আছে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী, সমাপ্তিতে জনগণের মুক্তি কামনা রূপ নিয়েছে জাগ্রত জনগণের সমবেত দাবীর কাছে দেশী ও বিদেশী অত্যাচারীর পরাজয়ে।"

মানিক ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের এই নৃত্য নাট্যকে প্রশংসা করেছেন দুটো কারণে—প্রথম জনগণের জীবনের বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে লোক-কলাকে বাঁচাবার ও লোক শিক্ষার বাহন হিসেবে তাকে কাজে লাগাবার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এবং দ্বিতীয়, দর্শক সাধারণকে এঁরা ভোঁতা বা একগুয়ে মনে করেন নি সেজন্য এঁরা যখন এই অভিনব প্রচেষ্টা নিয়ে দর্শকের কাছে উপস্থিত হয়েছেন তখন তাকে সাদরে গ্রহণ করতে সাধারণ মানুষের এতটুকু দেরী হয়নি। মানিক লিখেছেন :

"সঙ্ঘের অভিনব প্রচেষ্টাকে সাধারণ দর্শক যে রকম উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, তাতে আমি উপলব্ধি করছি যে, আমরাই, লেখক ও শিল্পীরাই, পাঠক ও দর্শক সাধারণের ঘাড়ে অযথা দোষ চাপাই, তাঁদের কতগুলি সঙ্কীর্ণতা ও বিরোধিতা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই। আসলে তাঁরা আমাদের সব রকম সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে সর্বদাই প্রস্তুত, আমরাই তাঁদের এই উদারতা স্বীকার করতে ভয় পাই। আমি বিশ্বাস করি, নিজের এই দুর্বলতা চেনার ফলে আমার লেখার উন্নতি হবে।"

এই শেষের লাইনেই মানিক চরিত্রের বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মুরুব্বির মত উপদেশ দেওয়ার প্রবৃত্তি তার নেই। নতুন কিছু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে তার এতটুকু দ্বিধা নেই। সেজন্য মানিকের সৃষ্টি কখনো পুরাণো হয় না। নতুন নতুন সৃষ্টি আর রূপায়নে পাঠক অভিভূত হয়।

এ বছরেই (১৯৪৪ইং) পূর্বাশা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'Stories of rural Bengal' নামে কয়েকটি বাংলা ছোট গল্পের এক ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প 'Hut-maker's romance' অন্তর্ভুক্ত হয়।

তেরশ' পঞ্চাশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিকায় জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স (১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলি) কর্তৃক শ্রীপরিমল গোস্বামীর সম্পাদনায় 'মহামন্বন্তর' নামে এক গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় (মার্চ, ১৯৪৪)। এই সংকলনে মানিকের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' নামে গল্পটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

॥ ১৬ ॥

১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিরতি ঘটে। দেশের অবস্থা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে থাকে। ফলে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য আবার দেখা দেয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার ও নৌবাহিনী-কর্মীদের বিদ্রোহ আমাদের স্তিমিত রাজনৈতিক চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। কেবল আমাদের দেশে নয়, যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র জনসাধারণ মুক্তির পথে অগ্রসর হতে লাগল।

এই পটভূমিকায় মানিকের নতুন উপন্যাস "দর্পণ" প্রকাশিত হলো। প্রকাশক বুক এম্পোরিয়াম। গ্রন্থে প্রকাশের তারিখ নেই। তবে লেখকের কথায় মানিক যে তারিখ দিয়েছেন তার থেকে মনে হয় উহা আষাঢ়, ১৩৫২ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের শেষে "সমাপ্ত (প্রথম ভাগ)" লেখা ছিল। সম্ভবত মানিকের পরিকল্পনা ছিল তিনি দুভাগে উপন্যাসটি শেষ করবেন। কিন্তু বেঙ্গল পাবলিশার্সের দ্বিতীয় মুদ্রণে (ভাদ্র, ১৩৫৮) তাহা নেই।

এই উপন্যাসে লেখকের কথায় মানিক লিখেছেন, "প্রায় তিন বছর আগে উপন্যাসটি পাটনার একটি মাসিকে মাসে মাসে লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। অন্য নাম দিয়েছিলাম। কিছুদিন লেখার পর নানা কারণে লেখা বন্ধ করি। অসমাপ্ত বইখানা সম্পূর্ণ করে দর্পণ নাম দিয়ে প্রকাশ করলাম।

এই বইখানা শেষ করিয়ে ছেপে প্রকাশ করতে বুক এম্পোরিয়ামের শ্রীবীরেন ঘোষ যে অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। কপি দেওয়া আর প্রুফ দেখার ব্যাপারে ভদ্রলোককে যে কত জ্বালাতন করেছি তা তিনি জানেন আর আমি জানি।

প্রুফ দেখায় ত্রুটি হয়েছে। ভুলগুলি মার্জনা করে নেবেন।" আষাঢ়, ১৩৫২।

অসম্পূর্ণ লেখাটি পাটনার 'প্রভাতী' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

৪.১১.৪৫ তারিখের Amrita Bazar Patrika-য় এই গ্রন্থের সমালোচনায় বলা হয়েছে :

"We live in an age of discontent and the political and economic structure of our country cannot make us happy. It is an age of challenges and questions. Our novelists too are susceptible to the peculiar ferments of the age and their works too articulate with the spirit of the times.

The volume under review mirrors the troublous times that Midnapore had not long ago. Bireswar is a sturdy peasant with powerful personality. Rambha reminds us of the amazons of other days. She occupies too big a space in the canvas and throws into shade the other characters in the volume. Marxian philosophy has been wedded to the congress ideology and the result is not altogether an unpleasant one. In the picturesque last few pages the story moves at a very fast tempo. The novel will make you think."

এই বছরেই (১৯৪৫) কমলা পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হলো মানিকের আরেকটি গল্প সংকলন গ্রন্থ। নাম 'হলুদপোড়া'। অবশ্য গল্পগুলো এই সময়ের লেখা নয়। মনে হয়, অনেকদিনের ফেলে রাখা গল্পগুলোকে নিয়ে তিনি এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মানিক চারদিন রেডিওতে প্রবন্ধ পাঠ করলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'সাহিত্যে যুদ্ধের প্রভাব'। অন্য তিনদিন আলোচনা করলেন সঙ্গীত সম্বন্ধে। সঙ্গীত সম্পর্কে মানিকের আগ্রহ আমরা পূর্বেই দেখেছি। তিনি ভাল গাইতে পারতেন, ভাল বাঁশী বাজাতেন। এই সঙ্গীত সম্পর্কে তার ডায়েরির পাতায় লেখা আছে :

"সন্ধ্যার পর হঠাৎ মনে হলো সঙ্গীতের সুরে মানুষের হাসবার কাঁদবার সম্পর্ক আছে। দুঃখে মানুষ যে ভাবে কাঁদে কয়েকটা তার স্পষ্টরূপ মেলে। এ বিষয়ে চিন্তা করে প্রবন্ধ লিখতে হবে। সাধারণ জীবনে বিভিন্ন আবেগ শব্দোচ্চারণের যে যে ছন্দ ভঙ্গি নেয়, তার সঙ্গে সুরের সম্পর্ক।

এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবে গবেষণা। সুর সম্বন্ধে বই কিনতে হবে।"

ডায়েরিতে তারিখ দেওয়া আছে ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৬ বুধবার। এর থেকে সঙ্গীত সম্বন্ধে তার মানসিক প্রবণতার নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে মানিকের অনেক ইচ্ছার মত এ ইচ্ছাও পূর্ণ হয়নি। সঙ্গীত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণাও তিনি করতে পারেন নি, আর চিন্তা করে প্রবন্ধ লেখার সময়ও তিনি পাননি।

১৯৪৫ সালে বাংলার সেরা লেখকদের মধ্যে কয়েকজন 'আমার গল্প লেখা' পর্যায়ে কতকগুলি বেতার বক্তৃতা দেন। এ পর্যায়ে মানিকও ১২ই মে তারিখে নিজের 'গল্প লেখার গল্প' নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে ১৩৬১ সালের শারদীয়া চতুষ্কোণে উহা প্রকাশিত হয় এবং ১৩৬৪ সালে 'লেখকের কথা' নামক গ্রন্থে তা সংকলিত করেন। এই প্রবন্ধে মানিক নিজের প্রথম গল্প লেখার ইতিহাস বিবৃত করেন। এখানে আছে তার ছেলে বেলার মানসিক প্রবণতার কথা, বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ একটি গল্প লিখে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠার কথা।

প্রথম গল্প লেখার সময় মানিক বিজ্ঞান চর্চায় মশগুল। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

"তখন আমার বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক পড়েছে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? তখনও আমি বিশ্বাস করিনি, আজও বিশ্বাস করি না যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের বিরোধ আছে। তবে এ কথা সত্য যে, কেউ একসঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক হতে চাইলে তাকে দিয়ে বিজ্ঞান বা সাহিত্য কোনটারই বিশেষ উপকার হয় না। কিন্তু এ কথা সত্য যে, এ যুগে বিজ্ঞান বাদ দিয়ে সাহিত্য লেখা অসম্ভব—তাতে শুধু পুরাণো কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। সাহিত্য বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক হলে তিনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হিংস্র মানুষের হাতে মারণাস্ত্রই তুলে দেবেন—তাঁর আবিষ্কারকে মানুষ মানুষকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করবে। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্বন্ধ এ যুগের অতি প্রয়োজনীয় যুগধর্ম।

স্বীকার করছি, ১৩৩৫ সালে এ সব তত্ত্বকথা মানতাম না—অস্পষ্ট অনুভূতি ছিল মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞান-প্রেমের সঙ্গেই দৃঢ়তর হতো লেখার সঙ্কল্প।"

এই প্রবন্ধেই মানিক স্বীকার করেছেন তাঁর অফিসিয়াল নাম ছিল প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক নামে ডাকতো শুধু বাড়ির লোক। তিনি বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে লিখলেন পাঠকের মন ভুলানো গল্প। সেজন্য তাতে নিজের নাম দিলেন না। ঠিক করলেন পরে নিজের নামে ভালো গল্প লিখবেন। সেজন্য প্রথম গল্পে তিনি দিলেন ডাক নাম মানিক। কিন্তু পরে ডাকনামের কাছেই আসল নাম হার মেনে গেল।

হঠাৎ গল্প লিখে মানিক বিখ্যাত হলেও তিনি জানতেন সাহিত্য সাধনার জিনিস। 'হাত মকস করতে হয়—কঠিন সাধনায় জীবনপাত পরিশ্রম করতে হয়। কেরাণীর বেশী খেটে লিখতে না শিখে জগতে আজ পর্যন্ত একটি ছোট খাটো লেখকও লেখক হতে পারেন নি।'

মানিকের এই সাহিত্য কীর্তিতে কিন্তু তার আত্মীয় স্বজন খুশী হতে পারে নি। তারা এখনো আপশোস করেন, "তোর দাদা লেখাপড়া শিখে দু'হাজার টাকার চাকরি করছে, তুই কি করলি বলতো, না একটা বাড়ি, না একটা গাড়ি—"

মানিকের অবশ্য তার জন্য কোন আপশোস ছিল না। সেজন্য এসব কথা নিয়ে তিনি কৌতুকবোধ করতেন। তিনি ছিলেন সচেতন শিল্পী। 'কলম পেশা মজুর' নিজের বাস্তব উপলব্ধি দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের নতুন জগৎ সৃষ্টি করে গিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নামও যাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় তিনি সেজন্য নিজেকে উপযুক্ত করে তুলেছিলেন।

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে মহম্মদ আলি পার্কে ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে মানিকবাবু সভাপতি মণ্ডলীর একজন সদস্য নির্বাচিত হন। এ সম্পর্কে চিন্মোহন সেহানবীস লিখেছেন, "এর পর থেকে সংঘ যতদিন সক্রিয় ছিল ততদিনই মানিকবাবু তার নায়কতা করেছেন। সে নায়কতা শুধু সম্মেলনের ভাষণ বা আনুষ্ঠানিক কাজকর্মেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আমাদের সংঘের ৪৬, ধর্মতলা ষ্ট্রিটস্থ দপ্তরের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি কাজে, বয়স বা সাহিত্যিক গুণাগুণ নির্বিশেষে সংঘের কর্মীদের সঙ্গে প্রাণখোলা, সকৌতুক আলাপে, 'পরিচয়ের' শুক্রবাসরীয় বৈঠকে—সর্বত্রই তা সমান ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠত।

সব থেকে জমত তখন আমাদের সংঘের বুধবারের বৈঠকগুলি। আমাদের

রেওয়াজ অনুসারে এখানে লেখকেরা তাঁদের সদ্যরচিত গল্প, কবিতা বা নাটক পড়ে শোনাতেন অথবা সুরকারেরা তাঁদের সদ্যরচিত গান গাইতেন।......

মানিক বাবুও বুধবারের বৈঠকে একাধিক সদ্যরচিত গল্প পড়ে শুনিয়েছিলেন। স্বভাবতই সে সব দিনে শ্রোতাদের ভিড় আমাদের অফিস ছাপিয়ে সিঁড়ি অবধি পৌঁছত। মন্বন্তরের সময়কার দু' একটি গল্প ছাড়া 'পেট ব্যথা'র মত নির্মম অত্যাচারের কাহিনীও তিনি এইখানে শোনান। সব থেকে আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে 'হারানের নাতজামাই' গল্পটি পড়ার স্মৃতি। সময় সম্ভবত ১৯৪৬ সালের শেষ অথবা ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিক। দাঙ্গার দুঃস্বপ্নকে মুছে ফেলে দিয়ে সারা বাংলা দেশ জুড়ে তখন চলছিল হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ তেভাগা আন্দোলন। চারিদিকে প্রবল উত্তেজনা। গোলাম কুদ্দুসের মত সাহিত্যিক সংবাদদাতারা জেলায় জেলায় সফর করে আন্দোলনের জলন্ত ছবি আঁকছিলেন 'স্বাধীনতা'র পাতায়। এমন সময়ে এল মানিকবাবুর 'হারানের নাতজামাই'। মানিকবাবু যখন গল্প পড়া শেষ করলেন তখন ভাবছিলাম সাহিত্য সত্যই কত ধারালো হাতিয়ার হতে পারে। কিসানী ময়নার মা-র চরিত্র-মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়েছিলাম আমরা সবাই কিন্তু তার গাঁয়ার জামাইও কি ফেলবার? এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা।

বুধবারের বৈঠকগুলিতে রচনা পাঠের পর বেশ দিলখোলা আলোচনার রেওয়াজ ছিল। সে আলোচনায় শুধু মানিকবাবুর মত নামজাদারাই যোগ দিতেন না, আনকোরারাও নির্ভয়ে গুরুগম্ভীর সমালোচনা করতে ছাড়তেন না, এমন কি মানিকবাবুর গল্পের ভালোমন্দ নিয়েও। হয়তো বা অনেক কাঁচা কথাই বলা হত সেখানে। তবু একমুখ হাসি নিয়ে মানিকবাবু বসে বসে শুনতেন আলোচনা, থেকে থেকে জোরালো সমর্থন বা প্রবল প্রতিবাদ করতেন কোনো মন্তব্যের, মাথা ঝাঁকি দিয়ে মেতে উঠতেন প্রচণ্ড উৎসাহ ও উত্তেজনায়। কিন্তু কখনও তাঁকে অধৈর্য হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।"[১]

॥ ১৭ ॥

১৯৪৬ সালে মানিকবাবুর পাঁচ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে প্রথমে (ফেব্রুয়ারী মাসে) প্রকাশ লাভ করে **'সহরবাসের ইতিকথা'**। (প্রথম

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতিলেখক আন্দোলন, পরিচয়, পৌষ, ১৩৬৩।

সংস্করণ ফাল্গুন, ১৩৫৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৬০)। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। এই দ্বিতীয় মুদ্রণে 'লেখকের কথা'য় মানিক লিখেছেন—

"কয়েকবছর আগে একটি দৈনিক পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু অসম্পূর্ণতা ছিল, ঘষামাজা করার প্রয়োজনও ছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সময় ঘটনাচক্রে ওসব কিছুই করা হয় নি।

সংশোধন করা উচিত ছিল এরকম খুঁত ও অসম্পূর্ণতা থাকা সত্বেও পাঠক পাঠিকারা বইটিকে যে সমাদর করেছেন এজন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই সংস্করণে যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, আমি দাবী করছি বইটিতে এবার কোন খুঁত রইল না।

প্রথম সংস্করণে সবচেয়ে বড় অসম্পূর্ণতা ছিল শ্রীপতি আর সন্ধ্যার—একটা পরিণতির দিকে এগোতে এগোতে দুটি চরিত্রেরই যেন খেই হারিয়ে গিয়েছিল। এই সোজা কথাটা সব লেখকই জানেন যে কোন চরিত্রের বিকাশ বা কাহিনীর গতি এমন জায়গায় থামানো চলে না যাতে প্রশ্ন জাগে : তারপর কি হল? গতিটা কোন পরিণতির দিকে এটুকু অন্তত ধরিয়ে দিতেই হবে—যাতে ধারা কল্পনা করে অনুভব করে নেওয়া সম্ভব হয়।

যেমন পীতাম্বর। মোহনের বাড়ী ছেড়ে পীতাম্বর কোথায় গেল কি করল বলার কোন প্রয়োজনই হয় না—অনায়াসেই অনুমান করে নেওয়া যায় যে কোথাও কম খরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে সে তার নতুন পেশা নিয়ে দিনরাত মেতে থাকবে।

কিন্তু শ্রীপতির কথা যেখানে থেমেছে ওখানে তাকে থামানো যায় না, কদমের সংসারটুকুর জন্য গভীর টান এবং গ্রাম্য সংস্কার ও বিশ্বাসভরা শ্রীপতিকে মোহনের সঙ্গে শহরে টেনে এনে কারখানায় কাজে ঢোকানোর কোন সার্থকতাই থাকে না। কি ভাবে তার চেতনা সর্বহারার চেতনায় রূপান্তরিত হল তার একটু সূত্র পাওয়া পর্যন্ত তার কথা বলতেই হবে।

এই সব খুঁত ও অসম্পূর্ণতার জন্য মনে খুঁত খুঁতানি ছিল—বর্তমান সংস্করণে যথাসাধ্য সংশোধনের সুযোগ পেয়ে খুসী হয়েছি।

আমি ভূমিকা লেখার জন্যই একটা ভূমিকা জুড়ে দেওয়ার নীতির বিরোধী। দু'চারটি বইয়ে দু'চার লাইন ভূমিকা হয়তো দিয়েছি। 'সহরবাসের ইতিকথা'র কপালেই আমার সবচেয়ে বড় ভূমিকা জুটল।

সংশোধন করতে গিয়ে বইয়ের আকার বেশ খানিকটা বেড়েছে। প্রকাশিত উপন্যাসের নূতন সংস্করণে বেশী রকম পরিবর্তন করা হলে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া

লেখকের কর্তব্য বলে মনে করি।"

১৯৪৩ সালে (বাংলা ১৩৫০) বাঙলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষ ছিল যুদ্ধেরই প্রত্যক্ষ ফল। এই দুর্ভিক্ষের ফলে গ্রাম বাঙলার মানুষের জীবন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। এই দুর্ভিক্ষের সময় মানিক বাঙলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষী দরিদ্রের না খেয়ে মরার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে এসে অতি দুঃখে বলেছিলেন,—

"দুশো বছরের পরাধীনতায় বাঙলার মেরুদণ্ড গেছে ভেঙে। গরীবগুলোকে কত বললাম—না খেয়ে শেয়াল কুকুরের মতো রাস্তাঘাটে মরে পড়ে না থেকে তোরা একবার উঠে দাঁড়া। সরকারের তালাবন্ধ শস্যের গুদামগুলো লুঠ করে একদিনও পেট পুরে খেয়ে বাঁচি—তারপর না হয় জেল খাটবি,—কিন্তু ব্যাটাদের কি সাহস আছে?"১

এই দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় গত এক বছরের মধ্যে লেখা গল্পগুলোকে নিয়ে সংকেত ভবন থেকে এপ্রিল-মে, ১৯৪৬ (বৈশাখ, ১৩৫৩) তারিখে 'আজ কাল পরশুর গল্প' সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় মানিক লিখেছেন, "গল্পগুলি একটা বিশেষভাবে পরপর সাজিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল, যাতে 'আজ কাল পরশুর গল্প' নামটির সঙ্গতি হয় তো আরেকটু পরিস্ফুট হবে মনে করেছিলাম। কিন্তু সাজানোটা এলোমেলো হয়ে গেছে।" এই গল্পগুলোতে মানিক কেবল দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের করাল ছায়া অঙ্কন করেন নি। তার থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বাঁচার সংগ্রামও দেখিয়েছেন। সঙ্ঘবদ্ধতার পথেই মানুষের মুক্তি আসবে, অন্যায়ের প্রতিকার সম্ভব হবে, এই দৃঢ় প্রত্যয়ও ঘোষিত হয়েছে।

১৯৪৬ সালের মে মাসে মানিক লিখেছেন একখানি নাটক। নাম 'ভিটেমাটি'। প্রকাশক ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স। গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। অনেক চেষ্টা করেও নাটক খানি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।

এ বছরের জুলাই মাসে (শ্রাবণ, ১৩৫৩) বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশ করেন মানিকের নতুন উপন্যাস 'চিন্তামণি'। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পট ভূমিকায় গ্রাম বাংলার এক মর্মন্তুদ কাহিনী। যুদ্ধের ফলে দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষ, চোরা কারবার। গ্রাম-বাংলা হয়ে পড়ল বিপর্যস্ত। মানুষের এতদিনের মূল্য বোধ সব নষ্ট হয়ে গেল। চতুর্দিকে শুরু হোল নারীমেধ যজ্ঞ। তার মধ্যেও বেঁচে থাকল বেঁচে থাকার দৃঢ়তা, বাস্তব প্রেম।

১। স্মরণ করি।

এই পর্বে সিগনেট প্রেস থেকে শ্রীদিলীপকুমার গুপ্তের সম্পাদনায় 'The Best stories of modern Bengal' নামে বাংলা গল্পের যে ইংরেজী সংকলন প্রকাশিত হয় তাতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'Siree or The stair' গল্পটি ছাপা হয়েছে।

১৯৪৬ সালেই মানিক মাসিক বসুমতীর সম্পাদকের কাছে নতুন উপন্যাস লেখার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১০।৮।৪৬ তারিখে মাসিক বসুমতীর সম্পাদক মহাশয়কে মানিক যে চিঠি দেন তার মধ্যে মানিকের চিন্তার পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। মানিক লিখেছেন :

" 'পদ্মানদীর মাঝি'র মত আবার একটি উপন্যাস লিখতে অর্ডার করেছেন, কিন্তু তখনকার মন আর চোখ এখন আর নেই। সেই পারিপার্শ্বিককে হারিয়েছি বহু কাল আগে। এখন আমি সহরের বাসিন্দা। যান্ত্রিক কলকাতার সংস্পর্শে এসে গ্রামীণ সরলতাকে প্রায় ভুলতে বসেছি। তবুও হলপ করছি, আপনাকে এমন লেখা দেব যে আপনি অবশ্যই খুশী হবেন।"[১]

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট একটি ঐতিহাসিক কলঙ্কিত দিন। এর আগে ২৯শে জুলাইয়ের ডাক-ধর্মঘটের সমর্থনে সাধারণ হরতালের মধ্যে যে বিপুল উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল এই দিনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তা একেবারে চাপা পড়ে গেল। কোলকাতার কালো রাজপথ হিন্দু-মুসলমানের রক্তে স্নাত হয়েছে। মানিক তখন থাকেন কোলকাতার দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায়—টালিগঞ্জে। তাঁর ডায়েরিতে এই দিনটির বর্ণনা এবং তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা লেখা আছে। অবশ্য তার আগে আছে মানিকের এক পারিবারিক ঘটনার কথা :

"ভোরে উঠে শুনলাম রাত্রে রান্নাঘর সব চুরি হয়ে গেছে—গুড়, তেল, তরি-তরকারী কলাই করা বাটি সব কিছু।"

এর মধ্যে আছে মানিকের সাংসারিক অস্বচ্ছলতার চিত্র। অবশ্য মানিকের ডায়েরির পাতায় যে হিসাবের অঙ্ক পাওয়া যায় তার থেকে কিন্তু মনে হয় না মানিক খুব কম আয় করতেন। এ সময়ে মানিকের মাসিক গড় আয় ছিল প্রায় পাঁচশ টাকা। এই টাকায় তার ব্যয় সঙ্কুলান হত না। কারণ মানিক খুব বিষয়ী লোক ছিলেন না। ছিলেন খেয়ালী মানুষ। তাছাড়া তার ছিল সুরাসক্তির বদ অভ্যাস। অবশ্য এ সম্পর্কে তিনি খুব সচেতন ছিলেন তবু এই অভ্যাস কখনো একেবারে ছাড়তে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে ১৫।১০।৪৬ তারিখে মাসিক বসুমতীর সম্পাদককে তিনি যে ব্যক্তিগত পত্র দেন তা খুবই উল্লেখযোগ্য।

১। মাসিক বসুমতী, পৌষ, ১৩৬৩।

তিনি লিখেছেন :

"আপনার কথামত আমি আমার মাত্রা কমিয়েছি। কিন্তু একেবারে ছাড়তে পারছি না। কি যে এক বদ অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যার পর একটু-আধটু না চললে সারাদিনের ক্লান্তি যেন কিছুতেই মোচন হয় না। লিখতেও বসতে পারি না। আপনি সেদিন প্রশ্ন করেছিলেন, এই বিশেষ অবস্থায় লেখা চলে কি না। বিশ্বাস করুন, না খেয়ে আমি লিখতেই পারি না। মনের একাগ্রতা আনতে পারি না। তবে ভাল জিনিষ সকল সময়ে মেলে না। ব্যয় অনুপাতে আমার আয় খুবই অল্প। এই দুঃখে চাকরী নিয়েছিলাম সরকারী। সেই চাকরি আমার কাল হয়েছিল। চাকরি পাওয়ার পর থেকেই বদ অভ্যাসটা আয়ত্ত করতে হয়।"[১]

ডায়েরির পাতায় তার চুরি যাবার সংবাদের পরেই লেখা আছে :

"আজ হরতাল—direct action day. দাঙ্গার সংবাদ শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। দাঙ্গা হাঙ্গামা হবে এরকম জানাই ছিল, তবু মনে হোল—কি আপশোষ! কি আপশোষ! ক্রমাগত গুজব রটছে—চারিদিকে দারুণ উত্তেজনা। কালীঘাট অঞ্চলে শিখদের সঙ্গে মুসলিমদের ভীষণ সংঘর্ষ হয়েছে শুনলাম।[২] ফাঁড়ির ওদিকে নাকি গোল উঠেছে। মসজিদের সামনে ভিড় দেখে এলাম। পাড়ার ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে defence party গড়ছে। কি হচ্ছে বুঝতে না পেরে ছোঁয়াচ লেগে—নার্ভাস হয়ে পড়লাম।

সন্ধ্যার পর ফাঁড়ির দিকে আগুন লেগেছে নজরে পড়ল।

রাত প্রায় ১০টায় পার্টির[৩] দুইটি ছেলে এল। Peace Committee গঠনের চেষ্টা হচ্ছে—সকালে যেতে হবে। ওদের সঙ্গে কথা বলে মনের ভাব বদলে গেল। যতই গুরুতর হোক অবস্থা, হাল ছাড়বার দরকার নেই। অক্ষয়বাবুর ছেলে হৈ চৈ চেঁচামেচি করে—শাঁখ আর হুইসল বাজাবার ব্যবস্থা করে—পাড়াকে সরগরম করে রেখেছে—১৫।২০ মিনিট অন্তর অকারণে alarm পড়ছে। সারারাত তাই চলল। নিজেকে ছোকরা নেতা বানাচ্ছে—সকলের panic-এর সুযোগ নিয়ে। ছাঁচে ঢালা উত্তেজনা ও ভাবপ্রবণ নেতা।

১। মাসিক বসুমতী, পৌষ, ১৩৬৩।

২। মানিকবাবুরা তখন টালিগঞ্জে ছিলেন।

৩। মানিক তখন ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত।

সকালে[১] Peace Committee গঠনের জন্য ডাকতে এল না, একটু আশ্চর্য হলাম। ভয়ানক সংবাদ আসতে লাগল। গুজব অনেক—কিন্তু তবু টের পেলাম, অবস্থা সাংঘাতিক। ট্রামডিপোর দিকে রাস্তার ধার থেকে তরিতরকারী কিনে আনলাম। পাড়ার বস্তির ভিতর দিয়ে গিয়ে আনোয়ার শা রোডের দোকান থেকে সিগারেট—মুসলমানের দোকান থেকে আলু ও সরষের তেল কিনে আনলাম। বস্তির মুসলমানেরা খুব ভয় পেয়ে গেছে। এ অঞ্চলে কোন গোল নেই। কলাবাগানের হেঁটো কাপড় ভুঁড়িওলা ভদ্রলোক ও একজন মুসলমান বললেন, তারা কলাবাগানে ঠিক থাকবেন—বাইরে থেকে কেউ এসে যাতে গোল না করে দেখবেন। আমরাও যেন আমাদের পাড়ায় শান্তি বজায় রাখি। খুশী হলাম। বাজারের খালের পুলের কাছে পশ্চিমা গয়লা গাড়োয়ানরা নাকি নেতা 'চৌধুরী'র হুকুমে মুসলমানদের মারছে—ঘরে আগুন দিয়েছে। তারা পাছে আসে—এ বস্তির মুসলমানদের সেই ভয়টা স্পষ্ট।

বিকালে এ অঞ্চলে শান্তিসভা হবে শুনলাম। খুশী হয়ে নিজে রাজী হলাম যতটা পারি সাহায্য করতে। যাকে দেখছি তাকে বলছি মিটমাটের জন্য সভায় যেতে। মসজিদের কাছে আনোয়ার শা রোডের একদল মুসলিম স্বীকার করলেন মিটমাট দরকার—কয়েকজন উত্তেজিত ভাবে বললেন, মেরে পুড়িয়ে এখন মিটমাটের কথা কেন? অন্যরা তাদের থামালেন। ফাঁড়ি পেরিয়ে পুলের নীচে যেতে এল বিরোধিতা—হিন্দুদের কাছ থেকে। কিসের মিটমাট—মুসলমানেরা এই করেছে, ওই করেছে। ব্যাটা কমিউনিষ্ট বলে আমায় মারে আর কি! প্রায় দেড়শো লোক মিলে ধরেছিল।

মিটমাটের চেষ্টা ব্যর্থ হবে, কাল বিকালের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি। খোঁচা খোঁচা দাঁড়িওয়ালা সেই কালো লোকটি লম্বা বক্তৃতা দিয়ে আমায় বোঝাবার চেষ্টা—তার পিছনে ভীড়ের সায়। প্যাকিস্তানের দাবী বাতিল করা হচ্ছে—ব্যাটারা টের পাচ্ছে। যেখানে মুসলমানেরা দলে ভারী সেখানে যে হিন্দুরাও টের পাচ্ছে আমার এ যুক্তি উড়ে গেল। মুসলমানেরা এদের এ পাড়ায় এসে নাকে খত দিলে মিটমাটের কথা বলতে পারে। কজনকে বক্তৃতা করতে দেওয়ায় মারটা খেলাম না। কে পি রায় লেন দিয়ে বাঁক পর্যন্ত এসেছি—লাঠি হাতে এক ছোকরা পথ আটকেছিল—ফের আমায় ভীড় ঘিরে ধরল। এক ছোকরা লাঠি দিয়ে মারে আর কি! নিজেই ধমক দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করলাম। ধীর শান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ

১। ১৭ই আগষ্ট সকালে।

ভাব না বজায় রাখতে পারলে নিশ্চয়ই মার খেতাম। "শ্যালা কমিউনিষ্ট!" "মুসলমানের দালাল"। রব উঠছিল চারদিকে।

আজ বিকেলে আবার ফাঁড়ির সামনে দিয়ে পুলের তলা দিয়ে কে পি লেন দিয়ে ঘুরে এলাম। ফাঁড়ির মোড়টা জনহীন—দূরে চারু মার্কেটের দিকে রাস্তায় হাঙ্গামা হচ্ছে। পাশে একটা বাড়িতে আগুন লেগেছে। কে পি লেনে বহু লোক—উত্তেজিত, হিংস্র। ছাদ থেকে এক ব্যাটা চীৎকার করল—"ওই সেই ব্যাটা উপন্যাসিক যায়।" ধীর পদে চলতে লাগলাম। একজন পাশে চলতে চলতে লজ্জিতভাবে বলল—"দেখে যা ভাবছেন তা নয় কিন্তু। সবাই উত্তেজিত কিন্তু aggressive নয়।"

বৃটিশ সিংহ বুঝি মুচকি হাসছে?

শুনলাম রেডিওতে নাকি খবর বেরিয়েছে ৩০০০ মৃত! আহতের হিসাব নেই। হাসপাতালে স্থানাভাব। গলির মোড়ে মোড়ে তারকাঁটার বেড়া পড়েছে—হিন্দ-ফৌজের ভূতপূর্ব একজন মেজরের পরামর্শে। কথা শুনে প্রথমটা খুশী হয়েছিলাম—পাঁচ মিনিটের মধ্যে টের পেলাম তিনি শুধু হিন্দু সংগঠন করছেন—তাদের কাছে মিলিটারী ডিসিপ্লিন দাবী করছেন: সংঘর্ষ বাঁচানো, শান্তি বজায় রাখা আসল উদ্দেশ্য নয়।

কয়েকজন মুসলমান লীগ নেতাদের—সারোয়ার্দিকে গাল দিলেন। কয়েকজন হিন্দু—হিন্দু নেতাদের মুণ্ডপাত করলেন। তারা টের পেয়েছেন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নেতাদের নাচাচ্ছেন—কংগ্রেস লীগ দুইয়েরই নেতাদের। নেতারা এসে হাঙ্গামা মেটাতে পারবেন সাধারণের মনে এ বিশ্বাসের একান্ত অভাব দেখলাম। গুজব যে জিন্না সাহেব কলকাতায় এসেছেন। কংগ্রেস নেতা আসছেন। কিন্তু কেউ ভরসা পেয়েছে মনে হয় না। উত্তেজনা, উগ্র ভয়ার্ত হিংস্র উত্তেজনা, নিজেকে ক্ষয় করছে টের পাচ্ছি। অসুবিধায় সকলের প্রাণান্ত হচ্ছে। কার কি লাভটা হোল? —বার বার কানে আসছে। ভয়, উত্তেজনা, অবিশ্বাস কমতে কমতে স্বাভাবিক অবস্থা সাধারণ লোক নিজেদের মধ্যে নিজেরাই ফিরিয়ে আনছে টের পাচ্ছি। উস্কানি না থাকলে দু একদিনের মধ্যে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসতো।"

এই লেখার মধ্যে যেমন সমকালীন চিত্র সুন্দর বিকাশ লাভ করেছে তেমনি লাভ করেছে মানিকের সত্যনিষ্ঠা এবং অসীম সাহসের পরিচয়। মানিক বিশ্বাস করতেন হিন্দু মুসলমানদের দাঙ্গা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কারসাজী। অতএব এই দাঙ্গায় যারা সাধারণ হিন্দু মুসলমান কোনভাবেই উপকৃত হয় নি। তিনি কেবল তা

বিশ্বাস করেই নিবৃত্ত হন নি তাকে চরম উত্তেজনার মধ্যে প্রচার করতেও নেমেছিলেন। এমন কি আত্মপীড়নের ভয়কেও তুচ্ছজ্ঞান করেছিলেন। এখানেই মানিকের চরিত্রের বলিষ্ঠতা।

মানিকের স্মৃতিকথায় শ্রীঅমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

'...মন ছিল মানিকের অসীম সাহসপূর্ণ। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় টালিগঞ্জের বাড়ির চতুর্দিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। তখনকার মুসলমান প্রধান টালিগঞ্জে রাতদিন খুনোখুনি,—বাড়ির সকলে পালিয়ে এলো হিন্দু প্রধান পাড়া বালিগঞ্জে। কিন্তু মানিক অকুতোভয়ে পাহারা দিতে রইলো সে বাড়িতে, নিরবচ্ছিন্ন একা। বৃদ্ধ পিতার নিত্য আহার্য মাগুর মাছ দাঙ্গার ভিতরে না পাওয়া গেলে পাছে তাঁর অসুবিধা হয়, সেজন্য ঐ হাঙ্গামার ভিতরেও জেলে পাড়া ঘুরে রোজই বালীগঞ্জে এসে দিয়ে যেত মাগুর মাছ।

আবার পরিণত বয়সে ভাইদের সঙ্গে মতের অমিল হলে মারামারি করতেও তার বাধতো না। তার রুক্ষ কঠোর চেহারার মধ্যে ছিল এক দরদী অশান্ত মন। পরিবারের মধ্যে যাদের নিকটে সে ছিল স্নেহাকাঙ্ক্ষী, তাদের মাঝে মাঝে বলত—

"আমার অভাব নেই কিছুরই,—তবুও মনে শান্তি পাই না,—দরকার আমার শুধু মানসিক শান্তির যা আমাকে কোন কিছুই দিতে পারে না।"[১]

এই দাঙ্গার পর প্রকাশিত হলো মানিকের আরেকটি গল্প সংকলন গ্রন্থ 'পরিস্থিতি'। অগ্রণী বুক ক্লাব ১৩৫৩ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশ করেন। সংকলনের প্রথমেই মানিক লিখেছেন, 'প্যানিক'' 'সাড়ে সাত সের চাল', ও 'রিক্সাওয়ালা' ছাড়া অন্য গল্পগুলি বছরখানেকের মধ্যে লেখা। 'প্যানিক' যুদ্ধের গোড়ার দিকে লেখা, অন্য দুটি তার পরবর্তী সময়ে।

গল্পগুলি সাজাতে ত্রুটি হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাতে খুব বেশী এসে যাবে বলে মনে হয় না। চারিদিকে দ্রুত ও বিরাট পরিবর্তনের কতকগুলি ছাড়া ছাড়া দিকের ছাপ গল্পগুলিতে আছে, সব কিছু বদলে যাচ্ছে এইটুকুই শুধু গল্পগুলির একতা। সবগুলি গল্প মিলে বিশেষ কোনো অখণ্ড সমগ্রতা বা ধারা কতখানি গড়তে পেরেছে বলা কঠিন।" ২৯শে ভাদ্র, ১৩৫৩।

১। স্মরণ করি।

মানিক কমিউনিষ্ট পার্টির কাজে বিশেষ করে সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক সভা সমিতিতে যোগদানের জন্য এ সময় খুবই ব্যস্ত থাকেন। দূর দূরান্তের নানা জায়গায় তিনি যোগ দিয়েছেন। ১৯৪৭ সালের প্রথম দিকেই তিনি সুদূর বরিশালে গিয়েছিলেন এই কাজে। মাসিক বসুমতীর সম্পাদকের কাছে লেখা এক চিঠিতে তার বিবরণ পাওয়া যায়।[১]

"বরিশালে গিয়ে ফিরতে দেরী হয়ে গেল। সেখানে নিরালায় বসে ভালভাবে লিখবো ভেবেছিলাম, কিন্তু সাধারণ সভা, কলেজের সভা ইত্যাদি বড় বড় সভা ছাড়াও কত যে সঙ্ঘ সমিতি আর ক্লাবের আসরে গিয়ে সাহিত্যের কথা বলতে হয়েছে! তাছাড়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল থেকে অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির বাড়ি কয়েক মিনিটের জন্য পদার্পণের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয়। এখানে একটি দুর্ঘটনার সুমুখে পড়তে হয়, সেটা আপনাকে জানাই। এখানে এক আসরে জনৈকা মহিলা আমাকে সঙ্গোপনে ডেকে আমার পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলেন। প্রণাম সেরে উঠতেই দেখি তাঁর চোখ দুটি অশ্রু সজল। কান্নার কারণ জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন, এ না কি তাঁর আনন্দের অশ্রু। আমার লেখার প্রথম থেকে তিনি আমার প্রত্যেকটি রচনা পড়েছেন। আমি তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে বলেছি, আপনার মত পাঠিকা বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সৃষ্টি হোক।

...বরিশাল থেকে ফিরে দু'দিন চেষ্টা করেও এক লাইন লিখতে পারিনি। কাল বিকেলের দিকে লেখার চেষ্টা স্থগিত রেখে খালের ধার দিয়ে বেশ অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে এক নির্জন জায়গায় বহুক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। ফিরে এসেই লিখতে বসেছি। এখনও লিখে চলেছি। এখন রাত প্রায় তিনটে। এক ফাঁকে একটা সিগারেট ধরিয়ে আপনাকে এই চিঠিখানি লিখছি।"

অমানুষিক পরিশ্রম করতেন মানিক। তবু অনেক সময় প্রকাশকের চাহিদা-মত লেখা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠতো না। কিন্তু পার্টির কাজে তার কোন গাফিলতি ছিল না। প্রকাশকের নিকট প্রতিশ্রুত লেখা সম্পূর্ণ হয় নি তার মধ্যেও যদি কোন পার্টির কোন সভা সমিতির ডাক আসত তিনি লেখা ফেলে সেই কাজে চলে যেতেন।[২]

১। মাসিক বসুমতী, পৌষ, ১৩৬৩।

২। মাসিক বসুমতীর সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠিতে তার প্রমাণ আছে।

১৯৪৭ সালে মানিকের দু'খানি উপন্যাস—'চিহ্ন' এবং 'আদায়ের ইতিহাস' এবং একখানি গল্প সংকলন গ্রন্থ 'খতিয়ান' প্রকাশিত হয়েছে।

'চিহ্ন' উপন্যাসটি প্রকাশ করে বসুমতী সাহিত্য মন্দির। এর প্রকাশকাল মাঘ, ১৩৫৩। 'লেখকের কথা'য় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন। "'চিহ্ন' বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন করেছি। বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা, একে উপন্যাস বলা চলবে কিনা আমার জানা নেই। এ ধরণের কাহিনী, যার ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত গতিতে ঘটে চলে, এ ভাবে সাজালেই জোরালো হয় বলে মনে করি।"

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রসিদ আলি দিবসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাশে ধর্মতলার মোড়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের অবস্থানের উপর পুলিশ যে গুলি চালিয়েছিল তারই পটভূমিতে মানিক রচনা করলেন এই 'চিহ্ন' উপন্যাস। এই উপন্যাস কোন এক ব্যক্তি বিশেষের কাহিনী নয়। রাজপথের নানা মানুষকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়েছে। এ যেন মিছিলের মহাকাব্য।

এই উপন্যাসে অক্ষয় নামে যে চরিত্র আছে সেই অক্ষয় মানিক নিজে। ধর্মতলার মোড়ে যেদিন ছাত্ররা পথ আটকে পুলিশের মুখোমুখি বসেছিল সেদিন মানিক ওদিকে গিয়েছিলেন রোজকার নেশার তাগিদে। সেদিনের ব্যাপার দেখে তিনি মদ না খেয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। এই উপন্যাসে মানিকের মদ খাওয়ার জন্য সুন্দর আত্ম-সমালোচনা এবং অনুশোচনা ফুটে উঠেছে। সেজন্য অক্ষয়ের কাহিনীটি এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অক্ষয় রোজ মদ খায়। সেদিন বাড়ি থেকে বেরোবার সময় সে প্রতিজ্ঞা করেছিল আর মদ খাবে না। কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতে তার খাবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠে। কিন্তু "সারাদিন রাজপথের ও দৃশ্য দেখার পর মদ খেলে বড়ই নোংরামি করা হবে সেটা।" সেজন্য তার আর সেদিন মদ খাওয়া হয় না। অনেক রাতে অক্ষয় নেশা না করে বাড়ী ফিরেছে। "তার নেশা করার জন্য সুধা কষ্ট পায় সে জানত, কিন্তু কত তীব্র, কি অসহ্য যে হত সে কষ্ট তা সে শুধু আজকে, এখন সুধাকে চোখে দেখবার পর, প্রথম পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছে।...পশুর মত কি ভাবে সুধাকে সে নির্যাতন করে এসেছে। এতকাল পরে আজ প্রথম পশুর মত জমজমাট নেশা না করে বাড়ী ফিরে হঠাৎ সেটা অনুভব করে আজ প্রথম আন্তরিক অনুতাপ দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।"

অক্ষয় আজ প্রথম উপলব্ধি করে, "প্রায়শ্চিত্ত বাকী আছে তার, অনেক

প্রায়শ্চিত্ত। নিজেকে অনেক দিন ধরে দলে পিষে ছিঁড়ে খুনে চলতে হবে। নেশা করার দুরন্ত, অবাধ্য দৈহিক মানসিক সর্বাঙ্গীন সাধ শুধু নয়, সে যে মাতাল হওয়া বরবাদ করেছে এ বিষয়ে বহুকাল ধরে ঘরে বাইরে সকলের অবিশ্বাসের পীড়ন। মাথাটা আজ যেন আশ্চর্য রকম সাফ মনে হয় অক্ষয়ের। জগতের যাবতীয় সমস্যার মর্ম যেন তার আজ মদ খাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও না খাওয়ার এবং এ নেশা যেভাবেই হোক ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞার বিদ্রোহে অকস্মাৎ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে জীবনে কঠিন, কঠিন এ কাজ।

"কিন্তু অন্য এক ভয়ঙ্কর নেশাতে একেবারে সচেতন অচেতন মন নিয়ে মশগুল হওয়ার মজাও টের পেয়েছে অক্ষয়, বাঁচার জন্য বাঁচাবার জন্য গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে মরা। এই প্রথম ও নতুন নেশা এত সাফ করে দিয়েছে তার মাথা যে সে জেনে গিয়েছে মদ হয়তো সে খাবে দু' একবার নিজের দুর্বলতায় কিন্তু সেটা দু' একবারের বেশী আর খাবে না। কারণ, ফেনিল গ্লাসে চুমুক দিতে গেলে তার মনে হবে সে জীয়ন্ত তাজা ছেলের রক্ত খাচ্ছে—গেঁজানো রক্ত।"

সুধা (প্রথমে কিন্তু অক্ষয়ের স্ত্রীর নাম বলা হয়েছে অলকা। এরকম অসংলগ্নতা আমরা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' গ্রন্থে দেখেছি। পরবর্তীকালেও অনেক দেখা গিয়েছে।) কিন্তু প্রথমে ভাবতেই পারেনি অক্ষয় আজ নেশা করে আসেনি। সে যে নেশা না করে থাকতে পারে এটা আর কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। পরে বিশ্বাস করে সুধা বিস্মিত হয়েছিল। অক্ষয় তখন সুধাকে তার নেশা না করার কারণ বলল, এমন ব্যাপার আজ দেখলাম, যাদের মেয়ে শোঁকা ভাবপ্রবণ ফাজিল ছোকরা বলে জানতাম, তাদের এমন অদ্ভুত মনের জোর দেখলাম, আমি একেবারে থতমত খেয়ে গেলাম সুধা। বুঝলাম যে, আমি যা ভাবি সব ভুল। মদ খেতে হোটেলের দরজা পর্যন্ত গেলাম কিন্তু তখনো ভাবছি, গুলি খেলে মরতে হবে জেনেও সাধারণ একটা ছেলে যে গুলি খাবার জন্য তৈরি, ওটা কিসের নেশা? মদ না খেয়েও যদি মানুষের ওরকম নেশা হতে পারে, আমি তবে কেন বোকার মত গাঁটের পয়সা খরচ করে এই সস্তা বিশ্রী নেশা করি? ওই ছেলেগুলোর জন্য আজ খেতে পারলাম না। আমার মনের জোরের জন্য নয়।"

তারপর মানিক সত্যি কিছুদিন আর নেশা করেননি। তার তখন নতুন নেশা ধরেছে। কলকাতায় তখন তুমুল উত্তেজনা। "মনে এল নৌবিদ্রোহের, রসিদ আলি দিবস বা ২৯শে জুলাই-এর অগ্নিগর্ভ দিনগুলির কথা। এসব দিনে মানিকবাবুকে দেখেছি কখনও মজুরদের মিছিলের সঙ্গে একাগ্রমনে চলেছেন, কখনও

ছাত্রদের সঙ্গে জুটে রাস্তায় বসে কখনও সংঘ অফিসে অথবা কমিউনিষ্ট পার্টির দপ্তরে বসে তুমুল আলোচনা করেছেন, কখনও বা পথচারীর কাছে জেনে নিচ্ছেন সংগ্রামের টাটকা খবর। আর এই সব টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা তাঁর হাতে কখনও রূপ পেয়েছে 'চিহ্নে', কখনও জ্বলন্ত বিবৃতির, কখনো বা বড়ো উপন্যাসের উপাদানের।" (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন—চিন্মোহন সেহানবীস।) 'চিহ্ন' উপন্যাসের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় মানিকের নতুন গল্প সংকলন গ্রন্থ 'খতিয়ান' প্রকাশিত হল ১৯৪৭ এর আগষ্টে। প্রকাশক ভারতী ভবন।

"১৯৪৭ পূজোর আগে প্রগতি লেখক সংঘ, কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সঙ্গে একযোগে এক অভূতপূর্ব দাঙ্গা বিরোধী মিছিলের ব্যবস্থা করে। সম্ভাব্য দাঙ্গার আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হিন্দু মুসলমান নর-নারীর কাছে সেদিন বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিকেরা দলমত নির্বিশেষে উপস্থিত হয়েছিলেন নবজীবনের বাণী নিয়ে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বিশেষ করে যে সব অঞ্চলে দাঙ্গার আশঙ্কা বেশি সেই সব এলাকায় সেদিন মানিকবাবু, তারাশঙ্করবাবু গোপালবাবু, জ্যোতির্ময় রায় প্রমুখ সাহিত্যিকেরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন শান্তির প্রতি তাঁদের অবিচল আস্থা—সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন চৌধুরী, সন্তোষ সেনগুপ্ত প্রমুখেরা গেয়েছিলেন জাতীয়-সঙ্গীত। কলিকাতাবাসীর সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।" (ঐ)

এই বছরেই মানিক লিখলেন আরেকটি উপন্যাস— 'আদায়ের ইতিহাস'। প্রকাশক এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স। পরে এই গ্রন্থ প্রকাশ করে বিভূতি প্রকাশক (আশ্বিন, ১৩৬৮)। এই উপন্যাসে আছে বিকারগ্রস্ত অস্থিরমতি এক যুবকের সুস্থ জীবনাদর্শের সন্ধান লাভের কাহিনী।

এ ছাড়াও মানিক এ বছরে (৮ই এপ্রিল এবং ৬ই সেপ্টেম্বর) রেডিওতে দুটো গল্প পাঠ করেন।[১]

গল্প উপন্যাস ছাড়া মানিক এ বছরে লিখলেন দুটো প্রবন্ধ এবং দুটো কবিতা। প্রবন্ধ দুটির নাম 'প্রেস মালিকদের ষড়যন্ত্র' এবং 'প্রতিভা'। আর কবিতা দুটির নাম 'সুকান্ত ভট্টাচার্য' এবং 'প্রথম কবিতার কাহিনী'। প্রেস মালিকরা হঠাৎ ছাপার চার্জ বহুগুণে বৃদ্ধি করায় মানিক তার প্রতিবাদে লিখলেন 'প্রেস মালিকদের ষড়যন্ত্র'। তার মতে এটা আসলে বাঙালী সংস্কৃতিকে ধ্বংস

১। মানিকের ডায়েরিতে উল্লেখ আছে। প্রথম দিনের গল্পের নাম নেই। দ্বিতীয় দিনের গল্প 'ভালবাসা' 'ছোট বড়' গ্রন্থে সংকলিত।

করার ষড়যন্ত্র।

'প্রতিভা' প্রবন্ধটি এ বছরের শারদীয়া 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সে জন্য তিনি প্রতিভাকেও মনে করেছেন জনসাধারণের সম্পত্তি। সেজন্য "লেখক-কবিও টের পাচ্ছেন যে নিছক হাসি কান্নার আরক আর ভূমার মূলধনে প্রেম চলবে না মানুষের সঙ্গে, বৈজ্ঞানিকের মতো মানুষের রোগ উপবাস লড়াই নিয়ে গবেষণা করা ছাড়া উপায় নেই।

সেজন্য নিজেকে সাধারণ মানুষ ভাবা ছাড়াও আমার পথ নেই।"

মানিক দশজনের একজন এই উপলব্ধিই এই প্রবন্ধের মূল কথা।

কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়েছে। সে ছিল খুব গরীব। তাঁকে বাঁচাবার জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছিল। সুকান্তকে মানিক খুব ভালবাসতেন। রোগাক্রান্ত কবি সুকান্তের কথা স্মরণে রেখেই মানিক লিখেছিলেন 'সুকান্ত ভট্টাচার্য' কবিতা :

চৈত্রের পরিচয়ে তুমি সূর্য হতে চেয়েছো।
তোমার যক্ষা হয়েছে।
তোমার তরুণ রশ্মি দেখে ভেবেছিলাম,
বাঁচা গেল, কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ।
তোমার যক্ষা হয়েছে?
এও বুঝি ষড়যন্ত্র রাত্রিজ মেঘের,
ঊষায় যারা আজ দুর্যোগ ঘটালো।

'প্রথম কবিতার কাহিনী' ১৩৫৪ সালের শারদীয়া বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা লেখার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সেজন্য এই কবিতায় নিজের কাহিনী, নিজের ভবিষ্যতের স্বপ্ন সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা জানতে পারি। মানিক লিখেছেন :

কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম কৈশোরে।
পিতৃপুরুষের স্বপ্নালু ঐতিহ্যের মিষ্টি নেশায়
পীড়িত মনের অভিমানী বিদ্রোহে পুষ্ট সঞ্জাত
অজস্র কেনর ফুল ফুটিয়ে ছড়া গাঁথার সাধ।

কৈশোরে তিনি দেখেছেন আত্মীয়দের 'চিকণ সুন্দর সব আকাশী বাতাসী অভিলাষ', দেখেছেন কত ভালবাসা-বাসি, কত 'প্রেমের পুরাণ'। তারপর পদ্মায় ভেসে যেতে যেতে তিনি দেখলেন অন্য জগৎ।

ব্যস্ত হাটে, শ্লথ পথে, ছায়া-শান্ত ঘাটে
শণ খড় খেজুরের কুঁড়েতে কুঁড়েতে,
হাসি-কান্না কুড়াই আগ্রহে,
শূন্যে মিশে যায় স্বপ্ন-বালুকার মত।

এই চাষী মাঝিদের জীবনে তিনি তার পূর্ব পরিচিত প্রেম-জীবনকে খুঁজে পেলেন না। সেজন্য কৈশোরে তার কবিতা লেখা হলো না। প্রথম যৌবনে 'সঞ্জীবনী মন্ত্র বা সুধার' জন্য অথবা 'নাগলোকের মণির একটা টুকরো'-র সন্ধানে তিনি ঘাঁটলেন 'দেবাশ্রমিক কবিতা'। আর জীবনের নীচের তলায় বস্তির পচা পাঁক। ইচ্ছে ছিল

'সবুজ করব হৃদয়ের শুকনো বিদ্রোহের চারাগুলি,
বাঁচাব পাতালের বিষ-হত কালো ধনঞ্জয়দের।'

কিন্তু বাস্তবে তাঁর অভিজ্ঞতা হোল ভিন্নরূপ। সেখানে তিনি আশাহত। কাব্যের কুয়াশা ভেদ করে তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন :

পেটে দানা মানুষের নেই, অনর্থক বাঁচার লড়াই,
মাটি শক্ত, অভিযান প্রতিহত স্নায়ু শিকড়ের,
অশ্রুজলে ফলে না ফসল,
হৃদয়ের বাষ্পোদ্গমে চলে না ইঞ্জিন।
মুক্তির স্বাদ নেই লবণের মাশুল ভিক্ষার
রক্তহীন গঙ্গাজলী আলুনি সংগ্রামে।

মানিক 'জীবনের মানে' পেলেন না কবিতায়, 'মরণের মানে' পেলেন না দুঃখীর জীবনে। সেজন্য 'কবিতা লেখা হল না প্রথম যৌবনে'। তারপর বুদ্ধির ছুরিতে চলেছে তার নিত্য আত্মহত্যা, পদে পদে অনাকাঙ্ক্ষিত পরাজয়। অথচ তিনি জীবনে সহজ সুলভ শান্তির সন্ধান করেন নি, কামনা করেন নি

আত্মীয় বন্ধুর বরাভয়,
বিদ্যা অর্থ মান নারী প্রতিষ্ঠা ক্ষমতা
সীমাবদ্ধ যথেচ্ছচারিতা।

তিনি জীবনে কষ্ট ক্লিষ্ট পথ বেছে নিয়েছেন। সেই পথে খেয়েছেন খুদ, করেছেন উপবাস। ভুগেছেন রোগ চাষী মজুরের সাথে। অকারণে লক্ষ মৃত্যুর মধ্যে তার স্বপ্ন কৈশোর যৌবনকাল অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। মানিকের মনে জেগে উঠেছে দৃঢ় প্রত্যয় :

আমার জগতে কাল মানুষের জন্মক্ষণ থেকে
তিলে তিলে করেছে সঞ্চয়
মহাসম্ভাবনাময় যে মহাবিপ্লব
আমি তারি আত্মীয়তা চাই।
তার পিতা, তার হোতা, তার সার্থকতা দাতা,
একমাত্র আমি।
আমি! আমি! আমি!
আমি তারে বাঁচাব আঁতুড়ে
আমি চিকিৎসক।
প্রহরে প্রহরে দেব বোতলে বোতলে
মর্মের মন্থনজাত সঞ্জীবনী ঘৃণা
আমি মৃত্যু হব তার সাথে
জগতের ভীরু পঙ্গু ছদ্মবেশী মৃত্যু দাতাদের।
আমি তার চোখে দেব কয়লা খনির কালো
মরণ কাজল,
টিপ দেব চাকায় মাখানো গায় জমাট রক্তের।
সর্ব অঙ্গে এঁকে দেব লালিম অঙ্কনা
বুলেটের তাজা তাজা ক্ষতের চিহ্নের।
শিরে দেব সাদা দানবের
দয়ার শোষণে শুভ্র পাটের মুকুট,
রাঙাতে রক্তের প্রতিদান।
লোহার নূপুর দেব পায়ে
সোনা মোড়া বুক ভেঙ্গে সেরা লোহা কেড়ে,
চলনে প্রলয় বাজাবার।
আমি সব দেব,
আমি! আমি! আমি!

মানিক চেয়েছিলেন মানুষের আসল কবিতা লিখতে। কৈশোরে যৌবনে ছিল তারই অদম্য আকাঙ্ক্ষা। কবিতা লিখবার প্রেরণায় ক্রমে জিদ বাড়ে। কিন্তু এ কাজে তাঁর আপনজন কেউ নেই। অথচ এ কবিতা লিখতে না পারায় তার জীবনে ব্যর্থতা আসে। এমন সময় এল "একদল বাস্তব কবি"। ইতিহাসের সুতোয়

তারা জীবন যুদ্ধের, জয়লাভের, অগ্রসরের কবিতা লিখছে। কিন্তু তাদের সবই 'নকল ব্যথা, দরদের অভিষেক'। মানিকের মনে হল, "আমার মানুষের কণ্ঠে তারা মোটেই কাঁদছে না সমবেদনায়।" তবু ওরা বলল, সব ঠিক আছে। মানিকের সকলের সঙ্গে থেকেও তিনি একা। তিনি খুঁজে ফেরেন নতুন প্রতিনিধি, নতুন প্রতিশ্রুতি। এমন সময় তিনি যেন সঙ্গী পেলেন এক কিশোর কবিকে। বলা বাহুল্য এই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। তার লেখায় ফুটে ওঠে মানিকের না-লেখা কবিতা। মানিক লিখেছেন :

> আমার বিদ্রোহের চারাগুলি সবুজ হয়েছে ওর মনে,
> আমার সাধ হয়েছে ওর সার্থকতা।

কিন্তু বেশীদিন সেই সৈনিক কবি লিখতে পারলো না। যক্ষারোগে তার অকাল মৃত্যু হোল ১৩৫৪ সালের ২৯শে বৈশাখে। অতএব অন্য কবিকে দিয়ে মানিকের কবিতা লেখা হোল না। অবশেষে নিজেকেই লিখতে হোল কবিতা। লিখলেন তিনি চাষী, মাঝি, কলম-পেষা মানুষের শ্রম সাধনার সুন্দরের কবিতা। এই জন্যেই তিনি পড়েছিলেন বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মনের বিশ্লেষণে তিনি 'চতুর্থ বিশ্ব' খুঁজে চলেছেন। আর অনেক আলো জ্বালিয়ে দিলেন মনের অন্ধকারে।

॥ ১৯ ॥

১৯৪৮ সাল থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু কিছু ডায়েরি পাওয়া গিয়েছে। তাতে মানিকবাবু লিখতেন খুবই কম। তবু তার মধ্যেই মানিকের ব্যক্তি মনের আসল ছবিটি পাওয়া যাবে বলে সেগুলি প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি।

১৯৪৭ এর ডিসেম্বরের শেষ দিকে মানিক প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য বোম্বে গেলেন। ঠিক এই সময়েই বোম্বেতে অনুষ্ঠিত হলো ছাত্র ফেডারেশনের সর্ব ভারতীয় সম্মেলন। কিন্তু সম্মেলনের আগের দিন হঠাৎ এই সম্মেলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। ছাত্ররা আইন অমান্য করে প্রকাশ্য সম্মেলন করল। মানিকের ডায়েরিতে তারই উল্লেখ আছে।

1.1.1948—বোম্বাই-এ শুরু হলো। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে এসেছিলাম। ২৮শে শেষ হয়েছে। গণ সাহিত্য শাখার সভাপতি। কমবেশী সব সভাপতি ও বক্তার লিখিত অলিখিত বক্তৃতা একঘেয়ে, পুরাণো গতানুগতিক। আমার বক্তৃতাই সাড়া জাগিয়েছে। সমাজ সাহিত্য জনগণ সম্পর্কে এ

সব কথা বোধ হয় সম্মেলনে ২৫ বছরে কখনো শোনেনি। আসলে সম্মেলনটি বরাবর ছিল প্রবাসী ভদ্রলোকদের বড় দিনের দেশ ভ্রমণের অজুহাত—এবারও তাই।

কাল যোগেশ্বরী গুহা দেখে এসেছি। বিকালে ছাত্রদের নিষেধ অমান্য করে সম্মেলন করা এবং পুলিশের টিয়ার গ্যাস ও গুলিবর্ষণ—অকথ্য অত্যাচার। ১২০০-১৩০০ ছাত্র ডেলিগেট ভারতের সারা প্রদেশ থেকে এসে জমেছে, তাদের শেষ মুহূর্তে সম্মেলন নিষিদ্ধ করা কি অর্থহীন কর্ত্তরবাজি! ২৯শে হরতাল শান্তিপূর্ণ—পরদিন সম্মেলনের অনুমতি দিলে কি দোষ হত?

৮ দিন ঘুরে ফিরে বোম্বাই শহরকে প্রায় চিনেছি। কলকাতার চেয়ে অনেক বিষয়ে পৃথক—সমৃদ্ধশালী, পরিচ্ছন্ন, লোকের নাগরিক কর্তব্যবোধ জাগ্রত। বাসের জন্য স্বেচ্ছায় 'Q'—বসার সিট পূর্ণ হলে কেউ উঠতে পারবে না! তবে ট্রামগুলি বাজে—শামুকের গতিতে চলে। শহরের মাঝখান দিয়ে electric train চলায় যাতায়াতের আশ্চর্য সুবিধা হয়েছে। এখানে দেশী মূলধন, শিল্পীকরণের মুনাফা দেশে থাকে—কলকাতায় বিদেশী মূলধন: লাভের টাকা বিদেশে যায়। তাছাড়া কলকাতার চেয়ে বোম্বেতে বিভিন্ন প্রদেশের লোক সমাবেশ বেশী।

2.1.1948.—সকালে সদলবলে নৌকায় এলিফ্যান্ট কেভস গেলাম। বাতাস বিরোধী হওয়ায় gateway of India থেকে ৯টায় ছেড়ে পৌঁছতে ১টা বেজে গেল। গাল গল্পে কাটল বেশ।

পাহাড় কেটে গুহা: পাথর কুঁদে বিরাট আশ্চর্য সব মূর্তি। পথে নৌকাতে চিত্তপ্রসাদ ও প্রভাস আমার ও গোপালের স্কেচ নিয়েছে—এখানে মূর্তির স্কেচ নিতে লেগে গেল। বিরাটত্বের অনুভূতি অভিভূত করে দেয়। ত্রিমূর্তি, পার্বতীর বিবাহ, রাবণের কৈলাস উত্তোলন এসব কতকগুলি কত ধৈর্যের সঙ্গে শিল্পী পাথরে খুঁদেছে—একটি পাথরে—হয়তো এক বংশে শেষ হয়নি!

আজ দর্শক আমরাই। রবিবার ষ্টিমারে নাকি অনেকে আসে—বেশীর ভাগ পিকনিক করতে!

জোয়ারের মুখে ফিরতি—জোর বাতাস পক্ষে। প্রবল ঢেউ—নৌকা উঠছে পড়ছে—অনেকের মুখ ভয়ে শুকনো: পালের টানে জোরে চলছে—সকালে লেগেছিল চার ঘন্টা, এবার সোয়া ঘন্টায় পৌঁছে গেলাম।

3.1.1948.—পাঁচটায় কলকাতা রওনা—নাগপুর হয়ে।

সকালে V.T. তে টিকিট করলাম—ইন্টার ক্লাস ভাড়া বেড়ে হয়েছে ৫৭।৶০ —সাংঘাতিক কথা। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য খরচ না দিলেই হয়েছিল!

সাহিত্যের মূলনীতি সম্পর্কে মুলকরাজের সঙ্গে আলাপ হল। মূলনীতি নিয়ে নাকি ২ বছর হিন্দী সাহিত্য সাহিত্যিক সভ্যদের তর্ক চলছে। হিন্দী সাহিত্য কংগ্রেসে শেষ মীমাংসা হবে।

১০০০ দেশী charminar সিগারেট কিনলাম। নিজামে তৈরী। প্রায় সাড়ে চার পয়সা প্যাকেট—যদি চলে তবে সিগারেট খরচ কমবে। ডলির (মানিকের সহধর্মিনী) দুখানা শাড়ী কিনলাম।

4.1.1948. ট্রেনে। যুক্তপ্রদেশ দিয়ে চলেছি। বিস্তীর্ণ প্রান্তর—কত অনাবাদী জমি যে পড়ে আছে। এ দেশী এক সহযাত্রী আলাপের সূত্রে জানাল, অল্প মাটির নীচেই নাকি পাথর, তাই চাষ কম হয়। তাই কি!

সারাদিন গাড়ী চলেছে। লোক উঠছে, নামছে। দূর পথের যাত্রীরা কেউ বসে, কেউ শুয়ে, কেউ গল্পে রত। ট্রেনের এই বাধ্যতামূলক অবসরেও সকলে যেন অল্পবিস্তর অস্থির—অস্বস্তি বোধ করছে।

ডাইনিং কারে খেতে গেলাম। ইংরাজের রাজকীয়তার নিদর্শন! ঝকঝকে পালিশ—সাজানো টেবিল চেয়ার—বত্রিশটি আলোয় ঝলমল। সাত আটজন খানসামা—ত্রিশ বত্রিশজন খানা খেতে পারে। ফর্সা ধবধবে পোষাক—খাবার দেবার সময় আবার হাতে সাদা গ্লোবস পরে। রূপোলি চকচকে কাঁটা চামচ, দামী প্লেট। এক টুকরো পাঁউরুটি, সুপ, মাংস, পুডিং, কফি—বাঁধা খাদ্য।

খাঁটি ইংরাজি প্রথা—পরিবেশন পর্যন্ত।

একটি মাত্র ইংরেজ, প্রথম থেকে গম্ভীর মুখে বই পড়ছে। পঞ্চাশ, পুষ্ট, ভরাট মুখ, কপালে রেখার আভাস, ধৈর্যের স্থৈর্যের অবতার—সিধে হয়ে ঠায় বসে আছে—খানসামাকে পর্যন্ত অতি ধীরে ঈষৎ মাথা নেড়ে সায় দেওয়া!

কিন্তু হঠাৎ চোখ তোলে—চকিতে চারিদিকে চায়! কি হতাশা চোখে। এ ডাইনিং কার—তার এই রাজত্ব—কালা আদমি বেদখল করেছে!

পরক্ষণে বইয়ের পাতায় চোখ!

ডায়েরির এই সব মন্তব্য এবং বর্ণনা থেকে ব্যক্তি মানুষকে জানবার সুবিধে হয়। লেখক তার সৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে থাকেন নির্বিশেষে কিন্তু এখানে তিনি বিশেষ মানুষ। তারপর তিনি লিখেছেন:

"17.1.1948. পুতুল নাচের ইতিকথার ছায়াচিত্রের চুক্তি সই করলাম: কে. কে. প্রোডাকসনের সঙ্গে। আমিই একমাত্র খ্যাতনামা লেখক যে সিনেমার কাছে আত্মবিক্রয় করে নি। এতদিন পর যেচে এসে আমার নির্দেশ 'সস্তা করা চলবে না'

যেনে নিয়ে সিনেমা কোম্পানী চুক্তি করল। আশা করছি ছবিটা ভাল হবে। দেখা যাক।"

কিন্তু সে ছবি আর হয় নি। বোধ হয় সস্তা না করলে চলবে না এই চুক্তিতেই প্রযোজক আর এগোলেন না।

এই সময় মানিক লেনিনের লেখা পড়ছেন। লেনিনের লেখা থেকে অনেক উদ্ধৃতি নিজের ডায়েরিতে টুকে নিয়েছেন আর প্রতিদিনের সঙ্গী করে নিয়েছেন লেনিনের কথা। তার মধ্যে একটি হল :

"Learn from the masses, try to comprehend their action ; carefully study the practical experience of the struggle of the masses."

তারপর ডায়েরিতে লেখা আছে ৩০শে জানুয়ারী। সেদিনের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,

"দুর্দিন। গান্ধীজি গুলির আঘাতে নিহত।

বেলা সাড়ে বারোটা। বাথরুমে স্নান করতে ঢুকেছি। টুবলু বারান্দায় লাফাচ্ছিল। রান্নাঘরে ডাল ফুটন্ত ডাল উনান থেকে নামিয়েছে। সেই ডালে টুবলুর বাঁ পা হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত পুড়ে গেল।

সে কি দুর্ঘটনা! এতটুকু শিশুর সে কি যন্ত্রণা! মুখার্জি ডাক্তার এসে মূর্খের মত ট্যানিক এ্যাসিড তুলো দিয়ে বাঁধল!

এই যন্ত্রণা কাতর শিশু সন্তানকে নিয়ে আছি; জ্বর এসে গেছে, সন্ধ্যার পর সংবাদ এল : দিল্লীতে প্রার্থনা সভায় পিস্তলের গুলিতে গান্ধীজি নিহত। সমস্ত মনপ্রাণ যেন হায় সর্বনাশ! বলে আর্তনাদ করে আঘাতে মুহ্যমান হয়ে গেল। ওষুধে ঝিমিয়ে আছে টুবলু, মাঝে মাঝে কাতরাচ্ছে।" শিয়রে বসে স্নেহবৎসল পিতা রূপে মানিকের এখানে সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। ছেলে মেয়েদের অসুখে বিসুখে তিনি খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। বড় মেয়ের টনসিল অপারেসন হওয়ার সময়ও তার কী ব্যাকুলতা।

১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে মানিককে নানা ব্যাপারে বিব্রত থাকতে হয়। এই সম্পর্কে ২০.২.৪৮ তারিখে মানিক তার এক বন্ধুকে লিখেছেন, "গত ৮ মাসের ইতিহাস শুনবে? স্ত্রী একমাস শয্যাশায়ী ছিলেন। তার আগে সপ্তাহ দুই গিয়েছিল পারিবারিক ব্যাপারে তাঁকে ও ছেলেমেয়েকে বিহারের এক শহরে নিয়ে যেতে নিয়ে আসতে। তারপর মফঃস্বলের দু'তিনটি ছোট বড় সাহিত্য সম্মেলন। তারপর বোম্বাই প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। তারপর এই কিছুদিন হল ছোট বাচ্চাটির

একটা পা পুড়ে যাওয়ার বিপর্যয়! তা ছাড়া চলতি চাপ তো আছেই।"

এই সময় মানিক পড়ছেন Marx and Engels এর 'Literature and Art' এবং Sidney Finkeistein এর 'Art and society; Christopher Caudwell এর 'Illusion and Reality' প্রভৃতি গ্রন্থ। এ সব গ্রন্থ পড়ছেন আর ডায়েরিতে পছন্দমত উদ্ধৃতি লিখে রাখছেন।

এরপর ১৯৪৮ সালের ডায়েরি পাওয়া যায় নি। আবার তাঁর ডায়েরি পেয়েছি ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাস থেকে।

১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হল মানিকের দুটি গল্প সংকলন 'মাটির মাশুল' এবং 'ছোটবড়' এবং দুটি উপন্যাস 'চতুষ্কোণ' এবং 'ধরা বাঁধা জীবন'। 'মাটির মাশুল' গ্রন্থের প্রকাশক হল বিমলারঞ্জন প্রকাশন, মুর্শিদাবাদ, আশ্বিন, ১৩৫৫। ভূমিকায় মানিক লিখেছেন, "কয়েকটি গল্প কয়েক বছর আগে লেখা। অন্য গল্পগুলি, যেমন 'আপদ', 'বাগ্দী পাড়া দিয়ে' ইত্যাদি এই বছরের মধ্যেই লেখা।" 'ছোটবড়' গ্রন্থের প্রকাশক পূরবী পাবলিশার্স লিমিটেড। এই গল্পগুলোতে আছে যুদ্ধের বিভীষিকা, মন্বন্তরের করাল ছায়া, সাম্প্রদায়িকতার আত্মঘাতী রক্তপাত, চোরাকারবার প্রভৃতি পটভূমিকায় জীবনজয়ী সংগ্রামী মানুষের কাহিনী।

'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের প্রকাশক ডি এম. লাইব্রেরী। ভূমিকায় লেখক লিখেছেন, "রাজকুমারের মত অসংখ্য ছেলে দেখেছি। তারা নানা রকম, কিন্তু আসলে এক। রাজকুমারকে 'টাইপ' বলে ধরলে ভুল করা হবে। একজনের মধ্যে অনেককে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। এই 'অনেক' যারা, তাদের মধ্যে মূলগত মিল আছে, তাই এটা সম্ভব হল। রাজকুমার একটু বেলুনের মত ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু তাতে কিছু আসবে যাবে কি? আমার উদ্দেশ্যও তাই ছিল।" রাজকুমারের বিকৃত চিন্তাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসে আছে এক উদ্ভট প্রেমের কাহিনী।

'ধরা বাঁধা জীবন' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ কবে হয়েছিল এবং কে প্রকাশ করেছিল তা জানা যায় না। বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত 'মানিক গ্রন্থাবলী'র দ্বিতীয় ভাগে ইহা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই উপন্যাসে প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে প্রেমের প্রকাশ সম্পর্কে এক বলিষ্ঠ মতাদর্শ প্রচার করেছেন।

পরিচয় পত্রিকার সঙ্গে মানিকবাবুর যোগ বহুদিনের। সুধীন্দ্র নাথ দত্ত যখন এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখনও পরিচয়ে মানিকবাবুর 'অহিংসা' উপন্যাস ও একাধিক ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়ে তিনি এর পরিচালক বর্গেরই অন্যতম ছিলেন। "পত্রিকার শুক্রবাসরীয় আড্ডারও তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী

পাওা। বেশ কয়েকটি ছোটগল্প ছাড়াও এই সময়ে তাঁর 'জীয়ন্ত' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়ের' পাতায়।"[১]

১৩৫৪, ফাল্গুন সংখ্যা পরিচয়ে 'পাঠকগোষ্ঠীর আলোচনায়' মানিক প্রগতি সাহিত্য এবং মার্কসবাদী সাহিত্যবিচার সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন। পৌষের পরিচয়ে বিষ্ণু দে মশায়ের পত্রে যে অকারণ তিক্ততা, অসংযম এবং মার্কসীয় সাহিত্য বিচার সম্পর্কে যে ভুল ধারণা প্রকাশ পেয়েছে মানিক অতি স্পষ্ট ভাবে সেগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন। এ লেখায় শ্রেণীগত চেতনা সম্পর্কে মানিকের স্বচ্ছ ধারণার নিদর্শন পাওয়া যায়।

১৯৪৯ সালের ১৮ই জানুয়ারী কোলকাতার কলেজ স্কোয়ার এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রদের উপর পুলিশের নির্মম গুলিবর্ষণ এবং অত্যাচারে যে ছাত্র হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তারই প্রতিবাদে মানিক পরিচয়ের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখেছেন **'মানবতার বিচার'**[২]। এ বছরের মার্চ-এপ্রিল মাসে হাওড়ায় সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর যে বর্বরোচিত আক্রমণ করা হয় তার প্রতিবাদেও তিনি ১৩৫৬, বৈশাখ সংখ্যা পরিচয় পত্রিকায় লিখলেন **'সাহিত্যিক ও গুণ্ডামি'** শীর্ষক রচনা।

১৯৪৫ সালে প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের দীর্ঘ চার বছর পরে ১৯৪৯ সালে চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন হয়। তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই সংঘের অন্যতম যুগ্মসম্পাদক। এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে তিনি যে রিপোর্ট পেশ করেন তা 'প্রগতি সাহিত্য' নামে প্রবন্ধাকারে পরে তাঁর 'লেখকের কথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই প্রবন্ধে সংঘের কার্য বিবরণী যেমন আছে তেমনি আছে নানা ত্রুটি বিচ্যুতির কথা। যারা মার্কসবাদে বিশ্বাস করেন, শ্রেণী সংগ্রাম এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকায় আস্থা রাখেন তাদের পক্ষে এই আত্ম-সমালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪৮-৪৯ সালে প্রগতিশীল লেখক, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের উপর সরকারী আক্রমণ শুরু হয়। এদের বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। এঁদের অনেককে তখন বক্সায় পাঠানো হয়। মানিক তখন বিনা বিচারে শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি কর্মীদের আটক রাখার বিরুদ্ধে লিখলেন **'বক্সা ক্যাম্পে শিল্পী-সাহিত্যিক।'**[৩]

১। চিন্মোহন সেহানবীসের লেখা প্রবন্ধ, পরিচয়, পৌষ, ১৩৬৩

২। পরিচয়,মাঘ , ১৩৫৫

৩। পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৫৭।

এই বিনা বিচারে আটক রাখার আইনকে তিনি 'একপেশে স্বেচ্ছাচারিতা', শাসক ও শোষিতের মধ্যে অসৎ সম্পর্কের সুস্পষ্ট নগ্ন অভিব্যক্তি বলে মনে করেছেন। বাংলার একজন সাহিত্যিক হিসেবে তিনি এই আইন সম্পর্কে প্রশ্ন ও প্রতিকারের দাবী তুলেছেন: "সাধারণ আইনে প্রকাশ্য আদালতের বিচার যখন দেশের মানুষ আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত, তখন বিনা বিচারে আটক রাখার আইন কেন? বিদেশী শাসকের নামে রাস্তার নাম পর্যন্ত যখন অপমানজনক বিবেচিত হচ্ছে, তখন জাতীয় অপমানের প্রতীক ইংরেজের তৈরী বক্সা ক্যাম্পে বন্দীদের আটক রাখার ব্যবস্থাই বা কেন? শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিবিদেরা যখন সম্পূর্ণরূপে গণমত ও গণবিচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, গোপন কার্যকলাপের কিছুমাত্র সুযোগ সুবিধা যখন তাঁদের বিশেষ পেশায় নেই, এবং শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণটাই যখন নির্ভর করে শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিবিদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার উপর—তখন বাংলার প্রিয়তম শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি কর্মীরা বক্সা ক্যাম্পে আটক কেন?"

১৯৪৯ সালে বেরোল মানিকের মাত্র একখানি গ্রন্থ: 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। গল্প সংকলন। ১৯৪৮-৪৯ সালে বাংলা দেশে কৃষকদের 'তেভাগা' আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। সেই কারণে বড়-কমলাপুরেও দেখা দেয় পুলিশী সন্ত্রাস। মানিক নিজে গেলেন সেখানে। তারপর একদিন বেরোল 'ছোট বকুল-পুরের যাত্রী'। সন্ত্রাসের ছমছমে আবহাওয়া মূর্ত হয়ে উঠেছে এই গল্পে। এই গল্পের নামেই সংকলন গ্রন্থের নাম রাখা হলো। গ্রন্থটি প্রকাশ করেন ইন্টার ন্যাশন্যাল পাবলিশিং হাউস লিঃ।

১৯৪৯-৫০ সালে কমিউনিষ্টদের উপর সরকারী আক্রমণ তীব্রতা লাভ করে। সেই আক্রমণের ধাক্কা মানিকবাবুর গায়েও এসে লাগে। কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার অপরাধে বহু প্রকাশকের দরজা মানিকের কাছে রুদ্ধ হয়ে যায়। এমন কি সাময়িক পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যাগুলোতে তাঁর লেখার চাহিদা নেই। অথচ লেখাই মানিকের একমাত্র পেশা। আয় নেই ব্যয় আছে। যুদ্ধোত্তর পর্বে ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধিতে ব্যয়ের সীমা অনেক বেড়ে গিয়েছে। ফলে মানিককে পড়তে হলো দারুণ অর্থকষ্টে। এই অর্থাভাব জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও তাঁর কমেনি।

বসুমতী পত্রিকার সম্পাদকের নিকট লেখা এক চিঠিতে (২৭.৬.৫১) তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তখন বসুমতীর সম্পাদকের প্রস্তাব অনুসারে নতুন লেখা—কল্লোল যুগের সম্পর্কে আলোচনায় হাত দিয়েছেন, অবশ্য শেষ পর্যন্ত আর লিখতে পারেন নি। ঐ চিঠিতে মানিক লিখেছেন:

'ভেজাল' আমার এক রাত্তিরে লেখা। ঠিক ঐ ধরণের লেখা লিখতে যেন আর সাহস হয় না। আপনার প্রস্তাব আমার অন্তর স্পর্শ করেছে। 'কল্লোল যুগ' সম্পর্কিত লেখার প্রথম কিস্তী নিয়েই একেবারে হাজির হবো। শুধু একটা কিস্তী নিয়ে নয়, বেশ অনেকটা লেখা। কোন কারণেই কোন মাসে লেখা বন্ধ রেখে যাতে পাঠক সমাজ ও আপনাদের কাছে অপরাধী হতে না হয়। তার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত থাকবো। কিন্তু বাংলা দেশে সাহিত্য সাধনায় কত যে অভাবনীয় বাধা-বিঘ্ন, তার কিছু কিছু আপনি তো জানেন। কেবল দারিদ্র্য নয়,—সে তো হিসাবের মধ্যে ধরে নিয়ে মেনে নেওয়াই হয়েছে। সহযোগিতারও অভাব বটে। পয়সাওলা কাগজওয়ালারা আমাকে আবার এক রকম বয়কট করেছেন। আপনাদের মত কিছু মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাই রক্ষা এ যাত্রায়।" (মাসিক বসুমতী পৌষ, ১৩৬৩)

॥ ২০ ॥

১৩৫৭ সালেও মানিকের একমাত্র নতুন গ্রন্থ 'জীয়ন্ত' উপন্যাস প্রকাশিত হলো। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। এই বছরে বেঙ্গল পাবলিশার্স তাদের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সিরিজে মানিকের 'শ্রেষ্ঠ গল্প'ও প্রকাশ করেন। বিভিন্ন গল্প সংকলন থেকে আঠারোটি গল্প নিয়ে এই সংকলন সম্পাদিত করেন অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য। তাছাড়া এই বছরেই প্রকাশিত হলো বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে 'মানিক গ্রন্থাবলী' প্রথম ভাগ। এই গ্রন্থাবলীতে আছে দুটি উপন্যাস 'জননী' এবং 'চতুষ্কোণ' এবং দুটি গল্প সংকলন গ্রন্থ 'হলুদপোড়া' এবং 'আজকাল পরশুর গল্প'।

গত কয়েক বছর ধরে 'মার্কসবাদী' ও 'পরিচয়' পত্রিকায় 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক প্রকাশিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বিতর্কিত আলোচনায় যোগ দেন। এবং তিনি পৌষ, ১৩৫৬ সংখ্যা পরিচয়ে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধে লেখেন পরে আবার শ্রাবণ, ১৩৫৭ সংখ্যা পরিচয়ে ঐ প্রবন্ধ তিনি প্রত্যাহার করে নেন। তর্কবিতর্কে মানিকের চিরকাল অনীহা ছিল। ব্যক্তিগত আক্রমণ করাকে তিনি খুব নিন্দনীয় মনে করতেন। তিনি সব সময় নিজের বক্তব্যকে খুব স্পষ্ট অথচ স্বচ্ছ রাখতেন। তার লেখায় কখনো কেতাবী পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়নি। তিনি মার্কসবাদকে কেবল বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করেন নি। জীবন দিয়েই উপলব্ধি করেছিলেন। শ্রমিক

শ্রেণীকেই তিনি ষোল আনা বিপ্লবী এবং সেরা মানুষ বলে অভিনন্দিত করেছেন।

১৩৫৭ সালে বিশ্বশান্তি আন্দোলন মুখর হয়ে ওঠে। আণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ নিষিদ্ধ করার দাবী নিয়ে স্টকহল্‌ম্‌ শান্তি আবেদনের স্বপক্ষে লক্ষ লক্ষ স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গেও প্রায় দুই লক্ষ লোক এতে স্বাক্ষর দেন। এই আবেদনপত্রের স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন বসু প্রমুখ বাংলাদেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্যিক-শিল্পীরা ছিলেন।

পরিচয়ের সম্পাদকমণ্ডলী জনসাধারণের ব্যাপক হত্যালীলা ও আক্রমণের হাতিয়ার হিসেবে আণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ বিনাশর্তে নিষিদ্ধ করার এবং তার জন্য কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করার দাবী জানিয়ে এই বছরের শারদীয়া সংখ্যায় প্রত্যেকটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের নিকট এই আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। মানিক তখন কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিটি কাজেই সোৎসাহে যোগ দিতেন।

বাংলাদেশে তখন সাংস্কৃতিক আন্দোলনও খুব জোরদার। ১৯৫০ সালের ১৩ই অক্টোবর শতাধিক প্রতিনিধিসহ বরানগরে কোলকাতার প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের এক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি তখন এক গুরুতর সংকটের সম্মুখীন। একদিকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চিরসঙ্গী দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতিতে এ দেশের জাতীয় জীবন বিপর্যস্ত অন্যদিকে মানুষের বাঁচার দাবী বেয়নেটের ডগায় ছিন্নভিন্ন, বুটের তলায় নিষ্পেষিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা। মজুর-কৃষক মধ্যবিত্তের স্বপ্নসাধ রক্তনিমজ্জিত, লাঞ্ছিত। মনুষ্যত্বের এই অবমাননায় চারিদিকে বিক্ষোভের ঝড় উঠেছে। সাহিত্য-শিল্পে এই সব সামাজিক সমস্যার সার্থক রূপায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্যই এই সম্মেলন। সম্মেলনে তারা নয় দফা ঘোষণা পত্র স্থির করেছেন। তবে সভাপতি সহ অনেকেই স্বীকার করেন সাহিত্যে শ্লোগান-সর্বস্বতা পরিহার করে শিল্পবস্তু ও আঙ্গিকের সমীকরণ করা প্রয়োজন। সেজন্য কেবলমাত্র পুঁথিগত রাজনীতি এবং শিল্পনীতিকে আয়ত্ত করলে চলবে না, বহুবিস্তৃত জীবনধারার সঙ্গে, জনজীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গে শিল্পী-সাহিত্যিকদের একাত্মতা অনুভব করতে হবে।

১৯৫১ সালের ১লা জানুয়ারী পরিচয়ের পক্ষ থেকে বিনাবিচারে আটক সন্ত-

মুক্ত সাহিত্যিক রাজবন্দীদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। প্রগতিশীল লেখকদের তরফ থেকে গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও মুক্ত সাহিত্যিকদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

১৯৫১ সালের শেষদিকে প্রকাশক এবং সাময়িক পত্রিকার রুদ্ধ দরজা আবার মানিকের জন্য খুলে যায়। তবে মানিকের ভিন্ন মতের জন্য কাগজের সমালোচকরা তাঁর সাহিত্যের প্রতিও বিরাগ ভাজন হয়ে আছেন। এ জন্য ক্ষতিকর সমালোচনা লিখতেও তাঁরা পেছ পা হন না। মাসিক বসুমতীর সম্পাদকের নিকট এই মত জানিয়ে তিনি ২৪.৮.৫১ তারিখে এক চিঠি দিয়েছেন।

১৯৫২ সালে মানিকের আর্থিক দুরাবস্থা চরমে উঠে। তিনি এ দুঃসময়কে ঠেকিয়ে রাখার জন্য একটি পারিবারিক ত্রৈমাসিক প্ল্যান করেন। তিনি নিজেই ডায়েরিতে লিখেছেন, "কঠোর চেষ্টার দ্বারা এই তিন মাসে (মে, জুন, জুলাই, ১৯৫২) বর্তমান অবস্থা অনেকটা বদলাইয়া না দিলে সর্বনাশ ঠেকানো যাইবে না।" অবশ্য এই প্ল্যান কতখানি কার্যকরী হয়েছে তা বলা শক্ত।

এ বছরেই মানিকের প্রকাশিত হল চারখানি উপন্যাস : পেশা, স্বাধীনতার স্বাদ, সোনার চেয়ে দামী এবং ছন্দপতন। পেশা উপন্যাসের প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের প্রথমে নামকরণ করেছিলেন 'নবীন চিকিৎসক' পরে গ্রন্থ প্রকাশের সময়ে নাম বদলে রাখেন 'পেশা'। ডাক্তারি পেশার মধ্যেও যে গলদ এবং অনিয়ম রয়েছে এই উপন্যাসে তা বিবৃত হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে মানিকের লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সমাজ সচেতনতা। তাঁর প্রতিটি গল্প উপন্যাস এক একটি সামাজিক সমস্যাকে রূপায়িত করে তোলে। স্বাধীনতা উত্তরকালে শোষিত শ্রেণীগুলি একটা শ্বাসরোধকারী সামাজিক অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রতিপক্ষ শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত।" সমাজজীবনের এই বাস্তবতাকে মানিক অসীম ধৈর্যের সঙ্গে রূপায়িত করে চলেছেন। জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশকে বাছাই করে গল্প উপন্যাসে দিয়ে চলেছেন শিল্পরূপ। এই সব গল্প উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন সমাজ জীবনে বিরাট ভাঙ্গন শুরু হয়েছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলছে পুনর্গঠনের কাজ।

এই কাজ করতে গিয়ে তিনি নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এবং তুলে ধরতে চেয়েছেন দীনবন্ধু-মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যকে। প্রতিবাদী সাহিত্যে মানিক সৃষ্টি করলেন নতুন আদর্শ, নতুন সমাজ ও শ্রেণী চেতনা।

মানিকের এ কাজকে অনেকে ভাল চোখে দেখেন নি। তাঁর সমকালীন উত্তর তিরিশের লেখকরা অনেকেই যেখানে আত্মজীবনী, সাধুজীবনী প্রভৃতি স্মৃতি রোমন্থনে ব্যস্ত তখন মানিকই একমাত্র লেখক যিনি সমাজের গতি এবং প্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিত্য নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। সমাজের এত বিচিত্র সমস্যার রূপায়ন একমাত্র মানিক প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। সাহিত্যে বিচিত্রতা সৃষ্টির দিক দিয়ে তিনি অসাধারণ।)

'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসের প্রকাশক হলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। লেখকের কথায় মানিক লিখেছেন, "এই উপন্যাসটি ১৩৫৩-৫৭ সালে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বইখানা লেখা হয়েছিল তিন বছর আগে, শেষ হয় '৫৭-এর গোড়ার দিকে।" বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশের সময় এই উপন্যাসের নাম ছিল 'নগরবাসী'। পরে গ্রন্থাকারে পরিবর্তিত হয়ে হল 'স্বাধীনতার স্বাদ'।

১৯৪৭ সালে ভারত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব বছরে কোলকাতায়, বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র এবং বিহারে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। স্বাধীনতার স্বাদ উপন্যাসটি সেই দাঙ্গার পটভূমিকায় একটি শ্রেণী সচেতন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। সেজন্যই বোধ হয় মানিক "সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসাধারণকে এই বইখানা উৎসর্গ" করেছেন, কারণ, "জনসাধারণই মানবতার প্রতীক।" এই উপন্যাসে মানিকের কাব্য রচনার আরেকটি নিদর্শন পাওয়া যায়।

'সোনার চেয়ে দামী' দুই পর্বের উপন্যাস। প্রথম পর্বের নাম 'বেকার'। এই পর্বের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ সালে। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। একটি মধ্যবিত্ত পরিবার সংগ্রামী জীবনের সংস্পর্শে এসে কি করে নিজেদের বিকারমুক্ত করল তারই কাহিনী আছে এ উপন্যাসে।

'ছন্দপতন' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশের তারিখ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮। প্রকাশক, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড। ছন্দপতন একজন কবির আত্মপ্রতীতির ইতিবৃত্ত। ছন্দপতন নব কবির জীবনবোধের কাব্য। তার আত্মসমালোচনার কাব্যিক প্রকাশ। কবি কি করে মানুষের প্রাণের ভাষা খুঁজে পেলেন এতে আছে তারই চমৎকার বিবরণ। এ যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজেরই কথা। মানিক প্রথমে এই গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন 'কবির জবানবন্দী' পরে নাম বদলে দিলেন 'ছন্দপতন'।

১৯৫১ সালে 'পূর্বাশা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর অগ্রজ

ঔপন্যাসিকদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন "তাঁরা যদি দয়া করে যাঁর যাঁর উপন্যাস সম্পর্কে স্বীয় ধারণা পাঠকের অবগতির জন্য পূর্বাশার পৃষ্ঠায় জানান।" এই অনুরোধে মানিক ১৩৫৮-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পূর্বাশায় তাঁর 'উপন্যাসের কথা' নামে প্রবন্ধটি পাঠান। প্রবন্ধের সঙ্গে অবশ্য তিনি সঞ্জয়বাবুকে 'মজুরি'র কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। সঞ্জয়বাবু মানিকের এই 'ভয়াবহ মজতুরিতে' ব্যথিত হয়েও প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছিলেন। এই ব্যথিত হওয়ার কারণ মানিক এবং সঞ্জয়বাবুর চিন্তাধারা স্বতন্ত্র।

মানিক কখনো বিনা পারিশ্রমিকে কোথাও লিখতেন না। পারিশ্রমিক যাই হোক কিছু না দিলে তিনি লেখা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ তিনি মনে করতেন, 'লেখক নিছক কলম পেশা মজুর'। অতএব লেখকের শ্রমের মূল্য না নিয়ে তিনি ছাড়তেন না।

তাছাড়া তিনি তখন খুবই অর্থাভাবে ছিলেন। তার হিসাবের খাতা থেকে দেখা যায় তিনি পূজা পার্বণের জন্য United Bank-এর ম্যানেজারের সাহায্যে টাকায় মাসে ২ পয়সা সুদে ইয়ারিং বাঁধা রেখে ৩০৲ টাকা ধার করে এনেছেন।

যাই হোক এ প্রবন্ধে মানিক নিজের প্রথম গল্প লেখার কাহিনী বিবৃত করেছেন। তা ছাড়া তিনি কেন উপন্যাস লিখেছেন তার কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আমার বিজ্ঞান-প্রীতি, জাত বৈজ্ঞানিকের কেন-ধর্মী জীবন-জিজ্ঞাসা, ছাত্র বয়সেই লেখকের দায়িত্বকে অবিশ্বাস্য গুরুত্ব দিয়ে ছিনিমিনি লেখা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি কতগুলি লক্ষণে ছিল সুস্পষ্ট নির্দেশ যে, সাধ করলে কবি হয়তো আমি হতেও পারি ; কিন্তু ঔপন্যাসিক হওয়াটাই আমার পক্ষে হবে উচিত ও স্বাভাবিক।" কারণ তিনি মনে করতেন, "সরাসরি বিজ্ঞানের কিছু শিক্ষা পাওয়া নয়, উপন্যাস লেখার জন্য দরকার খানিকটা বৈজ্ঞানিক বিচার বোধ।...প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান-প্রভাবিত মন উপন্যাস লেখার জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন যুগের যে কোন উপন্যাস ধরে বিশ্লেষণ করলে লেখকের এই বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে এই বিশেষ ধরণের মানসিক সমতা খুঁজে পাওয়া যাবে"।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন উপন্যাসের জন্য প্রয়োজন বাস্তববোধ এবং যুক্তিবোধ। তর্কের খাতিরে লেখা তার প্রথম গল্প 'অতসীমামীর' মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছিল মানিকের ঔপন্যাসিকের ধাত। তিনি লিখেছেন, "উপন্যাসে বাস্তবের ক্ষেত্র হয় আরও ব্যাপক ও প্রসারিত—অনেক রকমের অনেক মানুষকে তাদের বাস্তব জীবন

ও পরিবেশ সমেত টেনে এনে কাহিনী ফাঁদতে হয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই কবিতার চেয়ে উপন্যাসে ভাববাদী কল্পনার স্থান বস্তুবাদী কল্পনা অনেক সহজে ও দৃঢ় ভাবে দখল করেছে।"

১৯৫২ সালে প্রকাশিত হল মানিকের চারটি নতুন উপন্যাস "সোনার চেয়ে দামী" (২য় পর্ব), 'ইতিকথার পরের কথা', 'পাশাপাশি' এবং 'সার্বজনীন'। এ ছাড়া এ বছরে প্রকাশিত হয়েছে বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে মানিক গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় ভাগ। এতে আছে দুটি উপন্যাস 'অহিংসা' ও 'ধরা বাঁধা জীবন' এবং একটি সংকলন গ্রন্থ 'ছোট বড়'।

'সোনার চেয়ে দামী' দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৮-এর ফাল্গুন মাসে। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। লেখকের কথায় মানিক লিখেছেন, "পরিকল্পনা ছিল প্রথম খণ্ডের মত তিনটি খণ্ডে সোনার চেয়ে দামী কিছুটার দাম কষব। দ্বিতীয় খণ্ড লিখবার সময় দেখলাম তৃতীয় খণ্ডকে পৃথক করা যায় না।

প্রথম খণ্ডের চেয়ে তাই দ্বিতীয় খণ্ড অনেক বড় হয়ে গেল। বিজ্ঞাপিত ডাক নাম 'মালিক' হয়ে গেল 'আপোষ'।"

'ইতিকথার পরের কথা' (প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫৯) প্রকাশ করেন বেঙ্গল পাবলিশার্স। গ্রন্থের প্রথমে মানিক লিখেছেন, "এই উপন্যাসটি 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সময় অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা হয়েছে।" পুতুল নাচের ইতিকথায় আছে ক্ষয়িষ্ণু এক পল্লী সমাজের কাহিনী। ইতিকথার পরের কথায় আছে সেই সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের কাহিনী।

'ইতিকথার পরের কথা'র পরের মাসেই বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশ করল মানিকের আরেকটি উপন্যাস 'পাশাপাশি'। প্রথমে মানিক এই গ্রন্থের নাম রেখেছিলেন 'হৃদয়হীন'। গ্রন্থ প্রকাশের সময় নাম গেল বদলে। রোমান্টিক রিয়ালিজমের উপর ভিত্তি করে এই উপন্যাসে আছে এক আদর্শবাদী যুবকের কাহিনী। তার কাছে হৃদয়াবেগের চেয়ে আদর্শই হোল শ্রেয়।

'পাশাপাশি'র সঙ্গে প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হল মানিকের আরেকটি উপন্যাস 'সার্বজনীন'। প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরী। এই উপন্যাসে লেখকের কথায় মানিক লিখেছেন,—

"এই উপন্যাসের পূর্ববঙ্গত্যাগী চরিত্রগুলির মুখে তাদের কথ্য ভাষা, এমন কি, বিশেষ টানটুকু দেবারও চেষ্টা করিনি। তার কারণ, এই উপন্যাসে আরও অনেক

প্রধান চরিত্র আছে যারা ও ভাষায় কথা বলে না, যাদের কথায় ও রকম টান নেই। এ ক্ষেত্রে কতকগুলি চরিত্রের মুখে স্বাভাবিক আঞ্চলিক ভাষা বা টান দিলে চরিত্রগুলির মধ্যে একটা ভাগাভাগি এনে দেওয়া হত।

কোন কাহিনীতে দু'চারটি বিশেষ চরিত্রকে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলানো যায়—তাতে চরিত্রকটির বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট ও স্বাভাবিক হয়। বিশেষ কাহিনীতে বিশেষ প্রয়োজনে ছাড়া চরিত্রগুলিকে মোট দুটি ভাগ করে দু'রকম আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলানো উচিত নয়—বিশেষ করে চরিত্রগুলি যদি একই শ্রেণীর মানুষ হয়।

আমার এই উপন্যাসে কোন চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষা আমদানীর কোনই প্রয়োজন নেই। এই কাহিনীর মূল ভিত্তি হল সমাজের ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমা ভেঙ্গে গিয়ে সার্বজনীন ব্যাপকতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার যে নতুন গতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সমাজের কোন শ্রেণীতে ভাঙ্গন ধরার অর্থ অনেকে মনে করেন মানুষগুলিরও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে শেষ হয়ে যাওয়া—আসলে মানুষগুলির জীবনও নতুন দিকে গতি পায়। নতুন রূপ গ্রহণ করতে থাকে। সমাজ জীবনে ভাঙ্গন ধরার সঙ্গে গড়ন চলাও থাকবেই।

কাজেই এই কাহিনীতে কতগুলি চরিত্রকে আরও বেশী বাস্তব করার উদ্দেশ্যে তাদের মুখে আঞ্চলিক ভাষা দান করলে চরিত্রগুলির পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে একটা অকারণ ও নিষ্প্রয়োজনীয় ব্যবধান সৃষ্টি করা হত, কাহিনী ব্যাহত হত।

এই কৈফিয়ৎ দেবার কারণটা বলি। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে সকলেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছে। অন্য বইয়ে এ পর্যন্ত যত পূর্ববঙ্গীয় চরিত্র এনেছি সকলকেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলিয়েছি। এই কাহিনীতে সর্বপ্রথম ওরকম চরিত্রের মুখে সাহিত্যের চলতি কথা ভাষা বসালাম।"

সার্বজনীন মানিকের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ভেঙ্গে সার্বজনীন ব্যাপকতার মধ্যেই আত্মপ্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ উপায় সম্ভব। এই উপন্যাসে উদ্বাস্তু সমস্যার এক বাস্তব চিত্রনের মধ্যে মানিক তা সুন্দর রূপায়িত করেছেন। বাঙলা সাহিত্যে উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে অনেকেই গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন কিন্তু মানিকের এই বলিষ্ঠ প্রত্যয় আর কোন লেখকের মধ্যে পাওয়া যায় না।

১৯৫২ সালের অক্টোবরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি তখন নানা সাংস্কৃতিক সভা করে বেড়ান। কিন্তু অসুস্থতার জন্য তাঁকে ঘরে আটকা থাকতে হয়। এই সময় তার পারিবারিক শান্তিও নষ্ট হয়। তিনি তাঁর ডায়েরির এক জায়গায়

(4.10.52) লিখেছেন, "ডলির অন্ধ স্বার্থপরতায় অন্য সব চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ায় নূতন ব্যবস্থার সূত্রপাত।" মনে হয় এতদিন তাঁর সুরাপান বন্ধ ছিল। এই সময় থেকে আবার তার মাত্রা বেড়ে যায়। এই বছরেই ১৪ই অক্টোবর সন্ধ্যায় (বোধ হয় কালী পূজার সময়) বাজী পোড়াতে গিয়ে তাঁর আঙ্গুল ঝলসে যায়। সহজ মানুষ মানিকের সুন্দর পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

শরীর ভাল নয়, কাজে মন বসে না। এমন অবস্থায় মানিক সারাদিন cross word নিয়ে কাটিয়ে দিতেন। মানিক ছিলেন সাধারণের মত। রোজ নিজে বাজার করতেন। একদিন (20 12 1952) বাজারে গিয়ে দেখেন ইলিস মাছের দাম বেড়ে গেছে। তার কাছে মনে হোল এ এক দুর্ঘটনা। আজকের মানুষের পক্ষে হয়ত অবিশ্বাস্য ঠেকবে। মানিক লিখেছেন, "ইলিশ ১৲ সের। কী কারসাজি। সামনের বছর ইলিশের দুর্ভিক্ষ"।

১৯৫২ সালে রামপুর হাট থেকে প্রকাশিত পত্রিকা "বীরভূমের ডাক"-এ জনৈক পাঠকের প্রতি ছোট গল্প লেখা সম্পর্কে মানিকের এক নির্দেশ ছাপা হয়েছে। এই পত্রিকা সংগ্রহ করতে পারলে মানিকের ছোট গল্পের আঙ্গিক সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট মত পাওয়া যেত। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি।

॥ ২১ ॥

১৯৫৩ সালের প্রথমেই মানিকের চিহ্ন উপন্যাসের চেক অনুবাদের জন্য চুক্তি হোল। ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর তখন বিশ্বজোড়া খ্যাতি। Czechoslovak Cultural Festival-এ মানিকের অবদান এবং সাহায্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে নিউ দিল্লীর চেক এমব্যাসীর ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষ ১২-৩-৫১ তারিখে চিঠি দিয়েছেন। মানিকের পদ্মানদীর মাঝি এবং চিহ্ন উপন্যাস চেক ভাষায় অনুবাদ করেন সম্ভবত কবি বিমল ঘোষের এক আত্মীয় অজিত মজুমদার। কিন্তু ঘরে তখন তাঁর অচল অবস্থা। এমন দিন গিয়েছে তিনি দুমাইল হেঁটে গিয়েছেন। অনভ্যাসের দরুণ ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু তাহলে তো চলবে না। তাঁর অনেক কাজ। লেখার জন্য অতিরিক্ত খাটুনি আছে, আর আছে সাহিত্য ও রাজনীতির জন্য বহু সভাসমিতি। শরীর যত ভেঙ্গে পড়ে তত তিনি মদের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। এ সব কথা তিনি নিজের ডায়েরিতে লিখে গিয়েছেন। 12.8.53 তারিখে তিনি লিখেছেন "কাল সংযম অভ্যাস করায়

আজ শরীর খুব ভাল—কিন্তু সংযমে হয় না; খাটুনি না কমালে সংযমের সাধ্য হবে না।" শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। এদিকে অর্থাভাবও তীব্র হচ্ছে। জিনিষপত্র বাঁধা দিয়ে টাকা আনছেন। তার জন্য অযথা বহু সুদ গুণতে হয়। তিনি নিজেই মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়ে যান। 19.9.53 তারিখে লিখেছেন, "৫০ টাকায় বাঁধা রেখে গোষ্ঠর কাছে ১১ মাসে সুদ গুণলাম ২৬৸৵০। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শুনে চটে গেছে।"

মানিক ছিলেন খুব রগচটা। একটুতেই তিনি খুব রেগে যেতেন। তার জন্য অনেক সময় নিজেকেই কষ্ট পেতে হোত। একটি দিনের ঘটনা (৮-১-৫৩) তিনি লিখে রেখেছেন, "সারাদিন বর্ষা—কাল শ্লিপে লিখেছিলাম ডিম দোকানের টাকা আজ দেব—বর্ষা বাদলে নিজে না গিয়ে শ্লিপ দিয়ে খোকনকে পাঠালাম —টাকা ছাড়া মিলবে না। ছাতি মাথায় সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ১৮৵০ মিটিয়ে দিয়ে মল্লিক কলোনী থেকে ডিম নিয়ে এলাম।"

আরেকটি ঘটনা। তার 'সহর বাসের ইতিকথা'র দ্বিতীয় সংস্করণ নিয়ে ডি. এম. লাইব্রেরীর লোকেদের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে এরা ছোট লোকামি করছে। তাই রেগে সঙ্গে সঙ্গে বইখানা দিয়ে এলেন বেঙ্গল পাবলিশার্স'কে।

এই বছরেই ৫ই মার্চ জোসেফ স্তালিন মারা যান। এ সম্পর্কে মানিক নিজের ডায়েরিতে লিখেছেন, "6.3.53, কমরেড স্তালিন কাল রাত্রি ৯.২০ মি. মারা গেছেন—সকালে স্বাধীনতায় খবর পাইনি—বেলা ৮টা নাগাদ রেডিওতে খবর শুনলাম বিকালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সভা—সবার মুখ ম্লান—কিন্তু মৌন দৃঢ়তা—"

৬ঠা এপ্রিল মহাবোধি সোসাইটি হলে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ কর্তৃক আহূত সভায় সভাপতিত্ব করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মহান স্তালিনের মৃত্যুতে বাংলার সাহিত্যিকরা তাঁহাকে অন্তরের গভীরতম দেশ থেকে শ্রদ্ধা জানায়।

এই সভায় সভাপতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "কেহ কেহ একথা বলিতে চেষ্টা করেন, সাহিত্যে স্তালিন নীতি গ্রহণ করিলে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, তাঁহারা স্তালিনের শিক্ষার বিপরীত কথাই বলেন। সমস্ত জাতি তাঁহার নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশের জন্য স্তালিন সাহিত্য নীতি গ্রহণ করিবে।" (স্বাধীনতা, ৫ই এপ্রিল, ১৯৫৩।)

স্তালিনের মৃত্যুতে 'পরিচয়' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা (চৈত্র, ১৩৫৯) বের হয়। মানিক এই সংখ্যায় 'মহামানব স্তালিন' শীর্ষক একটি রচনা লেখেন।

গল্পের উপাদান এবং সংকেত কম-বেশী থাকে।

কোন কোন গল্পেও আবার উপন্যাসের বীজ থাকে। গল্প লিখে উপন্যাসের ইঙ্গিত পেয়ে উপন্যাসও আমি লিখেছি—গল্পটি না লিখলে উপন্যাসের পরিকল্পনা হয়তো কোনদিনই আমার মনে আসত না।"

"গল্প কেমন হবে সেটা আলাদা প্রশ্ন। আলাদা ভাবে গল্প ভেবে নিয়ে লিখলেই যে গল্প উৎরে যাবে, এমন তো কোন নিয়ম নেই।"

"গতবারের 'শারদীয়া যুগান্তরে'র 'লেভেল ক্রসিং' পরিচয়ের 'শিল্পী' ইত্যাদি গল্প 'আরোগ্য' উপন্যাস থেকে নেওয়া, কিছু অদল বদল কাটা ছেঁড়া জোড়া দেওয়া ঘষা মাজা করতে হয়েছিল।

গল্পগুলি কেমন হয়েছে বলার অধিকারী আমি নই। কিন্তু ও গুলি যে গল্প হয়েছে এবং আমার আর দশটা সাধারণ গল্পের চেয়ে বাজে হয়নি একথা জোর গলাতেই বলতে পারি। সুতরাং ফাঁকি দিয়েছি এ অভিযোগ তোলা যাবে না।"—এই উক্তির মধ্যে গল্প উপন্যাসের আঙ্গিক সম্পর্কে নতুন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

নাগপাশ (প্রথম প্রকাশ নববর্ষ, ১৩৬০) প্রকাশ করে সাহিত্য জগৎ এবং পরিবেশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। এ উপন্যাস কতকগুলো বেকার উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের জটিল জীবনাবর্ত। এই উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে যুগান্তর পত্রিকা লিখেছেন, "সমাজ দর্শনের সঙ্গে জীবন দর্শনের একটি নির্লিপ্ত বলিষ্ঠ প্রায় নির্মম ভঙ্গী এই উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলিকে অসাধারণ করিয়া রাখিয়াছে।"

চালচলন উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, আষাঢ়, ১৩৬০। প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরী। মধ্যবিত্ত জীবনের জটিল চালচলনের কাহিনী।

এ বছরের মহালয়ায় প্রকাশিত হল **'তেইশ বছর আগে পরে'** উপন্যাস। প্রকাশক ক্যালকাটা পাবলিশার্স। এ উপন্যাসের আরম্ভ মানিকের নিজের কথা দিয়ে। তিনি লিখেছেন,

"তেইশ বছর আগে ছাত্র জীবনে একটি করুণ কাহিনী রচনা করেছিলাম। 'অতসীমামী' নিয়ে গল্প লেখা শুরু করার পর এটি আমার দ্বিতীয় লেখা। কাহিনীটি প্রকাশিত হয়েছিল বিচিত্রায় (ব্যথার পূজা নামে)। সম্পাদকেরা নতুন লেখকের রসালো গল্পও স্বেচ্ছায় খুশী হয়ে ছাপেন বন্ধুদের সঙ্গে বাজী রেখে এটি প্রমাণ করার জন্য লেখা 'অতসীমামী' বার হবার পর বিচিত্রা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় উপেনদা'র তাগিদ আর উৎসাহেই দু'নম্বর কাহিনীটি লেখা হয়।

'অতসীমামী'ও করুণ রসে ফেনানো কাহিনী। পরে এই কাহিনীটির নাম দিয়ে গল্প সংকলন বার করতে আমার দ্বিধা হয়নি। কারণ, রস যাই থাক, যতই রোমান্টিক হোক, ওটা ছিল সম্পূর্ণ গল্প। ওই কাহিনী-সংকলনের মধ্যে 'অতসীমামী'র পরেই 'ব্যথার পূজা'কে ঠাঁই দেবার লোভ সামলাতে নিজের সঙ্গে কি লড়াইটাই করতে হয়েছিল অনভিজ্ঞ তরুণ লেখক আমাকে!

এতো গল্প নয়। এযে অসম্পূর্ণ কাহিনী। মাসিকের পাতায় জীবনের খণ্ডিত একপেশে অসম্পূর্ণ কাহিনী ছাপানোর ছেলেমানুষির জের তো গল্প-সংকলনে টানা চলে না! কাহিনীটিকে সম্পূর্ণতা দেবার দায়িত্বই কেবল নয়, বাস্তবকে ফাঁকি দিয়ে আর সত্যকে আড়ালে রেখে কিভাবে ফেনিল ভাবালুতার গল্প লেখা যায় সেটা দেখিয়ে দিয়ে সাহিত্যে 'ব্যথার পূজা'র নজির বাতিল করার দায়িত্বও আজ তেইশ বছর পরে পালন করছি।

দু'একটি সামান্য ভুল ত্রুটি সংশোধন করে বিচিত্রায় প্রকাশিত অসম্পূর্ণ কাহিনীটি অবিকল তুলে দিয়ে আমাদের উপন্যাস আরম্ভ করা যাক :"

মানিক লিখেছেন এ এক বন্ধুর জীবনের কাহিনী। বন্ধু বলতে যা বোঝায় মানিকের জীবনে সে রকম কোন বন্ধুর সন্ধান পাওয়া যায়নি। মানিক নিজেও তার কোন সূত্র রেখে যান নি।

এ গল্পের নায়কের পরিণতির সঙ্গে মানিকের অনেক মিল আছে। এ কাহিনীর নায়ক জগদীশ সাধু। সে তার নিজের প্রেমিকাকে খুন করেছে, খুন করেছে তার ভালবাসার মানুষকে। তারপর এক জঙ্গলে এসে আশ্রম খুলে রয়েছে। দিনের বেলায় সে সাধু, রাতে সে আকণ্ঠ মদ খায় আর নিজের জীবনগ্রাসী ভালোবাসাকে ভুলতে চায়। শেষকালে হঠাৎ সে ড্রিঙ্ক বন্ধ করে দেয়। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে "ডিলিরিয়াম ট্রেমেন্স। বেশী ড্রিঙ্ক করলে হয়, হঠাৎ ড্রিঙ্ক বন্ধ করলেও এ রকম হয়।" তারপর জগদীশকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল মদ ছাড়বার জন্য। মানিকেরও শেষে ডিলিরিয়াম ট্রেমেন্স হয়েছিল। এবং মদ ছাড়াবার জন্য হাসপাতালেও যেতে হয়েছিল।

ক্যালকাটা পাবলিশার্স ১৯৫৩ সালের মে মাসে (বৈশাখ, ১৩৬০) প্রকাশ করলেন 'ফেরিওয়ালা' গল্প সংকলন গ্রন্থ। লেখকের নিবেদনে মানিক লিখেছেন, "গত দু'তিন বছর ধরে গল্পগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা কিন্তু গল্পগুলির মধ্যে সমসাময়িক জীবনের মূল-সূত্রের একটি যোগাযোগ আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমি সে ভাবেই গল্পগুলি বাছাই করেছি। অবশ্য এ বিচার পাঠকপাঠিকা এবং সমালোচকের। আমি কেবল এই সংকলনটির জন্য গল্প বাছাই করার নীতির কথাটা উল্লেখ করলাম।”

এ বছরে মানিকের দুটি রচনা প্রকাশিত হয়: ‘লেখকের সমস্যা’ এবং ‘সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ’। ‘চতুষ্কোণ’, ১৩৬০, আষাঢ় পত্রিকায় ‘সাহিত্যিকের জীবিকা’ নামে যে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাহাই পরে ‘লেখকের সমস্যা’ নামে ‘লেখকের কথা’ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে মানিক গল্প উপন্যাসের লেখক লেখিকার জীবিকার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে মানিকের মূল বক্তব্য:

“যে সমাজে লেখকের শ্রমের মূল্য দেবার ব্যবস্থা নেই, সে সমাজে লেখাকে পেশা করার অর্থ শুধু কলম চালিয়ে লেখার শ্রমটুকু পণ্য করা। জীবিকার জন্য লেখার শ্রমটার উপর নির্ভর করলে স্বভাবতঃই এই শ্রমটাই প্রধান হয়ে উঠবে, সাধনার শ্রমটা গুরুত্ব হারাবে।” কারণ, বাংলা সাময়িক পত্রের সামান্য দক্ষিণা এবং বই বিক্রীর স্বল্প আয়ে তাঁর চলে না। সেজন্য তাঁকে অনেকগুলি কাগজে এবং অনেক বই লিখতে হয়। তার ফল মারাত্মক হয়। নতুন নতুন চিন্তা ও অভিজ্ঞতার পুঁজি বাড়াবার তাঁর অবসর কম। পাঠক পাঠিকার রুচি অনুযায়ী লিখতে গিয়ে তাকে পাঁচমেশালি লিখতে হয়। ফলে লেখকের স্বাধীনতাও নষ্ট হয়ে যায়।

এ তো মানিকের নিজের কথা। শুধু লিখে জীবিকা-নির্বাহ করার জন্যই তাঁকে বহু লিখতে হয়েছে। অনেক কাগজে লিখতে হয়েছে। বহু ক্ষণজীবী পত্রিকায় তিনি লিখেছেন বলে তার অনেক লেখা সাহিত্যের আসর থেকে হারিয়ে গিয়েছে। সেগুলো খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ নিবন্ধটি বেরিয়েছিল নতুন সাহিত্য, ভাদ্র, ১৩৬০ পত্রিকায় একটি সমালোচনার জবাবে। নতুন সাহিত্য চৈত্র, ১৩৫৯ পত্রিকায় অচ্যুত গোস্বামীর ‘অনাগতের প্রতীক্ষায়’ প্রবন্ধে মানিকবাবুর সাহিত্য সম্পর্কে যে সমালোচনা আছে সে বিষয়ে ‘নতুন সাহিত্য’ পত্রিকার সম্পাদক মানিকের মতামত চেয়ে অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন। এই নিবন্ধটি সেই অনুরোধের ফল। এই প্রবন্ধে তিনি লেখককে, সাহিত্যের সার্থকতার নিরিখ কী, সাহিত্যের বাস্তবতা, আঙ্গিক বিচার প্রভৃতি বিষয়ে অচ্যুতবাবুর ভ্রমাত্মক বিচার সুন্দর বিশ্লেষণ এবং যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এ ছাড়া মানিক এ বারের শারদীয়া বসুমতীতে লিখেছেন 'সাহিত্যের কানমলা' শীর্ষক একটি রচনা। মানিক কেন এবার ঐ পত্রিকায় গল্প লিখছেন না তারই কৈফিয়ৎ। এই রচনায় তিনি গল্প এবং উপন্যাসের আঙ্গিক সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন। ২৮-৯-৫৩ তারিখে মাসিক বসুমতীর সম্পাদকের নিকট মানিক এ সম্পর্কে লিখেছেন : "আপনার দাবী অনুসারেই এবার কেন গল্প লিখছিনা তার কারণ গল্পাকারে দু'খানা ফুলস্ক্যাপের বদলে তিন খানা লিখে রেখেছি। নাম দিয়েছি 'সাহিত্যের কানমলা'। সাহিত্য সত্যিই এবার আমাকে কানমলে নতুন শিক্ষা দিয়েছে।"

॥ ২২ ॥

১৯৫৩ সালে মানিকের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা কেমন ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ডায়েরির পাতা থেকে। তিনি তখন নানা কথা ভাবছেন। শরীর অবসন্ন অথচ মদের ক্রিয়া প্রবল! তারফলে হয়ত এসব চিন্তা দেখা দিয়েছিল। তিনি ৩.১.৫৩ তারিখে লিখেছেন—

"মূল নিয়ম কি?

আমরা নিয়মের সূত্রে বাঁধা। মূল নিয়ম জানার জন্য—শুধু বুদ্ধি দিয়ে জানা নয়, জীবন দিয়ে জানা—আমরা ক্রমাগত নিয়মের শাখা প্রশাখাই জেনে এসেছি, এবং চিরকাল তাই আমাদের করে যেতে হবে।

এরই নাম প্রগতি।

সমস্ত ধর্ম আর মতবাদের ভিত্তিও এই।

সৃষ্টি রহস্য। বিশ্বের মূলনীতি কোনদিনই জানা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে—সে জ্ঞান অনন্ত সীমাহীন।

কিন্তু সেটাই আশীর্বাদের মত। কারণ, জেনে জেনে এগিয়ে যাওয়া কোনদিনই আমাদের শেষ হবে না। নিয়মের পর নিয়ম আবিষ্কার করব—চেতনা নব নব রূপ নেবে—কিন্তু এ ভয় নেই যে কোনদিন এ প্রক্রিয়া থেমে যাবে—শেষ সীমায় পৌঁছে কোন মানুষ বলতে পারবে—এইখানেই ইতি।

গতি শেষ।

আর রূপান্তর নেই।

নিয়ম জেনে চলব, মূল নিয়ম কোনদিন জানতে পারব না—এটাই মানুষের

জীবনের মূল নিয়ম। চেতনাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা কারো নেই।

চেতনা দিয়ে চেতনকে অতিক্রম করার চেষ্টা ?

মানুষের জগৎ আর জলবায়ু বাতাস ইত্যাদি অবলম্বন করে জীবিত মানুষের জগৎ পৃথক করাই রোমান্টিসিজম।

আরও অনেক জগৎ আছে। চেতনায় তার সাড়া পেয়েছি। চেতনা দিয়ে চেতনার সীমাই শুধু জানা যায়—আরও কিছু আছে বিরাট ব্যাপার সেটা—চেতনায় উপলব্ধি করা যায়—তার বেশী আর কিছু সম্ভব নয়।

এটা না মানা রোমান্টিকতা—এটা মানা বাস্তবতা।

বিজ্ঞানও এই দ্বন্দ্বের চরম বিকাশ।

বিজ্ঞান আজও বলে, এই এই নিয়মে এই এই ব্যাপার, এটাই হল চরম কথা—শেষ কথা নয়। আবার নতুন কথা আসবে।"

তার পরেই তিনি লিখেছেন শক্তি বিষয়ে। তারিখ দেওয়া নেই। ডায়েরিতে এর পরেই আছে :

"Shakti—

1. The longdrawn controversy—what was first—matter or energy ?

Not meaningless, but also a manifestation of truth, the real truth, that human conciousness is progressive. Religion to controversial philosophy of Idealism and materialism—

এই সংঘাতে বিজ্ঞানের জন্ম। বিজ্ঞানের উন্নতিও কি যে প্রগতি থেকে বিজ্ঞানের জন্ম তারই সঙ্গে অবিরাম সংঘাতের ফল নয় ?

দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ বিপরীত কিন্তু একই জ্ঞানের উভয় দিক। শক্তিই আসল। শক্তির কোটি কোটি...বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী প্রকৃত রূপ ছোট্ট পৃথিবীর মানুষ কোনদিন জানতে পারবে না কিন্তু জানার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে অবিরাম।

মার দয়ার মানে কি ? যেটুকু জেনেছি তা এই—যেমন চাওয়া তেমন পাওয়া।

চাওয়াই জীবনের ধর্ম। জ্ঞান চাই বা অর্থ চাই বা সুখ চাই বা অন্যায়ের প্রতিকার চাই।

বাঁচা মানেই বাঁচার—এভাবে পছন্দ নয় বলে ওভাবে বাঁচার দাবী।

প্রত্যেক জীবের চলাফেরার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা—চিরকাল ছিল এখনো আছে—সীমার মধ্যেই।

মানুষ অতীত যতটা জেনেছে, বর্তমান যতটা জানছে—তারই অনুপাতে ভবিষ্যৎ

জানা সম্ভব। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন এই সত্য বুঝেছিলেন তাই সমস্ত জগৎ যখন সাম্যবাদী হবে তখনকার জগৎ কেমন হবে সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দিতে অস্বীকার করেছেন।"

১৯৫৩ সাল থেকেই মানিক খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর চিন্তায় অসংগতি এবং বিক্ষিপ্ততা দেখা দিতে থাকে। মাসিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক মশায়ও এই কথা বলেন—"লেখকের মৃত্যুর প্রায় দুই বছর পূর্বে থেকে লেখক এমন সব চিঠি দিতে থাকেন যা থেকে অনুমান করা যায় লেখকের মনের স্থিরতা নানা কারণে বিনষ্ট হয়েছিল।"[১]

মানিক যে তখন ডিলিরিয়ামে ভুগছিলেন এগুলো তারই প্রমাণ। তাঁকে তখনো বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বহু লেখা লিখতে হচ্ছে। তাছাড়া আছে গ্রন্থাকারে নানা উপন্যাস ও গল্প সংকলন। এই অসম্ভব পরিশ্রমের জন্যই তাঁকে সুরার মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দিতে হয়েছে। ১৮.৬.৫৩ তারিখের ডায়েরিতে লেখা আছে :

"রাত্রে গেলাস কুঁজো ভাঙ্গা—এক ব্যাপার, ডলির উপর রাগ : সকালে অস্পষ্ট মনে পড়ল ভাঙ্গবার কথা—আর সব ভুলে গেছি—ডলির কাছে সব শুনলাম—শ্যামবাজারে বেশী খাওয়া হয়েছিল।"

কী অদ্ভুত সরল স্বীকারোক্তি। তাঁর মনে কোন পাপ নেই। তারপর এক জায়গায় লিখেছেন, সংযম অভ্যাস করে শরীর ভাল আছে। কিন্তু খাটুনি না কমালে সংযমে কী হবে? অথচ খাটুনি কমানোর কোন সম্ভাবনা নেই। লেখা ছাড়াও তিনি তখন নানা সভা ও পার্টির কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ফলে এ বছরের শেষের দিকে শরীর ভীষণ ভেঙ্গে পড়ে।

ডাক্তার দেখিয়েছেন। ডায়েরির এক জায়গায় লেখা আছে—২০.১১.৫৩ Dr. Nandadulal's advice :

1. Antisacker ২ বড়ির বদলে সকালে ½ বড়ি, দুপুরে খাওয়ার পর ½ বড়ি।
2. Vit. B. comp. দুপুরে খাওয়ার আধঘণ্টা আগে ২ চামচ।
3. Livergen : ২ চামচ—১ চামচ হলেও চলে (সকালে খাওয়ার পর ?)
4. রাত্রে Brandy এক ডোজ—নটা দশটা নাগাদ—দেশী সম্পূর্ণ বন্ধ।
5. সকালে ছোলা ভেজানো মাখন, বিকেলে কলা ও পেঁপে ইত্যাদি ফল।

এই পরামর্শ তিনি হয়তো মেনে চলতে পারেন নি। ফলে শরীর আরও খারাপ হয়ে পড়ল।

১। মাসিক বসুমতী, পৌষ, ১৩৬৩।

১৯৫৪ সালেও মানিকের শারীরিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। তাঁর চিন্তায় এসেছে শ্লথতা, অসংলগ্নতা। অথচ 'এত জটিল মানুষের জীবন। এই জীবনের মর্ম অনুভব করে, জীবন সত্য ধরতে পেরেই তবেই লেখক হওয়া সম্ভব'। মানিকের পক্ষে এখন আর এই কঠিন কাজ সম্ভব হয়ে উঠছে না। তাঁর জীবনের পুঁজি যেন ফুরিয়ে আসছে। তবু তাঁকে লিখতে হবে জীবিকার তাগিদে। এ বছরে তাঁর প্রকাশিত হোল, **লাজুকলতা** গল্প সংকলন এবং দুটি উপন্যাস—**'হরফ'** ও **'শুভাশুভ'**।

'লাজুকলতা' যোলটি গল্পের সংকলন। প্রকাশ করেছেন রীডার্স কর্ণার। (কোজাগরী পূর্ণিমা, ১৩৬৫)। লেখকের কথায় মানিক লিখেছেন, "এই সংকলনের অধিকাংশ গল্প তিন চার বছরের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটি গল্প সংকলনের মূল একটি সূত্রের ভিত্তিতে, অর্থাৎ সমাজ জীবনের কোনো একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ অবস্থায় ছোট ছোট কাহিনীর মধ্যে যে মিলটা স্বভাবত থাকে তাকে আশ্রয় করে গল্প চয়ন করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।

এই সংকলনেও সেই চেষ্টাই করেছি। কতটা সফল হয়েছে আমার বিচার্য নয়।"

লাজুকলতা মানিকের জীবিতকালের শেষ গল্প গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি শ্রমিক কৃষকের সংগ্রামী জীবনকেই আদর্শ বলে রূপায়িত করেছেন। অর্থনৈতিক দুরবস্থায় মধ্যবিত্ত সমাজ ক্রমশ শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণতি লাভ করে যেন নিজেদের সুস্থ মনে করছে।

'হরফ' উপন্যাসটি (বুদ্ধ পূর্ণিমা, ১৩৬১) প্রকাশ করে সাহিত্য জগৎ। এই উপন্যাসে আছে সাহিত্যকারের বাঁচার সংগ্রাম আর সাহিত্য ব্যবসায়ীর মুনাফা মৃগয়ার কাহিনী। হরফ মানিকের অন্তিম পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এই উপন্যাসে মানিক লেখকের সমস্যা সম্বন্ধে বলেছেন :

"এত জটিল মানুষের জীবন! এই জীবনের মর্ম অনুভব করা—জীবনসত্য ধরতে পারা—তবে লেখক হওয়া? এবং লেখক হয়েও জীবনসত্য আবিষ্কার করে করে চলা,—আরও সহজভাবে জীবনকে জেনে আরও সোজা ভাষায় জানাটুকু দশজনকে জানিয়ে দেবার একটানা চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।"

মানিকের সময়কার লেখকরা যখন স্থবিরতা লাভ করেছেন, আত্মজীবন এবং অধ্যাত্মজীবনের মধ্যে লেখার ধারাকে অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করে চলেছেন তখন মানিক জীবনের শেষ পর্যন্ত জীবনসত্যকে আবিষ্কার করে করে তাকে বিচিত্ররূপে দান করে চলেছেন। এখানেই মানিকের নিষ্ঠা এবং সততার পরিচয়

আর এখানেই বাংলা সাহিত্যে মানিকের স্বাতন্ত্র্য।

একটি ধনাঢ্য ব্যবসায়ী পরিবার ভাঙতে ভাঙতে কি করে শ্রমজীবী পরিবারে পরিণত হয়েছে 'শুভাশুভ' উপন্যাসে তা বর্ণিত হয়েছে। এই উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় আশ্বিন, ১৩৬১ সালে। প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরী। এই উপন্যাসের আঙ্গিকে নতুনত্ব আছে। এ সম্পর্কে লেখকের কথায় মানিক লিখেছেন:

"কয়েক বছর আগে একটি অখ্যাতনামা ছোট নূতন মাসিক পত্রিকায় এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেছিলাম। কয়েক মাস প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটির অকাল মৃত্যু ঘটে এবং যথারীতি আমারও বইটি শেষ করার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে যায়।

এতদিন পরে আবার নতুন করে গোড়া থেকেই বইটি লিখে ফেলেছি।

নতুন উপন্যাস ফাঁদার চেয়ে খানিকটা লেখা উপন্যাস লিখে শেষ করা সাধারণত সহজ হয়—যদিও নিয়মটা সব ক্ষেত্রে খাটে না। প্রথম লাইনটি লিখবার আগেই বেশ কিছুদিন উপন্যাসটি নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়—কতগুলি দিক ভেবে রাখতে হয়, কমপক্ষে আসল কাহিনীর মূল ভিত্তিটা মনে মনে ছকে নিতে হয়।

অর্থাৎ আরম্ভ করা উপন্যাসে অনেকটা কাজ এগিয়ে থাকে।

এটি আমার পরীক্ষামূলক উপন্যাস। আমার বিশ্বাস, প্রধান নায়ক ও নায়িকাদের প্রধান করে বজায় রেখেও সংশ্লিষ্ট আরও অনেক চরিত্র আমদানি করলে উপন্যাসের শ্রেণীগত সামাজিক বাস্তবতা রূপায়ণে সাহায্য হয়।

উপন্যাস লেখার পুরানো একটা রীতি আজও অনেকে আঁকড়ে আছেন—সেটা এই যে উপন্যাসে কোন চরিত্র আনলে তার একটা গতি ও পরিণতির সম্পূর্ণতা দিতেই হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষটার কি হল।

আমার প্রথম উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় আমি প্রথম এই নিয়ম ভঙ্গ করি।

কয়েকটি ছোটখাট চরিত্রের বেলা তো বটেই, দু'টি প্রধান চরিত্র মতি ও কুমুদের বেলাতেও কুমুদের সঙ্গে ট্রেনে মতিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়ে সেইখানে ছেদ টেনেছিলাম—লিখেছিলাম যে সন্তানের প্রয়োজনে হয়তো ওদের কোনদিন নীড় বাঁধার প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু সেটা ভিন্ন কাহিনী, দরকার হলে ভিন্ন বই লিখে সে কাহিনীকে রূপ দেব।

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বইয়ে লেখা ভূমিকা দেওয়া আমার অভ্যাস নয়। এ বইয়ে এত দীর্ঘ ভূমিকা দেওয়ার কৈফিয়ৎটাই উপরে সরলভাবে লিখে দিলাম।"

এই সময়কার এক সুন্দর গল্প লিখেছেন বিমল মিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি সংখ্যা পরিচয় পত্রিকায়। দামোদর বাঁধ পরিকল্পনার কাজ কর্ম দেখতে যাবার জন্য একবার জন কুড়ি সাহিত্যিক এবং কিছু সরকারী লোক স্পেশাল ট্রেনে যাবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঐ দলে মানিকও ছিলেন। মানিক ষ্টেশনে গিয়েই দেখলেন চারিদিকে অব্যবস্থা। গাড়ি কখন ছাড়বে ঠিক নেই। অন্যেরা ঐ অব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু "হঠাৎ অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন মানিক। এত অব্যবস্থা! এত অনাচার, এত অনিয়ম, এত বেহিসেব! দেশের কোথাও কি সুস্থতা, কোথাও কি শৃঙ্খলা থাকতে নেই! সারাজীবন ধরে এক সুস্থ, সুশৃঙ্খল, সুখী সমাজের বাস্তবরূপ দেখতে চেয়েছেন। সে সমাজ পাবার আশায় আপোষহীন সংগ্রাম করে এসেছেন—পুতুলের সমাজ ভেঙে মানুষের সমাজ গড়তে চেয়েছেন, সব চেষ্টা কি তবে ব্যর্থ!

মানিক গট গট করে ফিরে চলে গেলেন বাড়ির দিকে। হাতে তার দুটো ভারি বোঝা। এক হাতে রঙ চটা ভারি টিনের সুটকেশ, আর এক হাতে লেপ তোষক, নারকেল দড়ি দিয়ে বেশ করে বাণ্ডিল বাঁধা। বোঝার ভারে নড়তে পারছেন না। তবু আপ্রাণ শক্তিতে আবার ফিরে চলেছেন।"

অন্যেরা যখন আপোষ রফা করে সংসারের সব অনিয়ম এবং অব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলেছে তখন মানিক একা আপোষহীন সংগ্রাম করে জীবনকে ক্ষত বিক্ষত করে তুলেছেন। তবু কখনো মাথা নত করেন নি।

এ সময়ে মানিকের নানা গ্রন্থের দেশ বিদেশে অনুবাদ হতে থাকে। মানিকের তখন আর্থিক অস্বচ্ছলতা খুব। সে সময় ওগুলো যেন আশীর্বাদের মত দেখা দিল। ১৯৫৩ সালে তাঁর পদ্মানদীর মাঝির World Cinema right কেনার option বাবদ তিনি পেলেন ২৫০৲ টাকার চেক। তা ছাড়া পুতুল নাচের ইতিকথার গুজরাতী সংস্করণ হওয়ায় তিনি পেলেন ১২৫৲ টাকা। ১৯৫৫ সালে 'চিহ্ন' উপন্যাসের চেক অনুবাদ বাবদ ড্রাফট পেলেন চারশ আট টাকার এবং পদ্মানদীর মাঝির চেক অনুবাদের জন্য পেলেন চারশ তিন টাকা। পদ্মানদীর মাঝির সুইডিস অনুবাদের জন্য আটশ পঁচিশ টাকা।

মানিকের তখন শরীর অবসন্ন। আয়ের পথ সংকুচিত। অথচ ব্যয়ের কোন কমতি নেই। মনে আসে নানা চিন্তা। এলোমেলো। ২২.১০.৫৪ তারিখে ডায়েরিতে লেখা আছে :

"আরম্ভ আছে মানেই কি শেষ আছে? যার শেষ নেই তার আরম্ভের মানে কি?

শেষ নেই আরম্ভ আছে এটা কি অসম্ভব ব্যাপার নয়?

অনন্ত মানে কি? যার আদিও নেই অন্তও নেই? এটা আমরা ধারণা করতে পারি না। আদি অন্তহীন তার" (এখানেই অসমাপ্তভাবে শেষ)

॥ ২৩ ॥

মানিকের অসুস্থতা বাড়তে থাকে। এই অসুস্থার সংবাদে অনেকেই চিন্তিত হয়ে পড়েন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত মশায়ের বাড়িতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীদের এক আলোচনা সভা হয়। ঐ সভায় সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। মানিকের আর্থিক সাহায্যের যে খুব প্রয়োজন একথা সকলেই উপলব্ধি করেন এবং প্রত্যেকেই সভাস্থলে কিছুকিছু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এভাবে ঐ দিনই প্রায় আটশ' টাকা উঠেছিল।

এ সময় মানিকের সাহায্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত মশায় সব চেয়ে বেশী এগিয়ে এসেছিলেন। অথচ মানিকের এবং অতুলচন্দ্রের মধ্যে কোন মিল ছিল না বরং বিরোধিতা ছিল। অতুলচন্দ্র মানিকের মত বিশেষ করে রাজনীতি মোটেই পছন্দ করতেন না। তবু সাহিত্যিক মানিকের জন্য ছিল তাঁর অসীম দরদ। মানিকের প্রতিভাকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করতেন। সেজন্য প্রতি মাসে তিনি মানিকের চিকিৎসা এবং সাংসারিক খরচের জন্য বহু টাকা নিজের পকেট থেকে ব্যয় করতেন। কিন্তু কোনদিন কারুর কাছে এ কথা প্রকাশ করতেন না। এমন কি তাঁর বাড়ির লোকেরাও তা জানত না। তখন মানিকের চিকিৎসার জন্য মাসে মাসে বহু অর্থ ব্যয় হোত। তথাপি মানিকের যাতে কোন অসুবিধে না হয় সেজন্য অতুলচন্দ্র সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

তারপর মানিকের চিকিৎসার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা শুরু হয়। অতুলচন্দ্র গুপ্তের পরামর্শে কোলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখান হয়। কিন্তু সুরাপান থেকে নিবৃত্ত করতে না পারলে মানিকের কোন সুফল চিকিৎসাই সম্ভব নয়। সেজন্য স্থির হয় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে নিয়মিত চিকিৎসা করান হবে। মানিক কিন্তু হাসপাতালে যেতে মোটেই রাজী নন। তার অনেক কারণও ছিল। সেই কারণ বিবৃত করে মানিক ৯.২.১৯৫৫

তারিখে অতুলচন্দ্রকে এক চিঠি লেখেন।[১]

"আমি কেন হাসপাতালে যেতে অস্বীকার করছি সে সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার।...

আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস যে নিজেকে রোগী মনে করলে এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলে আমার সর্বনাশ হবে—আমাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে।

আমার কোন রোগ নেই, আমি সুস্থ সবল সক্রিয় মানুষ—এ বিশ্বাস আঁকড়ে থাকা ছাড়া আমার কোনো গতি নেই।

কারণগুলি এই—

(১) প্রথম দিকে পুতুল নাচের ইতিকথা প্রভৃতি কয়েকখানা বই লিখতে যেতে গিয়ে যখন আমি নিজেও ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার একটা শরীর আছে এবং পরিবারের মানুষেরাও নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন হয়ে গিয়েছিল তখন একদিন হঠাৎ আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। একমাস থেকে দু'তিন মাস অন্তর এটা ঘটতে থাকে।

তখন আমার বয়স ২৮/২৯—৪।৫ বছরের প্রাণান্তকর সাহিত্য সাধনা হয়ে গেছে।

(২) কয়েক বছর ধরে বহুভাবে আমার চিকিৎসা হয়েছে, কয়েকজন স্পেসালিষ্টও আমায় পরীক্ষা করেছেন। ৬।৭ বৎসরের জন্য আমি ডাক্তারের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিলাম, সব রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলাম।

ডাক্তারেরা শুধু ব্রোমাইড ইত্যাদি ওষুধের ব্যবস্থা দিতেন।

কোনো স্পেসালিষ্ট বলতে পারেননি আমার অসুখ কি এবং কেন আমি মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাই।

অ্যালকোহলের সঙ্গে তখন আমার সম্পর্ক ছিল না।

(৩) ঝিমিয়ে দেওয়া ওষুধ খেয়ে খেয়ে ক্রমে ক্রমে অকর্মণ্য হয়ে পড়লাম এবং মৃত্যুর প্রায় মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

...মাঝে মাঝে আমি কেন অজ্ঞান হয়ে যাই তার কারণ আজও চিকিৎসা বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারেনি।

(৪) দীর্ঘকাল চিকিৎসা চালিয়ে অকর্মণ্য মরণাপন্ন হয়ে আমি তখন সিদ্ধান্ত নিই যে নিজেকে আর রোগী ভাবব না।

কোনো ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়েই আমি একটা পেটেণ্ট ওষুধ এবং

১। শারদীয়া পরিচয়, ১৩৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত।

সেই সঙ্গে এত বছর ঝিমিয়ে দেওয়া ওষুধ খাওয়ার প্রতিষেধক হিসাবে বিপরীত জিনিষ অ্যালকোহল শুরু করি।

(৫) ...আমি বরাবর ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছি, দরকার মত ওষুধপত্র খেয়েছি।

এমন কি, অ্যালকোহল বেড়ে যাবার পর এর বিপদটা টের পেয়ে আমি যে কয়েক বছর ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করেছি, তার প্রমাণ আছে।

এ ডাক্তার গত ছ'সাত বছর আমার পরিবারের সমস্ত অসুখ বিসুখের চিকিৎসাও করে আসছেন।

(৬) তবে কথা হল এই, ডাক্তার-এর সব উপদেশ মেনে চলা বা সব ওষুধ নিয়ম মত খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কারণ অর্থাভাব এবং অতিরিক্ত খাটুনি। আজ এখন ওষুধ খেয়ে ঘুমোলে কাল হাঁড়ি চড়বেনা—খানিকটা অ্যালকোহল গিললে কিছুক্ষণের জন্য তাজা হয়ে হাতের কাজটা শেষ করতে পারব। এ অবস্থায় অ্যালকোহলের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় কি?

(৭) সমস্ত চিকিৎসা বন্ধ করে, নিজেকে রোগী ভাবতে অস্বীকার করে এবং সাধারণ একটা পেটেন্ট ওষুধ ও অ্যালকোহলের সাহায্যে আমি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলাম।

ডাঃ নারায়ণ রায় আমার পরীক্ষা করতে এলে পেটেন্ট ওষুধটা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে গেছেন—It was the correct medicine.

কিন্তু শুধু ওষুধটা অবলম্বন করলে আমি বাঁচতাম না।

...অ্যালকোহলের আশ্রয় না নিলে National War Front এর চাকরীটা একমাসও আমি টানতে পারতাম না।

কবিরাজী 'মৃত সঞ্জীবনী সুরা' দিয়ে আমার অ্যালকোহলিজম শুরু হয়েছিল—চাকরী করার সময় বিলাতী মদ রপ্ত করি।

(৮) বছর দশেকের কথা।

প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলাম। আর ক'মাস বাঁচব এই ভাবনা মাথায় এসেছিল।

নিজেকে রোগী না ভেবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলাম বলেই রক্ষা পেয়েছিলাম।

গত দশ এগার বছরের মধ্যে ২৷৩ বছর দায়িত্বপূর্ণ পদে চাকরী করেছি, শত শত সভা সমিতিতে যোগ দিয়েছি, বক্তৃতা করেছি, ১৯৷২০ খানা বই লিখেছি।

(৯) এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে যা একদিন আমায় বাঁচিয়েছিল,

সেটা গিলবার অভ্যাসই হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার প্রধান রোগ।

অ্যালকোহলের কবল থেকে এবার মুক্তি লাভ করা দরকার সে বিষয়ে আমি যে অনেকদিন আগে থেকেই সচেতন হয়েছি তার প্রমাণ আছে।

অর্থাভাব ও অতিরিক্ত খাটুনির জন্য এটা একেবারে বর্জন করতে পারিনি কিন্তু সামলে চলার চেষ্টা যে করেছি সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন আমার পুরানো ফেমিলি ফিজিসিয়ান।

(১০) আমি মাতাল নই—সাহিত্যিক।

ডাক্তারের সহযোগিতা যে দরকার আমি তা জানি। সপ্তাহে ২/৩ দিন আমি আমার পুরানো ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করি।

দয়া করে আমায় রোগী বানাবেন না. জোর করে হাসপাতালে টানবেন না।

খাটুনি এবং চিন্তাভাবনার হাত থেকে রেহাই পেলে বাড়িতে থেকেই আমি অ্যালকোহলকে কিছু দিনের মধ্যে বশে আনতে পারব।

এটুকু মনের জোর যদি আমার না থাকে তবে কলম বন্ধ করে আমার মরাই ভাল।”

অ্যালকোহল সম্পর্কে মানিক অনেকবারই এমন কথা বলেছেন। মাঝে মাঝে একেবারে ছেড়েও দিয়েছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। কারণ যাই থাক এই হোল ঘটনা। সেজন্য অতুলচন্দ্র প্রমুখ মানিকের হিতৈষীরা তখন মানিকের চিকিৎসার জন্য ইসলামিয়া হাসপাতালে সব বন্দোবস্ত করলেন এবং মানিককে সেখানে ভর্তি করে দিলেন।

মানিকের আদৌ তাতে সায় ছিল না। সেজন্য হাসপাতালে এসেও তিনি অনিয়মের চূড়ান্ত করলেন। এই হাসপাতালে মানিক মাস তিনেক ছিলেন। হাসপাতালে কড়া নিয়ম ছিল তিনি কোন সুরাপান করতে পারবেন না। কিন্তু মানিকের প্রকৃতি তখনো বদলায়নি। বিকালে দর্শকদের জন্য যে সময় হাসপাতালের নিয়ম একটু শিথিল থাকে মানিক এক ফাঁকে সেই সময়ের মধ্যে বাইরে চলে যেতেন এবং প্রকাশকদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। তারপর হাসপাতালের জমাদারের সাহায্যেও তিনি মদ সংগ্রহ করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর ২৪.২.৫৫ তারিখের ডায়েরিতে লেখা আছে :

“হঠাৎ হাসপাতালে! বিকালে এক ঘণ্টার ছুটি। চিনু ১২।/০ বেঙ্গল 75/- ক্যালকাটা পাবলিশার্স 20/- D.-40. Howards ৮।০ গেঞ্জি ১৸৶০ বাস ।৫।”

হাসপাতালের চিকিৎসায় মানিকের শারীরিক কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। এখানে

তিনি মাস খানেক ছিলেন। কিন্তু হাসপাতালের বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে মানিক অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিলেন এবং একদিন হঠাৎ ডাক্তারদের মতের বিরুদ্ধে হাসপাতাল থেকে চলে আসেন।

এ সময় অতুল গুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় সরকার পক্ষ থেকে মানিককে মাসিক একশ টাকা করে পেনসন ভাতা মঞ্জুর করা হয় এবং তাঁর চিকিৎসার জন্য এককালীন বারশ টাকা দেওয়া হয়। সরকারী নিয়মে এই পেনসন ভাতার জন্য সাহায্য প্রার্থীকে দরখাস্ত করতে হয়। কিন্তু চরম আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে থেকেও সরকারী আর্থিক সাহায্য নিতে মানিক প্রস্তুত ছিলেন না। সেজন্য তিনি কোন দরখাস্তে সই করেন নি। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে ধরে মানিকের হিতৈষীরাই এই অর্থ মঞ্জুর করিয়েছিলেন। এবং এই অর্থ কখনো সরাসরি মানিকের নিকটে আসে নি।

॥ ২৪ ॥

মানিকের মৃত্যুর বছর দুই আগে একবার নরেন্দ্রনাথ মিত্র মানিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তখনকার মানিকের মানসিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :[১]

"সস্তা এক জোড়া টেবিল চেয়ার। এক পাশে আচ্ছাদনহীন একখানা তক্তাপোষ। দেয়ালে ঠেস দেওয়া কাঁচ ভাঙা আলমারিতে এলোমেলো ভাবে রাখা একরাশ বই। বেশির ভাগই ছেঁড়া ছোঁড়া পুরোন মাসিক পত্র। বইপত্রে পাণ্ডুলিপির এলোমেলো পাতায় আগোছালো অপরিচ্ছন্ন টেবিল। তক্তপোষের ওপর পাণ্ডুলিপির খানিকটা অংশ পড়ে আছে।

আমি বিস্মিত হলাম। মানিকবাবুর ঘরের এই চেহারাই যেন সব চেয়ে মানানসই। এ যেন বাইরের ঘর নয়, স্রষ্টার মনের অন্দর মহল। যেখানে ঝড়-ঝঞ্ঝা বৃষ্টি-বিদ্যুতের বিরাম নেই।"

মানিক তখন খুবই অসুস্থ। শরীর অবসন্ন। কিন্তু তখনো তার স্বাভাবিক মনের জোর প্রবল। চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও তার চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ক্ষুণ্ন হয় নি। নরেন্দ্রবাবুর প্রশ্নের উত্তরে সেদিন মানিক বলেছিলেন, "উপন্যাস লিখতে লিখতে যদি ছোট গল্প লেখার ইচ্ছা হয় তাহলে গল্পই লিখব। উপন্যাস লিখলে বেশি টাকা

১। শারদীয়, পৌষ ১৩৬৩

পাব বলে কি উপন্যাসই লিখব ? সংসারের প্রয়োজন, পাবলিশারের তাগিদ কিছুতেই লেখকের হাত-পা বেঁধে দিতে পারে না।"

মানিক সাধারণ পাঠকদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাঁর জীবনের শেষ সময়ে অনেকে তাঁর জন্য ভাবিত হয়ে সাধ্যমত সাহায্যের চেষ্টা করেছে। এ কথাও মানিক সেদিন স্বীকার করেছেন, "সকলেই তার সাধ্যমত এমন কি সাধ্যের অতিরিক্ত করতেও চায়। এদিক থেকে কারো বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই। বাংলা দেশের লোক তাদের লেখকদের ভারি ভালোবাসে।" এদের কথা বলতে বলতে মানিকের রোগক্লিষ্ট মুখ প্রসন্ন পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠল।

॥ ২৫ ॥

মানিক তখন শরীর এবং মন উভয় দিকেই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বাইরের লোকের কথাবার্তায় তাঁর স্বাভাবিক প্রত্যয়ের পরিচয় পাওয়া গেলেও মনে মনে তিনি খুবই দুর্বল। বিদ্রোহী মানিক, কমিউনিষ্ট মানিকের দৃঢ় প্রত্যয় আর সেখানে নেই। চিন্তায় এসেছে নানা অসংলগ্নতা। এলোমেলো নানা চিন্তা তাঁকে গ্রাস করেছে। দীর্ঘদিনের সংস্কার তাঁর মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাঁর ডায়েরির পাতায় রয়েছে এই দুর্বলতার পরিচয়। অবশ্য তিনি তাতে কোন তারিখ দেন নি তিনি লিখেছেন :

মায়ের দয়া

দয়া চেয়েছি, দয়া পেয়েছি—বহুবার। নিতে পারিনি, কাজে লাগাতে পারিনি ভুল করেছি। একবার নয়, বারবার। হাত শূন্য, কোথাও পাওনা নেই, কাতরভাবে মাকে ডাকছি—২।১ দিনের মধ্যে হঠাৎ অনুবাদ বা সংকলন বাবদ টাকা এসে গেল সামলে চললে আর মুস্কিলে পড়তাম না। কিন্তু আমার বাঁকা হিসাব।

সব নিয়মে ঘটেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য যোগাযোগ। চোখে অন্ধকার দেখছি মার কাছে আরেকবার ক্ষমা আর দয়া চাইছি—চেনা লোক ডেকে নিয়ে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং-এর 'স্বনির্বাচিত গল্প বাবদ' ন'শো টাকা আগাম পাইয়ে দিল। এরকম অনেকবার হয়েছে।

মন্দির মনে এনে মাকে ডাকতাম, বলতাম—মন্দির নয় মা, ওই মন্দিরে মানুষ যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময়ী মায়ের পূজা করে সেই মাকেই প্রণাম করছি।

কতরকম ছুঁচিবাই এসে গিয়েছিল। তবু মা দয়া করেছেন। দয়া চাইলে দয়া

পাওয়া যায়।

মায়ের রূপগুণ কিছুই জানি না, কি নিয়মে দয়া করেন তাও জানি না, শুধু এইটুকু জানি যে মায়ের নিয়মের এদিক ওদিক নেই, জগৎ নিয়মে বাঁধা, কাতরভাবে মায়ের কাছে দয়া চাইলে মা দয়া করেন, এটাও মায়েরই একটা নিয়ম।

নিরুপায় হয়ে দয়া চেয়েছি, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে—কেবল তাই নয়।

আর যখন ঠেকনো দিয়ে পারি না, মার কাছে বড় দয়া চাইতাম—ধনৈশ্চর্য নয়, সুস্থ নিশ্চিন্ত হয়ে আরও কিছুদিন বেঁচে থেকে সাহিত্য-সাধনা করতে চাই, মায়ের দয়ার নিয়ম বুঝতে চাই—যদি পারি পুরানো শাস্ত্র সংস্কার বিশ্বাসের গণ্ডী বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাশক্তিকে নিয়ে একখানা বই লিখব। সেকেলে মাকে (লোকে যেমন জানে) একেলে করার সাধ—এ যুগের অবিশ্বাসী মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্যা মননযোগ্যা করার সাধ।

এটা আমার ছেলেমানুষি। মা যদি এটা চাইতেন—মাকে সাহিত্যিক আমার ভরসায় থাকবার দরকাত হত না।

যে যে রূপে শাস্ত্রে, লোকাচারে ভক্তিতে বিশ্বাসে মাকে কল্পনা করা হয়ে এসেছে—বিজ্ঞানের যুগে ক্রমে ক্রমে মানুষ তা শুধু প্রাচীন ধর্মের নিদর্শন মনে করবে, শিক্ষিত অগ্রণী সমাজে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনার (যা এখনও বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে কোনদিন আয়ত্ত করতে পারবে কিনা তাও বিজ্ঞান জানে না) মূল শক্তি ও নিয়ম সম্পর্কে কোন রূপক পরিকল্পনা মানবে না—এ বিষয়ে মাথা ঘামাবে না :—এটাই বোধ হয় মার নিয়ম।

জানি না—বুঝি না। ভাবতে হবে, মায়ের দয়ায় যদি জানতে বুঝতে পারি। মায়ের দয়া চেয়ে কিভাবে অসহায় নিরুপায় বিকারগ্রস্ত মৃতপ্রায় মানুষটা জীবন্ত হলাম—কত ছোট বড় অঘটন ঘটে গেল সহজভাবে সাধারণ নিয়মে—আমার কাছে যা আশ্চর্য, কল্পনাতীত যোগাযোগ—তারই যেটুকু খেয়াল হয়েছে ধরতে পেরেছি, লিখে রাখছি। ধারাবাহিক করার চেষ্টা করলেও হয়তো এলোমেলো হবে।

এ বিষয়ে ভাবতে হবে, তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে।

১। মাস তিনেক আগে থেকে অদ্ভুত নিস্পৃহ ভাব। দুর্বলতা অক্ষমতা থেকে নয়, দুর্বলতা তার আগেও ছিল এবং জোরালো ইচ্ছাও জাগত, দু'একদিন দু'চারদিন অন্তর খেলাও করতাম।

বড় দয়া চাওয়ার পর ইচ্ছাটাই যেন উধাও হয়ে গেল। বরং একটা

বিতৃষ্ণার ভাব।

চিকিৎসার প্রস্তুতি হিসাবে খুবই দরকারী ছিল—বিশেষত আমার পক্ষে।

কামে বিরাগ-জাগা সহজ স্বাভাবিক সংযম—দেহ এবং মনের—একটানা এত দীর্ঘ দিন ধরে এবং আমার জীবনে এটা অভিনব কল্পনাতীত ব্যাপার।

তখন বুঝিনি। ঝিমিয়ে গেছি ভেবে মাঝে মাঝে আপশোষ হত।

Anti—s কমানো বাড়ানোর সঙ্গে সম্পর্ক আছে। সেটাই তো স্বাভাবিক নিয়ম।—

২। হাসপাতালে এলাম, চিকিৎসা শুরু হল—বসন্তকাল শুরু হওয়ার সঙ্গে, যখন এমনিই শরীর খানিকটা তাজা হয়ে ওঠে।"

অথচ এই হাসপাতালে শুয়ে শুয়েই তিনি সাহিত্যের বাস্তবতা নিয়ে নানা চিন্তা করেছেন।

হাসপাতালে থাকবার সময় একদিন সাহিত্যিক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় এবং নতুন সাহিত্যের সম্পাদক শ্রীঅনিল সিংহ গিয়েছিলেন মানিকের সঙ্গে দেখা করতে। সেই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে ভবানীবাবু লিখেছেন,[১] "অনেকক্ষণ ধরে নানা কথা হল। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের বর্তমান আকৃতি ও প্রকৃতি সেদিনের প্রধান আলোচ্য ছিল। মানিক কয়েকদিন হাসপাতালের নিয়মের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে কিঞ্চিৎ সুস্থ। নার্স এসে ওষুধ খাইয়ে গেল, কমলালেবু চুষতে চুষতে মানিক বলল, 'যাই বলো বাস্তবের রাজত্ব ছেড়ে পিছু হটে কল্পনার ক্ষেত্রে চলে গিয়ে পিরিয়ডের রোমান্টিক কাহিনীতে কৃতিত্ব থাকতে পারে গবেষকের, কিন্তু তাতে শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যাবে না। মাল মসলা যোগাড় করে ঠিকাদারের বাড়ি তৈরির মতো ইঁটের স্তূপ হবে। তার মধ্যে শিল্প নৈপুণ্য কোথায়! আশেপাশের মানুষকে ছেড়ে দিয়ে যাদের কখনো দেখিনি শুনিনি তাদের ব্যথা বেদনার কি ইতিহাস লিখবো আমরা?'

অনিলবাবুকে 'নতুন সাহিত্য' কিভাবে আরো মনোহর করা যায় সে বিষয়ে মানিক নতুন আইডিয়া দিয়েছিলেন।...মানিক সেই রোগশয্যায় শুয়ে 'নতুন সাহিত্য' এবং সেই সঙ্গে মূলধনহীন অল্প পুঁজির সাহিত্য পত্রের সমস্যা নিয়ে অনেক কথা বললেন। বললেন যে, এই সব পত্র পত্রিকাকে যদি না বাঁচানো যায় তাহলে বাংলা সাহিত্য তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারাবে, সাহিত্য পুঁজিবাদী মালিকের কথামত রচিত হবে এবং সাহিত্যিকের মানসিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে।"

হাসপাতালে মানিক ডায়েরির পাতায় প্রতিদিনের কথা লিখে রাখতেন।

১। নতুন সাহিত্য, ১৩৬৩।

এসব লেখা থেকে তৎকালীন মানিকের শরীর ও মনের অবস্থাটা জানতে পারা যায়। হাসপাতালে এসে তার স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়েছিল। মদের তৃষ্ণাও অনেকটা জয় করেছিলেন। প্রথম প্রথম 'কিছু না করার ও কিছু না ভাবার বিশ্রামটা, ভালই লেগেছিল। বেশীর ভাগ লেখাই তাঁর মদ ছাড়া না ছাড়া সম্পর্কে। মদ যে ছাড়া উচিত এ কথা মানিক স্বীকার করতেন কিন্তু তাঁর শারীরিক এবং মানসিক অবস্থায় তা যে একেবারে ছাড়া সম্ভব নয় তাও তিনি উপলব্ধি করতেন।

হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে তিনি নানা কথা ভাবতেন। নানা লোক দেখা করতে আসত তাদের সঙ্গে নানা আলোচনা করতেন। এই সময়ে অন্ধ্রে সাধারণ নির্বাচন হচ্ছিল। এই নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টির শোচনীয় পরাজয় মানিককে খুব ব্যথিত করেছিল এই সম্পর্কে তিনি ৫.৩.৫৫ তারিখে লিখেছেন :

"অন্ধ্রের ব্যাপারটা সত্যই অদ্ভুত। সরকার গঠন করতে পারব এই সগর্ব ঘোষণার পর এমন পরাজয় আজকের খবরে ১২৯ সিটের মধ্যে মোটে সাত। এই বিরাট বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের কারণ কি? দায়ী কে বা কারা?

বিনয় শিখতে হবে, ঐতিহ্যকে বা বর্তমান সমাজকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার দম্ভ ত্যাগ করতে হবে, মানুষকে ভালবাসতে হবে। আমি মার্কসবাদী, আমি বৈজ্ঞানিক, আমি সব জানি, সংস্কার বা ভাবপ্রবণতার ধার আমি ধারি না। আমি লড়ায়ে শ্রমিক শ্রেণীর যোদ্ধা কমিউনিষ্ট—আমার হৃদয় পাথর।

একজন পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কাছে গেলেন—চাঁদা বা ভোটের জন্য। পঞ্চাশ বছর ধরে সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে তার হৃদয় মন বিশেষ গড়ন পেয়েছে। বকতে ভালবাসেন, কথায় সায় পেলে খুসী হন। পার্টির সোভিয়েট পদলেহন নীতির সমালোচনা শুরু করলেন। কি দরকার তর্ক করে? আধ ঘন্টা এক ঘন্টার মধ্যে তার পঞ্চাশ বছরের সংস্কার ধারণা চিন্তাধারা ও বিশ্বাসকে শুধরে দেবার শিশুসুলভ চেষ্টা করে? মার্কসবাদের হিসাবে, বিজ্ঞানের হিসাবে বরং সিদ্ধান্ত আসবে—না, সেটি যখন উদ্দেশ্য নয়, তখন যে উদ্দেশ্যে তার কাছে যাওয়া সেটা সফল করার চেষ্টাই একমাত্র কর্তব্য।

মানুষটাকে শুধরে দেওয়াই যদি কর্তব্য মনে হয়—মার্কসবাদী পদ্ধতিতে পরম ধৈর্যের সঙ্গে সে কাজ শুরু করুন। পঞ্চাশ বছরের একটা মানুষের মন তো দু'চার দিন দু'চারটে যুক্তি তর্ক শুনিয়ে বদলানো যায় না—যতই অকাট্য হোক সেই যুক্তি। সামনে দেয়াল, মার্কসবাদী সোজা চলতে গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে ধপাস করে পড়ে না—ওটা যে বীরত্ব নয়, দেয়ালের পাশ কাটিয়ে যাওয়াই

বুদ্ধিমানের কাজ, এটুকু তাকে বুঝতে হয়।

তাই বলে কি ভদ্রলোকের সঙ্গে সোভিয়েটের নিন্দায় মাততে হবে? মোটেই না, একটু অর্থহীন অমায়িক হাসি, একটু মাথা নাড়া, দু একটা বিচ্ছিন্ন কথা—তাই নাকি, অ্যাঁ, বটে, ও ইত্যাদি দিয়ে সমর্থন না জানিয়েও প্রলাপ শোনা যায়। দরকার হলে প্রলাপ শোনার ধৈর্যও মার্কসবাদীর চাই।

এক সময় থামবেন। কাজের কথা বলার সুযোগ মিলবে। কৌশল কি শুধু একটা—বাঁধা ধরা? সর্বত্র সেটাই প্রয়োগ করতে হবে? যেখানে যেমন দরকার।

কিন্তু অবজ্ঞা অনুকম্পা বিরাগ বিতৃষ্ণা বিদ্বেষ দূর করে দেশের পিছিয়ে থাকা মানুষগুলোকে ভালবাসতে হবে এ দরদ না জাগলে বিচারবুদ্ধি, ধৈর্য কৌশল কিছুই আয়ত্ত করা যাবে না।

পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে? না, ও আমার পাঁচ বছরের ছেলে। আহা, বেচারা! কথা কইতে ভালোবাসে, হয়তো কেউ শোনে না। আমিই শুনি বাপের মত, বুঝবার চেষ্টা করি ওর মনের শৈশবের চেহারাটা কি রকম।

সোজা কথায় বলা যায়—The C. P. I does not understand the mind of India.

কিন্তু ক্রটি কি শুধু নেতৃত্বের! সভ্যেরা নাকি ভয়ানক গরম। কিন্তু একটা পার্টির নেতৃত্ব ভুল করলে সে ভুলের দায় কি সভ্যদের উপরেও পড়ে না। দিনের পর দিন ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পার্টিকে নেতৃত্ব ভুল পথে চালিয়ে নিয়ে এলেন—কোন পার্টিসভ্য টু শব্দটি করল না। আজ সর্বভারতীয় মারাত্মক ভুলের রূপ নিয়ে ধরা পড়েছে বলেই কি নেতৃত্বের সব দোষ? অন্ধ্র তো একদিন বা দু'একমাসের বিভ্রান্তির পরিণাম নয়।

নেতৃত্ব দোষী—গুরুতর রূপে দোষী। কিন্তু সভ্যেরাও দোষী। দোষটা পার্টিগত। অন্ধ্রের স্থানীয় ওয়াকিবহাল সভ্য কি একজনও ছিলেন না যিনি সাবধান করে দিতে পারতেন?"

এ ছাড়া হাসপাতালে মানিকের এক বাল্যবন্ধু দেখা করতে এসেছিল। তার কাছ থেকে মানিকের স্কুল জীবনের কিছু জানতে পারা যায়। মানিক 12.3.55 তারিখে লিখেছেন:

"চারটের পর টাঙ্গাইলের বাল্যবন্ধু নরেশ, সঙ্গে আপিসের আরেকজন। সহপাঠী ও বন্ধু হলেও নরেশ ছিল আমার পরম ভক্ত। প্রেমে পড়া মেয়ের মত আমায় ভালবাসত। একটু মিষ্টি কথা, একটু দরদ পেলে কৃতার্থ হয়ে যেত।

কথাবার্তা ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা গেল আজও সে আমার পরম ভক্তই আছে। আমার মনে নেই টাঙ্গাইলের এমন অনেক ঘটনার কথা বলল। স্কুলের বাংলা শিক্ষক সতীশবাবুকে কি রকম আশ্চর্য প্রশ্ন করতাম। বর্ষা সম্পর্কে রচনা লিখতে বলায় সমস্ত ক্লাসের সঙ্গে আমার রচনার কি রকম আকাশ পাতাল তফাৎ—সতীশ মাষ্টার নিজে ক্লাসে সেটা পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ মহাপুরুষত্বের লক্ষণ নাকি বাল্যে প্রকাশ পায়। অন্য দু একটা ঘটনার সঙ্গে বারুদ দুর্ঘটনার পর গা কেটে কাঁচ বার করার সময় কেমন টু শব্দটি করিনি সে কথার উল্লেখ করল।"

এ বছরের (১৯৫৫) শেষের দিকে মানিকের শরীর আবার খুব খারাপ হয়ে পড়ে। ডাঃ যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে আরও কড়াকড়ি নিয়মের মধ্যে রাখবার জন্য মানিককে এবার ভর্তি করা হোল লুম্বিনী[১] পার্ক হাসপাতালে। এখানে তিনি ছমাস ছিলেন। লুম্বিনী পার্কে ভর্তি করানোর জন্য মানিক খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর ভালই লেগেছিল এবং বেশ ভাল হয়েই তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন।

১৯৫৫ সালে মানিকের একটি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। নাম **'পরাধীন প্রেম'**। একটি উপন্যাস। প্রকাশ করেছে রীডার্স কর্ণার, ১৩৬২ জ্যৈষ্ঠ মাসে। প্রেম যে বাস্তব অবস্থার পরাধীন, মানিক বিনয়-বকুল, অনিল-কান্তা এবং অজিত-উমার কাহিনীর মধ্যে সেই কথাই প্রকাশ করেছেন।

॥ ২৬ ॥

১৯৫৬ সাল মানিকের জীবনের শেষ বছর। হাসপাতালের চিকিৎসায় মানিকের যেটুকু উন্নতি হয় বাড়ি ফিরে এসে সেটুকু শেষ হয়ে শরীর আরও কাহিল হয়ে পড়ে। ডাক্তারেরা বারবার পরামর্শ দিয়েছেন মদ ছেড়ে দিতে। কিন্তু মানিকের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। অথচ মদ যে তাঁর শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর একথা মানিকের অজানা ছিল না। মদ যে তিনি ভালবাসতেন তাও নয়। তবু তিনি না খেয়ে পারতেন না।

মানিকের বাড়িওয়ালা তখন মানিকের বিরুদ্ধে মামলা করছেন তাঁকে বাড়ি থেকে

১। ২০.৯.৫৫ তারিখে।

তুলে দেওয়ার জন্য। মানিককে সে ব্যাপারেও ছুটাছুটি করতে হচ্ছে। তখনকার মানিকের অবস্থা সম্পর্কে মানিক নিজেই সুন্দরভাবে তাঁর ডায়েরিতে লিখে গিয়েছেন। এবং লেখাটার একটা শীর্ষনাম দিয়েছেন—"ঐতিহাসিক"। ডায়েরিতে তারিখ দেওয়া আছে ১৬।৪।৫৬ :

"সামান্য একটু মদ ছিল, শেষরাতে ঘুম ভেঙে উঠে খেলাম।

ভাবলাম কি যে আগামীর লেখাটাও[১] শেষ করব—মামলার ব্যাপারেও ভেবে চিন্তে শেষ সিদ্ধান্ত করব।

দেখা গেল এ ভাবে হয় না। মদে কোন ঝন্‌ঝাটের মীমাংসা নেই।

ঘুম পেয়ে গেল। শুয়ে পড়লাম।

খুব সকালেই উঠলাম। কিছু কাজও করলাম।

অবস্থা অতি কাহিল।

বাজার আনতে দেবার মত নগদ পয়সা নিজের হাতে নেই।

ডলি চালিয়ে দিল। বাজার হল ভালই। মাছ তরকারী যথেষ্ট এল।

আগামীর লেখাটা লিখব ভাবছি, এল দেবীপ্রসাদ ও সুভাষ। মামলার ব্যাপারে।

অতুল গুপ্ত রাগ করেছেন। দেবীদেরও খুব রাগত ভাব। আমার ওরা এত করেছেন, আমি চুপচাপ বসে আছি।

অনুযোগ মেনে নিলাম।

উকিল প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করে, মামলার তদ্বির করে, সম্ভব হলে উকিলকে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে অতুলবাবুর বাড়ী যাব। সারাদিন কী খাটুনি।

১০—১০॥টায় বাবার পেনসন বিল ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এলাম।

বাড়ী ফিরে স্নান করে সামান্য কিছু খেয়ে রওনা দিলাম শহরে।

কিছু টাকা চাই। উকিল আর তার মুহুরি নইলে কিছুই করবে না।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেডের জিতেনবাবু সত্যই ভদ্রলোক। পাওনা আছে হিসাব করে একটা চেকও দিলেন, সামান্য কিছু নগদও দিলেন।

একটা ডাব খাওয়ালেন।

আরামে খেলাম। D-র চেয়ে অনেক ভাল। একটি ডাবে এক গ্লাস জল হয়। দাম তিন চার আনা। এক গ্লাস D-এর জন্য ২॥৹/৩৲ টাকা দিতে হয়।

শিয়ালদা কোর্টে উকিল খুঁজে বের করতে প্রাণান্ত হল। শেষ পর্যন্ত হদিস

১। মাটির কাছের কিশোর কবি।

পেলাম।

মামলার তারিখ পিছিয়ে দেবার জন্য মোটা টাকা দিতে হল।

তখন কোথায় যাই?

বালীগঞ্জে দাদার বাড়ীতে গেলাম। দাদা বৌদির সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা হল। তারপর অতুলবাবুর বাড়ী। অতুলবাবুর শরীরের অবস্থা বড়ই কাহিল। কিন্তু মানুষটা কাজ করছেন।"

১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হল মানিকের **স্বনির্বাচিত** গল্প এবং দুখানি উপন্যাস **'হলুদনদী সবুজবন'** এবং **'মাশুল'**।

স্বনির্বাচিত গল্প গ্রন্থে লেখকের কথা বলে মাণিক ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬২ তারিখে এক ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। পরে ইহা নিজের কথা নামে 'লেখকের কথা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটি অবশ্য ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড কর্তৃক ১৯৫৬ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় মানিক লিখেছেন:

"নিজের গল্প বাছাই করা বড়ই ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। ঠিক যেন নিজের সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেছে নেবার চেষ্টা যে জীবন সমাজ সাহিত্য ইত্যাদি আসল পরীক্ষায় কে সব চেয়ে ভালোভাবে পাশ করেছে অর্থাৎ উৎরে গিয়েছে।

অনেক বছর ধরে অনেক গণ্ডা ছেলেমেয়েকে জন্ম দেওয়া হয়ে থাকলে বাছাই করার ঝঞ্ঝাট বা মুস্কিলটা সত্যই বিষম হয়ে দাঁড়ায়।

কোন নিয়মে বাছাই করবো? খ্যাঁদা নাক থ্যাবড়া গাল কালো রোগা নোংরা মেয়েটাই হয়তো বাপের সবচেয়ে আদুরে—জগৎ-সংসারে উলঙ্গ সত্যের নির্ভীক নিরাবরণ নিছক খাঁটি মহান প্রতীক হিসাবে হয়তো আর কোন তুলনা খুঁজে পাওয়াই সম্ভব নয় বাপের স্নেহান্ধ দৃষ্টি এবং বিচারে।

এটাই কি শেষ কথা?

মায়া?

কী হাস্যকর ভাবেই মায়াকে অস্বীকার করেন মায়াবাদী পণ্ডিতেরা। জীবনকে জানা আর জীবনকে মায়া করা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। একটাকে বড় করে অন্যটাকে তুচ্ছ করা জীবন দর্শীর পক্ষে বীভৎস অপরাধ।

অবাস্তব কথা টেনে আনলাম কি—বেদ বেদান্ত উপনিষদের মূলতত্ত্ব?

তা নয়। বড় ব্যাপার সম্পর্কে হলেও কথাটা অতিশয় সহজ এবং সরল। জগৎ আর মানুষকে জানা আর ভালোবাসা যে একত্রীকৃত প্রক্রিয়া। একটা ছাড়া অন্যটা যে শুধু অসম্ভব নয়, অর্থহীনও বটে—এটুকু বোঝা আজকের দিনের

মানুষের পক্ষে মোটেই কঠিন হওয়া উচিত নয়।

গল্প নির্বাচনে কোন্‌টা আগে লেখা কোন্‌টা পরে লেখা সে হিসাব করিনি। গল্পের বিচারে ধারাবাহিকতার হিসাবটাই নিরর্থক।

দশজনে আমার যে গল্পকে যতটা সমাদর করেছেন মোটামুটি সেটাই আমি এই সংকলনের জন্য গল্প নির্বাচনের মাপকাঠি ধরে নিয়েছি।

আমার বিচার হয়তো সকলের মনঃপূত হবে না। এ গল্পটা কেন নির্বাচন করলাম এবং ও গল্পটা কেন বাদ দিলাম তাই নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন উঠবে।

সেটাও আমি কামনা করি—প্রশ্ন উঠুক, সমালোচনা হোক, দশজনে আমার বিচার বিবেচনার ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিন। সাহিত্যিকের পক্ষে সেটা পরম সৌভাগ্যের কথা।"

এমনি ছিলেন মানিক। তাঁর জীবনে বলিষ্ঠতা ছিল ঔদ্ধত্য ছিল না। ছাত্র সুলভ কৌতুহল এবং নিজের ভুলত্রুটি সংশোধন করে সঠিক পথে চলবার আগ্রহ নিয়েই তিনি সাহিত্য পথের নায়কতা করেছেন।

হলুদ নদী সবুজ বন প্রকাশিত হল ১৩৬২ সালের মাঘ মাসে। প্রকাশক নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড। উপন্যাসের গোড়ায় 'লেখকের কথা'য় মানিক লিখেছেন :

"হলুদ নদী সবুজ বন আট দশ মাস আগে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আমার শরীর খারাপ, এই দোষে বইটা এত দিন আটক হয়ে ছিল। দোষ আমার…।"

'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসের লখার মার চরিত্রটি খুব জীবন্ত। ও যেন মানিকেরই চরিত্র। সে বাল বিধবা। কথকতা দ্বারা তার জীবন নির্বাহ হয়। ইচ্ছে করলে সেও রূপযৌবনের পসরা নিয়ে চাঁদের হাট বসাতে পারত কিন্তু তা সে করেনি। তার লোভ কম প্রাণে আনন্দাবেগ আছে। গরীব মানুষের প্রতি তার গভীর মমত্ব বোধ। সে লৌকিক সংস্কৃতির বাহক। সেজন্য নিছক অর্থের বিনিময়ে সিনেমা কোম্পানীতে তার কথকতাকে সে বিক্রয় করেনি। সাধারণ মানুষকে আনন্দ দিয়ে তাদের সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িয়েই তার আনন্দ। এ যেন মানিকেরই জীবন, তিনি যখন চরম দারিদ্রের সম্মুখীন তখন ডাঃ বিধান রায় তাঁকে বড় চাকুরী দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাতে শিল্পীর স্বাধীনতা নষ্ট হবে বলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

মাশুল উপন্যাসটি সাহিত্য জগৎ প্রকাশ করেন ১৩৬৩ সালের আশ্বিন মাসে।

মানিকের শরীর তখন খুবই খারাপ। জোর করে নিজেকে শক্ত রাখবার জন্য তিনি অত্যধিক মদ্য পান করেন। ফলে স্মৃতিভ্রষ্টতা দেখা দেয়। অনাদি মিলনী সুনীলের কাহিনী চালচলন উপন্যাসে আছে। এই উপন্যাসে তার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিল দেখা যায়। আসলে সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে কাহিনী রচনা করবার শক্তি আর মানিকের নেই। কিন্তু মানিক নিজে তা কখনো স্বীকার করতেন না। বন্ধু-বান্ধবদের বলতেন, "দেখুন তো মদ খেলে আমি কেমন শক্ত হয়ে চলাফেরা কথাবার্তা বলতে পারি আর ওরা কেবল আমাকে মদ খেতে নিষেধ করবেন।"

মানিকের এই সময়কার অবস্থা সম্পর্কে শ্রীজগদানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "মানিকের মৃত্যুর মাস দুয়েক আগে দেখতে গিয়েছিলাম। এক ঘরে মানিকের বড় মেয়ে পা ভেঙ্গে পড়ে আছে ও অপর ঘরে মানিকের বাবা মৃত্যু শয্যায়। মানিকের সঙ্গে দেখা হতেই মানিকের মুখে মদের গন্ধ পেলাম। ও জিজ্ঞেস করতেই বল্লো, "মাইরি মদ খাইনি।" এই রকম সাংসারিক অবস্থাতেও তাঁর অটুট মনোবল দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম, আমার সঙ্গে পুরানো-স্মৃতির নানারকম গল্প হলো, মনে হলো না যে কোন সংসারের চিন্তা আছে। ও অসম্ভব পিতৃভক্ত ছিল।"

মানিক অনেক সময় নিজেই নিজের চিকিৎসা করতেন। আয়ুর্বেদ বই থেকে প্লীহা, যকৃত, পাণ্ডুরোগ, পঞ্চামৃত, ক্রিমি থাকলে পুরানো জ্বর ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা প্রতিকার ব্যবস্থা ডায়েরিতে টুকে রেখেছিলেন।

মানিকের শরীরে তখন নানারোগের জটিলতা দেখা দিয়েছে। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে তিনি রক্ত আমাশয় রোগে ভুগছিলেন। যকৃতের রোগ তো তাঁর ছিলই। এক বছরের উপর এই যকৃতের পীড়ায় তাঁর আয়ু ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। অবশ্য দেবীপ্রসাদ বলেন, তিনি মৃগীরোগেই মারা গিয়েছেন। ৩০শে নভেম্বর শুক্রবার সকাল বেলা হঠাৎ মানিক সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁর জ্ঞান আর ফিরে আসে নি। ২রা ডিসেম্বর রোববার রাত প্রায় দশটার সময় তাঁকে তাঁর বরানগরের বাড়ি থেকে নীলরতন সরকার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সোমবার ভোর সাড়ে চারটেয় তিনি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর পরলোকগমনের সংবাদ প্রচারিত হবার পর বহুলোক হাসপাতালে আসেন। কিন্তু হাসপাতালে বেশী সময় মৃতদেহ না রাখায় অনেককে বিমুখ হয়ে ফিরে যেতে হয়। বেলা প্রায় দশটার সময় মানিকের নশ্বর দেহ পত্রপুষ্পে আচ্ছাদিত করে লোয়ার সার্কুলার রোডে কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটির অফিসে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখান থেকে বিকেল ৪টায় হাজার হাজার গুণমুগ্ধ মানুষের এক বিরাট

শোকযাত্রা সহকারে তাঁর নশ্বর দেহ 'স্বাধীনতা' পত্রিকা অফিস, কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পঃ বঃ শান্তি পরিষদ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, রাজ্য কৃষক সভা অফিস ও ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী সাজ্যর অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মৃতদেহে মাল্য অর্ঘ্য অর্পিত হয়। পরে এক বিরাট শোকযাত্রা নিমতলা শ্মশানঘাটে পৌঁছলে সেখানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মানিকের ট্র্যাজিক জীবননাট্যের এখানেই অবসান ঘটে।

॥ ২৭ ॥

মানিকের সাহিত্যসৃষ্টি তাঁর মৃত্যুর পরেও বহু প্রকাশলাভ করতে থাকে। মৃত্যুকালে তাঁর অপ্রকাশিত বহু লেখা এবং চিঠিপত্র এক বাণ্ডিলে বাঁধা ছিল। অবজ্ঞা এবং অবহেলায় তার কিছু কিছু চিরদিনের জন্য হারিয়ে গিয়েছে। মানিক নিজে কিন্তু খুব বেহিসেবী ছিলেন না। তিনি কখন কার কাছ থেকে কোন লেখা বাবদ কত টাকা পেয়েছেন তার হিসেব লিখে গিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর ডায়েরিতে রোজকার বাজারের হিসেব পর্যন্ত পাওয়া যায়। তিনি ডায়েরির একজায়গায় হাতে লেখা সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ কপির এক তালিকা দিয়েছেন :

১। ঘরেতে ডাক্তার এল রেশন নিয়ে ১ পাতা (ঘরেতে ভ্রমর এল গানটির প্যারডি বোধহয়)

২।	খুনী	১ পাতা
৩।	পরিবর্তন	১ ,,
৪।	A wet night	1 Page trans.
৫।	পঞ্চান্ন	২ পাতা
৬।	সাধু	৪ ,, (ভারতে প্রকাশিত ?)

এ গুলোর আর কোন হদিস পাওয়া যায় নি। এ ছাড়া বহু সাময়িক পত্র পত্রিকায় মানিকের এখনো বহু গল্প কবিতা ছড়িয়ে আছে। অনেক পত্রিকা অধুনা লুপ্ত। আমরা কিছু কিছু গল্প সংগ্রহ করেছি। যেগুলো পারিনি সেগুলোর একটি তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

মানিকের মৃত্যুর পর অনেকগুলো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলো অধিকাংশই উপন্যাস। সে গুলোর নাম প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান, মাটিঘেঁষা মানুষ, মাঝির ছেলে এবং শান্তিলতা। এ ছাড়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এবং

অপ্রকাশিত গল্প থেকে বেছে নিয়ে প্রকাশিত হল 'গল্প-সংগ্রহ'। এ গুলোর মধ্যে 'মাটিঘেঁষা মানুষ' অসমাপ্ত উপন্যাস। "মানিকবাবুর ইচ্ছে ছিল 'চাষীর মেয়ে—কুলির বৌ' নামে একটি বড় উপন্যাস লিখবেন।

পরে তাঁর সে মতের পরিবর্তন হল। এবং তিনি স্থির করলেন 'চাষীর মেয়ে' ও 'কুলির বৌ' নাম দিয়ে দুটি ছোট ছোট উপন্যাস লিখবেন।

অবশেষে তাঁর সে মতও পাল্টে গেল এবং 'চাষীর মেয়ে' পরিবর্তন করে তিনি নতুন নামকরণ করলেন, 'মাটিঘেঁষা মানুষ'।

'মাটিঘেঁষা মানুষ' সম্পূর্ণ করবার আগেই 'কুলির বৌ' এর একটি মাত্র কিস্তি তিনি লিখেছিলেন।"

মানিকের এই উপন্যাসের লেখা ক্রমশ মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু এই উপন্যাস তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করে দিলেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশ করেছেন ডি. এম. লাইব্রেরী ১৩৬৪ সালের বৈশাখ মাসে।

'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান' উপন্যাসটি প্রকাশ করেন বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৩৬৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে।

'মাঝির ছেলে' (৭ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮১ শকাব্দ) প্রকাশ করেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ প্রাইভেট লিঃ।

'শান্তিলতা' উপন্যাসটিও প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। ইহা প্রথমে ১৯৫৯ সালের (১৯৮১ শকাব্দ) শারদীয় এলোমেলো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী 'গল্পসংগ্রহ' প্রকাশ করেন ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে। প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়েছিল, "এই পুস্তক বিক্রয়ের সমগ্র লভ্যাংশ লেখকের পরিবারের সাহায্যার্থে দেওয়া হইবে।" পরে ন্যাশনাল বুক এজেন্সী গল্পসংগ্রহের পরিবর্তে 'উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ' নামে পঞ্চাশটি গল্পের এক বৃহৎ সংকলন প্রকাশ করেন ১৯৬৩ সালের নভেম্বরে।

পিপল্‌স পাবলিশিং হাউস থেকে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এগারটি গল্পের ইংরেজী অনূদিত এক সংকলন প্রকাশিত হল ১৯৫৮ সালে। সংকলনের নাম 'Primeval and other stories.' অবশ্য এর আগেও দুইটি ইংরেজীতে অনূদিত গল্প সংকলনে মানিকের দুটি গল্প—'ঘর ও ঘরামি' এবং 'সিঁড়ি, প্রকাশিত হয়েছিল। সংকলন দুটির নাম 'Stories of rural Bengal' এবং 'The Best stories of Modern Bengal. প্রথমটি সম্পাদনা করেন সঞ্জয়

ভট্টাচার্য এবং দ্বিতীয়টি দিলীপকুমার গুপ্ত।

এ ছাড়া অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির ১৯৫৮ সালের জুন মাসে প্রকাশ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' এবং গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ১লা বৈশাখ, ১৩৭৫ তারিখে একটি পুরানো উপন্যাস, পাঁচটি পুরানো এবং পাঁচটি নতুন গল্প নিয়ে প্রকাশ করেছেন 'কিশোর বিচিত্রা'।

॥ ২৮ ॥

৭।১২।৫৬ তারিখ শুক্রবার কোলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটুটে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে এক বিরাট শোকসভা হয়। সভায় তিল ধারণের স্থান ছিল না। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং শোকজ্ঞাপক প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র এই সভায় বলেন, "সাহিত্যের ধারায় মানিক এক নতুন যুগের সন্ধান দিয়েছিলেন। সমাজের সমস্ত ধারণা ও বিশ্বাসের মূল ধরে তিনি আশ্চর্যভাবে নাড়া দিয়েছিলেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল তাঁর অন্যতম বিশেষত্ব।"

এই সভায় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় চমৎকার কথা বলেছিলেন, "পশ্চিমের নবাগত শিল্প-সমৃদ্ধ সভ্যতা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপটে ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে যে সংঘর্ষ বাধিয়েছিল তাতে ছিল অমৃত আর গরল, মাইকেল সেই গরল পান করে দেশকে দান করেছিলেন অমৃত। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ধনতান্ত্রিক প্রাচীন সভ্যতা ও সমাজতন্ত্রের নূতন ভাবাদর্শের সংঘাতে যে গরল উঠেছিল, মানিক ব্যক্তি জীবনে স্বয়ং সেই গরল পান করে সাহিত্য জীবনে অমৃত দান করেছেন।"

সজনীকান্ত দাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের প্রতি দেশবাসীর কর্তব্য ও দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঐ বৎসরের রবীন্দ্র পুরস্কার তাঁকে দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট অনুরোধ জানান। পরিচয় পত্রিকায় তিনি লিখিতভাবেও এই অনুরোধ করেন।[১]

"মানিক স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যবরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার পরিবারকেও এই দারিদ্র্য লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে কি না মানিকের জীবিত দাদারা তাহা নির্ধারণ করিবেন। না করিলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং তাঁহার বন্ধু-বান্ধব দেশবাসীর দায়িত্ব গুরুতর। আমরা প্রস্তাব করি, আপাততঃ

১। পৌষ, ১৩৬৩।

এই বৎসরে তাঁহাকে রবীন্দ্র পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা দিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করুন। এখন পর্যন্ত যাঁহারা এই পুরস্কার পাইয়াছেন মানিক তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা যোগ্যতায় ন্যূন নহেন।...আমরা শুধু এইটুকু নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, মৃত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ততপক্ষে পাঁচখানি উপন্যাস ও গল্প পুস্তক রচনা করিয়াছেন, যাহা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সাদরে স্বীকৃত হইবে এবং বাংলা দেশের সাহিত্যকে অধিকতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবে।"

শ্রীমনোজ বসু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাডেমি পুরস্কার দিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

স্বর্গত মানিক বন্দোপাধ্যায়ের পরিবারের সাহায্যার্থে অর্থদানের আবেদন জানান হলে সভায় অল্পক্ষণের মধ্যে নগদ পাঁচ শতাধিক টাকা ও একটি সোনার চুড়ি সংগৃহীত হয়। উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে অর্থ সাহায্য দেবার প্রচুর উৎসাহও দেখা যায়। ভবিষ্যতে অতুলচন্দ্র গুপ্তের ঠিকানায় এই অর্থ সাহায্য প্রেরণের জন্য সাধারণকে অনুরোধ জানান হয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকীয় এবং বিশেষ প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখলে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে মানিকের স্থান নির্দিষ্ট করতে সুবিধে হয়। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে (৮।১২।৫৬) লেখা হয়:

"বৈষয়িক অর্থে মানিকবাবুকে কেহ সফল সাহিত্যিক বলিবেন না। অন্যতর অর্থে তিনি সফলতম সাহিত্যিক। সাহিত্য জীবনে সাম্প্রতিককালে তাঁহার মত এতখানি দুঃখ যন্ত্রণা আর কেহ পাইয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু জনহৃদয়ের এত সুগভীর শ্রদ্ধাই বা আর কয়জন পাইয়াছেন? এক সুদুর্লভ সুকঠোর নিষ্ঠায় তাঁহার শিল্পাদর্শকে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই আদর্শকে তিনি ধূলায় মলিন হইতে দেন নাই।

মানিকবাবু ছিলেন জীবনবাদী সাহিত্যিক। জীবন সমুদ্রকে মন্থন করিয়া যে অমূল্য রত্নরাজি তিনি আহরণ করিয়াছিলেন, দেশবাসীর হাতেই তিনি তাহা তুলিয়া দিয়াছেন। মন্থনের পরিণামে শুধু অমৃত ওঠে নাই। হলাহলও উঠিয়াছিল। সেই হলাহল তিনি আপন কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন।"

দেশ পত্রিকায় ঐ সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন:

"মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বিরলতম লেখকদের একজন জীবনে ও সাহিত্যে মানস সত্তা যাঁদের অভিন্ন। ফলে ছাঁটা মাপসই মানুষদের মাঝখানে বিসদৃশ

বেমানান প্রাণবেগ ও ঘোলাটে মুখস্থ ধারণার জগতে অন্তর্ভেদী স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে আসবার যে ট্র্যাজিডি তাই তাঁর জীবন ও দৃষ্টিকে স্পর্শ না করে ছাড়েনি।

জীবনে ও সাহিত্যে তাঁর দুরন্ত প্রাণবেগ সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খলতার অপবাদ ওঠবার যদি কোনো অবকাশ হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য দায়ী সেই কাল ও সমাজ এ প্রাণবেগকে সহজ স্বাভাবিক ভাবে প্রবাহিত হতে দেওয়ার মত সুবিন্যস্ত দৃঢ়তা যার মধ্যে এখনো অনুপস্থিত। তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ সুস্থতা সম্বন্ধে যদি কোথাও সন্দেহ জাগে তাহলে নিজেদের সুস্থতার স্বরূপও আমাদের আগে বিচার করা দরকার।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত গোত্র ছাড়া প্রতিভা যে উৎকেন্দ্র, তার কারণ আমাদেরই অসম বিন্যাসের বিশৃঙ্খলা। তাঁর রচনায় যেটুকু অসুস্থতার ছায়া—তা আমাদেরই রুগ্নতার প্রতিবিম্ব।

মাঝারি মাপের মানুষ হলে জীবন ও সাহিত্য তাঁর অভিন্ন না হলে হয়ত অনেক কিছু তিনি মানিয়ে নিতে পারতেন; রচনায় ও জীবনে তেমন একটা সুলভ সৌষ্ঠব রেখে যাওয়াও তাঁর সাধ্যাতীত হতনা, সাবধানী সুবিবেচকদের বাহবা যাতে সহজেই পাওয়া যায়।

কিন্তু কোন দিকেই মাঝারি হবার সৌভাগ্য নিয়ে তিনি আসেন নি। চূড়াও যেমন তাঁর মেঘ-লোক ছড়ানো, খাদও তেমনি অতল গভীর। তাই মানিয়ে নেবার মানুষ তিনি নন।...

অকালে অকৃতার্থরূপে বিদায় নিলেও আমাদের জীবনবোধের ভূয়ো আত্মপ্রসাদের ভিৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ একটু নাড়িয়ে যান নি কি?"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে শ্রীবুদ্ধদেব বসু লিখেছেন,[১] "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সামাজিক চেতনাকে মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা আক্রান্ত হ'তে দেননি; তাঁর জগতে এমন কোনো স্তর নেই যেখানে 'ধনী-নির্ধন', 'উচ্চ-নীচ', 'সুস্থ-রুগ্ন' প্রভৃতি সমাজ স্বীকৃত বিপরীত গুলো কোনো ভাবগত আদর্শের চাপে ভেঙে পড়ে। সেইজন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বভাবীরাও ছায়া মূর্তির মতো হানা দেয় না, রক্ত মাংসে সীমিত হ'য়ে থাকে; তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় ঘটনা বিন্যাসও সর্বদাই যথাযথ মনে হয়। মধ্য-বিশ-শতকের বাংলা দেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলার ঘনিষ্ঠ রূপকার তিনি; যে সময়ে তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীর একটা অংশ নিচে নেমে এলো, এবং তথাকথিত দীন শ্রেণীর একটা

১। কবিতা, পৌষ, ১৩৬৩।

অংশ প্রবল হ'য়ে উঠলো, সেই অধ্যায়ের বিবিধ লক্ষণ ভাবীকালের জন্য মূর্ত হ'য়ে রইলো তাঁর রচনায়। বাংলা কথাসাহিত্যে বস্তু নিষ্ঠায় তিনি অদ্বিতীয়; বঙ্কিমের মতো, অথবা কোনো কোনো উত্তর পুরুষের লেখকের মতো, তাঁকে কখনো স্থানে অথবা কালে দূরে স'রে যেতে হয়নি; উপন্যাসের আসর সাজাতে হয়নি অতীতের কোন নিরাপদ অধ্যায়ে, অথবা কৌতূহলোদ্দীপক বৈদেশিক পরিবেশে; বর্তমান, প্রত্যক্ষ ও সমসাময়িকের মধ্যেই তিনি আজীবন শিল্পের উপাদান খুঁজেছেন, এবং তার যে-অংশটিকে শিল্পরূপ দিয়ে গেছেন, তা সাক্ষর ও বিত্তহীন সর্বসাধারণের সর্বাধিক পরিচিত। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা।"

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন, "Manik Bandopadhyaya wrote in a direct unornamented style. It has a dry efficiency, which, at its best is of surprising literary force." (Forward to Primeval and other stories).

'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়:[১]

"মানুষের প্রতি যে গভীর মমত্ববোধ ও গভীরতর দায়িত্ববোধ হইতে নিঃস্ব মেহনতী মানুষের জীবনযাত্রাকে তিনি নির্মম বাস্তবতায় চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, ভাবালুতাকে স্তব্ধ এবং আবেগকে সংযম করিয়া যুক্তি, বুদ্ধি ও বিশ্লেষণী মেধার সাহায্যে গলিত পুঁজিবাদী সমাজের স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা অন্তত আমাদের সাহিত্যিক সমাজে মেলে না।...জীবনের শেষ দিকে ব্যাপক গণ বিক্ষোভ ও কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে তাঁহার লেখনী এক আশ্চর্য দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। বিপ্লবী জীবন ও বিপ্লবী ঘটনাকে রসোত্তীর্ণতার শিখরে তুলিয়া তিনি বাংলার প্রগতি সাহিত্যকে নূতন পথের নির্দেশ দিয়াছিলেন।"

॥ ২৯ ॥

বাংলা সাহিত্যে মানিক ছিলেন এক জীবন্ত প্রতিবাদ। মধ্যবিত্ত জীবনে জন্মগ্রহণ করে তার ঘুণধরা অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার সর্পিল গতিতে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন, এই সমাজের ন্যাকামি আর ভণ্ডামি তাঁর কাছে মনে হয়েছিল অসহ্য। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে ভাবালুতাকে সযত্নে পরিহার করে

১। ৩.১২.৫৭ তারিখের সম্পাদকীয়।

সমাজের নীচু তলার মানুষের প্রতি একাগ্রতা বোধ করেছিলেন। সাহিত্য রচনা করতে বসেই তিনি অঙ্ক জ্যামিতির মত এই মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা একের পর এক তুলে ধরলেন। পুতুল নাচের ইতিকথা, প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, সমুদ্রের স্বাদ, একের পর এক গ্রন্থে তিনি সত্যিই যেন মহাকালের জটার জট খুলে দিয়ে দর্পণের মত তুলে ধরলেন আর সকলে তা দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তুলে ধরলেন পদ্মা নদীর মাঝি এবং শহরতলীর শ্রমিকদের কথা। একদিকে ভাঙন অন্যদিকে গড়া দুটো রূপকেই তিনি প্রত্যক্ষ করে তুললেন।

আর পাঁচজন সাহিত্যিকের ন্যায় তিনি আপন কল্পনা বিলাসে মত্ত হয়ে ওঠেন নি, বিশৃঙ্খল সমাজের নানা সমস্যা এড়িয়ে অবাস্তব রোমান্টিক চরিত্র সৃষ্টি করে সহজে পাঠক চিত্ত জয় করার চেষ্টা করেন নি। দৈনন্দিন বিড়ম্বিত জীবনের একেবারে গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার কারণ অনুসন্ধান করেছেন, নতুন জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন, তার পথ নির্দেশ করেছেন। "এলিয়টের মতো, গ্রেহাম গ্রীনের মতো, ইভলীন ওয়ার মতো বা আরও অনেক লেখক লেখিকার মতো ভগবানের ওপর সুখ-দুঃখের দায় চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া তাঁর মতো সমাজ-সচেতন লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিল না বলে তিনি একই জীবনে জন্ম-জন্মান্তর দেখাতে চেয়েছিলেন মানুষের ব্যাপক সামাজিক চেতনার মধ্যে দিয়ে।"[১]

মানিক ছিলেন তাঁর কীর্তির চেয়েও মহৎ। মানুষ হিসেবে বিশেষ করে পল্লী বাংলার এবং সহরতলীর দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষদের যে তিনি অকৃত্রিম ভালবেসেছিলেন এবং তাদের দারিদ্র্য মোচনের পথে, মুক্তির পথে, নিজের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিয়েছিলেন তার তুলনা হয় না। তাঁর সৃষ্ট শশী ডাক্তার গাওদিয়ার গ্রামবাসীদের ভালবাসত, হোসেন মিয়া পদ্মা নদীর মাঝিদের নিয়ে নতুন দ্বীপ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল বটে কিন্তু তাদের সেই ভালোবাসাও নিঃস্বার্থ এবং সক্রিয় নয়। কিন্তু পরবর্তী জীবনে এই দুঃখ নিপীড়িত শোষিত অসহায় মানুষদের প্রতি মানিকের ছিল গভীর সহানুভূতি এবং তাদের দুঃখ দূরীকরণের জন্য বাস্তবতর আত্মনিবেদনের ইচ্ছা হয়ে উঠে প্রবল। তিনি সত্যি ছিলেন কৃষাণের শ্রমিকের সংগ্রামী শরিক। তিনি তাদের আন্দোলনের সার্থক বাণীরূপ দান করলেন। এখানেই মানিকের সাহিত্যের চেয়েও মানিক আরো বড়।

১। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—মাটিঘেঁষা মানুষ এর ভূমিকা।

ফ্লবেয়া মোপাসাঁকে বলতেন, "মনে রাখবে আর্টের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে হয়। শিল্পীর জীবন শিল্প সৃষ্টির উপায় মাত্র ; তার জীবন উপভোগের জন্য নয়, আর্টের বেদীমূলে তাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করে দিতে হয়।" মোপাসাঁ আর্টের বেদীমূলে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে গেলেন। জীবনে ক্ষত বিক্ষত এই বিখ্যাত শিল্পীর অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় প্রাণের স্পন্দন থেমে গিয়েছে শিল্প চেতনায় চির অস্থির, ভাবীকালের সুন্দর জীবন ও সমাজ গড়ার কাজে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আর্টের জন্যই সব কিছু দিয়ে গেলেন বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন চেতনার পথিকৃৎ। কিন্তু তাঁর জীবনের অবসান হল ট্র্যাজিক নায়কের মতই। বাংলা সাহিত্যের যুগন্ধর মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের ন্যায় নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায় মানিককেও হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হল।

সাম্যবাদে দীক্ষিত হবার পর মানিকের সাহিত্যকৃতি নিয়ে অনেকের মনে সংশয় জেগেছে। অনেকেই প্রশ্ন করেছেন সাহিত্যিক মানিকের মৃত্যু হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর মানিকের বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে কখনো মন্থরতা আসেনি। নানা সমস্যায় কণ্টকাকীর্ণ জীবন পথে তিনি সাহিত্যের সৌরভ বিতরণ করেছেন। সমসাময়িক অনেক লেখকের মত তাঁর চিন্তায় এবং সৃষ্টিতে স্থবিরতা দেখা দেয় নি। জীবন জয়ী সাধনা তাঁকে নতুন নতুন সমস্যা রূপায়ণে তৎপর করে তুলেছে। এই পথ অবশ্য চিরাচরিত নয়। সমাজ জীবনে এতকাল যারা মার খাচ্ছিল তারা মরীয়া হয়ে উঠেছে। শোষিত শ্রমজীবী মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। জীবনের পুরানো মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে নতুন মূল্যবোধ মুখর হয়েছে। মানিক যখন এই নতুন মূল্যবোধের কথা রূপায়িত করেন তখন অভ্যস্ত পথের নায়কদের মনে প্রশ্ন এবং সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক ১৯৩৬ সালে গোর্কীর মৃত্যুর পর তাঁর বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযোগ উঠেছিল যতদিন যাচ্ছে তত গোর্কীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ব অনুভূত হচ্ছে। মানিকের সাহিত্যে বিচারও হবে আগামী দিনে। তখনই তাঁর সত্যিকার স্থান নির্ণীত হবে।

অসাধারণ ক্ষমতাকে সাধারণের মানদণ্ডে উপলব্ধি করা শক্ত। মানিকে পরিবারে সকলেই আশা করেছিল, মানিক ভালকরে লেখাপড়া শিখে ভা চাকুরী করবে। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আর পাঁচজনের মতই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে মানিকের পক্ষে তা করা কখনো সম্ভব হয় নি। স্নেহময় পরিবারের প্রতি তাঁ আসক্তি কম ছিল না। কিন্তু কেবল নিজের পরিবারের প্রতি সাধারণ দশ

মানুষের মত দৃষ্টি দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সেজন্য মানিকের পরিবারের মানুষদের মানিকের সম্পর্কে ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মানিক যদি তাই করতেন, ভাল লেখাপড়া করে ভাল চাকুরী করতেন তাহলে কে আজ তাঁকে মনে রাখত। ঠিক এই কথাই অতুলচন্দ্র গুপ্ত মানিকের বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক বড়দা সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন।[১] বড়দা মানিকের সুরাপান সম্পর্কে ভীষণ অনুযোগ করলে অতুল গুপ্ত বলেছিলেন, আমি আপনি সকলেই একদিন মরে যাব। তারপর কে আর আমাদের মনে রাখবে? মানিক তখনো বেঁচে থাকবে তাঁর সাহিত্যের জন্য। সেজন্য মানিককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। মানিক সাহিত্য সাধনাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বলেই আজ মানিকের সঙ্গে মানিকের পরিবারও অমরত্ব লাভ করেছে।

মানিকের গুণমুগ্ধ পাঠকের সংখ্যা বহু। দিন দিনই তা বর্ধমান। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের পর মানিকের মত জনসাধারণের হৃদয়ের এত আতিথ্য আর কেউ পায় নি। মানিকের শব মিছিলে এবং শোক সভায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গোর্কীর মৃত্যুর সংবাদে লণ্ডনের একজন শ্রমিক মহিলা বলেছিলেন It is sad to die when one is loved by so many people. মানিকের মৃত্যুর পর আমরা সেই কথা বলতে পারি। মানিক তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার দ্বারা আন্তরিক ভাবে এবং একান্ত মনে নতুন জীবন গড়ার স্বপ্নে কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত জীবনের একান্ত কামনাকে, আপোষহীন সংগ্রামকে রূপায়িত করার জন্য জীবনজয়ী সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলেই আমরা শিল্পী মানিক, মানুষ মানিকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছোট গল্প

অতসীমামী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেমন প্রথম প্রকাশিত গল্প তেমনি 'অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প' তাঁর প্রথম গল্প সংকলন গ্রন্থ।[১] এই গল্পগুলিতে আছে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব, ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্ব এবং শরৎচন্দ্রের প্রভাব। অতসীমামী গল্পটি মানিক লিখেছিলেন বাজি রেখে। সুতরাং এই গল্পে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় অপেক্ষা বাজি জেতাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। তবু এই গল্পটির প্রতি মানিকের একটা বিশেষ মমত্ব ছিল। পরবর্তীকালে বহুবার তিনি এই গল্প সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গল্পটি সেন্টিমেন্টাল। রোমান্টিক আবেগে পূর্ণ।

ইহা অপূর্ব বাঁশীবাদক যতীনমামা এবং অতসীমামীর রোমান্টিক প্রেমের গল্প। অবশেষে ট্রেন দুর্ঘটনায় যতীনের মৃত্যু হয় এবং যেখানে যতীনমামা মারা গিয়েছিল সেখানে অতসীমামী প্রতি বৎসর এসে স্বামীর মৃত্যুদিন পালন করে। এক নাটকীয়তার মধ্যে গল্প পরিণতি লাভ করে। অতসীমামী একটি রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী হলেও এই গল্পে মাটির পৃথিবীর দুটি মানুষের আবেগপ্রবণতা পাঠককে অভিভূত করে। নেকী[২] ও এক রোমান্টিক প্রেমের গল্প। এই গল্পেও মানিক শরৎচন্দ্রের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। দেউলে পিতার অকাল-মৃত্যুর পর মামার আশ্রয়ে গ্রামে এসে এক মেয়ের প্রতিবেশী হাকিম পুত্রের সঙ্গে প্রণয়ের কাহিনীই এই গল্পের বিষয়বস্তু। নেকী একটি সুন্দর সেন্টিমেন্টাল গল্প।

'বৃহত্তর ও মহত্তর' গল্পের আবেদন ভিন্ন। এই গল্পে মমতাদি স্বামী পুত্র ত্যাগ করে নারী সমিতিতে কাজ করতে গিয়েছে। কিন্তু এ কাজ সে রাগের

১। এই সংকলন গ্রন্থে আছে (১) অতসীমামী (২) নেকী (৩) বৃহত্তর ও মহত্তর (৪) শিপ্রার অপমৃত্যু (৫) সর্পিল (৬) পোড়াকপালি (৭) আগন্তুক (৮) মাটির সাকী (৯) মহাসংগম এবং (১০) আত্মহত্যার অধিকার।

২। 'ঘরোয়া', কলিকাতা—৬ থেকে প্রকাশিত সুকুমার ঘোষ সম্পাদিত 'প্রেমের গল্প' (১৯৬৪) সংকলনে 'নেকী' গল্পটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মাথায় করে নি। ভেবে চিন্তে করেছে। এগার বছর ধরে সে স্বামীর অবিচার অত্যাচার সহ্য করেছে। ত্যাগ করেও তাদের প্রতি তার মমত্ব বোধের অভাব হয়নি। স্বামী ত্যাগের কথায় সে বলেছে, "স্বামী আমার কাছে ছোট নয়—তুচ্ছ নয়—কিন্তু পর। সব স্বামীই পর—নিজের চেয়ে মানুষের আপনার কেউ নয়—প্রেমে নয়, স্নেহে নয়। প্রেম দুটি আত্মাকে কাছে আনে কিন্তু আত্মগত আত্মার চেয়ে কাছে আসা আত্মার দূরত্ব বেশী। তাই আমি ভাবতাম যে, শুধু পরের কল্যাণেই বেঁচে থাকব, আমার আত্মার কল্যাণ নেই? আমার জীবন তাদেরি কল্যাণে ব্যর্থ হবে যাদের কল্যাণ হয় না? সবাই পরের জন্য অবশ্য বেঁচে থাকে, কিন্তু নিজের জন্য আহরণ করে ওই বেঁচে থাকার সার্থকতাটুকু। ওরি নাম নিজের আত্মার কল্যাণ। নিজেকে দিলাম কিন্তু দেওয়াটা মিথ্যা হল না, এই টুকু। অন্যায়ের বিনাশের জন্য দধীচির আত্মদান—ইন্দ্র বজ্র নিয়ে খেলা করবে বলে নয়। আমি দধীচির মেয়ে নই। যদি হইও দধীচির মেয়ে, আমার অস্থির বজ্র নিভে গেছে। একটু তাপ শুধু আছে নেভা বজ্রের ভস্মে। সেইটুকু যদি বরফের ঘর রাখতে ব্যয় করে যেতাম, মরবার সময় অপচয়ের স্মৃতিতে আমার আত্মা দগ্ধ হত। আজীবন স্বামী সেবার পুণ্যও পুড়ে হত ভস্ম। কারণ, সারা-জীবন চোখ বুজে কাটিয়ে মরবার সময় আমি চোখ মেলে দেখতাম দুর্লভ জীবন কার পূজায় কাটল। তখন জীবন-ব্যাপী দানব-পূজার আপশোষ নিয়ে আমায় পরলোকে যেতে হত।" বর্তমান অবস্থার কথা বলতে গিয়ে সে বলে, "আমার এ জীবন আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের বহু উর্ধ্বে—আমার এ জীবন তুলনাহীন। ছিলাম যন্ত্র —আজ আমি মানবী, যার আত্মা আছে, যার জীবনের অনেক মূল্য, অনেক প্রয়োজন, অনেক মানে।"

এই গল্প পড়ে ইবিসেনের 'নোরা' নাটক, রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তি' কবিতা এবং 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের কথা মনে হয়। অবশ্য মানিকের প্রকাশ ভঙ্গী স্বতন্ত্র,আরও বলিষ্ঠ এবং যুক্তিনিষ্ঠ। (মানিকের চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক। ভাবাবেগকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দেন নি। বৈজ্ঞানিকের মত জীবনকে তিনি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর গল্প উপন্যাসে আছে জীবনের সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণেই ধরা পড়েছে আমাদের জীবন ও সভ্যতার পুঞ্জীভূত কত মিথ্যা ও ফাঁকি।

'শিপ্রার অপমৃত্যু' গল্পে মানিক প্রতিভার স্বকীয়তা সূচিত হল। অনিন্দিতা-পরাশরের প্রেমে খাদ ছিল না। অনিন্দিতার ভালবাসায় কোন বিকার নেই এবং এই ভালবাসার মূল্যেই পরাশরের জীবনকে সে শোধরাতে চায়। কিন্তু

প্রায় বিগত-যৌবনা অনিন্দিতার শিক্ষয়িত্রী শিপ্রা পরাশরের প্রেম লাভ করতে গিয়ে যে নকল প্রেমের অভিনয় করল এবং যে বিকৃতির পরিচয় দিল তারই পরিণতিতে এল আকস্মিকতা। ঘটল তার প্রেম জীবনের অপমৃত্যু।

'সর্পিল', 'পোড়াকপালী', 'আগন্তুক', 'মাটির সাকী' এবং 'মহাসংগম' এই পাঁচটি গল্পে আছে বিকারগ্রস্ত এবং অসুস্থ নরনারীর কাহিনী। এরা সকলেই অসুখী। এদের অসুস্থতার মূলে আছে বিকারগ্রস্ততা। মানিক এই সব অসুস্থ নরনারীর মনোগহনের জটিলতার সন্ধান দিয়েছেন। প্রেমের ক্ষেত্রেই মানব জীবনের জটিলতা এবং বিকৃতি তীব্রভাবে প্রকাশ লাভ করে। 'সর্পিল' গল্পে বিকারের ভয়ংকরতা বর্ণিত হয়েছে। পূর্বপুরুষের এক পোড়ো বাড়িতে এককালের দেবদ্রোহী বিলাসী শংকর এখন কালীপূজা করে। সে বলে শক্তি পূজা। শংকরের স্ত্রী কেতকীর চিঠি পেয়ে তার বাল্যবন্ধু অনন্ত সেই পোড়ো বাড়িতে যায়। রাতে আশ্বিনের ভীষণ ঝড়ে কড়ি কাঠ আর টালি পড়ে অনন্ত-কেতকী মারা যায়। সকালে শংকর ওদের উপর ঝুড়ি ঝুড়ি ইঁটের স্তূপ ফেলে দেয়। বহুকাল পরে যেন তার পৈশাচিক সাধনা শান্তিলাভ করে।

মানুষের মনোজীবনের অন্তরালে কত পাপ ও ক্লেদ আছে তারই এক সুন্দর গল্প সর্পিল। শংকর কালীমন্ত্রের জোরে ভাঙা মন্দিরের সাপখোপের মধ্যে বাস করে অথচ সেখানে কার্বলিক এসিডের গন্ধ পাওয়া যায়। মানব জীবনে এরূপ বহু অসঙ্গতি ও পরস্পর বিরোধী আচরণর বর্তমান। সর্পিল গল্প যেন সরীসৃপের পূর্বাভাষ।

এই সংকলন গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ গল্প হোল 'আত্মহত্যার অধিকার'। এই গল্পে আছে একটি দরিদ্র পরিবারের দুর্দশার চিত্র আর তার সঙ্গে আছে বিধাতা ও মানুষের প্রতি নিষ্ফল আক্রোশ। লেখকের প্রকাশভঙ্গী বক্র এবং ব্যঙ্গাত্মক। মানুষের এই পৃথিবীতে সম্পদ এবং সম্পদ বৃদ্ধির আয়োজনের কোন অভাব নেই তবু দারিদ্র্যের জ্বালায় মানুষের পেটে ভাত নেই, মাথা গুঁজবার এতটুকু ঠাঁই নেই, পর্বত প্রমাণ দুঃখেরও শেষ নেই। ঘরের ঝাঁঝরা চালের ভিতর দিয়ে বৃষ্টির সবটাই যখন ঘরের মধ্যে পড়তে শুরু করেছে, মাথা বাঁচাবার কোন উপায় যখন আর রইল না, নীলমণি অসুস্থ স্ত্রী পুত্র কন্যাদের নিয়ে যখন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছিল, 'বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিপ্রয়োজন' তখন উপায়ান্তর না দেখে বৃষ্টির মধ্যে সে বেরিয়ে পড়ল। তখন তার মনে হচ্ছিল, "জগতে কোটি কোটি মানুষ যখন উষ্ণ শয্যায় গাঢ় ঘুমে পাশ ফিরিয়া

পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিতেছে,—সপরিবারে অক্ষম দেহটা টানিয়া সে তখন চলিয়াছে কোথায়?"

সে জানে চারিপাশের নির্মমতার কথা। সে জানে, "তার শক্তি নাই, কিন্তু আক্রমণ চারিদিক হইতে; পেটের ক্ষুধা, শীত, বর্ষা, রোগ, বিধাতার অনিবার্য জন্মের বিধান,—সে কোন দিক সামলাইবে? সকলে যেখানে বাঁচিতে চায়, লাখ মানুষের জীবিকা একা জমাইতে চায়, কিন্তু কাহাকেও বাঁচাইতে চায় না, সেখানে সে বাঁচিবে কিসের জোরে?" তবু সে নির্দয় সরকার বাড়ির বন্ধ দরজায় ঘা মারল এতটুকু আশ্রয়ের আশায়। সেখানে সে দেখল রোগজর্জর, মৃত্যুকামনায় অস্থির সরকার বাড়ির ধনী বৃদ্ধ আত্মীয়কে।

(এই গল্পে প্রকৃতি ও মানুষের নিষ্ফল আক্রোশ ও নির্মমতায় অসহায় মানুষের কথা বিবৃত হলেও দুঃখ দুর্ভাবনায় মানিকের দৃষ্টিকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে নি; রূঢ় ভৎসনা আর নিঃশব্দ অসহায় নালিশে যেন ভরে উঠেছে। মানবজীবনের প্রতি আশা থাকলেই নালিশ উঠে। মানিক জীবনের অসহায় যন্ত্রণা এবং দুঃখ-ভোগের কথা লিখলেও তাঁর এখনো আশা আছে। তাঁর কামনা উদ্ভিন্ন যৌবনা নীলমণির মেয়ে শ্যামার মত। "পেটের ক্ষুধায় এখনো তার কান্না আসে, ছেঁড়া কাপড়ে তার সর্বাঙ্গ লজ্জায় সংকুচিত হইয়া থাকে; তবু বুকে ভাষা আছে, মনে আশা আছে। ভব-যন্ত্রণা সহ্য করিতে তার শক্তির অকুলান হয় না, বরং একটু বাড়তিই হয়। ওইটুকু শক্তি দিয়া সে বর্তমান জীবন হইতেও রস নিংড়াইয়া বাহির করে,—হোক পান্‌সা, এও তুচ্ছ নয়। ভুলুর মত কুকুরটিও মরিবার অথবা তাকে মারিবার কল্পনা শ্যামার কাছে বিষাদের ব্যাপার। তার সহ্য হয় না।"

এই গ্রন্থেই মানিক স্বকীয়তা লাভ করেছেন। তাঁর কাছে মনে হয়েছে অসমাবস্থস্ত এই জীবনে সকলেই অসুস্থ, বিকারগ্রস্ত অথবা দারিদ্র্যপীড়িত। এখানে কেউ সুখী নয়, সুস্থ নয়। মানিক প্রথম দিকে এই বিষাদময়তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে প্রকাশ ভঙ্গিতে, বাস্তবতার স্বচ্ছ রূপায়ণে চরিত্রসৃষ্টিতে মানিকের রচনা উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে)। তাঁর সন্ধানী দৃষ্টির বিশ্লেষণ যন্ত্রণাজর্জর জীবনের উত্তাপে দৃঢ়-সংহত ও কেন্দ্রমুখী। 'অতসীমামী' গল্প সংকলনের নিবেদনে মানিক লিখেছেন, "রচনাকাল অনুসারে গল্পগুলো সাজানো হয়েছে। অতসীমামী আমার প্রথম রচনা। তারপরে লেখার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেটা স্পষ্টই বোঝা যাবে।"

//অতসীমামী গল্প সংকলনেই মানিকের লেখার পরিবর্তন অনুভূত হয়েছিল।

সেটা স্পষ্টতর হল তার দ্বিতীয় গল্প সংকলন 'প্রাগৈতিহাসিক' গ্রন্থে। এই সংকলনে মোট দশটি গল্প আছে।*

অতসীমামী গল্প মানিককে সাহিত্য জগতে স্বীকৃতি দিয়েছে আর প্রাগৈতিহাসিক গল্প তাঁকে করেছে রীতিমত বিখ্যাত। অশোক-সুপ্রিয়া-আনন্দ, শশী-কুসুম, কুবের-কপিলা, বিমল-শান্তার মধ্যে যে কথাটা স্পষ্টতা লাভ করেনি তা এই গল্পে এক চিরন্তন সত্যরূপ লাভ করেছে। এই গল্পের নায়ক এক নৃশংস ডাকাত। নাম ভিখু। বৈকুণ্ঠ সাহার গদীতে ডাকাতি করতে গিয়ে বর্শার খোঁচা খেয়েও একমাত্র সেই পালাতে পেরেছে। প্রথমে বনের মধ্যে পরে বন্ধু পেহ্লাদ বাগ্দীর বাড়ীতে গুপ্তভাবে আশ্রয় পেয়ে এক রকম বিনা যত্নে এবং বিনা চিকিৎসায় ভিখু সেরে উঠল। কাঁধে বর্শার আঘাতের ফলে ডান হাতখানি গাছের মরা ডালের মত শুকিয়ে গিয়ে অবশ ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে, কাজেই ডাকাতি করবার উপায় আর তার নেই। একদিন তাড়ি খেয়ে পেহ্লাদের বৌয়ের হাত ধরার জন্য ভিখুকে মারের চোটে আধমরা করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোল। প্রতিহিংসায় পেহ্লাদের ঘরে আগুন দিয়ে পালিয়ে এল মহকুমা শহরে। তখন সে ভিক্ষাজীবী। সেখানেই ভিক্ষা করত পাঁচী ভিখারিণী। কিন্তু সেখানেও প্রধান অন্তরায় পাঁচীর সঙ্গী বসির। ভিখু হার মানবার লোক নয়। এক অন্ধকার রাত্রে সে ঘুমন্ত বসিরকে গলা টিপে মেরে ফেলে পাঁচীকে নিয়ে পালিয়ে গেল। তখন

"দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

হয়ত ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না।"

আলো ঝলমল সভ্যতার চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যের অন্তরালে বর্বর যুগের আদিম অন্ধকার এখনো মানবজীবনে সমভাবে প্রবহমান, জীবনসত্যের এই বলিষ্ঠ স্বীকৃতি বাংলা সাহিত্যে ছিল দুর্লভ। মানিক বাংলা সাহিত্যে নিরাবরণ

* ১। প্রাগৈতিহাসিক ২। চোর ৩। মাটির সাকী ৪। যাত্রা ৫। প্রকৃতি ৬। ফাঁসি ৭। ভূমিকম্প ৮। অন্ধ। ৯। চাকরী এবং ১০। মাথার রহস্য।

সত্যের বলিষ্ঠ প্রকাশ দ্বারা নিজের বিশিষ্ট স্থান করে নিলেন। এই গল্পের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল ভিখু চরিত্রের বলিষ্ঠতা এবং সজীবতা। বাংলা সাহিত্যে যখন কেবল নির্জীব চরিত্রের বিষাদময়তায় ভারাক্রান্ত হচ্ছিল তখন ভিখুর চরিত্র যেন বিদ্রোহীর মত আত্মপ্রকাশ লাভ করল। এ গল্পে কোন রোমান্টিক আবেগপ্রবণতা নেই, আছে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মেকি আবরণের স্বরূপ প্রকাশের উদ্ধত বিদ্রোহী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী।

'চোর' গল্পেও অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মধু চোর। গ্রামের রাখাল মিত্রের বাড়িতে সে চুরি করতে যায়। ফিরে এসে দেখে তাঁর স্ত্রী রাখালের ছেলে পান্নাবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছে। মধুর মনে হল, "জগতে চোর নয় কে? সবাই চুরি করে।"

ভাবাবেগকে বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করলে আমাদের জীবনের অনেক কুশ্রীতা ধরা পড়ে। 'প্রকৃতি' গল্পের নায়ক অমৃত দারিদ্র্য অসহ্য হওয়ায় দেশ ত্যাগ করে গিয়েছিল। দশ বৎসর পরে সে ধনী হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। ধনী সমাজের প্রতি তার ছিল বদ্ধমূল বিদ্বেষ এবং দারিদ্র্যের প্রতি ভাব-বিলাস-মূলক সহানুভূতি। সে গেল তার হিতৈষী এবং সাহায্যকারী উকিল প্রমথবাবুর বাড়ি। কিন্তু এই পরিবারের দারিদ্র্য, অনুগ্রহ প্রার্থী সুলভ কুণ্ঠিত ভাব দেখে সে ব্যথিত হয়। তাদের ব্যবহারে সে হাঁপিয়ে উঠে এবং এতদিন ধরে তাদের প্রতি যে মমত্ববোধ ছিল তা অন্তর্হিত হয়। তারপর মোটর চাপা দেওয়া ভিখারীকে সাধারণ কর্তব্যবোধে নিজের মোটরে তুলে নেয় কিন্তু এই অশুচি ক্লেদাক্তস্পর্শে তার সুকুমার রুচি আহত হয়। এ ভাবে মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র উভয় সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয়ে সে নিজের আভিজাত্যের মধ্যে আশ্রয় নেয় এবং ঘৃণ্য ধনী সমাজের প্রতিনিধি রাখাল হালদারের সঙ্গে করমর্দন করে তার অভ্যস্ত কৃত্রিম জীবনযাত্রায় ফিরে আসে। আসলে মানবজীবনের প্রকৃতি নির্ধারিত হয় তার শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য দ্বারা, লোক-দেখানো ভাবাবেগগুলো তার পোষাকী।

অন্ধ, ফাঁসি, ভূমিকম্প প্রভৃতি অন্যান্য গল্পগুলোও সুন্দর মনোবিশ্লেষণের গল্প। 'অন্ধ' গল্পে সনাতন অন্ধ হবার পর তার একমাত্র মেয়ে জামাইকে নিজের বাড়িতে এনে রাখে। অন্ধ হলেও সংসারের হালচাল সনাতন সহজেই বুঝতে পারে। সে বুঝতে পেরেছে তার কন্যাও স্বার্থবোধের দ্বারা চালিত। সে তার পিতার দীর্ঘায়ু কামনা করে না। আসলে সনাতন অন্ধ নয়, এ সংসারে সকলেই নিজের স্বার্থবোধের দ্বারা অন্ধ। 'ফাঁসি' আরেকটি চমৎকার গল্প। মিথ্যা খুনের মামলায়

ভদ্র মধ্যবিত্ত গণপতি জড়িয়ে পড়ে এবং তার ফাঁসির হুকুম হয়। অনেক চেষ্টায় আপিলে সে মুক্তি পায়। গণপতি বাড়ি ফিরে আসে এবং জীবনে আবার দাঁড়াবার পরিকল্পনা করে। তার স্ত্রী রমা এতদিন এতটুকুও বিচলিত হয় নি। কিন্তু এখন সে গণপতির কাছে পরদিনই ঐ বাড়ি ছেড়ে যাবার বায়না ধরে। অযৌক্তিক প্রস্তাব বলে গণপতি রাজী হয় নি। কিন্তু পরদিন দেখা গেল রমা গলায় দড়ি দিয়ে মারা গিয়েছে। খালাস পেলেও ভদ্র পরিবেশে খুনের আসামী গণপতিকে নিয়ে দৈনন্দিন সংসার যাত্রা নির্বাহ করার চিন্তা তার ভাবাবেগকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

এই সংকলনের 'মাটির সাকী' গল্পটি পূর্বে অতসীমামী সংকলন গ্রন্থেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই গল্পের নায়িকা হিমানীও হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত, বিকারগ্রস্ত।

মিহি ও মোটা কাহিনী মানিকের তৃতীয় ছোটগল্পের সংকলন। এই সংকলনে মোট গল্প আছে বারোটি*। অধিকাংশ গল্পেই ঘটনা থেকে মনোবিশ্লেষণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে বেশী। মনোবৈজ্ঞানিক অচেতন মানসের যে ক্রিয়ার কথা বলেন তারই ভাষ্যরূপ 'হাত' গল্পটি। মহামায়ার হাত দুটোকে সে কিছুতেই নিজের আয়ত্তে রাখতে পারে না। তারই অজ্ঞাতসারে হাত দুটো যত অনিষ্ট কাজ করে চলে। সেজন্য মহামায়া শেষ পর্যন্ত দপ্তরীর বই কাটা যন্ত্রের তলে নিজের হাত দুটোকে পেতে দিয়েছে।

'বিপত্নীক' গল্পে নায়ক স্ত্রীর প্রতি অসদাচরণ করেছে, কিন্তু সারারাত ঘুমিয়ে মেজাজ যখন শান্ত হোল তখন স্ত্রীকে একটু খুশী করতে গিয়ে দেখে স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু স্ত্রীর অপমৃত্যুর চেয়েও স্ত্রী দড়িটা হুকে কি করে আটকাল সে চিন্তাই তাকে বেশী করে পেয়ে বসল। 'ছায়া' গল্পে স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও নায়ক পাগলের মত তার সঙ্গ কামনা করে। সে রাত্রে ঘরের দেয়ালে স্ত্রীর ছায়া দেখতে পায়। পরে অবশ্য সে টের পেল, 'আমার ঘরের দরজার বাইরে বাড়ীর ঝি বসে আছে, ঠিক যেন কার প্রতীক্ষায়। নীচে নামার সিঁড়ির বাঁকের কাছে দেয়ালের গায়ে যে আলোটা জ্বলছে তার আলো দরজা দিয়ে সোজা আমার ঘরে ঢুকেছে।' একটি বিকৃত মস্তিষ্ক মানুষের আত্মকথন সুন্দর গল্পরূপ লাভ করেছে। 'শৈলজ শিলা' আরেকটি বিকৃত মনের চমৎকার গল্প।

* ১। টিকটিকি ২। বিপত্নীক ৩। ছায়া ৪। হাত ৫। বিড়ম্বনা ৬। রকমারি ৭। কবি ও ভাস্করের লড়াই ৮। আশ্রয় ৯। শৈলজ শিলা ১০। খুকী। ১১। অবগুণ্ঠিত। ১২। সিঁড়ি।

গল্পের নায়ক তার পালিত কন্যার প্রেমে মত্ত হয়ে তাকে বিয়ে করবে ঠিক করল। কিন্তু শৈলে যার জন্ম এবং শিলা যার নাম সে শক্ত হয়ে রইল। দাদুর প্রেমে সে ধরা দিল না। এই গল্পের মূল বক্তব্য নায়কের মুখেই লেখক প্রকাশ করেছেন: "বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় আমি যে আমার বিশাল লোমশ বুকে দুই হাতের হাতুড়ি দিয়া কচি মেয়েটাকে ছেঁচিতে চাই, ইহার মধ্যে আমিও নাই, শিলাও নাই, আছে শুধু অনাদি, অনন্ত ও শাশ্বত প্রেম,—পশু পাখী, মানুষকে আশ্রয় করিয়াও যে প্রেম চিরকাল নিজের সমগ্রতা বজায় রাখিয়াছে।" ছোটগল্পের প্রাণ প্রশ্নমূলকতার মধ্যে। তার একটি চমৎকার নিদর্শন 'বিড়ম্বনা' গল্প। অনন্তর পূর্ব প্রণয়িনীর ন বছর ধরে ফটো পূজা দেখে পূর্বপ্রণয়িনী শ্বেতা ভাবে "কায়ার প্রত্যাখানে অনন্ত তবে নটি বছর ছায়া নিয়ে কাটিয়েছে। হায়, মানুষের জীবনে একি বিড়ম্বনা।" কিন্তু অনন্ত যখন সত্যি সত্যি তার বিবাহিত স্ত্রীকে গ্রহণ করল তখন সেই শ্বেতা তাকে তাড়িয়ে দিতে তৎপর হয়ে উঠল। অতএব সত্যিকার বিড়ম্বনা কোনটি? ন বছর ধরে শ্বেতার ছায়া নিয়ে অনন্তর বেড়ানো না ন বছর ধরে যার প্রেম কামনা করে এসেছে ন বছর পরে তার অবিশ্বাস এবং ঈর্ষা। এক নারীকে নিয়ে দুই প্রতিভার লড়াইয়ের এক সার্থক সুন্দর গল্প হোল 'কবি ও ভাস্করের লড়াই'। প্রেমিকার মৃত্যুর পর ভাস্কর মূর্তি গড়ে তাকে অমরত্ব দেবার চেষ্টা করল কিন্তু কবি তাকে স্বীকৃতি দিল জীবন যন্ত্রণার মধ্যে। ভাস্করের মূর্তিকেও সে সহ্য করতে পারল না। পাথরের মূর্তির মুখখানা ক্ষত বিক্ষত করে ফেলল। 'টিকটিকি' জ্যোতিষার্ণবের জ্যোতিষীচর্চার এক তির্যক প্রকাশ।

'রকমারি' এই সংকলনের একটি চমৎকার গল্প। বাৎসল্যের মধ্যে, মমত্বের মধ্যেই বাঙালী গৃহিণীর যথার্থ পরিচয়। উকিল-গিন্নী ঝি চাকরকে সব সময় বকুনি দিলেও তিনি যে তাদের স্নেহ করেন তারই সুন্দর পরিচয় রয়েছে এই গল্পে। বাহ্যিক কাঠিন্য আর অন্তরের মাধুর্যের যুগপৎ প্রকাশের জন্যই বোধ হয় মানিক এই গল্পের নাম রেখেছেন রকমারি।

এই গল্প সংকলনে মানিকের উপর ফ্রয়েডের বহুল প্রভাব বিদ্যমান।

১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয় মানিকের আরেকটি গল্প-সংকলন গ্রন্থ **'সরীসৃপ'**। এই গ্রন্থে মোট বারোটি গল্প* আছে। এর মধ্যে 'মহাবীর ও অবলার কথা' এবং

* ১। মহাজন ২। বন্ধা ৩। মমতাদি। ৪। মহাকালের জটার জট ৫। গুপ্তধন। ৬। প্যাক ৭। বিষাক্ত প্রেম। ৮। দিক পরিবর্তন ৯। নদীর বিদ্রোহ ১০। মহাবীর ও অবলার কথা ১১। দুটি ছোট্ট গল্প (বোমা ও পার্থক্য) ১২। সরীসৃপ।

'দুটি ছোট্ট গল্প' চুটকি জাতীয়। 'সরীসৃপ' এবং 'মহাকালের জটার জট' গল্প দুটি বড় গল্প। সরীসৃপ গল্পে মানিক আধুনিক সভ্যতার আড়ালে যে বিকৃতি এবং বিকার রয়েছে তাকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। অতি জটিল মনোবিশ্লেষণে তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছেন বাঙলা সাহিত্যে তা ছিল দুর্লভ। চারু-বনমালী পরী এই তিনটি মতলবী মানুষের স্বরূপ উন্মোচনের কাহিনীই এই গল্প। চারুর শ্বশুর ছিল বিত্তবান ব্যক্তি। আর বনমালী শ্বশুরের মোসাহেব পুত্র। চারুর টন্‌টনে বৈষয়িক বুদ্ধি সত্বেও বনমালী সব গ্রাস করে নিল। চারু এবং তার একমাত্র পুত্র ভুবন এখন বনমালির কৃপা-নির্ভর। চারুর সহরতলীর বাড়িটি পর্যন্ত বনমালীর কুক্ষিগত হয়েছে। সে এখন যে কোন মুহূর্তে চারুকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। সেজন্য চারু প্রাণপণে চেষ্টা করে বনমালীকে ভুলিয়ে রাখতে। এ সময় তার বোন পরী সগুবিধবা হয়ে এল তার বাড়ীতে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গায়ে পড়া আত্মসমর্পণের দ্বারা সে বনমালীকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলল। আর চারুর প্রতি দেখা দিল বনমালীর বিমুখতা ও ঔদাসীন্য। চারু তখন প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্র থেকে বোনকে অপসারিত করার এক ঘৃণ্য পথ গ্রহণ করল, কলেরা রোগীর ভেদবমির পাত্রে তারকেশ্বরের নির্মাল্য দিল। যাতে পরী কলেরা হয়ে মারা যায়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, চারু নিজেই ঐ রোগের কবলে পড়ে মারা গেল। তখন বনমালীর স্নেহ গিয়ে পড়ল চারুর ছেলে ভুবনের প্রতি আর ঔদাসীন্য দেখা দিল পরীর প্রতি। পরী সহ্য করতে না পেরে ভুবনকে বোম্বে মেলের গাড়ীতে তুলে দিয়ে এল অজানা ভবিষ্যতের দিকে। বনমালী বুঝতে পেরেও ভুবনকে উদ্ধারের কোন চেষ্টা করল না। মায়ের কথায় শুধু বলল, "আপদ গেছে যাক।" নির্বিকার চিত্তে পরীকে নামিয়ে দিল ঝি চাকরের চেয়েও অধম অনুগৃহিতাদের মধ্যে। স্বার্থপর, মতলববাজ এবং আত্মসর্বস্ব বনমালীকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগী দুবোনের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছে। আমাদের সমাজ ও সভ্যতার কৃত্রিমতার অন্তরালে কত বিষাক্ত কুটিলতা সরীসৃপের মত বিরাজমান এ গল্পে তা দেখান হয়েছে। 'মহাকালের জটার জট, সরীসৃপ গল্পের মত স্পষ্ট নয়। মানবমনে নানা যৌন চিন্তা যে বিচিত্র জট পাকিয়ে রয়েছে তাকেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।

সরীসৃপ গল্প গ্রন্থের মধ্যে 'গুপ্তধন' এবং 'প্যাঁক' দুটি উৎকৃষ্ট গল্প। গুপ্তধন গল্পের নায়ক হরিখালি বাসী ভীম ওস্তাদ লাঠিয়াল। সে বড় খাপছাড়া লোক। তার অভাব কিছু ছিল না। ইচ্ছে করলে সুখেই থাকতে পারত। কিন্তু তা সে পারল

না। গ্রামের মেজকর্তার সঙ্গে বিরোধ বাধল। ভীমের বড় মেয়ের সঙ্গে নষ্টামি করতে আসার জন্য ভীম মেজকর্তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। তারপর টাকার জোরে মেজকর্তাও তাকে ডাকাতির অভিযোগে আটবছর জেলে পাঠাল। জেল থেকে ফিরে আসার পর সে দেখল তার বাড়ী এবং বাড়ীর পেছনের এগারটি পলাশ গাছ নিশ্চিহ্ন হয়ে সেখানে ফুটবল মাঠ হয়েছে। বাবুরা চালাকেটে তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েকে তুলে দিয়েছে। গাঁ শুদ্ধ লোক শত্রু হল। আপন জনও পর হল। ভীমের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা দেখা দিল। সে বাগদীদের গুপ্তধনের লোভ দেখিয়ে নদীর বাঁধের পার্শ্বে গর্ত করে দিয়েছে। যাতে প্রথম জোয়ারের ধাক্কায় বাকী বাঁধের পর্দা ভেঙ্গে গিয়ে গ্রামটাকে বন্যার জলে ডুবিয়ে ফেলে। গল্পে নাটকীয়ত্ব সৃষ্টি প্রশংসনীয়। মানিকের প্রকাশ ভঙ্গী যে বক্র এবং বিদ্রুপাত্মক তার প্রকাশও সুন্দর হয়েছে। 'প্যাঁক' গল্পেও তার সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। গল্পের আরম্ভেই আছে "চিংড়ী মাছ বোধ হয় রাঁধিতেছে শিবচরণের বোন মালতী। সে-ই দুবেলা রান্না করে, কারণ শিবচরণের অন্ন তার দুবেলাই খাইতে হয়, এখনো স্বামী জোটে নাই।" এই মালতী গল্পের নায়িকা। নায়ক সুশান্ত ভদ্রলোক অনাথবন্ধুর ছেলে। অর্থোপার্জনের জন্য মোটর ড্রাইভিং শেখে। কল্পনার জগৎ থেকে সুশান্ত বাস্তবে নেমে আসে। "তার বাড়ীতে পথের বাস্তবতা চিরদিন ছিল, এখনো আছে, পায়ে পায়ে পথের ধূলা যেমন অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, তেমনি ভাবে পথের বাস্তবতা মনে মনে প্রতিদিন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, পথের ধূলার মত এই বাস্তবতাকেও তাই ঝাঁটাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা দরকার হয়, সকাল সন্ধ্যা ঘর ঝাঁট দিলেও যেমন আনাচে কানাচে পথের ধূলা থাকিয়া যায়, শত ব্যবস্থার মধ্যেও পথের বাস্তবতাও তেমনি আনাচে কানাচে আশ্রয় খুঁজিয়া পায়। তবে চাহিয়া না দেখিলে চোখে পড়ে না। দেখিতে না জানিলে চাহিয়া দেখা যায় না। শুধু অস্বীকার করিয়া যাওয়া চলে।" নীচের ভাড়াটে ড্রাইভার শিবচরণের কাছে মোটর ড্রাইভিং শিখে একমাসের মধ্যে সে নিপুণ হয়ে পড়ে। শিবচরণের বোনকে সুশান্ত ভালবাসে। সে ভালবাসার মধ্যে রোমান্টিক কল্পনা ছিল। কিন্তু এখন বাস্তবতায় শব্দের অর্থ রূপান্তর গ্রহণ করেছে। মালতী খুশী হয়েছে। মানিকের রচনায় সেন্টিমেন্টালিজমের বালাই নেই, আছে কঠোর কঠিন বাস্তবতার নিখুঁত স্পর্শ।

সরীসৃপ গল্পগ্রন্থের বারোটি গল্পেই মানিকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হোল এখানে সেন্টিমেন্ট বা ভাবাবেগের প্রকাশ নেই, আছে বিশ্লেষণ ধর্মিতা। আমাদের সমাজ জীবনে যে বিচিত্র মানুষ রয়েছে তিনি তাদের চরিত্র

সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। এখানেও উল্লেখযোগ্য হোল মানিকের গল্পে উচ্চবিত্ত মানুষের কোন জীবন চিত্রণ নেই। সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষের কাহিনীই সেখানে প্রধান। সেগুলো বাস্তব ঘেঁষা। অবশ্য তাদের কাহিনীর মধ্যে তাদের শ্রেণীর সামগ্রিক চিত্র বা তাদের জীবন সংগ্রামের কথা তখনো বড় হয়ে ওঠে নি। উঠেছে যৌন চিন্তার জটিলতা। আলতামণি (বন্যা), সুমিত্রা (মহাকালের জটার জট), এমন কি মমতার (মমতাদি) মধ্যেও যৌন চিন্তাই প্রধান। মমতাদিকে অবলম্বন করে একটি বস্তীবাসী মানুষের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু সেই চরিত্রও প্রতিবাদী নয়। মমতাদি ঐ দীন অবস্থাকে স্বীকার করে এবং নিষ্ঠুর বদরাগী স্বামীর অত্যাচার সহ্য করে এমনকি তার সোহাগের জন্য প্রকাশ্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। মমতাদির মধ্য দিয়ে বস্তীবাসীদের জীবন সংগ্রামের কাহিনী ফুটে ওঠেনি। বরং সেদিক দিয়ে গুপ্তধন গল্পের ভীম চরিত্র প্রতিবাদী।

প্যাঁক গল্পে 'ভদ্রলোক' সুশান্ত জীবন সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর সমগোত্রীয় হয়েছে এবং সেখানেই সে জীবনের পুরস্কার মালতীর প্রেমে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সরীসৃপ ও মহাকালের জটার জট গল্পে যৌন চিন্তার কুটিলতা প্রকাশ লাভ করেছে। অসহায় মানুষ টিকে থাকার জন্য শেষ অপচেষ্টায় রত। তথাপি আগামী দিনের প্রতিবাদী সংগ্রামী মানুষের যে জীবন কাহিনী মানিকের লেখনীতে মুখর হয়ে উঠেছে এখানে তার পদধ্বনি শোনা যায়।

সরীসৃপ গ্রন্থের 'বিষাক্ত প্রেম' গল্পে নুট হামসুনের 'ভ্যাগাবণ্ডস' গল্পের সাদৃশ্য দেখা যায়। বিশেষ করে এই গল্পের সঙ্গে এডভার্ট ও লোভিয়ার মিথ্যা প্রেমের মিল আছে। তা ছাড়া সেক্সকে কেন্দ্র করে কোন সেন্টিমেন্টালিটি হামসুনের বইতে নেই। মানিকের গল্পেও নেই কোন ভাবপ্রবণতা। এখানেই মানিকের সঙ্গে হামসুনের মিল। কিন্তু দুজনের জীবনদর্শনের বৈসাদৃশ্য অনেক।

মানিকের প্রথম পর্বের গল্পে আছে ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার প্রভাব। সেযুগের অধিকাংশ লেখকের মধ্যেই তা ছিল। মানিক পরে নিজেই এ প্রভাবকে সজ্ঞানে ত্যাগ করেছেন। কারণ তিনি ছিলেন জীবন শিল্পী। মনোবিকলনের দ্বারা মানব-জীবনের এক ভগ্নাংশকে আবিষ্কার করা যায়, সমগ্র জীবনকে নয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জীবনকে সামগ্রিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে মনোবিকলন নয়, অর্থনীতি। স্বভাবতই মানিক এই চিন্তাকে বেশীদিন আঁকড়ে থাকতে পারেন নি। তাছাড়া, মানিকের প্রথম পর্বে চরিত্রগুলোর মধ্যে আছে পরস্পর বিরোধিতা, অস্বাভাবিকতা

এবং যৌনতার প্রাধান্য। তবে মানিক যে একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী লেখক, পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতায়, বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায়, আঙ্গিক কুশলতায় এবং প্রকাশ-ভঙ্গীর বলিষ্ঠতায় এই পর্বেই তার প্রমাণ রেখেছেন।

॥ ২ ॥

সরীসৃপ গল্পগ্রন্থেই মানিক স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত। ছোটগল্পের শিল্পকুশলতায় মানিকের নৈপুণ্য বিস্ময়কর। মানিক নতুন নতুন সৃষ্টিতে বাঙলা সাহিত্যে অভাবনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এবার তিনি লিখলেন বিভিন্ন ধরণের বৌদের নিয়ে গল্প। সংকলন গ্রন্থের নাম 'বৌ'। প্রথম সংস্করণে ছিল আটটি গল্প। পরে দ্বিতীয় সংস্করণে হোল তেরটি*। বর্তমানে প্রচলিত রবীন্দ্র লাইব্রেরীর নতুন সংস্করণে (আষাঢ়, ১৩৭০) আবার প্রথম আটটি গল্পই প্রকাশিত হয়েছে।

সমাজে বাস করে বিভিন্ন প্রকারের মানুষ। তাদের জীবন যাত্রা বিচিত্র। বিচিত্র তাদের মানসিক অবস্থা। তাদের বৌ-য়েরাও বিচিত্র। এই গল্পগুলোতে তাদের মানসিক অবস্থার সুন্দর বিশ্লেষণ রয়েছে। যেমন দোকানীর বৌ দোকানীর চেয়েও বেশী হিসেবী। দোকানীর যে ভাবাবেগ আছে তার তাও নেই। সে তার স্বার্থ এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুবই সচেতন। রাসবিহারী কেরাণী। তার "সাইজ মাঝারি, চেহারা মাঝারি, বিদ্যা মাঝারি, বুদ্ধি মাঝারি।" তার বৌ "সরসীর মুখখানি তেমন সুশ্রী নয়। বোঁচা নাক, ঢেউ তোলা কপাল, ছোট ছোট কটা চোখ। গায়ের রঙ তার খুবই ফর্সা, কিন্তু তেমন যেন পালিশ নাই। দেখিলে ভিজা স্যাঁতসেঁতে মেঝের কথা মনে পড়িয়া যায়।" তার কৌতূহল প্রচণ্ড অথচ প্রকাশ্যে তার দারুণ সঙ্কোচ। নিরালায় ছাদের মুক্ত পরিবেশে তার অবদমিত মনের বাসনা প্রকাশের বিচিত্র উপায় খোঁজে। সূর্যকান্ত সাহিত্যিক। প্রায় ত্রিশ বছর বয়স। তার দুর্বোধ ব্যক্তিত্ব, নিরুত্তেজ হাসি। "পাকা সাঁতারুর মত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে সে সাঁতার কাটে জীবনসমুদ্রে, প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়িয়া ফেনিল আবর্ত সৃষ্টি করে না।" অমলা তার স্ত্রী। সূর্যকান্তর লেখা গল্প পড়ে তার কাছ থেকে সেরকম আবেগ ও ভালোবাসা কামনা করে। কথা

* ১। দোকানীর বৌ ২। কেরাণীর বৌ ৩। সাহিত্যিকের বৌ ৪। বিপত্নীকের বৌ ৫। তেজী বৌ ৬। কুষ্ঠরোগীর বৌ ৭। পূজারীর বৌ ৮। রাজার বৌ ৯। উদারচরিতানামের বৌ ১০। প্রৌঢ়ের বৌ ১১। সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ ১২। অন্ধের বৌ এবং ১৩। জুয়াড়ির বৌ।

বলবার সময় সে সূর্যকান্তের লেখা নায়ক নায়িকার প্রসঙ্গ টেনে কথা বলে। সূর্যকান্তর তা ভাল লাগে না। "অমলার অপ্রতিহত উন্মাদনা, পৃথিবীতে আকাশ কুসুমের বাগান করার অপূর্ণ কামনা ও বিবাহিত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা"য় তার জীবন ব্যর্থ বলে প্রতীত হোল। অমলার মনের অস্বাভাবিক উত্তাপের চিকিৎসা করতে সূর্যকান্তর সাধারণ বুদ্ধি গুলিয়ে গেল। তার লেখা বন্ধ হল। অফিস থেকে একমাসের ছুটি নিয়ে পশ্চিমে চলে গেল আর অমলার দেখা দিল হিষ্টিরিয়া রোগ।

বিপত্নীকের বৌ-এর সহজেই স্বামীর ভালোবাসা পেয়ে মনে হোল তার স্বামীর পূর্ব স্ত্রীকে অত সহজে ভুলে যাওয়া তার উচিত হয়নি। তার তখন স্বামীর ভালোবাসায় অস্বস্তিবোধ হতে লাগল। এই সংকলনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হোল কুষ্ঠ রোগীর বৌ। মানুষের লোভ, লালসা এবং অর্থ গৃধ্নুতা সমাজ বিবর্তনে যে অসম অবস্থার সৃষ্টি করে তারই ফলে দেখা দেয় একদিকে পুঞ্জীভূত পাপ ও ব্যভিচার অন্যদিকে রিক্ত ও বঞ্চিতের আর্তনাদ। এদের নিষ্পাপ অভিশাপ অন্যদের পাপের ফলে পুরুষানুক্রমে বংশের রক্তধারার সঙ্গে মিশে দেখা দেয় দুরারোগ্য ব্যাধি। যতীনের বাবা বহু মানুষের সর্বনাশ করেই প্রচুর বিত্ত অর্জন করেছিলেন। অবশ্য ধনোলাভের এটাই বিধি। কারণ:

"এ কথা কে না জানে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন এবং এ কাজটা বড় স্কেলে করিতে পারার নাম বড়লোক হওয়া? পকেট হইতে চুপি-চুপি হারাইয়া গিয়া যেটি পথের ধারে আবর্জনার তলে আত্মগোপন করিয়া থাকে সেটি ছাড়া নারীর মত মালিকহীন টাকাও পৃথিবীতে নাই। কম এবং বেশী অর্থোপার্জনের উপায় তাই একেবারে নির্ধারিত হইয়া আছে, কপালের ঘাম আর মস্তিষ্কের শয়তানী। কারো ক্ষতি না করিয়া জগতে নিরীহ ও সাধারণ হইয়া বাঁচিতে চাও, কপালের পাঁচশো ফোঁটা ঘামের বিনিময়ে একটি মুদ্রা উপার্জন কর: সকলে পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্বাদ করিবে। কিন্তু বড়লোক যদি হইতে চাও মানুষকে ঠকাও, সকলের সর্বনাশ কর। তোমার জন্মগ্রহণের আগে পৃথিবীর সমস্ত টাকা মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দখল করিয়া আছে। ছলে বলে কৌশলে যে ভাবে পার তাহাদের সিন্দুক খালি করিয়া নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমাও। মানুষ পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিশাপ দিবে।

ধনী হওয়ার এ ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই।"

রিক্ত বঞ্চিত মানুষের অভিশাপের ফলেই হয়ত যতীনের বাবার পাপে যতীনের

কুষ্ঠরোগ হোল। বহু অর্থ বিনিময়েও সেই রোগ সারলো না। শুধু জটিলতা সৃষ্টি হল যতীন আর স্ত্রী মহাশ্বেতার মধ্যে। সেজন্য যতীন যখন কামাখ্যায় যায় দেবতার কাছে ধন্না দিতে তখন মহাশ্বেতা বাড়িতে কুষ্ঠাশ্রম খোলে। "সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠরোগাক্রান্তগুলিকে ভালবাসে।"

এমনি ধরণের নরনারীর দাম্পত্য জীবনের মধ্যে যে বিচিত্র মনস্তত্ব রয়েছে তারই সুন্দর বিশ্লেষণের কাহিনী এই গল্পগুলো।

১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হল আর একটি গল্পগ্রন্থ—'সমুদ্রের স্বাদ'। 'সমুদ্রের স্বাদ' গ্রন্থটি প্রকাশ করে বেঙ্গল পাবলিশার্স। গ্রন্থে প্রকাশের কোন তারিখ দেওয়া নেই। ১৩৫২ সালে ফাল্গুন মাসে দি বুকম্যান কর্তৃক প্রকাশিত সমুদ্রের স্বাদ এর নতুন সংকরণে লেখকের কথায় মানিক লিখেছেন, "ভাবের আবেগে গলে যেতে ব্যাকুল মধ্যবিত্তদের নিয়ে 'সমুদ্রের স্বাদের' গল্পগুলি লেখা। প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে, একদিকে চেনা চাষী মাঝি কুলি মজুরদের কাহিনী রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্চ্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার। মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মর মর এই সমাজের কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মত মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙে দিতে পারি, সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে। তখন জানা ছিল না যে ওগুলি জীবনযুদ্ধের ক্ষত নয়, জরার চিহ্ন, ভাঙনের ইঙ্গিত; জানা ছিল না যে স্বাভাবিক নিয়মেই এ সমাজের মরণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী এবং তাতেই মঙ্গল—সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙ্গে বিরাট জীবন্ত সমাজে আত্মবিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামীদিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা। জানা না থাকলেও সত্যই কি মনে প্রাণে বিশ্বাস ছিল যে নিজেকে জানতে পারলে এ সমাজ আবার নিজের গণ্ডীর মধ্যেই নতুন করে নিজেকে গড়তে পারবে—বিকার ছেঁটে ফেলে সুস্থ হয়ে উঠবে? আজ নিজের লেখাগুলি আবার পড়ে বুঝতে পারি, সে রকম জোরালো বিশ্বাস ছিল না। আমিও যে মধ্যবিত্ত, পথ খুঁজে না পাওয়ার আতঙ্কে বিহ্বল ও উদ্‌ভ্রান্ত বলেই নির্মম আত্ম-সমালোচক, এর প্রমাণটাই বড় হয়ে আছে বিশ্বাসের চেয়ে।

মধ্যবিত্ত ভদ্রদের পরিণাম জানতাম না বটে, তবে পচা ভদ্রতার মিথ্যা খোলস খুলে সবাই ছোটলোক হোক এ পরিণাম যে কামনা করতাম আমার

অনেক গল্পেই তা ঘোষণা করার চেষ্টা করেছি। পথ খুঁজে না পাই, পথের ইঙ্গিত জেনেছিলাম। তাই দরদ দিয়ে নির্মম আত্মসমালোচনার মূল্যে আমি আজও বিশ্বাসী।"

সমুদ্রের স্বাদ গল্প সংকলনে মোট তেরটি গল্প* আছে। 'সমুদ্রের স্বাদ' একটি স্বপ্নকাতর মেয়ের সমুদ্র দেখার সাধ না মেটায় চোখের জলের নোনতা স্বাদেই যে সেই সাধ মেটাতে হয়েছিল তার কাহিনী। পিতার দারিদ্র্য এবং পরে অকালমৃত্যুর জন্য তার সাধ অপূর্ণ রয়ে গিয়েছিল। জীবনে সে আর বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারল না। 'ভিক্ষুক' এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প। চমৎকার একটি ছোটগল্প। আঙ্গিক কুশলতাও অপূর্ব। যাদবের মুখে দারিদ্র্যের মিথ্যা কাহিনী শুনে ভদ্রলোকের অযাচিত সাহায্য পরবর্তীকালে তাকে ভদ্রবেশী ভিক্ষুকে পরিণত করল। চাকুরীর চেয়ে ভিক্ষায় আয় বেশী বলে যখন যাদব চাকুরী ছেড়ে দেবে ভাবছিল তখন সেওড়াফুলির ভদ্রলোকের পকেট মেরে রিটার্ণ টিকিট হারানোর গল্পে যাদবের সঙ্গে পাঠকও বিস্মিত হয়। ভিক্ষাবৃত্তির নতুন আর্ট যাদবকেও চমকে দিল। একেবারে ক্লাইমাক্সে গিয়ে গল্পের শেষ। 'পূজা কমিটি' গল্পে আছে পূজা কমিটি নির্বাচনের একটি ব্যঙ্গাত্মক বাস্তব চিত্রণ।

মধ্যবিত্ত সমাজে সকলেই নেশাখোর। এ নেশা বিচিত্র। তার জন্য আপিম খেতে হয় না। হরেন আপিম খায়। স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে তার মাত্রাটা বেড়েছে। কিন্তু তার চেয়েও তার পরিবারের অন্য লোকেরা বেশী বিকারগ্রস্ত। বরং হরেনের মনুষ্যত্ববোধ এবং বাস্তববোধ অনেক বেশী প্রখর। আসলের বদলে মেকীর জন্যই এ সমাজের লোকেরা পাগল। বাস্তবের চেয়ে কৃত্রিমতার ঔজ্জ্বল্যই তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। সেজন্য এরা সকলেই বিকারগ্রস্ত। এমনি বিকারগ্রস্ত এক ছেলে ও মেয়ের কাহিনী হল 'কাজল' গল্পটি। রাণীর কাজল পরা চোখ দেখেই বিকাশ মুগ্ধ। কিন্তু বেদনার্ত স্নায়বিক প্রক্রিয়ায় চোখে যে কালি পড়ে, কাজলের চেয়ে তা তো কম সুন্দর করে না মানুষের চোখকে। 'আততায়ী' এক উদ্ভট কাহিনী। মধ্যবিত্ত জীবনে যে ভণ্ডামি, স্বার্থবাদ আর কূটকামনার সর্পিল প্রবাহ বহমান তারই এক নির্মম উদাহরণ। এক বাল্য-বন্ধুর অপরের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার কাহিনী। 'বিবেক' এই সংকলনের আর

---

* ১। সমুদ্রের স্বাদ ২। ভিক্ষুক ৩। পূজা কমিটি ৪। আপিম ৫। গুণ্ডা ৬। কাজল ৭। আততায়ী ৮। বিবেক ৯। ট্র্যাজেডির পর ১০। মালী ১১। সাধু ১২। একটি খোয়া ১৩। মানুষ হাসে কেন।

একটি চমৎকার গল্প। মুমূর্ষু স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য বেকার স্বামী বড়লোক বন্ধুর সোনার ঘড়ি চুরি করে বিবেকের দংশন অনুভব করেছে। কিন্তু সমদরদী আরেকজন বেকার বন্ধুর মনিব্যাগের টাকা আত্মসাৎ করতে তার এতটুকু বিবেকে বাধেনি। বড়লোক বন্ধু কি মনে করবে এবং পুলিশ নিয়ে তাকে ধরতে আসবে এই চিন্তাই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে কিন্তু গরীব বন্ধু যে টাকার অভাবে তার মুমূর্ষু ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না সেই চিন্তাটা বড় হয়ে দেখা দিল না। মালী প্রভুপত্নীর অনুগ্রহকে গর্বের বস্তু বলে মনে করে। তাদের খুশী করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু এই প্রভুপত্নীরা কেউই এদের মানুষ বলে মনে করে না। কাজ বাগিয়ে নিয়েই তাদের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়। তবু এই মালীরা কোন প্রতিবাদ করে না। এরা আপন ভাগ্যকে সহজেই মেনে নেয়। এই গল্প পড়ে রবীন্দ্র-নাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা মনে পড়ে।

সাধুরা সংসার ত্যাগ করলেও জৈবিক কামনাকে জয় করিতে পারে না। তাদের মধ্যে নানা বিকৃতি দেখা দেয়। তাদের জীবনের বিকার অবলম্বনে মানিক অনেক গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন। 'সাধু' এই ধরণের একটি গল্প। সাধুদের বিকার গ্রস্ততা মানিক দুটি উপন্যাসে লিখেছেন—'অহিংসা' এবং 'তেইশ বছর আগে পরে'।

'মানুষ হাসে কেন' একটি সুন্দর হাসির গল্প। অসঙ্গতি থেকেই হাসির জন্ম। একটি হাস্যকর ব্যাপারের সঙ্গে নিজের যোগাযোগ আবিষ্কার করা মাত্র রসময় নিজেও পাগলের মত হাসতে লাগল।

॥ ৩ ॥

মহাযুদ্ধ এবং মন্বন্তরে বাংলা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত। বিশেষ করে গ্রামের গরীব কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। অনাহারে, অর্ধাহারে, অখাদ্য এবং কুখাদ্য খেয়ে অনেক মরে হেজে গেল। দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরে দেশে অরাজক অবস্থা। ন্যায় ধর্ম সকলই রসাতলে গেল। লোকের মান ইজ্জত সব গেল। পুরাণো মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে গেল।

দেশের এমন অবস্থায় প্রকাশিত হল মানিকের গল্পগ্রন্থ '**ভেজাল**'। মোট এগারোটি গল্পের সংকলন।* ঐশ্বর্য বিলাস, সভ্যতা সংস্কৃতি, পরিবেশ

* ১। ভয়ঙ্কর ২। রোমান্স ৩। ধনজন যৌবন ৪। সুখেভাত ৫। মেয়ে ৬। দিশেহারা হরিণী ৭। মৃতজনে দেহ প্রাণ ৮। যে বাঁচায় ৯। বিলাসন ১০। বাস এবং ১১। স্বামী স্ত্রী।

প্রশাসনে জীবনের যে দিকটা চাপা পড়ে থাকে তার মধ্যে যা প্রচ্ছন্ন এবং কর্দমাক্ত মানিক তাকেই গল্পে রূপায়িত করে তোলেন। তাঁর দৃষ্টি সুদূর প্রসারী। তিনি মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই যে অন্তর্নিহিত একটা বিকৃতি আছে, ভিয়েনের মধ্যেই আছে ভেজাল তাকে তিনি সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করেছেন। "এই গল্প-গুলি তাঁর জীবনদর্শনের বিশেষ বোধক। কতখানি খাদ মিশিয়ে সোনা, গাদ মিশিয়ে মধু ও ক্লেদ মিশিয়ে রূপ তারি তিনি নির্ভুল ফর্মুলা কষে দিয়েছেন। মানুষের জীবনে প্রকাশ্যের চেয়ে প্রচ্ছন্নের ব্যঞ্জনা যে অনেক গভীর, তার সমস্ত গতি বিরতির যে ব্যাখ্যাটা সহজগ্রাহ্য তারও চেয়ে যে একটা দুজ্ঞেয় ব্যাখ্যা আছে তার অবচেতনার, তার সমস্ত সারল্য যে দুর্বোধ এক কুটিলতার কুণ্ডলী, তার সমস্ত প্রেরণা আসছে উর্ধ্বস্থ আকাশ থেকে নয়, আদিম ও মৌল মাটির অন্ধকার গর্ভ থেকে, তার উদ্‌ঘাষণ এই গল্পগুলিতে। আর, এই বলা ও দেখা কি আশ্চর্য মিলেছে তাঁর সজাগ শিল্পবোধের সঙ্গে। ভঙ্গির সঙ্গে মিলেছে আঙ্গিক, বিষয়ের বক্রতার সঙ্গে মিলেছে ভাষার তীক্ষ্ণতা। আর, যা সূক্ষ্ম তাই তীক্ষ্ণ। যা সত্য তাই রূঢ় ও নির্মম।"

এই গল্পগুলোর সবকটি গল্পই যৌন জীবনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রকাশ করেছে। এই জীবনে যে বিকৃতি আছে তাকেই মানিকবাবু তুলে ধরেছেন। ভূষণের স্ত্রী আশা প্রসাদের প্রতি অনুরক্ত (ভয়ংকর), নটবরের স্ত্রী সুবলের জন্যে রাত্রির অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে এবং ঘাটের শিলায় তার সঙ্গে মিলিত হয় (রোমান্স); নির্মলেন্দু পিস্তল দেখিয়ে সুমতিকে ভোগ করে (ধন জন যৌবন); বেনারসী গগন ঠাকুরের বিছানায় আশ্রয় নেয় (মুখে ভাত), নীরদের মেয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে জগতের সঙ্গে বিয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে (মেয়ে); প্রমীলা স্বামীকে ছেড়ে পরাশরের সঙ্গে বাস করে (মৃতজনে দেহ প্রাণ); নলিনী নৃসিংহবাবুর ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায় (যে বাঁচায়)। বাংলা পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে মানুষের জীবনে যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল, যুদ্ধের সময় মানুষের নীতিবোধ যে শিথিল হয়ে পড়েছিল এগুলি তারই পরিচয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, যারা যুদ্ধের বাজারে ব্যবসা করে হঠাৎ ধনী হয়ে উঠেছে তারাই এ ব্যাপারে বেশী অগ্রণী।

ভয়ংকর, ধনজন যৌবন এবং বিলাসমন গল্প তিনটি অত্যাচারীর গল্প। তিনজন ধনী ব্যবসায়ীর অত্যাচারের কাহিনী। এদের মধ্যে বিলাসমনের জুড়ি নেই। সে যেন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দালাল এবং জমিদার ও নতুন কারখানার মালিক মহীধরের ম্যানেজার। সাধারণ নিরীহ মানুষের জীবন এই অত্যাচারে দুর্বিষহ

হয়ে উঠে। তারাও প্রতিবাদ করে কিন্তু অর্থ এবং পুলিশ যাদের স্বপক্ষে তারা সেই প্রতিবাদে সাড়া দেয় না। এই 'বিলামসন' গল্পটি 'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসের অংশ বিশেষ।

ভয়ঙ্কর গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রসাদ। "প্রসাদের দেহ দুর্বল, মন ততোধিক, নিরীহ বোকা অপদার্থ ভালোমানুষ হয়ে থেকেই বয়সটা তার ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে গেছে। উৎসাহ বা তেজ বলে তার কিছু নেই, অভাববোধ ভোঁতা হয়ে গেছে। অপরাধ করে বসার ভয়েই সর্বদা সে সন্ত্রস্ত।" এক দারুণ ঝড়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে তার মৃত্যু ভয় দূর হয়ে যায়। তার মধ্যে একটা উগ্র এবং উৎকট উল্লাস দেখা দেয়। সে ভয়ংকর হয়ে উঠে। তার গায়ে হাত তুলতে গিয়ে অত্যাচারী ভূষণ দত্ত পিছিয়ে যায়। প্রসাদ মুক্তির নেশায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। এই গল্পটিই পরে 'মাটির মাশুল' গ্রন্থে নাটকাকারে পরিবর্ধিতরূপে প্রকাশ লাভ করেছে।

১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হল 'হলুদ পোড়া'। মোট দশটি গল্পের সংকলন*। এই গ্রন্থের গল্পগুলো খুবই মামুলি। মানিকের চিন্তাধারার অগ্রগতি বা সৃষ্টির ক্রমপরিণতির এগুলো নিদর্শন নয়। অবশ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী সমাজের নানা ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যেকার লুক্কায়িত রহস্য উদ্‌ঘাটনে তৎপর, মনোবিশ্লেষণের যে তীক্ষ্ণতার জন্য মানিক প্রসিদ্ধ তার কিছু কিছু নিদর্শন এদের মধ্যেও আছে।

'হলুদ পোড়া' একটি সংস্কারাচ্ছন্ন পল্লীসমাজের ভৌতিক বিশ্বাসের গল্প। পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স গ্রামের স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক, বই দেখে ডাক্তারি করা যার নেশা সেই ধীরেনও এই ভৌতিক কুসংস্কারকে অবজ্ঞা করে কিন্তু ধীরে ধীরে নিজেই তার শিকার হয়ে পড়ে। ইহা একটি চমৎকার ভৌতিক গল্প। ভৌতিক কুসংস্কারকে অবলম্বন করে এর মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণও প্রশংসনীয়। ওমিল নাইন একটি কেশ তৈলের গন্ধে মানসিক বিকারাচ্ছন্ন এক যুবকের কাহিনী। অন্ধ ও ধাঁধা একটি সুন্দর গল্প। অন্ধ স্বামী এবং এক দৈত্যাকার ভৃত্য নিয়ে রাধার জীবন প্রতিবেশীর কাছে ধাঁধার মতই রহস্যময় হয়ে রইল। কিন্তু 'দর্পণ' উপন্যাসের পর মানব জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের যে মার্কসবাদী দৃষ্টি, শ্রেণীসচেতন যে রূপ, সমাজের ধনিকগোষ্ঠীর নিজেদের স্বার্থে তৈরি বিচিত্র রহস্যজালের যে উন্মোচন মানিকের কাছে প্রত্যাশিত ছিল তার কোন পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অবশ্য তিনি 'চুরি চুরি খেলা'

---

* ১। হলুদ পোড়া ২। বোমা ৩। চুরি চুরি খেলা ৪। তোমরা সবাই ভালো ৫। ধাকা ৬। ওমিল নাইন ৭। জন্মের ইতিহাস ৮। ফাঁদ ৯। ভাঙা ঘর এবং ১০। অন্ধ ও ধাঁধা।

গল্পের শেষে বলেছেন, ইহা 'হাত মকস করার সময় লেখা'। এই গ্রন্থের অধিকাংশ গল্প সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। মনে হয় অনেকদিনের ফেলে রাখা গল্পগুলোকে নিয়ে তিনি এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

॥ ৪ ॥

১৯৪৩ সালে (বাংলা ১৩৫০) বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষের সম্পর্কে Percival Spear তাঁর বিখ্যাত A History of India গ্রন্থে লিখেছেন, "The loss of Burma rice led to an overall food loss of about five per cent, which, however, was felt chiefly by the rice-eating regions of Bengal and in the south. The shortage was not catastrophic but stocks had to be moved over a transport system already clogged by the mounting allied was efforts. Prices began to rise ; the peasant sold his stock to pay off his debts and then found himself with nothing to eat ; black market appeared and the peasants began to flock to calcutta. The Bengal Government proved unable te meet the crisis while the Central Government refused to intervene from federal scruple of overriding a provincial administration. Thus what should have been a controlled shortage became the first famine of starvation since the famine code was devised in 1883 with a mortality of up to two millions."

দেশের সীমান্তের নিকটবর্তী বলে বাংলা ও আসামে সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধের আয়োজনে অকাতরে অর্থব্যয় করেছে, কিন্তু জনসাধারণের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ছিল তারা উদাসীন। ফলে যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের পরে সাধারণ মানুষের দুর্দশা এবং কষ্টের সীমা রইল না। ষ্টার্লিং রিজার্ভের বিরুদ্ধে ব্যাপক কাগজী মুদ্রার প্রচলনের দ্বারা দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিল। জিনিষপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে চলল। অথচ খাদ্যদ্রব্য, কাপড়, কেরাসিন, চিনি প্রভৃতির যোগান আগের তুলনায় অনেক কমে গেল। সহরাঞ্চলে রেশনিং প্রথা চালু হোল কিন্তু জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা গেল না। কালোবাজার দেখা দিল। যৌনবিকৃতি এবং সার্বিক দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেল। বাংলা দেশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এই যুদ্ধেরই প্রত্যক্ষ ফল। অথচ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষের সেদিকে তেমন লক্ষ্য ছিল না। ১৯৪৫এর মে মাসে দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান

কমিশন তার রিপোর্টে বলেছেন, "It has been for us a sad task to enquire into the course and causes of the Bengal famine. We have been haunted by a deep sense of tragedy. A million and half of the poor of Bengal fell victim to circumstances for which they themselves were not responsible. Society, together with its organs, failed to protect its weaker members. Indeed, there was a moral and social breakdown, as well as an administrative breakdown."

এই দুর্ভিক্ষের ফলে গ্রাম বাঙলার মানুষের জীবন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। অনাহারে কাতারে কাতারে শিশু ও বৃদ্ধের মৃত্যু হল। যাদের শক্তি ছিল তারা সহরে পালিয়ে গেল। সেখানে দ্বারে দ্বারে ফেন, ভাত ভিক্ষে করতে লাগল। কিন্তু দুর্ভিক্ষে ভিক্ষা মেলে না। কলকাতার রাজপথে যে মর্মভেদী দৃশ্য তখন দৈনন্দিন দেখা যেত তা কখনও ভুলবার নয়। পথে ঘাটে লোক মরতে লাগল। মেয়েরা অগত্যা দেহ বেচা আরম্ভ করল। যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ ফেঁপে ওঠা ধনিকগোষ্ঠী খাবারের লোভ দেখিয়ে গ্রামের মেয়ে-বৌদের সহরে চালান দিল। তাদের মধ্যে রোগে ভুগে অনেকে মারা গেল। যারা টিকে রইল তারা সহরের গলিতে বস্তিতে আটকা পড়ে গেল। নারী-কল্যাণ সমিতি এবং সমাজকর্মীদের উদ্যোগে কিছু কিছু মেয়েকে উদ্ধার করে আবার দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হোল। কিন্তু তখনো দেখা দিল সামাজিক রীতিনীতির বাধা।

দুর্ভিক্ষ এবং মন্বন্তরে অনাহারী উলঙ্গ মানুষের অসহায় দুর্দশার চিত্র বাংলা সাহিত্যে অনেকেই রচনা করেছেন। কিন্তু অন্যান্য সাহিত্যিকদের থেকে মানিকের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। তিনি কেবল তাদের দুর্দশার চিত্র অঙ্কন করেন নি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা মুখ বুজে অসহায় অবস্থাকে স্বীকার করেনি। প্রয়োজনবোধে তার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছে। লুঠ করে জেল খেটেছে। মানিক তাদের সজীব এবং প্রতিবাদী মানুষ করে গড়ে তুলে এক নতুন আদর্শ সৃষ্টি করেছেন। মানিকের সৃষ্ট চরিত্রদের সঙ্গে ছিল তাঁর সক্রিয় ভালবাসা। তাদের প্রতি তাঁর অসীম দরদ। দুর্ভিক্ষের সময় মানিক বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষী দরিদ্রদের না খেয়ে মরার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে এসে অতি দুঃখে বলেছিলেন—

"দু'শো বছরের পরাধীনতায় বাংলার মেরুদণ্ড গেছে ভেঙে। গরীবগুলোকে কত বললাম—না খেয়ে শেয়াল-কুকুরের মত রাস্তাঘাটে মরে পড়ে না থেকে তোরা একবার উঠে দাঁড়া। সরকারের তালাবন্ধ শস্যের গুদামগুলো লুঠ করে

একদিনও পেট পুরে খেয়ে বাঁচি—তারপর না হয় জেল খাটবি,—কিন্তু ব্যাটাদের কি সে সাহস আছে।[১]

সংকেত ভবন থেকে এপ্রিল-মে (বৈশাখ, ১৩৫৩) তারিখে এই দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা যোলটি গল্পের সংকলন 'আজ কাল পরশুর গল্প' প্রকাশিত হল। ভূমিকায় মানিক লিখেছেন, "গল্পগুলি একটা বিশেষভাবে পরপর সাজিয়ে দিবার ইচ্ছে ছিল, যাতে আজ কাল পরশুর গল্প নামটির সঙ্গতি হয়তো আরেকটু পরিস্ফুট হবে মনে করেছিলাম। কিন্তু সাজানোটা এলোমেলো হয়ে গেছে। 'সামঞ্জস্য' গল্পটি শেষে যাওয়া একেবারে উচিত হয় নি। অন্য গল্পগুলিও এরকম আগে পরে চলে গেছে।

গল্পগুলি প্রায় সমস্তই গত একবছরের মধ্যে লেখা।"

এই গ্রন্থে মোট গল্প আছে যোলটি।* আজ কাল পরশুর গল্পে রামপদর বৌ মুক্তাকে সহর থেকে উদ্ধার করে আবার গ্রামে রামপদর কাছে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মুক্তা রামপদর কাছে তার দুর্দশার ইতিহাস বলে। অভাবের তাড়নায় রামপদ যখন বিদেশে যায় তখন তার ছেলের বয়স সাত মাস। তারপর মুক্তা বলে :

"খোকন গেল কুপথ্যি খেয়ে। মাই-দুধ শুকিয়ে গেল, এক ফোঁটা নেই। চাল গুঁড়িয়ে বার্লি মতন করে দিলাম ক'দিন। চাল ফুরলে কি দিই। না খেয়ে শুকিয়ে মরবে এমনিতে, শাক পাতা যা সেদ্ধ খেতাম, তাই দিলাম, করি কি। তাতেই শেষ হল।"

কিন্তু তখন গ্রামের কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে এল না। মুক্তা বলে, "দাসমশায় দুধ দিতে চেইছিল, মোকেও দেবে খেতে-পরতে। তখন কি জানি মোর অদেষ্টে এই আছে? জানলে পরে রাজী হতাম, বাচ্চাটা তো বাঁচতো। মরণ মোর হলই, সে-ও মরল।"

এই ঘনশ্যাম দাসই তাদের সমাজের মাথা। সে গ্রামের মেয়ে গিরিকে সহরে নিয়ে নিজের রক্ষিতা করে রেখেছে অথচ রামপদ যাতে নিজের বৌকে গ্রহণ না

[১] স্মরণ করি

*১। আজ কাল পরশুর গল্প ২। দুঃশাসনীয় ৩। নমুনা ৪। বুড়ী ৫। গোপাল শাসমল ৬। মজুরী ৭। নেশা ৮। বেড়া ৯। তারপর? ১০। স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই ১১। শত্রুমিত্র ১২। রাঘব মালাকার ১৩। যাকে ঘুষ দিতে হয় ১৪। কৃপাময় সামন্ত ১৫। নেড়ী এবং ১৬। সামঞ্জস্য।

করে তার জন্য গ্রামে বিচার সভার আয়োজন করে। খবর পেয়ে গিরিও গ্রামে আসে। গ্রামে এতকাল যারা মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করেছে তারাই বিচার সভায় মোড়লদের মুখোস খুলে দেয়। গিরিও এদের সঙ্গে যোগ দেয়। গিরিও গাঁয়ে নিজের মায়ের কাছে ফিরে যায়।

সমাজে এতকাল যারা কেবল দিল অথচ পেল না কিছুই তারা জেগে উঠছে। অন্যায়কে তারা আর সহ্য করবে না। আগামী দিনে সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথার মধ্যেই গল্প শেষ হয়েছে। এই গল্পে হতাশা নেই, আশাভঙ্গের বেদনা নেই, দুর্ভিক্ষে মন্বন্তরে হতবল মানুষ আবার নতুন উদ্যমে জেগে উঠেছে এই বলিষ্ঠ সুর নিয়েই মানিক গল্পসৃষ্টি করেছেন।

তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তরে কেবল অনাহারেই মানুষ পর্যুদস্ত হয় নি। তার সঙ্গে ছিল কাপড়ের অভাব। বর্তমানের কালোবাজারী দুঃশাসনেরা ঘরে ঘরে দ্রৌপদীদের নিরাবরণ করে ছেড়েছে। কাপড়ের অভাবে তারা দিনের আলোয় আপন স্বামী পুত্রের নিকটও বের হতে পারে না। রাত্রির অন্ধকারে ছায়ার মত তখন মেয়েরা বের হয়ে তাদের সব কাজ সেরে নেয়। কাপড়ের অভাবে লজ্জা নিবারণের যে মর্মান্তিক জ্বালা তারই অপূর্ব বাস্তব চিত্র রয়েছে। অথচ দেশে কাপড় যে নেই তা নয়। কিন্তু সরকার বা পুলিশ তার কোন ব্যবস্থা করে না, বরং কালোবাজারীদের সঙ্গে যোগসাজস করে যারা প্রতিবাদ করে তাদের দাঙ্গাহাঙ্গামার দায়ে হাজতে পাঠিয়ে দেয়। গ্রামের নামে কাপড়ের পারমিট করে এনে সেই কাপড়ের গাঁট লরী ভর্তি করে চোরাবাজারের অন্ধকারে চলে যায়। আর কাপড়ের অভাবে আমিনা জলে ডুবে লজ্জা নিবারণ করে।

'নমুনা' গল্পে আছে জাল ওষুধের কাহিনী। যুদ্ধের বাজারে কুইনিন নামে যা বিক্রি হত আসলে তা ময়দার আঠা। জাল ওষুধ খেয়ে কেশবের এক ছেলে আর এক মেয়ে মারা গেল। বাকী রইল বয়স্থা মেয়ে শৈল। তার উপর নজর পড়ল কালাচাঁদের। যুদ্ধের বাজারে সে মেয়েদের দেহ-বেচা ব্যবসা খুলে দিল। সেজন্য শৈলকেও কি করে সে কাজে নিয়ে চালিয়ে দিল তারই এক মর্মান্তিক কাহিনী। অনাহারে এবং অভাবের তাড়নায় হতভাগ্য পিতা তার পিতৃধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কার রাখবার জন্য কালাচাঁদের নারীমেধ আশ্রমিক অবস্থার কথা শুনেও নারায়ণ সাক্ষী করে নিজের মেয়ে শৈলকে তার হাতে তুলে দিল। এই বিবাহের অভিনয়ে ভীত হয়ে কালাচাঁদ শৈলকে নিজের বিবাহিত স্ত্রীর মত রাখবার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত বাড়ীউলী মন্দোদরীর জন্য তা রাখতে পারল না। বাড়ীউলী

কালাচাঁদের হাতে যখন শৈলর বিনিময়ে একতাড়া নোট তুলে দিল তখন কালাচাঁদের কাছে নারায়ণ সাক্ষীর চেয়ে নগদ প্রাপ্তিই বড় হয়ে দেখা দিল। নারী ব্যবসায়ের পৈশাচিকতার মধ্যেও একটু মানবিকতার স্পর্শ লাগায় তা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

জোতদার কানাই (গোপাল শাসমল), হৃদয় পণ্ডিত (নেড়ী) গজেন (তারপর?) অনাহারে শীর্ণকায় মেয়েদের কৌশলে দেহবেচার পথে নিয়ে যায়। এ হচ্ছে ধ্বংসের দিক। উপায়ান্তর না দেখে অসহায় মানুষ নিজের নৈতিক মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালে এই অনাচার আর দুর্দশার নীরব সাক্ষী হয়ে যুবক সমাজ রইল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ একদিকে যেমন এনেছে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, সর্বস্তরের দুর্নীতি অনাচার তেমনি অন্যদিকে এনেছে নতুন আশা ভরসা। সাম্যবাদী আদর্শ জনমানসকে নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছে। এই পথ প্রতিবাদের, বিরুদ্ধতার, সংগ্রামের, ধনিক গোষ্ঠীর হাত থেকে সব ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে শোষিত মানুষের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার। মানিক এই মতবাদে দীক্ষিত। সেজন্য তাঁর রচনায় আছে এই নতুন আলোর নিশানা। সেজন্য এই গ্রন্থেও দেখি সীতু, রাখাল, বঙ্কি এবং আরও কয়েকটা ছোঁড়া জোতদার কানায়ের চালের নৌকা ধরিয়ে দিতে গিয়ে ফাটা মাথা নিয়ে ডাকাতির চার্জে জেলে গিয়েছে (গোপাল শাসমল)। মঙ্গলা ফেরারী আসামীকে ঘরে রাখতে ভয় পায় না। তাদের জন্য সে অত্যাচার সহ্য করে (মঙ্গলা)। পাড়ার ছেলেরা মেয়ে-ব্যবসার দালাল গজেনকে "স্পষ্ট বলে দিল পাড়ায় ঢুকলে তার একটি মাত্র আস্ত হাতটা মুচড়ে ভেঙ্গে দেবে।" (তারপর?)। গোরা সৈন্যরা যখন প্রতিপক্ষের সাক্ষী চাঁপার উপর অত্যাচার করে তখন রসুল মোকদ্দমার শত্রুতা ভুলে শক্ত হাতে লাঠি নিয়ে সকলের সঙ্গে গোরা সৈন্যদের বিরুদ্ধে ছুটে যায় (শত্রু মিত্র)। এই পর্বের শ্রেষ্ঠ গল্প হোল 'রাঘব মালাকার'। গ্রামের মা-বোনেরা যখন কাপড়ের অভাবে ঘরে ঘরে উলঙ্গ থাকতে বাধ্য হচ্ছে তখন রাঘবকেই চোরা কারবারীর কাপড়ের গাঁট মাথায় করে ভিন্নগ্রামে পৌঁছে দিতে হচ্ছিল। একদিন রাঘব সেই কাপড়ের গাঁট গ্রামের লোকজনের সাহায্যে লুঠ করে পরে জেলে যায়। (রাঘব মালাকার)। গল্পটির আগে মানিক লিখেছেন, "পুরাণে বলে একদা নর-রূপী ভগবান স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে তাদের অন্তর পরীক্ষা করেছিলেন—বহুকাল পরে আবার তিনি অদৃশ্য থেকে তাঁর প্রতিনিধিদের দিয়ে, সমগ্র বাংলা দেশের নর-নারীর বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে, কি পরীক্ষা করে দেখছেন, তা তিনিই জানেন……তবে

দুঃশাসনকে জব্দ করে বস্ত্রহীনা হওয়ার নিদারুণ লজ্জা থেকে দ্রৌপদীকে তিনিই রক্ষা করেছিলেন, হে রাঘব মালাকার, জেলে বসে ফাটা কপালে মলম দিতে দিতে অন্তত সেই কথা স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিও—আশা করি এই ছোট্ট কাহিনীটি পড়ার পর আপনিও ঠিক এই কথাই বলবেন।…"

'যাকে ঘুষ দিতে হয়' একটি চমৎকার ছোট গল্প। দুর্নীতি পরায়ণ—ধনিক সমাজের ব্যভিচারী রূপ এ গল্পে শ্বাপদমূর্তি লাভ করেছে। ঘুষ এবং অনাচারের দ্বারা পিছল পথে রাতারাতি বড়লোক হতে গেলে তাকে অনেক সময় চরম মূল্য দিতে হয় তারই এক সুন্দর দৃষ্টান্ত মানিক এই গল্পে দিয়েছেন। যুদ্ধের দৌলতে গরীবের ছেলে মাখন দাস সাহেবকে বহু ঘুষ দিয়ে অনেক কণ্ট্রাক্ট লাভ করে অতি দ্রুত বড়লোক হয়ে উঠেছে। এমনি একটা বিরাট কণ্ট্রাক্টের জন্য শেষ পর্যন্ত দাস সাহেবকে তার স্ত্রীকেও ঘুষ দিতে হয়েছিল। মাখনের এই প্রায়শ্চিত্ত তার অনাচারেরই অনিবার্য পরিণাম।

এ ছাড়াও আছে বুড়ী, বেড়া, নেশা, স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই, সামঞ্জস্য প্রভৃতি গল্প। এ সব গল্পেও স্বার্থ থেকে মানবিক বোধ হয়েছে প্রধান। প্রতিটি গল্পেই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিত্রতা, সৌহার্দ্য আর সহানুভূতি সহজ স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এই গল্প সংকলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শিল্পবিচারেও গল্পগুলি চমৎকার উৎকর্ষ লাভ করেছে। চরিত্র রূপায়ণে, ঘটনা বিন্যাসে, প্রশ্নমূলকতায় গল্পগুলো সুন্দর সার্থকতা লাভ করেছে।

॥ ৫ ॥

১৯৪৬ সালের ভয়াবহ দাঙ্গার পর প্রকাশিত হোল মানিকের আরেকটি গল্প সংকলন গ্রন্থ 'পরিস্থিতি'। অগ্রণী বুক ক্লাব ১৩৫৩, আশ্বিন তারিখে তা প্রকাশ করেন। এই সংকলনে মোট গল্প আছে বারোটি।* সংকলনের প্রথমেই মানিক লিখেছেন, "'প্যানিক' 'সাড়ে সাত সের চাল' ও 'রিক্সাওয়ালা' ছাড়া অন্য গল্পগুলি বছর খানেকের মধ্যে লেখা। 'প্যানিক' যুদ্ধের গোড়ার দিকে লেখা, অন্য দুটি তার পরবর্তী সময়ে।

* ১। প্যানিক ২। সাড়ে সাত সের চাল ৩। প্রাণ ৪। রাসের মেলা ৫। মাসি পিসী ৬। অমানুষিক ৭। পেটব্যথা ৮। শিল্পী ৯। কংক্রীট ১০। রিক্সাওয়ালা ১১। প্রাণের গুদাম ১২। ছেঁড়া।

গল্পগুলি সাজাতে ত্রুটি হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাতে খুব বেশি এসে যাবে বলে মনে হয় না। চারিদিকে দ্রুত ও বিরাট পরিবর্তনের কতকগুলি ছাড়া ছাড়া দিকের ছাপ গল্পগুলিতে আছে, সব কিছু বদলে যাচ্ছে এইটুকুই শুধু গল্পগুলির একতা। সবগুলি গল্প মিলে বিশেষ কোনো অখণ্ড সমগ্রতা বা ধারা কতখানি গড়তে পেরেছে বলা কঠিন।" (২৯শে ভাদ্র, ১৩৫৩।)

যুদ্ধের সময় বোমা পড়ার ভয়ে দলে দলে সহরের মানুষ পালিয়ে চলেছে। তখন চারিদিকে নানা গুজব, নানা আতঙ্ক। সেখানে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত। সব কিছুই উল্টে পাল্টে যাচ্ছে। মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষের জীবনের মূল্যবোধ হারিয়ে যেতে বসেছে। হঠাৎ একদিন গুজব রটল সব যুবককে বাধ্যতা-মূলক যুদ্ধে যেতে হবে। সেদিন রাতে ধনেশের ছেলে পুলক মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। পিতার প্রশ্নের উত্তরে পুলক বলল, "কেন খাব না? ক'দিন বাঁচব আর। তুমি বললে ধরে নিয়ে যাবে, শিবুদাও তাই বললে। শিবুদা বেশ লোক বাবা। বললে কি, দু'দিন বাদে সব তো ফুরিয়ে যাবে, আয় একটু ফুর্তি করে নি—"

যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে এল আকাল। দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। ক্ষুধার তাড়নায় কাতারে কাতারে মানুষ গ্রাম ছেড়ে সহরে ভীড় করল। সন্ন্যাসীও পালিয়েছিল। অনেকদিন পর কোনমতে কিছু চাল সংগ্রহ করে বাড়ী ফিরে দেখে সেখানে কেউ নেই। জ্বর গায়ে সন্ন্যাসীর মাথা ঘুরে যায়। ঝিমোতে ঝিমোতে এক সময় দাওয়া থেকে হুমড়ি দিয়ে উঠোনে পড়ে সন্ন্যাসী মারা যায়।

যারা সহরে পালিয়েছিল তারাও খাবার পেল না। মেয়েরা শুরু করল খাবার বিনিময়ে দেহ বিক্রয়। সব দিকেই দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের প্রথম মুখেই এল ভাঙন। বিত্তবান মানুষের যৌন বিকৃতি। সেই বিকৃতির মধ্যে নিজে থেকে ধরা দেওয়া সহজ নয়। এমনি এক ভীরু, সলজ্জ নারীর কাহিনী আছে 'প্রাণ' গল্পে। যৌনবিকৃতির কাহিনী আছে রাসের মেলা, মাসি পিসী, অমানুষিক গল্পে। এদের মধ্যে 'মাসিপিসী' গল্পটি স্বতন্ত্র। তারা অতি গরীব। সহরের বাজারে নিয়ে গিয়ে শাকসব্জী বিক্রী করে। তাদের আশ্রয়ে আছে আহ্লাদী। গাঁয়ের কত জনের যে আহ্লাদীর উপর নজর পড়েছে। শেষ-কালে গ্রামের জমিদার কত্তাবাবুরও নজর পড়েছে। তিনি আহ্লাদীকে ধরে আনবার জন্য একদিকে পাঠালেন চৌকিদার কনষ্টেবল অন্যদিকে গুণ্ডা। বঁটি আর দা হাতে নিয়ে মাসিপিসী ওদের তাড়া করে। তারা ভয়ে পালায়। কিন্তু

মাসি পিসী জানে এখানেই শেষ নয়। ওরা আবার ঘুরে আসতে পারে। "মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে ফেলায় সোনাদের ঘরে মাঝরাতে আগুন ধরিয়েছিল সেবার।" অতএব ভাবী যুদ্ধের আশংকায় তৈরী হয়ে থাকে মাসি পিসী। যুদ্ধে ছাগল যোগানোর ব্যবসায়ী কৈলাসের কাছে ছাগল বিক্রী করেনি বলে কৈলাসের লোকেরা ভৈরবকে মেরে আধমরা করে দিল। হাসপাতালের ডাক্তার পর্যন্ত কৈলাসের কথা শুনে ভৈরবকে সত্য সার্টিফিকেট দিলেন না। কৈলাসের অত্যাচারের প্রতিশোধ রাম শ্যামেরা তখন নিজেরাই নিল। কৈলাসকে তারা মেরে উপযুক্ত শাস্তি দেয়।

এই প্রকারের একটি উৎকৃষ্ট গল্প হোল 'শিল্পী'। যুদ্ধের বাজারে যখন সকলেই দুপয়সা কামাতে ব্যস্ত তখন তাঁতী মদন নিজের বেঁচে থাকার বিনিময়েও নিজের শিল্পীর ইজ্জতকে নষ্ট হতে দিল না। যুদ্ধের বাজারে অন্যান্য জিনিষের ন্যায় কাপড় বোনার সুতোও কালবাজারে চলে গেল। সুতোর অভাবে সাধারণ তাঁতির তাঁত বন্ধ হয়ে গেল। ভুবন সুতোর চোরাকারবারী। সে তাঁতিদের দারিদ্র্যের সুযোগ নেয়। তাদের দাদন কর্জ দিয়ে সস্তায় গামছা বুনিয়ে নেয়। মদনের সাত পুরুষ তাঁতী। তারা আগে বেনারসী বুনত। এখন কি গামছা বুনে নিজের শিল্পী ইজ্জত নষ্ট করবে? অভাবের তাড়নায় ভুবনের হাত থেকে দাদনে সুতো নিয়েও ভুবন সেই সুতো দিয়ে গামছা বুনতে পারে না। তাঁতীপাড়ার অনেক মানুষ মদনের দিকে তাকিয়েছিল। তারা জানত মদন খাঁটি গুণী লোক। সে যদি ভুবনের দাদন নিয়ে ইজ্জত বিক্রী করে তবে তারাও করবে। কিন্তু মদন বেইমানী করতে পারে না। পিতৃপুরুষের ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট হতে পারে না। কোন অপমানজনক সর্তে সে তার শিল্পী-সত্তাকে নষ্ট করতে পারে না। ভুবনকে তার সুতো ফিরিয়ে দেয়। এই বিবেকবোধের আরেকটি উৎকৃষ্ট গল্প 'কংক্রিট'। এই গল্প একটি কারখানা এবং তার শ্রমিকদের নিয়ে। যুদ্ধের সময় সিমেন্টের চাহিদা হু হু করে বেড়ে যায়। আর তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মালিকেরা সিমেন্টের যোগান দেয় গঙ্গামাটি মিশিয়ে। এই কারখানার শ্রমিক রঘু সবই জানে। কারখানার ম্যানেজার বিরামনারায়ণ ঘনঘন রুমালে মুখ পোঁছে বলে শ্রমিকদের কাছে সে মুখ-পোঁছা বাবু। সে মালিকের দক্ষিণ হস্ত আর তার হাতে আছে কিছু দালাল। কারখানার মালিক এবং ম্যানেজার প্রতিবাদী শ্রমিকদের প্রয়োজন হলে রোলার মেসিনে ফেলে একেবারে শেষ করে দেয়। এমনি এক ঘটনা ঘটে কারখানায়। কেষ্ট বাতাপি রোলার মেসিনে একেবারে থেতলে যায়। এবং এই কাজটা করে

একজন দালাল শ্রমিক বেন্দা। এই অপঘাতের ঘটনা নিয়ে শ্রমিক মহলে চাপা বিক্ষোভ দেখা দেয়। বেন্দার সঙ্গে রঘুর বহুদিনের খাতির। বেন্দার বাড়ি গিয়ে বেন্দার স্ত্রীর কাছে রঘু সব জানতে পারে। টাকার বিনিময়ে বেন্দা এই কাজ করেছে। এই টাকার ভাগ রঘুরও আছে। রঘুর যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গে। "কানে তালা লেগে গেছে রঘুর, সেটা যেন মানুষের নরম মাংস পিষে থেতলে যাবার যে শব্দ তার মত। এই কাজ এবার তাকেও করতে হবে। বেন্দা যা করে, ছিদাম যা করে। চুপ করে থাকলে তার চলবে না, পোঁছাবাবু তাকে কাছে টেনে কাজে লাগাবে বেন্দার মত, ছিদামের মত। এই তার পথ। আর এক মুহূর্ত এখানে থাকলে তার যেন প্রাণটা যাবে এমনি ভাবে চট করে খিল খুলে রঘু পথে নেমে যায়। হন হন করে এগিয়ে যায় অন্ধকার গলি ধরে। নেশা তার কেটে গেছে।...তার ধৈর্য ধরছিল না। কতক্ষণে গিরীনের কাছে গিয়ে বলবে নিজের চোখে যা কিছু দেখেছে—রোলার মেশিনের ঘটনা। সবাই যে অস্ত্রটি খুঁজছে, নিজের কাছে অকারণে এক মুহূর্তের বেশী সেটি লুকিয়ে রাখবার কথা সে ভাবতে পারছিল না।" শিল্পী মদনের মতই তার বিবেক জেগে উঠেছে। সে বেইমানী করতে পারবে না তার সহকর্মীদের সঙ্গে।

যুদ্ধের হতাশায় এবং বিশৃঙ্খলায় যখন মানুষের সমস্ত মূল্যবোধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল তখন মানিকই দেখতে পেলেন সাধারণ শ্রমিক কৃষকের মধ্যে সুস্থ বিবেক, প্রকৃত মনুষ্যত্বের চিত্র। মানিক সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্যেই খুঁজে পেলেন অসাধারণ সব মানুষের জীবন, সংগ্রামের পুরোভাগে একেবারে সামনের সারির সব মানুষ, যেখানে শ্রেণী-সংগ্রামের সুস্পষ্টতা সবচেয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠার ফলে মানুষের মধ্যেকার ভাল-মন্দ বিশেষত্বগুলো খুব ভাল ভাবে ফুটে ওঠে, এবং সকলের উপর তিনি খুঁজে পেলেন এমন সব বিশেষত্ব যেগুলো নিয়ে বাংলা সাহিত্যে ইতোপূর্বে কিছু লেখা হয় নি এবং যেগুলো অনুশীলন করে তিনি নিত্য নতুন সৃষ্টির কাজে প্রেরণা পেলেন।

তাঁর এই সৃষ্টি-প্রেরণা তখনকার কমিউনিষ্ট পার্টির সংশ্রবে আসার ফল। মানিক রীতিমত একজন কমিউনিষ্ট কর্মী এবং লেখক। তিনি প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে নানা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকেন। তাদের খোঁজ খবর নেন। সুতরাং ঔপন্যাসিক হিসেবে এ তার নতুন অভিজ্ঞতা। সমসাময়িক জীবন ও জগৎকে দেখবার তাঁর এক নতুন দৃষ্টি লাভ হোল যার ফলে তিনি নতুন নতুন বিষয় এবং চরিত্র সৃষ্টি করে যেতে লাগলেন। "যে সব মানুষ এক কদম এগিয়ে আছেন আর সমস্ত

জনতাকে যারা নিজেদের শক্তি আর গুণের জোরে পেছনে টানতে পারেন সেই সব মানুষের দৈনন্দিন সান্নিধ্যে আসাটা যে একজন ঔপন্যাসিকের পক্ষে কতখানি লাভজনক, সে কথা এমন কি অ-কমিউনিষ্টরাও বাইরে থেকে সহজেই অনুমান করতে পারেন।”[১]

মানিক প্রতিভাবান শিল্পী। সেজন্য তিনি তাঁর জীবনের গভীরতম আবেগ দিয়েই অতি দ্রুত রাজনৈতিক ধারণার দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। তিনি নিজের “রক্তে মাংসে” এই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন আর নিরবচ্ছিন্নভাবে তাকে তিনি সুস্পষ্ট করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সেজন্য তাঁর কাছে রাজনীতির মূল সমস্যাগুলো নীরস আর শিল্পরচনার বিরোধী বলে প্রতীত হয় নি। এখানেই মানিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মানিক দেখতে পেয়েছেন চতুর্দিকের পচা বিষাক্ত আবহাওয়া। এ যেন কন্ট্রোলের গুদামের মত। কন্ট্রোলের নামে ভাল খাদ্যের বিনিময়ে রদ্দিমাল চালানো হয়। কোথাও সুস্থতা বা স্বাভাবিকতা বজায় নেই। কোন গোপন পথে সেগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। এই পচা বিষাক্ত আবহাওয়ায় সুস্থ প্রাণও মরে যায়। ‘প্রাণের গুদাম’ তারই একটি চমৎকার গল্প।

মানিকের গল্প উপন্যাস পড়তে পড়তে আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবি মানিক শ্রমিক কৃষক নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের কত কাছাকাছি হয়েছেন, তিনি তাদের দুর্বলতাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন, মধ্যবিত্ত জীবনের ন্যাকামি, ভণ্ডামির মুখোস খুলে দিয়েছেন, ধর্মঘট হরতালে সামিল হওয়ার জন্য ডাক দিয়েছেন, শ্রেণী বৈষম্যকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন, সাহিত্যে রাজনীতি প্রচার করেছেন কিন্তু কোথাও তার শিল্পধর্মকে নষ্ট হতে দেন নি। মানিকের সাহিত্য খুব কম জায়গায় প্রচারসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। যারা কমিউনিষ্ট বিরোধী তারাও যদি মানিকের রচনার কেবলমাত্র বিষয়বস্তু না দেখে তার সাহিত্য-শিল্পকে সামগ্রিকভাবে বিচার করেন তাহলে মানিকের ভূয়সী প্রশংসা না করে পারবেন না। এবং সেখানেই কমিউনিষ্ট মানিকের কৃতিত্ব।

শিল্প সাহিত্যের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন সামগ্রিকভাবে তাকে শিল্প হয়ে উঠতে হবে একথা মার্কসবাদের প্রবক্তারাও অস্বীকার করেন নি। মার্ক্স, লেনিন, ষ্টালিন, মাও সে তুঙ সকলেই কবিতা লিখেছেন। এঙ্গেলস লিখেছেন, “The more the author's views are concealed the better for the work of

১। আঁদ্রে স্তিল—বিপ্লবীকর্মী ও লেখক।

art."[১] লেনিন লিখেছেন, "There is no question that literature is least of all subject to mechanical adjustment or levelling, to the rule of the majority over the minority. There is no question, either, that in this field greater scope must undoubtely be allowed for personal initiative, individual inclination, thought and fantasy, form and content. All this is undeniable."[২] ষ্টালিন শিল্পী সাহিত্যিককে বলেছেন, "Engineers of the human soul." আর সকলের চেয়ে স্পষ্ট করেছেন চীনের চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙ। তিনি বলেছেন, "আমরা দাবী করি : শিল্পের সঙ্গে রাজনীতিকে যুক্ত করতে হবে, বিষয়বস্তুকে রূপরীতির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, যথাসম্ভব উচ্চস্তরের শিল্পগুণের সঙ্গে বিপ্লবী রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর সমন্বয় ঘটাতে হবে। বিষয়বস্তু রাজনীতির দিক থেকে যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, শিল্পমূল্যের বিচারে উত্তীর্ণ না হলে তা ব্যর্থ হবে।

সেই জন্যই আমরা প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়বস্তুসম্পন্ন শিল্পকর্মের যেমন নিন্দা করি, তেমনি নিন্দা করি প্রাচীরপত্র বা শ্লোগানের ভঙ্গিতে রচিত শিল্পকর্মের, যাতে কেবল বিষয়বস্তু রয়েছে কিন্তু নাই রূপরীতি।"[৩]

॥ ৬ ॥

'চিহ্ন' উপন্যাসের পর মানিকের নতুন গ্রন্থ 'খতিয়ান' প্রকাশিত হল ১৯৪৭এর আগষ্টে। এই গল্প সংকলনে মোট গল্প আছে দশটি।*

এই গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পই চমৎকার। 'খতিয়ান' সাম্প্রদায়িক পটভূমিকায় লেখা। যে হিন্দু মুসলমান শ্রমিক একসঙ্গে কারখানায় কাজ করে, ধর্মঘট করে তারাই আবার বুদ্ধির ভুলে একে অন্যের বুকে ছোরা মারে। হিন্দু মুসলমানের পাড়ায় যখন আগুন জ্বলে তখন সাহেব পাড়ায় চলে উচ্ছৃঙ্খল হাসি আর গান-বাজনা। ওরা যেন ব্যঙ্গ করছে। আর এই দাঙ্গার সুযোগ গ্রহণ করে তাদের কারখানার মালিকেরা। যারা আগে শ্রমিক সংহতির ভয়ে শ্রমিকদের ছাঁটাই করতে সাহস

১। Literature and Art.

২। Party organisation and Party Literature.

৩। ইয়েনান বক্তৃতা, ২রা মে, ১৯৪২।

*১। খতিয়ান ২। ছাঁটাই রহস্য ৩। চক্রান্ত ৪। গুণ্ডামী ৫। কানাই তাঁতী ৬। চোরাই ৭। চালক ৮। টিচার ৯। ছিনিয়ে খায়নি কেন এবং ১০। একান্নবর্তী।

করত না তারাই দাঙ্গার ভেদবুদ্ধির সুযোগ নিয়ে চল্লিশজনকে ছাঁটাই করে দেয়। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বন্দুকধারী পুলিশ এসে ১৪৪ ধারা অমান্যের অপরাধে ছাঁটাই শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করে নেয়। পুলিশের গাড়িতে উঠে দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রমিকবন্ধু নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। তারা স্বীকার করে, তাদের কোন হাত নেই, "তুই গরীব, আমি গরীব। আমরা গরীবের জাত"।

'একান্নবর্তী' শ্রমিক সংহতির আরেকটি চমৎকার গল্প। চার ভাই বীরেন, ধীরেন, হীরেন ও নীরেন সকলেই পৃথক। এদের মধ্যে হীরেন খুব গরীব। আর তিনজনেই বড়লোক। সেজন্য হীরেন বা হীরেনের পরিবারের সঙ্গে এদের বনিবনা নেই। হীরেন তার মতো আরো তিনজন কেরাণী এবং তাদের পরিবারকে নিজের বাড়ী নিয়ে আসে। চার পরিবার একত্রে রান্নাবান্না করে। তাতে সকলেরই সুবিধে হয়, খরচ কম হয়। এই গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে চেয়েছেন, ভাই জন্মগত নয়, শ্রেণীগত। শ্রেণী আলাদা বলে আপন ভাইয়েরা হীরেনের সঙ্গে একান্নবর্তী হয়ে বাস করতে পারে নি। কিন্তু পুরানো যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গেলেও নতুন করে একান্নবর্তী পরিবার গড়ে উঠেছে। তা হলো একই শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে। হীরেনের স্ত্রীও খুসী হয়েছে। সে নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে। 'ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে সে মরতে গিয়েছিল কদিন আগে দিশেহারা হরিণীর মত, আজ বাঘিনীর মত বাঁচতে শুধু সে রাজী নয়, বাঁচবেই এই তার জিদ।"

'চক্রান্ত' গল্পেও এই শ্রেণীবোধের কথা আছে। যুদ্ধের পর চতুর্দিকে দেখা দিয়েছে ছাঁটাই, বেকারী। মধ্যবিত্ত জীবন অর্থ নৈতিক চাপে পিষে যাচ্ছে। এই সংকট মুহূর্তে মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিমা এই গল্পে একাত্মতা ও সমব্যথা অনুভব করেছে নীচুতলার মেহনতী মানুষ আহ্লাদীর সঙ্গে।

'ছাঁটাই রহস্য' যুদ্ধের বাজারে নিয়োগ এবং যুদ্ধের পরে ছাঁটাইয়ের এক চমৎকার ব্যঙ্গাত্মক গল্প। গিধর এণ্ড বাঙলা কোম্পানী যুদ্ধের বাজারেও স্থায়ী চাকরির লোভ দেখিয়ে কম বেতনে খাটিয়ে নিয়েছে। আর যুদ্ধের পর বেশী কামাই, অকর্মণ্যতা, চুরি প্রভৃতি নানা মিথ্যা অভিযোগে কর্মচারীদের বরখাস্ত করল। তবু বলল না ছাঁটাই করছে। কোম্পানী তার শোষণ এবং শাসন চালু রাখার জন্য কত কৌশল অবলম্বন করে এই গল্পে তার পরিচয় আছে। ক্রোধ, ঘৃণা, অবিশ্বাস ধূমায়িত হচ্ছিল সকলের মনে তবু তারা বিশ্বাস আঁকড়ে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও চলে যায়। দেওয়ালের গায়ে তারা ছবি আঁকে আর লিখে রাখে :

"১৯৪০ সাল—পরামর্শ। গিধর বলছে—পারমানেন্ট বলে লোক নিলে কত

সুবিধা। গড়পড়তা বিশ রূপেয়া কম দিতে হলে লোক পিছু বছরে দু-শো চল্লিশ রূপেয়া মুনাফা।

বাঙলা বলছে—তারপর বরখাস্ত করলেই হোল।" পাশের ছবিতে আছে, "১৯৪৫—শেষ ভাগ।" কয়েকজন পারমানেন্ট কর্মচারীকে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে ডাষ্টবিনে। সব কিছুর ওপরে লেখা আছে মোটা হরফে : 'ছাঁটাই রহস্য'।

যারা নিজেদের পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে শিক্ষকের দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য প্রচার করে থাকেন তাদের মুখোস খুলে দিয়ে শিক্ষকের আত্মমর্যাদা রক্ষার কাহিনী বিবৃত হয়েছে 'টিচার' গল্পে। আর মেয়েরা নিজেদের সম্মান বাঁচাবার জন্য নিজেরাই যে প্রস্তুত হয়ে উঠেছে তারই কাহিনী আছে 'গুণ্ডামি' গল্পে। আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনুভূতি এবং সম্পর্কও যে পাল্টে যায় তারই গল্প আছে 'কানাই তাঁতি' গল্পে। বাড়ির উড়িয়া ঠাকুরের ঘুটে বেচুনির সঙ্গে গোপন প্রেমের একটি সুন্দর গল্প 'চোরাই'।

দুর্ভিক্ষে দলে দলে লোক মরেছে তবু ছিনিয়ে খায়নি কেন? 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্প তারই এক সুন্দর আলেখ্য। পেট ভরে খেতে না পেয়ে মানুষের জীবনী শক্তি ক্ষয়ে আসে, প্রতিবাদের ক্ষমতা মিইয়ে যায়। "একদিন খেতে না পেলে শরীরটা শুধু শুকোয়না, লড়াই করে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার তাগিদও ঝিমিয়ে যায়।'

চার ছেলের মধ্যে দুটি চাকরে আর একটি এম.এ. পড়া ছেলে, বাকীটি বাস চালানো 'অভদ্র ছোটলোক ছেলে' অজিত। বাবা এই ছেলের জন্যই ভয়ে ভয়ে থাকতেন। কারণ ভদ্র জীবনে সে না কলঙ্ক আমদানী করে। কিন্তু বাবা শেষ পর্যন্ত বুঝলেন, "এই ছেলেটাই ভাল। সংসারে ঠিকমত টাকা দেয়, নিজের আর বৌয়ের বাবুগিরিতে সব উড়িয়ে দেয় না।" এই ছেলেই তার একমাত্র বিশ্বাসী। অন্য বাবু ছেলেদের উপর তিনি আর ভরসা রাখতে পারেন নি। তাই তাকে ভিন্ন করিয়ে তার সঙ্গেই তিনি থাকতে চান। 'চালক' গল্পে আছে তারই ইতিবৃত্ত।

মানিকের ব্যক্তিগত জীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। মানিকের পরিবারে মানিক ছিলেন অপাংক্তেয়। বড় চাকরি বাকরি করেন না। ছোট লোকদের গল্প লেখেন আর পার্টি করেন। মানিকের বড় ভাইয়েরা পদস্থ এবং বড় চাকরে। বড়জন নিজের বাড়ি করে পৃথক থাকেন। মেজো ডাক্তার বাইরে থাকেন। সেজোর সঙ্গে মানিকের বনিবনা একদম ছিল না। তিনি মানিককে একদম বরদাস্ত করতে পারতেন না। অপ্রীতিকর ঘটনা প্রায়ই ঘটত। বৃদ্ধ পিতা অশান্তি দূর করবার জন্য শেষ পর্যন্ত

টালিগঞ্জের বাড়ি বিক্রী করে দিয়ে ছেলেদের পৃথক করে দিলেন এবং পিতা আমৃত্যু মানিকের সঙ্গেই থাকতেন। মানিক টালিগঞ্জের বাড়ি বিক্রী হওয়ায় একেবারে বরানগরে চলে আসেন।

॥ ৭ ॥

'ছোট বড়' মোট চৌদ্দটি গল্পের সংকলন।* এদের মধ্যে 'চালক' গল্পটি খতিয়ান গ্রন্থে পূর্বেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই-এর ঐতিহাসিক ডাক ধর্মঘটের পরেই এল আর একটি কলঙ্কিত দিন ১৬ই আগষ্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। ইংরেজরা তখনো এদেশের শাসন ক্ষমতায়। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রাম তাদের বিরুদ্ধে শুরু হোল না। বরং তাদেরই চক্রান্তে শুরু হোল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। যে ২১শে জুলাই হিন্দু মুসলমান সাধারণ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে সেই হিন্দু মুসলমান ১৬ই আগষ্টে একে অন্যের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে লাগল। এই ঘৃণিত দাঙ্গা চলে অনেকদিন ধরে। বাংলাদেশের সভ্যতা ও সাংস্কৃতির পীঠস্থান কোলকাতা সহর যেন হিংস্র মানুষের জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তাতে লাভ হিন্দু বা মুসলমান কারুই হয় নি। হয়েছে ইংরেজ শাসকের। তারা দেশকে দুভাগ করে দিয়ে আরও বহুদিন ধরে এই বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে পরোক্ষে কর্তৃত্ব করার সুযোগ পেল। এই দাঙ্গার পটভূমিকায় লেখা অনেকগুলো গল্প—ভালবাসা, ছেলে-মানুষি, স্থানে ও স্তানে এবং ব্রিজ। যে কাজে পরস্পরের অপকার ছাড়া উপকার হয় না, বরং নিজেদের আরও দুর্বল করে দেয় সেই ঘৃণ্য কাজ দাঙ্গাকে মানিক ছেলে-মানুষি বলেই অভিহিত করেছেন। এই দাঙ্গায় মানুষ পশু হয়ে গিয়েছে। কত নারী তার আপনজনকে হারিয়েছে। কত জননী এবং স্ত্রীর বুক ভেঙ্গে গিয়েছে। কিন্তু তবু তাদের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠেনি। এই আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িকতা বন্ধ করার জন্য মনে প্রাণে কামনা করেছে। আপনজনের অন্যায়কে প্রতিবাদ জানিয়েছে (স্থানে ও স্তানে)। ভয়ে পালানোর চেয়ে শক্ত হয়ে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে চেয়েছে। মরণ-যজ্ঞের

*১। ভালবাসা ২। তথাকথিত ৩। চালক ৪। ছেলেমানুষি ৫। স্থানে ও স্তানে ৬। ষ্টেশন রোড ৭। পেয়াণটা ৮। দীঘি ৯। হারাণের নাতজামাই ১০। ধান ১১। সাথী ১২। গায়েন ১৩। নব আল্পনা ১৪। ব্রিজ।

আগুন নেভাতে শান্তি মিছিলে যোগ দিয়েছে (ভালবাসা)। যে সহরে আছে সভ্যতার অন্যতম দর্শনীয় বস্তু হাওড়া ব্রিজ, সেখানে যুদ্ধের সময় বিদেশী সাদা সৈনিকেরা "রুটির টুকরো দিয়ে দেশী মেয়ে কিনেছে চির দুর্ভিক্ষের দেশে, তাদের জন্য গরু-ছাগল হাঁসমুর্গী রসদ সরবরাহের মত গড়ে উঠেছে উপোসী উচ্ছন্ন গাঁয়ের মেয়ে বৌ সরবরাহের ব্যবসা।" তাদের বিরুদ্ধে আমরা কখনো প্রতিবাদ করতে পারিনি। এই দাঙ্গার সময়ও তারা রয়েছে নিরাপদ আর অসহায় মানুষ স্ত্রী পুত্র নিয়ে সহরে ঢুকতে আতঙ্কে ভয়ে কাতর হয়ে পড়ে। এই সব গল্পে একদিকে যেমন আছে চরম ঘৃণা অন্যদিকে তেমনি আছে সোচ্চার প্রতিবাদ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গী মার্কসবাদী। তিনি জীবনকে বিচার করেন সামগ্রিক ভাবে। সেজন্য এ জীবনে তিনি যেমন দেখেন অবিচার, অত্যাচার, দাঙ্গা খুনোখুনি অন্যদিকে তিনি উপলব্ধি করেন এগুলোই জীবনের চরম সত্য নয়। মানুষ জীবনের সমস্ত ঘাত প্রতিঘাতকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। এই আশা এবং বলিষ্ঠ প্রত্যয় না থাকলে জীবনে বাঁচার সার্থকতাই থাকে না। কোন নিয়মই চিরকাল এক থাকে না। যুগে যুগে জীবনের বাস্তববোধের ফলে তা পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন করে মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনে। এখানেই মানিকের বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য।

বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের নিপীড়নে হতভাগ্য দেশের হতভাগ্য দরিদ্র্য মানুষ-গুলো ভাঙাচোরা রুগ্নতায় আরো কাহিল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে এই দুর্ভিক্ষকে মূলধন করে ধানের চোরাকারবারে কিছু ধনী আরোও ধনী হয়ে উঠে। এদের প্রতি মানিকের কোন সহানুভূতি নেই। তাঁর সমবেদনা হতভাগ্য বঞ্চিত মানুষ-গুলোর প্রতি। এদের দুঃখে তিনি শুধু আর্দ্রতাই সৃষ্টি করেন নি। তিনি এই ভগ্ন মানুষদের হৃদয়ে আশার আলো দেখিয়েছেন। হতোদ্যমদের মধ্যে তিনি প্রতিবাদের সুর এনে দিয়েছেন। এই সংকলনের বাকী সব গল্পকেই এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

সাধু সেখ ধানের ভাগ নিয়ে লড়াই করে জেল খাটে। মুক্তির দিন জেল গেটে আবার সঙ্গী দুজনকে আটক রাখে কিন্তু সাধু সেখ ফেরার হয়। সে যেন স্বপ্ন দেখে, "ইংরেজ ভেসে গেছে কবে, আইন কানুন পাল্‌টে যাবে সব, আজ না তো কাল। না যাবে না? জমিদার জোতদার রইবে না, দারোগা পুলিশ মোদের পিটতে এসবে না ওদের হয়ে। দেশের মানুষ রাজা হয়েছে,

চাষী পেরজা মোদের কথা মানবে তো বটে, আজ না তো কাল? না মানবেনা? তাই মনে করলাম কটাদিন ডুব মেরে কাটিয়ে দিলে আর ভয়টা কি।" (পেরাণটা) খিদেয় খ্যাপা মানুষগুলো ঠিক করল শরৎ হালদারের ধানের গোলা অধিকার করে ন্যায্য মূল্যে সেই ধান সকলের মধ্যে বিক্রি করে দেবে। কিন্তু শরৎ হালদার ধূর্ত মানুষ। বিরাট ব্যবসায়ী জগৎ কুণ্ডুর লরীতে সেই ধান পাচার করে দেয় আর কিছুটা লুকিয়ে রাখে নায়েব নারায়ণের বাড়িতে। চাষীরা সেই ধান ধরে থানায় খবর দেয়। থানার লোকের সঙ্গে আগেই বন্দোবস্ত ছিল নারায়ণের। তাই দারোগা ভীড়ের মেজাজ দেখে লোক দেখানো গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় নারায়ণকে। আর ধানগুলো আটক রাখে থানায়। থানার যোগসাজসে নারায়ণ মুক্তি পায় আর ধানগুলো পচে গন্ধ হয়ে ওঠে। তবু সাধারণ মানুষের ভোগে সেগুলো আসে না। (ধান)

শুধু গোলা লুঠ নয়। তারপর শুরু হল ধানের ভাগ নিয়ে লড়াই। সেই লড়াইয়ে সাধারণ মানুষ জোট বাঁধে আর জমিদারও আনে পুলিশ, গুণ্ডা আর সাবেকি ওস্তাদ লেঠেল। কিন্তু লেঠেল হাসাতুল্লারও ভাল লাগে না জমিদারের এই লোকজনের ব্যবহার। কারণ "মগজে এদের শয়তানের বাসা, শক্তের ভয়ে আঁধারে লুকিয়ে থাকে, খুঁজে বেড়ায় একা অসহায় মেয়েছেলে।" লেঠেল হাসাতুল্লার চরিত্র বিশ্লেষণ চমৎকার। (দীঘি) এ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প হল 'হারাণের নাতজামাই'। এই গল্পে ময়নার মা মানিকের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে চাষীরা অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়েছে। ভুবন মণ্ডল এই চাষীদের নেতা। তাকে ধরবার জন্য জোতদার আর পুলিশের চেষ্টার অন্ত নাই। সংগ্রামী কৃষক সমাজের এমন চমৎকার গল্প বাংলা সাহিত্যে মানিকের পূর্বে কেহ লিখতে পারেন নি।

সমাজে আজ নতুন চেতনা দেখা দিয়েছে। এই চেতনা কেবল দুঃখের কাহিনী শোনাবার জন্য নয়। বাংলা সাহিত্যে এই সমবেদনার কথা অনেক আছে কিন্তু এই দুঃখ জয়ের পথের সন্ধান মানিকের পূর্বে আর কেহ দেন নি। গায়েন গল্পে আছে তারই কথা। কবিয়াল রাজেনের মত নাম করা গায়েন আর নেই। কিন্তু তার গানও আর চলে না। লোক ভুলানোর জন্য সে নতুন সমস্যার গান গায় প্রতিবাদের কথা বলে কিন্তু তাতে যেন রসকস নেই। অথচ তারই শিষ্য নরহরি গাইছে নতুন গান। "করুণ হয়ে ওঠে নরহরির মরণের গান, হৃদয়ে মোচড় দেয় তার রসালো, ঝাঁঝালো পদগুলি, কিন্তু চোখে জল

আসে না, কাঁদায় না। অসহায় হতাশায় ফেটে যাবার উপক্রম করে না বুক। ক্রোধে, ক্ষোভে তপ্ত হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস, হাতগুলি যেন এগিয়ে এগিয়ে যেতে চায় নরহরির ডাকেই সায় দিয়ে শিশুখেকো মেয়েখেকো মানুষখেকো রাক্ষসগুলির টুটি ধরে টেনে ফাঁসিতে লটকে দিতে—

ছাড়ো মিছে আশ
রাজার সেপাই দেয় কিরে ভাই
(মুখে) তুলে ভাতের গ্রাস।

বারংবার উন্মাদনা ফেটে পড়ে সভায়। মুখ টান টান। চোখে চোখে আগুনের ঝিলিক।"

বৃদ্ধ রাজেন নরহরির গান শুনে নরহরিকেই নবযুগের গুরু বলে স্বীকার করে। 'গায়েন' এই সংকলনের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। 'ষ্টেশনরোড' গল্পে পদ্মলোচনও গান করে, নতুন চেতনার গান।

এ ছাড়া আছে আধা সরকারী হাসপাতালের এল-এম-এফ ডাক্তার মতিলালের নতুন চেতনার কথা (তথাকথিত)। বড়লোকের উচ্ছৃঙ্খল ছেলে ত্র্যম্বকের আশা কোলকাতার বড় ডাক্তাররাও ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু মতিলাল অনেক যত্নে এবং অনেক চেষ্টায় সেই ত্র্যম্বককে সারিয়ে সুস্থ করে তুলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল। সেই ত্র্যম্বকের প্রতিশ্রুত টাকা না পেয়ে মতি ডাক্তার মনোক্ষুন্ন হয়েছিল কিন্তু সবচেয়ে আপন মনে তার ধিক্কার জাগল যখন দেখল ঐ ত্র্যম্বকই মাঠে ধানের ভাগ নিয়ে বিবাদ বাধিয়ে চাষীদের মাথায় লাঠি মেরেছে। 'নব-আল্পনা' মিলিটারীর অত্যাচারের এক কাহিনী। 'সাথী' চাষী পরিবারের একটি সুন্দর গল্প। রাগের মাথায় গগন তার স্ত্রী সোহাগীকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করলেও পরে তার অনুশোচনা এবং সোহাগীরও স্বামীর প্রতি গভীর দরদে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

এই সংকলনের প্রায় সব গল্পই নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং কৃষক সমাজকে কেন্দ্র করে লেখা। ঘটনার বর্ণনায়, চরিত্র রূপায়নে, মনোবিশ্লেষণে, চরিত্রানুগ ভাষা ব্যবহারে মানিকের কুশলতা প্রশংসনীয়। মানিক নিজেই যেন 'গায়েন' গল্পের নরহরি কবিয়াল। নতুন চেতনায় নবযুগের সাহিত্য রচনা করে তিনি পাঠকদের চমৎকৃত করে তুলেছেন।

'মাটির মাশুল' মোট পনেরটি গল্পের সংকলন।* এদের মধ্যে 'ভয়ঙ্কর' ভেজাল গল্পগ্রন্থের 'ভয়ঙ্কর' গল্প অবলম্বনে লেখা একাঙ্ক নাটক। তাছাড়া 'ব্রিজ' এবং 'নব-আল্পনা' গল্প দুটি ছোটবড় গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অতএব এই গ্রন্থের মোট মৌলিক গল্প হলো বারটি।

এই গ্রন্থটি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থারম্ভে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, এই গ্রন্থের "কয়েকটি গল্প কয়েক বছর আগে লেখা। অন্য গল্পগুলি যেমন 'আপদ', 'বাগদী-পাড়া দিয়ে' ইত্যাদি এই বছরের মধ্যেই লেখা।"

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হয়েছে। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার অবসাদের পর সকলেই ভেবেছিল এবার দেশে মুক্ত হাওয়া বইতে আরম্ভ করবে। সাধারণ মানুষ অনেক সুখ শান্তিতে থাকতে পারবে। তাদের অভাব-অনটনের অবসান ঘটবে। কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ বুঝতে সাধারণ মানুষকে বিশেষ করে খেটে-খাওয়া মানুষকে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয় নি। অভাব অনটন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। চারিদিকে শুরু হয়েছে চোরাকারবারের বিভীষিকা। চারিদিক থেকে এক সর্বনাশা দারিদ্র্য ঘনিয়ে এসেছে। স্বাধীনতা কথাটা অল্পদিনেই বাসি পচা সংবাদে পরিণত হয়েছে। এই সংকলনের অনেকগুলো গল্প 'পারিবারিক', 'মাটির মাশুল', 'আপদ', 'পথান্তর' এই পটভূমিকায় রচিত। এই সব গল্পে সমসাময়িক অবস্থার সুন্দর বিশ্লেষণ আছে। স্বাধীনতা পাওয়ার পর মধ্যবিত্ত কেরাণীদের দাসত্বের ডিগ্রি বহুগুণে বেড়েছে। নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাওয়ার মত এদের মাসিক উপার্জনের টাকা জিনিসপত্রের আগুনের তাপে অল্প দিনেই ভস্ম হয়ে যায়। অর্ধেকের বেশী যে মাসটা বাকী থাকে তা যে কিভাবে চলবে তা কেউ ভেবে পায় না। সংসারে যেন রোগের নিত্য হাট বাজার, সমারোহ লেগে আছে। অথচ খবরের কাগজে তাদের এই দুর্দশার চিত্র নেই। সংবাদপত্র পড়ে এই সব মধ্যবিত্ত মানুষের মনে দারুণ অসন্তোষ এবং অতৃপ্তি দেখা দেয়। তাদের মনে হয় সংবাদপত্রগুলো যেন "সত্য মিথ্যার মেশাল দেওয়া ঘন্টের মত, মন পোড়ানো ঝাল দেওয়া।" একদিকে যেমন সাধারণ

---

*১। মাটির মাশুল ২। বন্যা। ৩। ঘর ও ঘরামি ৪। পারিবারিক ৫। ট্রামে ৬। ধর্ম ৭। দেবতা ৮। নব-আল্পনা ৯। ব্রিজ ১০। ভয়ঙ্কর ১১। আপদ ১২। পথান্তর ১৩। সিদ্ধপুরুষ ১৪। হ্যাংলা এবং ১৫। বাগ্দীপাড়া দিয়ে।

মানুষের ঘরে ঘরে শূন্যতা দেখা দিয়েছে তেমনি অন্যদিকে চোরাকারবারীদের গুদামে গুদামে জমে উঠেছে ধান চালের পাহাড়। অবশ্য 'দেশে চাল না থাকলেও সিনেমার কমতি নেই।' নতুন নতুন সিনেমা হাউস দ্রুত গড়ে উঠেছে। "ওষুধের নেশার মত সস্তা আনন্দের জন্যে দুটি ঘণ্টার জন্য বিব্রত অতিষ্ঠ মানুষ পয়সা দিচ্ছে, সে লাভে ভাগ বসাতে একদিন দেরিও যেন সইবে না। তাড়াতাড়ি গড়ে তোলো, রোসনাই জ্বালো, দুয়ার খুলে দাও—কিছু রেডিও মার্কা মাছি ওড়া সুরের ভনভনানি, কিছু দেশপ্রেম আর বিপ্লবী নায়ক-নায়িকার বাসর ঘরের বিপ্লবে সমাপ্তি, এরই জন্য ভিখারির মত মেয়ে-পুরুষ এসে ভিড় করুক টিকিট ঘরের দরজায়" (আপদ)। মধ্যবিত্ত সংসারে এর আঘাত লেগেছে প্রচণ্ড। এককালে হয়ত সেখানে কোন আদর্শ ছিল, সত্য ছিল। আজ আর তা নেই। আছে শুধু কোন রকমে টিকে থাকার চেষ্টা।

সমাজে একদিকে যেমন ভাঙন অন্যদিকে তেমনি গড়ন দেখা যায়। সেজন্য সমাজের একদিকে যেমন পুরানো আদর্শ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তেমনি অন্যদিকে গড়ে উঠছে নতুন আদর্শ নতুন চেতনা। 'বাগ্দীপাড়া দিয়ে' তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাগ্দীপাড়া জলার কাছে, প্রায় জলার মধ্যে। প্রতি বছর বর্ষায় জল পাড়ায় ওঠে, আবদ্ধ জল পচতে পচতে এক আঙুল দেড় আঙুল সরতে সরতে আরেক বর্ষার আগে শুধু কিছুদূর তফাতে সরে যায় মাত্র। নীচু জমির স্বাভাবিক জলা, চারিদিকে জমি উঁচু, জলা ওখানে থাকবেই। পশ্চিমে জমি শুধু একটু কম উঁচু—আগে, বহুকাল আগে, ওই দিক দিয়ে জলার কিছু বাড়তি জল বেরিয়ে যেত, বর্ষার জল একেবারে পাড়া পর্যন্ত উঠত না। বহুকাল আগে, কতকাল আগে কারো আজ স্মরণ নেই, এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী পশ্চিম দিকে এক জায়গায় হাত ত্রিশেক লম্বা, দশ বারো হাত চওড়া এবং পাঁচ ছ' হাত উঁচু একটি বেদী বানায়, ইঁট আর মাটি দিয়ে। তার নাকি স্বপ্নাদেশ হয় যে বাগ্দী সমাজের চিরদিনের কল্যাণের জন্য ওখানে শিবাই ঠাকুরের বেদী স্থাপন করতে হবে। এবং এমনি আশ্চর্য ব্যাপার, স্বপ্নাদেশের খবর শোনামাত্র জমিদার টাকা আর লোক দিয়ে নিজেই বেদীটা বানিয়ে দেয়। মহাসমারোহে বেদীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয়, বাগ্দীদের মধ্যে নেশা উত্তেজনা আর উল্লাসের সীমা পরিসীমা থাকে না। সেই থেকে ওই ঠাকুরের থান তাদের সমস্ত ধর্মকর্ম সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এবং সেই থেকে বর্ষাকালে জলার বাড়তি জল ঠাকুরের থান ডিঙিয়ে যেতে না পেরে পাড়ার মধ্যে ঘরের মধ্যে ঢুকতে শুরু করেছে।"

যুদ্ধের বাস্তব ধাক্কায় বাগ্দী পাড়ার সমাজ জীবনে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। "কাছাকাছি যুদ্ধ কালীন কারখানা বসায় ধাক্কাটা লেগেছে প্রচণ্ড ভাবে, জীবিকার তাগিদে বুড়ো আর মাতব্বরের বাধা নিষেধ অমান্য করে কারখানায় খাটতে গিয়ে অনেকে হয়ে এসেছে সমাজ-ভ.া বোমা। নতুন আশা আর নতুন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেয়ে কত অল্পদিনে কি অদ্ভুতভাবে যে প্রাণবন্ত সচেতন হয়ে উঠেছে অন্ধকারের বদ্ধ পশুগুলি। তারা মাতিয়ে দিয়েছে বাগ্দী পাড়ার পচাই খাওয়া মেয়ে পুরুষকে, যথেচ্ছচারী ব্রাহ্মণের ছায়া-ভীরু অপদেবতার আতঙ্কে বিহ্বল মারামারিতে পটু ক্ষেতমজুর জেলে মাঝি চাটাই বোনা ঘরামি-খাটা বাগ্দীদের। উঁচুতলার মানুষের আচার নিয়মের বাঁধন থেকে মুক্তি ভোগের ফলে এতদিন যা ছিল তাদের বর্বরতার পাশবিক সাহস—লাঠি হাতে খুন করতে খুন হতে ভয় না পাওয়া চেতনার ছোঁয়াচ লাগা মাত্র তা পরিণত হতে আরম্ভ করেছে তেজে, মুক্তি কামনায়।"

এই তেজের প্রমাণ প্রত্যক্ষ করে বাগ্দীপাড়ার প্রধান দুলে বাগ্দী। সে ছিল জমিদার আর নায়েবের লাঠিয়াল। কত্তাবাবুর হুকুমে সে কত বিদ্রোহী প্রজার মাথা ফাটিয়েছে। আজ তার পাড়ার লোকেরা বিদ্রোহী হয়েছে। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে শতাধিক বাগ্দী মেয়ে পুরুষ কোদাল-খন্তা নিয়ে ঠাকুরের থান খুঁড়ে তারা বাগ্দীপাড়ার জল নিকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। দুলে বাগ্দী নায়েবের বাড়িতে সেই খবর দিয়ে এসেছে। এক্ষুনি পুলিশ মিলিটারী আসবে বলে সে সকলকে পালিয়ে যেতে বলল। কিন্তু ফল হলো উল্টো। দুলালী কারখানায় কাজ করে। সে খবর দেওয়ার কথা শুনে হাতের খন্তা দিয়ে দুলের মাথায় প্রচণ্ড ঘা বসিয়ে দিল। দুলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। "ঠাকুরের থানে নালা কাটা হলে বাড়তি বদ্ধ জলের স্রোত প্রবল বেগে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলে সকলে ধরাধরি করে দুলেকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে দেয়।" দীর্ঘদিনের বর্বর বন্ধনকে তারা সংহত শক্তির জোরে মুক্ত করে দিল। বদ জল আর দুলের সঙ্গে যেন তাদের পরাধীনতা আর শোষণের বদশক্তি বেরিয়ে গেল। এই গল্পে লেখকের সুস্পষ্ট শ্রেণী-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

'বাগ্দীপাড়া দিয়ে, গল্পের ন্যায় প্রতিবাদের কথা স্পষ্ট ধ্বনিত হয়েছে 'মাটির মাশুল', 'পথান্তর' প্রভৃতি গল্পে।

ধর্ম এই সংকলনের আরেকটি উৎকৃষ্ট গল্প। সমাজে পুরানো মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে সচেতন না হলে পারি-

বারিক জীবনেও বিকার দেখা দেয়। কিন্তু নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার জীবনের নতুন তাৎপর্য ধরা পড়ে। তমসা-সৌম্যেনের জীবনেও তাই ঘটেছিল। সত্যাগ্রহী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার দেখে তাদের মধ্যে দেখা দেয় সহমর্মিতা। শ্রমিকের সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজেদের তারা জড়িত করে ফেলে। তমসা-সৌম্যেনের মধ্যে যেন নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠে।

যুদ্ধের বিভীষিকা এবং মন্বন্তরের করাল ছায়ায় বাঙালী সমাজ জীবন যেভাবে বিপর্যস্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার থেকে উদ্ধার লাভের দুইটি উপায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পগুলির মধ্যে রূপায়িত করেছেন। এক, শক্তিধর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি হল ঐক্যবদ্ধতা। সচেতন সঙ্ঘবদ্ধতার পথেই তাদের মুক্তির পথ। দ্বিতীয়, ভয় মানুষের এগিয়ে চলার পথে প্রধান অন্তরায়। সেই ভয়কে জয় করতে পারলেই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে দাঁড়াতে পারবে। অতএব নির্ভীকতা জীবন সংগ্রামের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। 'ভয়ঙ্কর' নামক নাটিকায় বিশ্বম্ভরের কর্মচারী প্রসাদ যেদিন ভয়ঙ্কর ঝড়ের মধ্যে পড়ে ভয়কে জয় করতে শিখেছে সেদিন বিশ্বম্ভর প্রসাদের গায়ে হাত তুলতে আর সাহস করে নি। ভয়কে জয় করতে শিখেই প্রসাদ বাঁচতে শিখেছে। নতুন জীবনের আনন্দে উল্লসিত বোধ করেছে।

স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস সাধারণ মানুষের মনে অল্পদিনেই মিইয়ে গেল। নানা সঙ্কটের আবর্তে তাদের ভরাডুবির অবস্থা দেখা দিল। চোরাকারবার, স্বজন-পোষণ, দুর্নীতি, দুর্মূল্য, বেকারি প্রভৃতি তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলল। বাঁচার তাগিদে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে লাগল। শ্রমিক কৃষকেরা সহজে অবস্থাকে মেনে নিতে স্বীকৃত হলো না। তেলেঙ্গানায় বিদ্রোহ দেখা দিল। বাঙলাদেশে ব্যাপকভাবে কৃষকদের মধ্যে তে-ভাগা আন্দোলন দেখা দিল। সহরের কল-কারখানায় ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন ব্যাপ্তি লাভ করল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নানা গল্পে মানুষের এই প্রতিবাদের শিল্পরূপ দিতে লাগলেন।

'বাগদীপাড়া দিয়ে' গল্পে এই বন্ধনমুক্তির কথা ঘোষিত হল। কিন্তু এতকাল যারা শোষণের রাজসিংহাসনে বসে আছে তারাও পিছিয়ে রইল না। সৃষ্টি হলো সন্ত্রাসের রাজত্ব। পুলিশ মিলিটারী লেলিয়ে দেওয়া হলো। শুরু হলো ব্যাপক অত্যাচার। কিন্তু আসুরিক শক্তির এই চণ্ডনীতি উপযুক্ত প্রতিকূলতা লাভ করল শ্রমিক কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির কাছে। এই সময়কার বড়া কমলাপুরের একটি সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'ছোট বকুলপুরের

যাত্রী' সংকলনের* (১৯৪৯) বিখ্যাত গল্প 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক এবং নাটকীয়তায় গল্পটি চমৎকার হয়েছে।

'মেজাজ' এই সংকলনের আরেকটি সুন্দর গল্প। সাধারণত যাদের অর্থ, সংস্কৃতি, আরাম, বিলাস, প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে তাদেরই মেজাজ থাকে। কিন্তু এই গল্পের মেজাজী মানুষ হচ্ছে একজন ভাগচাষী—ভৈরব। গাঁয়ের লোকেরা দল বেঁধে রাখালের চোরাই ধান-চাল চালান বন্ধ করতে গিয়ে গুণ্ডাদের বীভৎস অত্যাচারের শিকার হয়। তার ফলে ভৈরবের ছেলে মারা যায়। স্ত্রীর উপর পাশবিক অত্যাচার চলে। ভৈরব নির্বিবাদে তা সহ্য করেনি। সুযোগ বুঝে তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেয়। এই গল্প একগুয়ে এক চাষীর অপূর্ব প্রতিবাদী চরিত্রের কাহিনী। মেজাজকে যদি ঠিকমতো কাজে লাগান যায় তাহলে তার দ্বারা কত মহৎ কাজ হতে পারে তারও দৃষ্টান্ত ভৈরব চরিত্র। আঙ্গিকও চমৎকার। গল্পের বাঁধুনিও আঁটসাঁট।

'প্রাণাধিক' একটি গরীব আদর্শবান সংগ্রামী জীবনের কাহিনী। অবনী গরীব কেরাণী হলেও হাজার টাকার চোরাকারবারের এজেন্সী দ্বারা প্রলুব্ধ হয় না।

অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারাই মানুষের সামাজিক জীবন নিরূপিত হয়। আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়ে ভদ্রলোকেরা নিজেদের আড়ষ্টতা ভেঙ্গে সাধারণ মেহনতী মানুষের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। ছুঁচো গেলার অবস্থা থেকে সরে এসে তারা এখন বেশ আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। 'সখী' তারই গল্প। আঙ্গিক বিচারে গল্পটি বিবৃতিধর্মী।

'নীচু চোখে দু আনা আর দু পয়সা' এবং 'নীচু চোখে মেয়েলি সমস্যা' নিম্নবিত্ত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কাহিনী। ছোটগল্প হিসেবে এগুলো উৎকৃষ্টতা লাভ করতে পারেনি।

*১। ছোট বকুলপুরের যাত্রী ২। বাগদীপাড়া দিয়ে ৩। মেজাজ ৪। প্রাণাধিক ৫। ঘর করলাম বাহির ৬। সখী ৭। নীচু চোখে দু-আনা দু-পয়সা এবং ৮। নীচু চোখে মেয়েলি সমস্যা। এদের মধ্যে বাগদীপাড়া দিয়ে গল্পটি মাটির মাশুল গ্রন্থে পূর্বে সংকলিত হয়েছে।

॥ ৯ ॥

'ফেরিওয়ালা' মানিকের বারটি গল্পের সংকলন।* এদের মধ্যে 'সখী' গল্পটি ইতিপূর্বে 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

ছোট বকুলপুরের যাত্রী সংকলনের চার বছর পরে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গত দু'তিন বছর ধরে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় এই গল্পগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের মধ্যে লেখা হলেও গল্পগুলোর মধ্যে সামাজিক জীবনের একটা মূলসূত্রের যোগাযোগ আছে।

অর্থনৈতিক দুরবস্থায় সঙ্কট যতই ঘনীভূত হচ্ছে ততই সাধারণ মানুষের মধ্যে বাঁচার সঙ্কল্পে দৃঢ়তা এসেছে। এই দৃঢ়তার ফলেই তথাকথিত ভদ্রলোককে ফেরিওলায় পরিণত হতে হয়েছে। জীবনের এই পথান্তরে তারা কিন্তু অস্বস্তি বোধ করে না। বরং কৃত্রিমতার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে তারা জীবনকে সহজ ভাবে উপলব্ধি করতে শিখেছে। শ্রেণীগত সহমর্মিতা দেখা দিয়েছে।

ফেরিওয়ালা গল্পে ভদ্রলোকদের ঠুনকো জীবনের এবং সহফেরিওলার মমত্ব-বোধের কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থনৈতিক দুরবস্থার একটি সুন্দর চিত্র এই গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেছেন।

গাঁয়ের চাষী মাখন এবং তার স্ত্রী শৈল অভাবে পড়ে সহরে এসে বিন্দের মার খপ্পরে পড়ে। বিন্দের মা তাদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ ব্যবহার করলেও তার স্বার্থের কুটিল চক্র মাখন ধরতে পারে। সে বোঝে, তার সংঘাত শৈলের বিরুদ্ধে নয়, তাদের সংঘাত বিন্দের মার বিরুদ্ধে। মেহনতী মানুষ তাদের সাধারণ শত্রুকে চিনতে পারে না বলে প্রায়ই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করে। তাতেও বিন্দের মার মত দালালদেরই সুবিধে। 'সংঘাত' গল্পে আছে তারই এক সুন্দর কাহিনী।

'ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই' গল্পে মানিক শোভার মার কণ্ঠে পথহারা মানুষদের বাঁচার দাবীকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। লতা স্বামীর টি. বি. রোগ সারাতে সর্বস্ব হারিয়ে দুপুর বেলায় যক্ষা নিবারনী মহাকর্কট বটিকা বিক্রী করে সংসার চালায় (মহাকর্কট বটিকা)। শিক্ষয়িত্রী সুরমা বাঁচার তাগিদে রাঁধুনীর কাজ নিয়ে

*১। ফেরিওয়ালা ২। সখী ৩। সংঘাত ৪। সতী ৫। লেভেল ক্রসিং ৬। ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই ৭। চুরি চামারি ৮। দায়িক ৯। মহাকর্কট বটিকা ১০। আর না কান্না ১১। মরব না সস্তায় এবং ১২। এক বাড়ীতে।

নতুন প্রতীতি লাভ করে, "আগে ভাবতাম বড়লোক সেক্রেটারীর কাছে টিচাররাই বোধ হয় মানুষ নয়, এখন দেখছি গরীব হলেই মানুষ থাকে না।" (মরব না সস্তায়)। যতীনের টানাটানির সংসারে মার খেয়ে খেয়ে মেয়েরাও প্রতিবাদী হয়ে বাঁচার দাবী জানায় (আর না কান্না)। স্বার্থের নিকট বন্ধুত্বও তুচ্ছ। সেখানেও দেখা যায় শ্রেণী সংঘাত। বিলাসময় বাড়ীওয়ালা শোষক আর সুধীর নিপীড়িত। সাধারণ মানুষের হাতে, মরিয়ার হাতে মার খেয়েই শেষ পর্যন্ত শোষকের প্রাণবিনাশ হয় (এক বাড়ীতে)।

'সতী' বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার এক ব্যঙ্গ চিত্র। পূর্বে মৃত স্বামীর সহগমন করেই সতী নামের সার্থকতা হোত। বর্তমানে সে ব্যবস্থা রহিত হলেও অন্য-ভাবে সে ব্যবস্থা রয়েছে। স্বামী না খেয়ে খেয়ে রাস্তায় পড়ে মারা যায়। খুঁজে খুঁজে মৃত স্বামীকে দেখে স্ত্রীর চোখে জল আসে না। হঠাৎ সে তার কোলের ছেলেটাকে রাস্তায় আচড়ে মেরে ফেলে আর নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ে চলন্ত বাসের সামনে।

'ধাত' আরেকটি সুন্দর গল্প। লোক ঠকানো যাদের ধাত তাদের কাছে প্রেম ভালোবাসারও নতুন কোন মূল্য নেই। তারা নিজেদের প্রিয় পাত্রীকে ঠকিয়েও নিজেদের লাভ বজায় রাখে। 'লেভেল ক্রসিং' আরোগ্য উপন্যাসের অংশ বিশেষ হলেও গল্প হিসেবে পূর্ণতা লাভ করেছে। এক ড্রাইভারের জীবনে প্রেমের ব্যঞ্জনা সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

'লাজুকলতা' (১৩৬০) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবিতকালের শেষ গল্পগ্রন্থ। এই গ্রন্থে মোট গল্প আছে ষোলটি*। এদের মধ্যে আপদ গল্পটি পূর্বে 'মাটির মাশুল' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। অবশ্য বর্তমান গ্রন্থে গল্পটির সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে গল্পের পরিণতি বর্তমান গ্রন্থে সুসঙ্গত।

'লেখকের কথা'য় মানিক লিখেছেন, এই সংকলনের অধিকাংশ গল্পই গত তিন চার বছরের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি এই গল্পগুলোর মধ্যে সমাজ জীবনের একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। চারিদিকে তখন কৃষক-শ্রমিক বিক্ষোভ চলেছিল। এই গল্পগুলোতে তিনি এই শ্রমিক-কৃষকের নতুন মূল্যবোধকেই রূপায়িত করেছেন। মধ্যবিত্ত সমাজ অর্থনৈতিক দুরবস্থায় ক্রমশ বেশী বেশী সংখ্যায় শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত

*১। লাজুকলতা ২। উপদলীয় ৩। এদিক ওদিক ৪। এপিঠ ওপিঠ ৫। পাশফেল ৬। কলান্তরিত ৭। গুণ্ডা ৮। বাহিরে ঘরে ৯। চিকিৎসা ১০। মীমাংসা ১১। সুবালা ১২। অসহযোগী ১৩। আপদ ১৪। স্বাধীনতা ১৫। নিরুদ্দেশ এবং ১৬। পাষণ্ড

হয়েছিল এবং নিজেদের অনেক বেশী সুস্থ বোধ করতে লাগল। এই গ্রন্থের গল্পগুলোতে শ্রম-জীবনের আদর্শ এবং বৈশিষ্ট্য মানিক ফুটিয়ে তুলেছেন।

যতীনের স্ত্রী তমাল বড় ঘোমটা টেনে এতদিন যেন অন্যায়কে ঠেকাচ্ছিল, লড়াই করছিল নিজের মধ্যেই, তারপর যতীন যখন একটা দোকানের ক্যাশ ভাঙ্গতে গিয়ে ধরা পড়ল তখন নিজেই জীবনযুদ্ধের লড়াই-এ কোমর বেঁধে নেমে পড়ল। এখানেই তার চরিত্রের বলিষ্ঠতা (লাজুকলতা)। এই বলিষ্ঠতা দেখা যায় মাধবের চরিত্রেও। কারণ সে মোটর মেকানিক। ছাঁটাই কেরাণী বর্তমানে দোকানদার শরৎ বড়লোক যাদবের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারে না। অথচ তার স্ত্রী পুত্র না খেয়ে ছেঁড়া কাপড় পরে থাকে। তখন মাধবই শরৎকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তার চরিত্রে কোন ভাবালুতা নেই। (এদিক ওদিক)। মহাপাপী বড়লোক ভূপেশের মোটর ড্রাইভার জীবনের মানসিক রোগের কোন চিকিৎসা ডাক্তার করতে পারল না। কিন্তু প্রত্যাখ্যাতা বিধবা বোনের মিথ্যা অপবাদে যখন তার চাকরি গেল তখন জীবনের নিজেকে খুব হাল্কা মনে হোল। বিনা চেষ্টাতেই তার সকল রোগের চিকিৎসা হয়ে গেল। (চিকিৎসা)। এই শ্রমিক জীবনকে বাদ দিয়ে কোন পোষাকী সংস্কৃতিও গড়ে উঠতে পারে না। একথা বহুদিন পূর্বে শরৎচন্দ্রও উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, রাশিয়ার মত যেদিন আমাদের সাহিত্যেও সাধারণ মানুষের কথা শিল্পরূপ লাভ করবে সেদিন আমাদের সাহিত্যে যথার্থ উন্নতি সম্ভব হবে। তথাপি আজও সংস্কৃতি বলতে গিয়ে আমরা অবাস্তব, পোষাকী এক মুষ্টিমেয়ের অধিকারকে মনে করি। নামকরা লেখক প্রশান্তও এরূপ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে গিয়েছিল। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে লোকের আগ্রহ বেশী নেই বলে লোকজনও তেমন হয়নি। ফেরার পথে সে দেখল দুর্ভিক্ষ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও চোরা কারবার নিয়ে এক সভায় বহুলোক জমা হয়েছে। সংস্কৃতির নামে প্রশান্ত এতক্ষণ যে অস্বস্তি বোধ করছিল তা দূর হয়ে গেল (উপদলীয়)।

অসহযোগী এই গ্রন্থের একটি উৎকৃষ্ট গল্প। ধনেশগঞ্জের মস্ত আড়তদার হর্ষনাথ তার ছেলে রমেনকে আদর্শবাদী স্বদেশী সূর্যপদর কাছে মানুষ করতে দিয়ে এল। রমেন মানুষ হল। দুর্ভিক্ষের সময় সে বাবার আড়ত থেকে হাজার হাজার মন চাউল বের করে বুভুক্ষু মানুষদের বিলিয়ে দিল। হর্ষনাথ মাথায় হাত দিয়ে বসল। তার মনে হোল তার ছেলে যদি এর চেয়ে যণ্ডা গুণ্ডা হোত তাহলেও ভাল হত। সে তো তার ছেলেকে এমন মানুষ করে তুলতে চায়নি।

পাশফেল, স্বাধীনতা, এপিঠ ওপিঠ, ঘরে বাইরে, আপদ, নিরুদ্দেশ, পাষণ্ড প্রভৃতি

গল্পে তখনকার সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। নীরেন পরীক্ষায় ভালভাবে পাস করেও ভবিষ্যতে পড়ার জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় আত্মহত্যা করে। কান্তা মাধবের খাতিরে চাকরি পেয়েও নিজেকে স্বাধীন মনে করতে পারে না। বাড়ীর সকলের দাবী দাওয়া সে মেটাতে পারেনি বলে সে এখন নানা অসন্তোষের অধীন হয়ে পড়েছে (স্বাধীনতা)। অভাব অনটনের সংসারে কনাদ তার স্ত্রীকে কেবল আপদই মনে করত (আপদ)। পাঁচ মাস আগে ছাটাই হয়েও বিনয় নিজের স্ত্রীর সুখশান্তি নষ্ট হওয়ার ভয়ে তার কথা গোপন করে। পরে বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে শ্বশুর বাড়ি রেখে বিনয় নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। আঙ্গিক বিচারেও 'নিরুদ্দেশ' একটি চমৎকার গল্প। অভাবের তাড়নায় সমীরও একদিন শ্বশুরের টাকা চুরি করে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর সে সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে যখন নিজের জীবনের আশাও পরিত্যাগ করেছিল তখন হঠাৎ শিয়ালদহের উদ্বাস্তুদের দেখে সে বাঁচতে শিখেছে। উদ্বাস্তুদের মতই সে আবার দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

উদ্বাস্তুদের নিয়ে যখন বাংলা সাহিত্যে নানা বিকৃত রসালো গল্প সৃষ্টি হচ্ছিল তখন মানিকই তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন জীবনজয়ী সাধনা। এ দৃষ্টি অভিনব এবং অনন্য।

এই গ্রন্থের অনেক গল্প বিভিন্ন উপন্যাসের অংশ বিশেষ। যেমন 'ঘরে বাইরে' সার্বজনীন উপন্যাসের প্রথমাংশ; 'চিকিৎসা' আরোগ্য উপন্যাসের অংশ বিশেষ। 'মীমাংসা', গল্পটি নেওয়া হয়েছে 'পাশাপাশি' উপন্যাস থেকে এবং 'পাষণ্ড' সার্বজনীন উপন্যাস থেকে। মানিকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে কোন লেখক এ প্রচেষ্টা করেন নি। এ সম্পর্কে মানিক ১৩৬১ সালের শারদীয়া বসুমতী পত্রিকায় যা লিখেছেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য:

"গত বছরের কথা! 'আরোগ্য' উপন্যাসটি লিখছিলাম। পূজা আসছে। বইটা লিখতে লিখতে খেয়াল হল, এই উপন্যাসটিতেই তো সুন্দর কয়েকটি গল্প রয়েছে। প্রায় একেবারে তৈরি গল্প—একটু অদল বদল ঘষা মাজা করলেই সত্যিকারের গল্প হয়ে যাবে। প্রায় তৈরি দু'তিনটি গল্প ছাড়াও গল্প আছে, তবে এ কটাকে নতুন করে ঢেলে সেজে নিতে হবে—নইলে উপন্যাসের গন্ধ ছাড়বে না গা থেকে।

উপন্যাস থেকে দু'একটি গল্প আগেও চয়ন করেছি। অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত উপন্যাস থেকে চয়ন করা এ রকম গল্প 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে গল্পের উপাদানটুকুই উপন্যাস থেকে সংগ্রহ করেছি, নতুন করে লিখে তাকে গল্পের রূপ দিতে হয়েছে। প্রত্যেক উপন্যাসেই একাধিক গল্পের উপাদান

এবং সঙ্কেত কম বেশী থাকে।

কোন কোন গল্পেও আবার উপন্যাসের বীজ থাকে। গল্প লিখে উপন্যাসের ইঙ্গিত পেয়ে উপন্যাসও আমি লিখেছি—গল্পটি না লিখলে উপন্যাসের পরিকল্পনা হয়তো কোনদিনই আমার মনে আসত না।

"গল্প কেমন হবে সেটা আলাদা প্রশ্ন। আলাদা ভাবে গল্প ভেবে নিয়ে লিখলেই যে গল্প উৎরে যাবে, এমন তো কোন নিয়ম নেই।

"গতবারে 'শারদীয়া যুগান্তরে'র 'লেভেল ক্রসিং', পরিচয়ের 'শিল্পী' ইত্যাদি গল্প 'আরোগ্য' উপন্যাস থেকে নেওয়া, কিছু অদল বদল কাটা ছেঁড়া জোড়া দেওয়া ঘষা মাজা করতে হয়েছিল।

গল্পগুলি কেমন হয়েছে বলার অধিকারী আমি নই। কিন্তু ওগুলি যে গল্প হয়েছে এবং আমার আর দশটা সাধারণ গল্পের চেয়ে বাজে হয়নি একথা জোর গলাতেই বলতে পারি। সুতরাং ফাঁকি দিয়েছি এ অভিযোগ তোলা যাবে না।

"পূজার কয়েক মাস আগে মনের মতো উপন্যাস ফাঁদব কান ধরে টেনে টেনে গল্পগুলি বার করে সম্পাদক মহলে বিলিয়ে দেব।……

"সেভাবেই এবার ফাঁদলাম এক উপন্যাস। মূল চরিত্র ও ঘটনার ধারা ছাড়া-ছাড়া এলোমেলো ভাবে বেশ কিছুদিন ধরে নাড়া চাড়া করছিলাম মনে মনে। এ প্রক্রিয়া হল মনে মনে মাল-মসলা সংগ্রহ এবং ঝাড়াই-বাছাই করার কাজ—উপন্যাসের আসল মানুষ ও জীবনের খণ্ডাংশ খুঁজে বেছে নিয়ে কল্পনার রসে জারিয়ে মজিয়ে দেখা যে সমগ্রতা গড়ে তুলতে মিলবে মিশবে কি না।

"তখন থেকেই ভারি খুসী, ভারি নিশ্চিন্ত যে গল্প মনে উঁকি দিয়েছিল, গল্প লিখতে শুরু করে খানিক লিখে এগোইনি, যে নতুন গল্প মনে আসবে, এ রকম দু' চারটে তো লিখবই এই উপন্যাস থেকেও কি বেরিয়ে আসবে না পাঁচ-ছটা গল্প?"

"গল্প বা উপন্যাস লেখার প্রক্রিয়াটা যে ভাবে ঘটে থাকে সব গল্প বা উপন্যাসের বেলাতেই তার কয়েকটা মোটামুটি একই রকম হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার এমন কয়েকটা দিক আছে যা প্রত্যেকটি গল্প বা উপন্যাসের বেলা ভিন্ন রকম হয়ে থাকে।"

"অনেক বছর ধরে অনেকগুলি গল্প, উপন্যাস লিখবার পরেও কোন ঝানু লেখকের পক্ষে নতুন আরেকটি গল্প বা উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করার সময় কল্পনা করাও সম্ভব নয় যে, লেখার কাজের কয়েকটা দিক তিনি ঠিক কি ভাবে চালাবেন।

প্রত্যেক নতুন গল্প নতুন উপন্যাসের বেলা গল্প উপন্যাস লেখার প্রক্রিয়ার এই দিকগুলি হয় নতুন রকমের।

ঢিমে তালে দ্রুত তালে উপন্যাসটি লেখা এগোচ্ছে। খটকা লাগল। গল্পের

সন্ধান পাচ্ছি না কেন?

ছোট উপন্যাস ফেঁদেছিলাম—উপন্যাস বড় হয়ে যাচ্ছে কেন?.. ...

"উপন্যাসের রকম ভেদ হয় জানতাম, রকম ভেদের জন্য আঙ্গিক ভেদ হয় জানতাম, গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে অনেক পণ্ডিতের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণও জানতাম,—তবু বিপন্ন গরিব জ্যান্ত বাংলার জ্যান্ত সাহিত্য আমার কান মলে শিখিয়ে দিল, তুমি উপন্যাসের রকম ভেদের সরু-মোটা অনেক কথাই জানো, শুধু জানোনা মূল একটা ভেদ। এতগুলো গল্প উপন্যাস লিখেও তুমি ধরতে পারোনি ঘটনা-প্রধান আর চরিত্র-প্রধান উপন্যাসের তফাৎ কোথায়? কোন উপন্যাসে ছোট গল্প থাকে কোন উপন্যাসে থাকে না।"......

এই লেখা থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প উপন্যাসের আঙ্গিক সম্বন্ধেও একটা সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে; সেজন্য দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া হোল। এই থেকে আরেকটা দিক স্পষ্ট হবে যে মানিক আঙ্গিক সম্বন্ধেও কতটা সচেতন ছিলেন। নতুনতর চেতনার আদর্শে মানিক বাংলা সাহিত্যে কেবল গতি বদলই করেন নি, রীতি বদলও করেছেন। তিনি গল্প উপন্যাসের গতানুগতিকতা ভেঙে তাকে আরও সজীব ও বলিষ্ঠ করে তুলেছেন। সবক্ষেত্রেই তিনি যে সার্থকতা লাভ করেছেন তা বলা চলে না। বোধ হয় কোন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের সম্বন্ধে তা বলা সম্ভব নয়।

॥ ১০ ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ পর্যন্ত চারটি বৃহৎ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দুইটি প্রকাশিত হয় মানিকের জীবিত কালে এবং বাকী দুইটি প্রকাশিত হয় মানিকের মৃত্যুর পর। প্রথম সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করে বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৩৫০ সালে। এই সংকলন সম্পাদনা করেন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। ১৩৬৫ সালে এই গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ নতুনভাবে সম্পাদিত হল। এই নতুন সংস্করণ সম্পাদনা করেন শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী। প্রথম সংস্করণে আঠারটি গল্প ছিল[১]। এদের মধ্যে 'বিচার' গল্পটি নতুন। বাকী গল্পগুলো বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নেওয়া। নতুন সংস্করণে মোট আঠারটি গল্প আছে[২]। এদের মধ্যে বারটি শ্রেষ্ঠগল্পের প্রথম সংস্করণে ছিল। পাঁচটি গল্প

১। প্রাগৈতিহাসিক, টিকটিকি, আত্মহত্যার অধিকার, সরীসৃপ, কুষ্ঠরোগীর বৌ, হলুদ পোড়া, সমুদ্রের স্বাদ, বিবেক, আপিম, আজ কাল পরশুর গল্প, যাকে ঘুষ দিতে হয়, নমুনা, দুঃশাসনীয়, কংক্রিট, শিল্পী, হারাণের নাত জামাই, বিচার, ছোট বকুলপুরের যাত্রী।

২। প্রাগৈতিহাসিক, টিকটিকি, আত্মহত্যার অধিকার, সরীসৃপ, কুষ্ঠরোগীর বৌ, হলুদ পোড়া, কে বাঁচায় কে বাঁচে, যাকে ঘুষ দিতে হয়, দুঃশাসনীয়, সাড়ে সাত সের চাল, মাসিপিসি, শিল্পী, কংক্রিট, টিচার, ছিনিয়ে খায়নি কেন, হারাণের নাত জামাই, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, আর না কান্না।

পরিস্থিতি', 'খতিয়ান', এবং 'ফেরিওয়ালা' গ্রন্থ থেকে নতুনভাবে সংকলিত। কেবল 'কে বাঁচায় কে বাঁচে' গল্পটি এই সংকলনের নতুন গল্প।

১৯৫৬ সালে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ থেকে প্রকাশিত হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প। এই গ্রন্থে মোট গল্প আছে কুড়িটি[১]। 'প্রাক্ শারদীয়া কাহিনী' এবং 'রক্ত নোনতা' ছাড়া বাকী আঠারটি বিভিন্ন গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। ভূমিকায় মানিক লিখেছেন, "দশজনে আমার যে গল্পকে যতটা সমাদর করেছেন মোটামুটি সেটাই আমি এই সংকলনের জন্য গল্প নির্বাচনের মাপকাটি ধরে নিয়েছি।" অবশ্য তিনি কামনা করেছেন তাঁর এই বিচারের সমালোচনা করে দশজনে তাঁর ভুল ত্রুটি সংশোধন করে দিক। এখানেই মানিকের অনন্যতা। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ যতদিন বাঁচে ততদিন শেখে। সেজন্য তাঁর মধ্যে কখনো অহংকার দেখা দেয় নি। নিজের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনকে সবসময় রেখেছেন উন্মুক্ত। ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে ন্যাশনাল বুক এজেন্সী কর্তৃক প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ গ্রন্থে মোট গল্প আছে পঁচিশটি[২]। এদের মধ্যে আটটি গল্প নেওয়া হয়েছে ছোট বকুলপুরের যাত্রী থেকে, দুইটি গল্প লাজুকলতা গ্রন্থ থেকে এবং দুটি গল্প 'স্বনির্বাচিত গল্প' থেকে। বাকী তেরটি গল্প (বড়দিন, শান্তিলতার কথা, সশস্ত্র প্রহরী, মাছের ল্যাজ ও মাংসের ঝাঁজ, সবার আগে চাই, জল মাটি দুধভাত, খাটাল, গলায় দড়ির কেন, কালো বাজারে প্রেমের দর, ঢেউ, হাসপাতালে, দুর্ঘটনা এবং মানুষ হতবাক নয়) এই গ্রন্থে নতুন সংযোজিত হয়েছে। এদের মধ্যে 'বড়দিন' এবং 'সশস্ত্র প্রহরী' 'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাস থেকে নেওয়া, 'শান্তিলতার কথা' পরবর্তী কালে 'শান্তিলতা' উপন্যাস হিসেবে বিস্তৃতি লাভ করেছে, 'হাসপাতালে' 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান' উপন্যাসের প্রথমাংশ, 'দুর্ঘটনা' 'শান্তিলতা' উপন্যাসের এবং 'মানুষ হতবাক নয়' "মাশুল" উপন্যাসের অংশ বিশেষ।

ছ বৎসর পর ১৯৬৩ সালের নভেম্বরে ন্যাশনাল বুক এজেন্সী গল্প-সংগ্রহের

১। বৃহত্তর-মহত্তর, নেকী, চোর, ফাঁসি, ভূমিকম্প, টিকটিকি, বিপত্নীক, সিঁড়ি, মহাকালের জটার জট, হলুদ পোড়া, চুরি চুরি খেলা, ফাঁদ, রাঘব মালাকার, প্রাক্ শারদীয়া কাহিনী, রক্ত নোনতা, হারাণের নাত জামাই, ভিক্ষুক, ধান, বিবেক, শিল্পী।

২। ছোট বকুলপুরের যাত্রী, বাগদী পাড়া দিয়ে, মেজাজ, প্রাণাধিক, ঘর করলাম বাহির, সখী, নীচু চোখে দু আনা আর দু পয়সা, নীচু চোখে একটি মেয়েলি সমস্যা, বড়দিন, শান্তিলতার কথা, সশস্ত্র প্রহরী, মাছের ল্যাজ ও মাংসের ঝাঁজ, সবার আগে চাই, জল-মাটি দুধ ভাত, খাটাল, গলায় দড়ির কেন, কালো-বাজারে প্রেমের দর, রক্ত নোনতা, ঢেউ, প্রাক্ শারদীয়া কাহিনী, হাসপাতালে, এদিক ওদিক, চিকিৎসা, দুর্ঘটনা, এবং মানুষ হতবাক নয়।

পরিবর্তে আরো বড় করে প্রকাশ করলেন 'উত্তর-কালের গল্প সংগ্রহ'। এই সংকলনে মোট গল্প আছে পঞ্চাশটি*। এদের মধ্যে 'আজ কাল পরশুর গল্প থেকে আটটি, পরিস্থিতি থেকে সাতটি, খতিয়ান গ্রন্থ থেকে চারটি, ছোট বড় গ্রন্থ থেকে চারটি, ছোট বকুলপুরের যাত্রী থেকে আটটি, ফেরিওয়ালা গ্রন্থ থেকে চারটি, লাজুকলতা গ্রন্থ থেকে তিনটি, গল্প সংগ্রহ থেকে সাতটি, স্বনির্বাচিত গল্প গ্রন্থ থেকে একটি, শ্রেষ্ঠ গল্প থেকে একটি মোট সাতচল্লিশটি গল্প সংকলিত হয়েছে। বাকী তিনটি গল্প একটি বখাটে ছেলের কাহিনী, উপায় এবং কোনদিকে এই গ্রন্থে নতুন সংযোজিত হয়েছে।

এ ছাড়া কোন গ্রন্থেই সংকলিত হয়নি এমন গল্প শিল্পী (শারদীয়া পরিচয়, ১৩৫৯); রত্নাকর (শারদীয়া মুখপত্র ১৩৬০), গেঁয়ো (শারদীয়া মুখপত্র, ১৩৫৯) ঘাসে কত পুষ্টি (শারদীয়া পরিচয়, ১৩৬১) ভোঁতা (মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯) 'ষ্টুডিও' (পূর্বাশা, বৈশাখ, ১৩৬০) বিষ (শারদীয়া মধ্যবিত্ত, ১৩৬০) কলমে হরফে (গল্প ভারতী) সমানুভূতি (ঐ), অগ্নিশুদ্ধি (ঐ) মতিগতি (ঐ) দিনের পর দিন (বঙ্গশ্রী) তারপর (বসুমতী) ঘটক (পরিচয়) এবং মায়া নয় দায় (গল্প ভারতী) আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। এদের মধ্যে 'অগ্নিশুদ্ধি' এবং 'রত্নাকর' গল্প 'তেইশ বছর আগে পরে' এবং 'শিল্পী' এবং 'ষ্টুডিও' আরোগ্য উপন্যাস থেকে, 'ভোঁতা', পাশাপাশি উপন্যাস থেকে, 'কলমে হরফে' হরফ উপন্যাস থেকে, 'মতিগতি' প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান থেকে এবং 'তারপর' মাশুল উপন্যাস থেকে নেওয়া। এ ছাড়াও অবশ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক গল্পের কথা জানা যায় সেগুলো এখনো সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। সেগুলোর তালিকা পরিশিষ্ট 'খ'তে দেওয়া হয়েছে।

* ১। আজ কাল পরশুর গল্প, ২। দুঃশাসনীয় ৩। নমুনা ৪। বুড়ী ৫। স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই ৬। রাঘব মালাকার ৭। যাকে ঘুষ দিতে হয় ৮। নেড়ী ৯। সাড়ে সাত সের চাল ১০। রাসের মেলা ১১। মাসিপিসি ১২। অমানুষিক ১৩। পেটব্যথা ১৪। শিল্পী ১৫। কংক্রিট ১৬। টিচার ১৭। একান্নবর্তী ১৮। ছিনিয়ে খায়নি কেন ১৯। নব আলপনা ২০। ব্রিজ ২১। চালক ২২। ছেলে মানুষী ২৩। হারাণের নাত জামাই, ২৪। ছোট বকুলপুরের যাত্রী ২৫। বাগদী পাড়া দিয়ে ২৬। মেজাজ ২৭। প্রাণাধিক ২৮। ঘর করলাম বাহির ২৯। সখী ৩০। নীচু চোখে দু'আনা দু পয়সা ৩১। নীচু চোখে একটি মেয়েলি সমস্যা ৩২। ফেরিওয়ালা ৩৩। সতী ৩৪। চুরিচামারি ৩৫। আর না কান্না ৩৬। এদিক ওদিক ৩৭। পাশফেল ৩৮। সুবালা ৩৯। মাছের ন্যাজ ও মাংসের ঝাঁজ ৪০। সবার আগে চাই ৪১। খাটাল ৪২। গলায় দড়ির কেন ৪৩। রক্ত নোনতা ৪৪। কালো বাজারের প্রেমের দর ৪৫। ঢেউ ৪৬। বিচার ৪৭। একটি বখাটে ছেলের কাহিনী ৪৮। জল-মাটি দুধ ভাত ৪৯। উপায় ৫০। কোনদিকে।

অতএব এই পর্বে আমাদের আলোচ্য গল্প হোল মোট পঁয়ত্রিশটি। এই গল্পগুলো বিভিন্ন সময়ের লেখা। অতএব এগুলোর মধ্যে জবনের কোন এক বিশেষ অবস্থা বা বিশেষ সুরের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব নয়। বিচার গল্পটি এই তালিকায় প্রথম। এই গল্পটি পরে 'শান্তিলতা' উপন্যাসের অংশরূপে বর্ণিত হয়েছে। ইংরেজের ভাগাভাগি নীতির চরম পরিণতিতে রক্তাক্ত বন্যায় কুটোর মতো দলে দলে যারা ভেসে এসে বস্তিতে, রোয়াকে, রাস্তায়, গাছতলায় চারিদিকে সর্বত্র আটকে গেছে তাদের বস্তী কলোনীর সাধারণ মানুষের বিচার বুদ্ধির গল্প। বিনা বিচারে আটক আইনের প্রহসনের সঙ্গে এর আনুপাতিক বিশ্লেষণ আছে। আঙ্গিক বিচারে এ গল্প ভাল ছোট গল্প হয় নি। একটি কাহিনী বা tale এর রূপ লাভ করেছে। হলুদ নদী সবুজ বন উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে প্রাকৃশারদীয়া কাহিনী, বড়দিন এবং সশস্ত্র প্রহরী গল্প তিনটি। এই তিনটি গল্পে শ্রেণী সচেতনতার পরিচয় আছে, সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা আছে, আর আছে বড়লোকের প্রতি মানিকের স্বাভাবিক ঘৃণা ও ব্যঙ্গ। কিন্তু এই তিনটিও ভাল গল্প হয়ে ওঠেনি। 'রক্ত নোনতা' একটি চমৎকার ছোট্ট গল্প। টিয়ার গ্যাসের বোমায় আহত কজনকে নিয়ে যাওয়া হয় ডাক্তার দাসের ডিসপেন্সারিতে। তাদের মধ্যে নিহত ছেলেটি ছিল তারই। একটি মর্মান্তিক দৃশ্য। ডাক্তার দাস তখনো নিজের কাজ করে চলেছেন অবিচল ভাবে।

'কে বাঁচায় কে বাঁচে' বিকারগ্রস্ত মৃত্যুঞ্জয়ের কাহিনী। বাস্তববোধ না থেকে কেবল পচা ঐতিহ্য আদর্শবাদের শৈথিল্য থাকলে মৃত্যুঞ্জয়ের মত বিকার দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। তারা কখনো প্রতিকারের পথ খুঁজে পায়না। ব্যর্থ গ্লানিতে নিজেকেই শেষ করে ফেলে।

'শান্তিলতার কথা' এবং 'দুর্ঘটনা' শান্তিলতা উপন্যাসের অংশ বিশেষ। একগুয়ে স্বামী সুখেন্দুর হাতে শান্তিলতার নির্যাতন এবং গুণ্ডাদের হাতে আহত সুখেন্দুর ভাব পরিবর্তনের কথাই আছে 'শান্তিলতার কথা' গল্পে। এই গল্পকে মানিক পরে উপন্যাসে বর্ধিত করেছেন। ব্যবসাদারি আর ব্যক্তিগত লাভই যেখানে প্রধান সেখানে দুর্ঘটনা ঘটবেই। এড়াবার অনেক চেষ্টা করেও মানুষ তাকে এড়াতে পারে না। একটাকে ঠেকাতে গিয়ে আরো কয়েকটা জীবনে ঘটে যায়। নলিনীকুমারের জীবনেও তাই দেখা দিয়েছে (দুর্ঘটনা)। বাস্তবে প্রযুক্ত না হলে তত্ত্বগত বিদ্যার অপূর্ণতা থেকে যায়। সেজন্য থিয়োরীতে বুঝলেও নমিতা নিঃশঙ্ক হতে পারে না (মানুষ হতবাক নয়)। দারিদ্র্য মধ্যবিত্ত জীবনে যে অসহায় অবস্থার সৃষ্টি করেছে তারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে

'মাছের ল্যাজ ও মাংসের ঝাঁজ' গল্পে। তবু সবার আগে চাই শান্তি। বৃহত্তর সমাজ জীবন থেকে নিজেকে কখনো বিচ্ছিন্ন করে রাখা যায় না। (সবার আগে চাই)। 'জল মাটি দুধ ভাত' একটি মামুলি গল্প। এই গল্পে নানা অসংগতি আছে। গল্প হিসেবেও সার্থকতা লাভ করেনি।

মালিক নিজের মুনাফা ঠিক রাখবার জন্য নিজের দালাল নিয়োগ করে। খাটালের মালিক যশোদাবাবুও গ্রামের নিরীহ মানুষ দেখে বামা ভামিনী ও ছিদামকে সেই কাজে লাগান কিন্তু পরে ওদের কাছে সব ফাঁস হয়ে যায় (খাটাল)। 'গলায় দড়ির কেন' এক অতি দুঃস্থ পরিবারের কাহিনী। সুন্দরীর চরিত্রাঙ্কন সুন্দর হলেও গল্পরস তেমন জমাট বাঁধেনি।

'কালো বাজারের প্রেমের দর' এবং 'ঢেউ' দুটি চমৎকার গল্প। তির্যকতায়, সমাজ বাস্তবতায় কালো বাজারে প্রেমের দর গল্পটি অনবদ্য। কালোবাজারী যুগে প্রেমেরও কোন মূল্য নেই। ঢেউ শ্রেণী সচেতন একটি সুন্দর গল্প। অর্থনৈতিক লড়াই থেকে যে রাজনৈতিক লড়াই পরিণতি লাভ করে তার কথা মানিক সুন্দরভাবে এ গল্পে উপস্থিত করেছেন। সাময়িক ভুল বুঝাবুঝি থাকলেও পিছিয়ে পড়া শ্রমিকের মনেও যে লড়াইয়ের ঢেউ লেগেছে তারই সুন্দর কাহিনী আছে এই গল্পে। যেমন বক্তব্য তেমনি শিল্পসুষমা।

চারিদিকে যে যৌনতা এবং অশ্লীলতা দেখা যায় তার থেকে উদ্ধার পেতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। একটি বখাটে ছেলের এই উপলব্ধির কাহিনীই আছে 'একটি বখাটে ছেলের কাহিনী' গল্পে। কোলকাতা সহরে উপায়হীন নিরাশ্রয় মানুষগুলোকে নিয়ে ব্যবসা চলেছিল তারই একটি চমৎকার কাহিনী হলো 'উপায়' গল্প। মল্লিকা এই বজ্জাতদের নিকট পরাজয় স্বীকার করেনি। বাঁচবার উপায় সে সন্ধান পেয়েছে। 'কোনদিকে' গল্পে আছে এক-জনের জীবন শেষের কাহিনী অন্যদিকে সবিতার জীবন-সংগ্রামে বিজয়ের গল্প। সবিতা গান করে লোকেদের উদ্বুদ্ধ করে আর তা দিয়েই নিজের সংসার চালায়। সেই গান 'গতর খাটিয়ে ধান ফলিয়ে, জিনিস বানিয়ে মানুষের উপোসী থাকার গান'।

'গেঁয়ো' গল্পটি বাঁচবার জন্য গেঁয়ো মেয়ের শহরে গিয়ে আত্ম-বিক্রয়ের কাহিনী। বাকী গল্পগুলো শিল্পী, রত্নাকর, ঘাসে কত পুষ্টি, ভোঁতা এবং ষ্টুডিও প্রভৃতি গল্প নানা উপন্যাসের অংশবিশেষ। গল্প হিসেবে এগুলো তেমন সার্থকতা লাভ করে নি। এই গল্পগুলো মানিকের শেষ জীবনে রচিত। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি সম্ভবত এগুলোর প্রতি তেমন যত্ন নিতে পারেন নি।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

কবিতা

বাঙলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাতি তাঁর গল্প উপন্যাসের জন্য। তাঁর স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই এই উপন্যাস প্রবণতার মূল কারণ। মানিক নিজেই বলেছেন, "আমার বিজ্ঞান-প্রীতি জাত বৈজ্ঞানিকের কেন ধর্মী জীবন-জিজ্ঞাসা, ছাত্র-বয়সেই লেখকের দায়িত্বকে অবিশ্বাস্য গুরুত্ব দিয়ে ছিনিমিনি লেখা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি কতগুলি লক্ষণে ছিল সুস্পষ্ট নির্দেশ যে, সাধ করলে কবি হয়তো আমি হতেও পারি; কিন্তু ঔপন্যাসিক হওয়াটাই আমার পক্ষে হবে উচিত ও স্বাভাবিক।" হয়েছিলেনও তাই। তবু তিনি মাঝে মাঝে কয়েকটি কবিতাও লিখেছিলেন। বিভিন্ন পত্র পুস্তিকায় মানিকের ষোলটি* কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। অপ্রকাশিতও আছে অনেক। সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ। গ্রন্থাকারে অবশ্য তার কোন সংকলন হয়নি। আমরা সেই কবিতাগুলোর সন্ধান পেয়েছি।

গল্প উপন্যাসের ন্যায় তাঁর কবিতাও গতানুগতিক নহে। শব্দচয়নে, ভাব-বিন্যাসে, শ্রেণী সচেতনতায় বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে এবং কাব্যিক ব্যঞ্জনায় মানিক কাব্য সাহিত্যেও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের এই দিকে মানিকের কৃতিত্ব খুব কমই বাঙালার পাঠকদের নিকটে জ্ঞাত। মানিকের কাব্য প্রতিভার পরিচয় পেলে তাঁদেরও বিস্ময়ের অন্ত থাকবে না। সমস্ত কবিতাগুলো থেকে যে কথা সব চেয়ে বেশী স্পষ্টতা লাভ করেছে তা হলো মানিকের প্রখর ব্যক্তিত্ব।

মানিক তাঁর কাব্য রচনার এক দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন 'প্রথম কবিতার কাহিনী' কবিতায়। 'পিতৃপুরুষের স্বপ্নালু ঐতিহ্যের মিষ্টি নেশায়' মানিকও কবিতা লিখতে চেয়েছিলেন কৈশোর বয়সে। এই বয়সটা কবিতা রচনার পক্ষেই সবচেয়ে বেশী অনুকূল। কিন্তু মানিকের ইচ্ছা ছিল স্বতন্ত্র। তিনি চেয়েছিলেন

---

*১। দিনের কবিতা ২। রাতের কবিতা ৩। দিবারাত্রির কাব্য ৪। উত্তর দক্ষিণ ৫। সুকান্ত ভট্টাচার্য ৬। প্রথম কবিতার কাহিনী ৭। আমি কবি শুঁড়ি নই ৮। চাতকের প্রাণ গেছে। ৯। শব্দমদ বেচা শুঁড়িগুলো ১০। আমি ধাত্রী ১১। দুর্ভিক্ষ ১২। গ্রীষ্ম ১৩। 'ভ্রম বঞ্চিতা শিকারিণী' (পূর্বাসা, বৈশাখ, ১৩৪৬) ১৪। 'চা' (শারদীয় (?) অভিবাদন ১৯৪৭)। ১৫। পরিচয়, (অভিধারা, ১৩৫৫), ১৬। ছড়া, (স্বাধীনতা, ১৭।৭।৫৩)।

ভিন্ন ধরণের কবিতা লিখতে। তার মনে তখনই নানা 'কেন' রোগ দেখা দিয়েছে। পরিবেশের নানা বিরোধী অবস্থায় কবির মন হয়ে উঠেছে বিদ্রোহে অভিমানী। তিনি ভেবেছিলেন বাংলা কাব্য সাহিত্যে 'অজস্র কেনর ফুল ফুটিয়ে' 'ফলের ভারে নত তরুদের অর্ঘ্য' দেবেন। কিন্তু তাঁর প্রাণের সেই জিজ্ঞাসা কাব্যরূপ গ্রহণ করতে পারল না।

'সাজানো গোছানো কবিতায়' আছে কত প্রেমের কথা। কিন্তু সেই প্রেমের মধ্যে যেন জীবন নেই, বাস্তবতা নেই, প্রিয়া আর প্রিয়তমকে সেখানে মনে হয় বোবা। তারা যেন পুতুলের মত 'ভালবাসা বাসি' খেলা করে। এই প্রেমিকা ফুলের মত কোমল। সে যেন বলে :

আমি মৃদু আমি সূক্ষ্ম, আঘাত করো না কিন্তু মোরে।
ঝরে যাব ছিঁড়ে যাব আমি,
আমি দাসী, কায়মনে শ্রীচরণে দাসী।

তার 'চোখ বোজা ভয়ে মুখে মন-রাখা হাসি / বিতৃষ্ণার প্রতিবাদ অন্তর্হিত আঁঠালো সরমে',—মানিক তাতে তৃপ্তি পান না। কারণ, "পদ্মায় ভেসে যেতে হেঁটে যেতে ক্ষেতে, / ব্যস্ত হাটে, শ্লথপথে, ছায়াশান্ত ঘাটে। শন খড় খেজুরের কুঁড়েতে কুঁড়েতে ; তিনি সাধারণ মানুষের হাসি কান্নার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, কিন্তু কোথাও তিনি কাব্যের প্রিয়তম এবং প্রিয়াদের খুঁজে পেলেন না। সেজন্য কৈশোরে আর তার কাব্য লেখা হল না।

তাঁর 'হৃদয়ের শুকনো বিদ্রোহের চারাগুলোকে সবুজ' করবেন বলে 'সঞ্জীবনী মন্ত্র বা সুধার বিন্দু' এবং 'নাগলোকের মণির একটা টুকরো'র জন্য তিনি প্রথম যৌবনে ঘাটলেন "দেবাশ্রমিক কবিতা, আর জীবনের নীচের তলায় বস্তির পচা পাঁক।" তখন 'কী মোহিনী ছিল সে আশা যে কাব্য জীবনেরি রসায়ন'। কিন্তু কবির প্রাণের সেই ব্যাকুলতাও ব্যর্থ হলো। আশা আশ্বাসের অসীমতাতেও / রসালো না প্রাণের বিদ্রোহই।' কাব্যের সাগরে তাঁর আর ঝড় তোলা হলো না। চারিদিকেই তখন ব্যর্থতা আর হতাশার গ্লানি। উনিশ শ তিরিশের ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডি অভিযানের মধ্যে।

পেটে দানা মানুষের নেই, অনর্থক বাঁচার লড়াই,
মাটি শক্ত, অভিযান প্রতিহত স্নায়ু শিকড়ের,

অশ্রুজলে ফলে না ফসল,
হৃদয়ের বাষ্পোস্তমে চলে না ইঞ্জিন।
মুক্তির স্বাদ নেই লবণের মাশুল ভিক্ষায়
রক্তহীন গঙ্গাজলী আলুনি সংগ্রামে।

ধনতন্ত্রের নতুন জাঁকিয়ে বসা আসরে তখন চলছে সংস্কৃতির সঙ্কট। কাব্য-লক্ষ্মীর সেখানে নগ্ন রিক্ত রূপ। জীবনের মধ্যেও নেই কোন বলিষ্ঠ প্রত্যয়, মৃত্যুর মধ্যে নেই মহাপতনের বজ্র অভিশাপ। কবিরা খোশামুদে, সাধারণকে লক্ষ্য করে কাব্যে বাণী রূপ দেয় প্রভুদেরই নির্দেশ। কবিদের এই দেউলেপনায় যোগ দিতে পারলেন না মানিক। তখনকার কবিতার সঙ্কটের এক চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন তিনি:

ঈর্ষা আতঙ্কে দিশেহারা,
মন বুদ্ধি অন্ন মাংস এক সাথে চোলাই চলেছে শুঁড়িদের,
শব্দমদ বেচা কারবারে।
জীবনের মানে পেলাম না কবিতায়,
মরণের মানে পেলাম না দুঃখীর জীবনে।
কবিতা লেখা হল না প্রথম যৌবনেও।

কবির জীবনে চলেছে তীব্র দ্বন্দ্ব। ভাববাদের সঙ্গে বস্তুবাদের চরম সংঘাত। অপরাজেয় কবির মন বুদ্ধির ছুরিতে নিত্য আত্মহত্যা করে চলেছে। অথচ তিনি তো আর পাঁচজনের মত সহজসুলভ শান্তি, আত্মীয়তা, সৌহার্দ্য, 'বিত্ত, অর্থ মান নারী প্রতিষ্ঠা ক্ষমতা সীমাবদ্ধ যথেচ্ছচারিতা' কামনা করেন নি। 'চাষী মজুরের সাথে' রোগে ভুগেছেন, উপবাস করেছেন, খেয়েছেন খুদ। তাদের জীবনের সংগ্রামে তিনি হয়েছেন অংশভাগী। তাই কবির একান্ত কামনা—'

'আমার জগতে কাল মানুষের জন্মক্ষণ থেকে
তিলে তিলে করেছে সঞ্চয়
মহাসম্ভাবনাময় যে মহাবিপ্লব,
আমি তার আত্মীয়তা চাই।

কবি হবেন সেই মহাবিপ্লবের হোতা, পিতা, সার্থকতা দাতা। তিনি তাকে চিকিৎসকের মত আঁতুড় থেকে বাঁচিয়ে তুলবেন। সেই মহাবিপ্লবকে তিনি

অপরূপ রূপে গড়ে তুলবেন, সাজিয়ে দেবেন, সার্থকতা দেবেন।

আমি তার চোখে দেব কয়লাখনির কালো
মরণ-কাজল,
টিপ দেব চাকায় মাখানো গাঢ় জমাট রক্তের।
সর্ব অঙ্গে এঁকে দেব লালিম অঞ্জনা
বুলেটের তাজা তাজা ক্ষতের চিহ্নের।

কবির জীবনে ছিল এতখানি কাব্যের ভূমিকা। মহাসম্ভাবনাময় এক অগ্নিক্ষরা ভবিষ্যৎ। আন্দামানী অন্ধকার থেকে তিনি আনতে চেয়েছিলেন 'নিশীথ কাব্যের তুষানল।' শৈশবের আকাশ কুসুম স্বপ্নে, 'যৌবনের পদ্মলোভী গোবর গাদায়' তাঁর মনে জেগেছিল কবিতা লেখার অদম্য আকাঙ্ক্ষা।.সে কবিতা গতানুগতিক নয়—

মানুষের আসল কবিতা—
আমার যে মানুষেরা
রোগ শোক ক্ষুধা ব্যথা বঞ্চনা হত্যায়
জীবিকার ব্যভিচারে পচে গলে যায়
আমার জীবন জুড়ে স্বপ্ন জাগরণে।
রেখে যায় প্রতিবাদ,
অক্ষম কবির বুকে শত কোটি ভাষাহীন বিরহী ধ্বনির।

কবির বুকে কত প্রেরণা জাগে। কিন্তু প্রতিবার ঘটে তার ক্ষুব্ধ পরাজয়। কবির মনে 'দিনে দিনে বাড়ে ক্ষোভ, বাড়ে জ্বালা, বাড়ে ব্যকুলতা / বাড়ে জিদ, বাড়ে অহঙ্কার,' কবির মনে হয় 'বহুরূপী অত্যাচারী জগতের সাথে' তিনি একাকী যোদ্ধা। তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে, তির্যক আঘাতে তিনি শত্রুকে দুর্বল করতে চেয়েছেন কিন্তু সে আঘাত ব্যর্থ হয়, মনে হয় এ যেন কবির নিজেরই ব্যর্থতা। 'নিজের চিবানো দাঁতে ব্যর্থতার অসহায় রোষে।' এ কবির কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। সাহায্য করবে এমন কেউ নেই। কবির মনে হয়:

জন্মভূমি বিদেশের মত,
বন্ধুরা মুখোসপরা বুদ্ধিজীবী জীব।
শত্রু মিত্র চেনা দায় স্বদেশের সঙ্কীর্ণ সীমায়,
দানবের দাঁতে নখে আহতা ধরনী

বিষে জরজর।
মনে হয় একমাত্র সুহৃদ শহীদ
আমারই অর্দ্ধেক জীবন,
আমার ব্যর্থতা।

কবির কাছে জীবনের অর্থ ছিল অস্পষ্ট। ভাববাদ আর বস্তুবাদের সংঘাতে দেখা দিল বিকার। 'জীবনকে দগ্ধ করে বিকারের চাওয়া প্রতিকার / শোষণ সংস্কার' তাও পাঠকের কাছে সমাদৃত হোল। কবির মনে হয় এ জীবন আশ্চর্য।

এমন সময় দেখা দিল একদল বাস্তব কবি। 'ইতিহাসের সুতোয় যারা মালা গাঁথছে মানের / জীবন যুদ্ধের, জয়লাভের অগ্রসরের, / কাজের। মানুষের সমবেদনায় তারা কেবল চোখের জল ফেলেনা, নকল ব্যথা নকল দরদ দিয়ে প্রজাকে করে তুলছে না রাজা। প্রজার দলে ভিড়ে গিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে / শিকড় গাড়ছে না মোড়ে মোড়ে অনেক শাখা পথের ধাঁধাঁয়, / পিছনের টানে।' ওরা বলল মানুষের অমরতার কথা। জানাল তাদের দুর্জয় সংকল্পের কথা :

আমরা হাতে হাতে শুধু ছিঁড়ে আনব না মেঘ,
শুধু দেখব না গ্রহণ-ক্ষুণ্ণ ম্লান সূর্যের মুখ,
হাতুড়িতে গুঁড়ো করে, কাস্তেয় কেটে
সাফ করব দুর্যোগের কারখানার হাড়-মাস মগজ-হৃদয়,
হাসব দীপ্ত সূর্যালোকে, সবুজে।'

তারা কবিকে আহ্বান করল তাঁর 'একার আকাশ ছেড়ে' আসতে।

তারা বলল, 'মেয়ে, মাঝি, চাষী, বস্তির ছেলে' কেউ মূক নয়। এদেরও ভাষা আছে, সুর আছে। অবিরাম চলেছে তাদের 'বাঁচার লড়াই'। 'ওদের শোণিতে কেনা নিরাপদ অলস ছুটিতে / যুগ যুগান্তের শান্ত নিশ্চিন্ত আরামে' যে 'বায়বীয় সংস্কৃতি' গড়ে উঠেছে তাতে মুগ্ধ হবার সময় তাদের নেই। বাস্তব কবিরা তাকে বলেছে :

অনেক জমেছে আবর্জনা,
অচল হ্রদের তীরে বহুদূর পচে গেছে মাটি।
ঝড়ে ও বন্যায় তাকে ধুয়ে নিতে হবে ফাঁকি,
পচা জল, বন্ধ্যা মাটি, আতঙ্কে আচ্ছন্ন মৃত বায়ু।
এসো সাথী, একার আকাশ ছেড়ে এসো।

মানিক ছেড়ে এলেন তাঁর 'একার আকাশ'। আবার সন্ধান চলল মাটির পৃথিবীতে। খুঁজতে লাগলেন নতুন প্রতিনিধি, নব প্রতিশ্রুতি, নতুন আশ্বাস। অবেশেষে সাক্ষাৎ পেলেন এক কিশোর সৈনিকের। সে লেখে তাঁর না-লেখা কবিতাগুলি, মানে দেয় মানিকের বিরহী-ধ্বনিকে। মানিকের সাধ সার্থকতা লাভ করল কিশোর কবি সুকান্তের মধ্যে। কিন্তু বেশী দিন সে লিখতে পারল না কবিতা।

তাকে জমিয়ে দিল ভাতের মালিকের ছড়িয়ে রাখা
উপোসী শীতের ফাঁদ,
ক্ষইয়ে দিল জিইয়ে রাখা রক্তপায়ী কীট।

অতএব অন্য কবিকে দিয়েও মানিকের কবিতা লেখা ব্যর্থ হোল। মাঝ বয়সে তাই 'আত্মপ্রীতি সংস্কারের দেওয়াল' ভেঙে, 'বুদ্ধির জটিল জাল' ছিঁড়ে তিনি ছন্দ খুঁজে হাত মক্স করছেন। শিখছেন 'রণ-রঙ্গিণী কাব্যলক্ষ্মীর সাথে / মারণ প্রেমের কায়দা-কানুন। কবি বেরিয়ে পড়েছেন নিজের জেলখানা থেকে। প্রাণে লাগছে তাঁর 'ঘরে ঢোকা ঝড়ের আলোড়ন'। পরিচয় পেলেন 'সহজ সরল বিরাট সুন্দরের'।

পদ্মায় যে ডিঙ্গি চালায়, মেদনিপুরের শক্ত মাটি চষে,
বোম্বে থেকে কলকাতাতে লাখো চাকা ঘোরায়,
উদয়াস্ত লাখো কলম পেশে,
বুঝতে যেন পারছি
তাদের ফাঁসে আটক গলার ঐক্যতান,
অনুভব করছি ব্যাহত জীবন কামনার উজ্জ্বলতাপ,
সূর্যালোকের মত।
তুলনা পাইনি রাজকীয় কাব্য ইতিহাসে,
এমন সহজ সরল বিরাট সুন্দরের।

মানিক জীবনে অনুভব করেছেন তীব্র প্রেরণা। জীবনের স্পন্দনে স্পন্দনে তিনি অনুভব করে চলেছেন অসাধ্য সাধনের ব্রত। টেষ্ট টিউবের বস্তু মিশ্রণের প্রতিক্রিয়ায় তিনি জীবনের অর্থের সন্ধান করেন নি। মনের মত জীবনের অর্থ খোঁজার প্রবৃত্তি আর তাঁর নেই। নিজের ব্যর্থতা তিনি আর বড় করে তুলতে চান

না। তাকে বরবাদ করে এবার তাঁকেই লিখতেই হবে কবিতা। আর তো সময় নেই। তাঁর অনেক কাজ :

বসন্ত ডেকে এনে
গেয়ে যেতে হবে সারা বসন্তে জয়গান,
জগতের কোকিলদের সাথে গলা মিলিয়ে।
অনেক আলো জ্বালতে হবে মনের অন্ধকারে ,
সুর মেলাতে হবে অনেক বেসুর শানায়ের,
অনেক ভাঙা পাঁজর জোড়া দিয়ে
শুধরে নিতে হবে অনেক গান।"

তাই তিনি লিখেছেন কবিতা। এ তাঁর প্রথম কবিতা লেখার কাহিনী। বলা বাহুল্য এ কবিতা মানিকের নিজের জীবনেরই ইতিহাস। অপূর্ব শব্দ সংযোজনায়, নতুন নতুন রূপকল্পের ব্যবহারে, ব্যক্তিগত অনুভূতির উত্তাপে, বলিষ্ঠ ভাষা প্রয়োগে এবং তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীতে কবিতাটি হয়ে উঠেছে অনবদ্য।

মানিক 'প্রথম কবিতার কাহিনী' কবিতায় তাঁর কবিতা লেখার ইতিহাস বিবৃত করলেও আমরা এর আগেই পেয়েছি মানিকের কবিত্ব শক্তির পরিচয়। তবে সমাজ সচেতন মানিকের এটাই প্রথম কবিতা।

মানিকের সর্বপ্রথম কবিতার পরিচয় পাওয়া যায় 'দিবা রাত্রির কাব্য' উপন্যাসে। এ উপন্যাসটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রতি ভাগের প্রারম্ভে আছে একটি করে কবিতা। অবশ্য বঙ্গশ্রী পত্রিকায় প্রকাশের সময় কবিতাগুলো ছিল না। এই কবিতা তিনটির নাম দিনের কবিতা, রাতের কবিতা এবং দিবারাত্রির কাব্য। এই কবিতা তিনটির মধ্যে আছে মানিকের উগ্র রোমান্টিকতার পরিচয়। এই প্রেমের জন্ম মাটির পৃথিবীতে কিন্তু বিকাশ ভাবরাজ্যে। ভাবসর্বস্ব এই প্রেম বাস্তব জীবনে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। প্রেমিক প্রেমিকাও জীবনে সহজ স্বাভাবিক হতে পারে না। এদের মিলনের মধ্যে আছে বাস্তব জীবনের দুস্তর বাধা। ফলে তারা হয়ে পড়ে উদ্বায়ু বা নিউরোটিক এবং অসুস্থ। তৃষ্ণায় ক্লান্ত ক্ষতবুক এক প্রেমিকার কাছে এক প্রাতে এল তার বাঞ্ছিত জন। কিন্তু তৃষ্ণানিবারণের ছায়া-বন শীতলতা নেই তার মধ্যে। প্রেমিকও তো অসুস্থ। দুজনের মধ্যেই আছে মরুভূমির তৃষ্ণা ব্যাকুলতা। তবু তারা মিলতে পারে না। প্রেমিকের সম্বল শুধু

'শুষ্ক জীর্ণ তৃণ একগাছি'। প্রেমিকার গৃহাঙ্গনে সে কেবল মরীচিকাই আনে। তার জীবনে আসে না জীবনের আভাস।

দুই বিকার গ্রস্ত মানুষের মিলন তো সম্ভব নয়। সম্ভব নয় তাদের জীবনে সুস্থ স্বাভাবিকতা আসা। প্রেমকে সর্বস্ব করে নিতে প্রেমের পথে নেমে আসে দুস্তর ব্যবধান। শান্ত রাত্রি অবসান ঘটায় সব উষ্ণতার কিন্তু ব্যর্থ প্রেমিকার নিকট মনে হয় তাকে বন্দী রাত্রি। তার 'বুকে উতল অধীর / অনুদার সংকীর্ণ আকাশ'। আসলে প্রেম এক অসহ্য প্রাণঘাতী যন্ত্রণার ব্যাপার। প্রেম চলে গেলেও তার অভ্যাসটুকু থাকে 'মায়া' হয়ে। জীবন মনে হয় মৃত্যুর সামিল।

এই প্রেমে মুক্তি নেই, তৃপ্তি নেই। আছে অসহ্য দাহন। কিন্তু জীবন-ধ্বংসী এই প্রেমের নানা রূপেই ফুটে ওঠে সৃষ্টির বৈচিত্র্য। নীরস নিরানন্দ জীবনে এই রোমান্টিক প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী উর্বশী নীড় বাঁধতে চায় না। 'সৃষ্টির স্বৈরিণী' হয়েও সে উপবাসী। ব্যর্থতাভরা তার বর্তমান ভবিষ্যৎ! বাস্তব সংসারে সে তো শুধু স্বপ্ন। চূর্ণ বিচূর্ণ। তাই 'হিমে তাপে মাগে সে পরিত্রাণ।' রয়ে যায় চির-অধরা। বলে যায়:

'সব্যসাচী! আমি ক্ষুধাতুরা,
শ্মশানের প্রান্ত ঘেঁষা উত্তর-বাহিনী
নদী স্রোতে চলেছি ভাসিয়া,
মোর সর্ব ভবিষ্যৎ-ভরা
ব্যর্থতার পরপারে!—কে কহে কাহিনী
মোর লাগি রহিবে বসিয়া!"

মানিকের এই কবিতাগুলো অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন। তথাপি এক রোমান্টিক ব্যাকুলতা, না পাওয়ার এক বিষণ্ণ অনুভূতি পাঠক-মনকে বিচলিত এবং ভাবাতুর করে তোলে।

তারপর মানিকের কবিতা পাই '১৩৩৫ সনের শ্রেষ্ঠ কবিতা'র সংকলনে। কবিতাটির নাম 'উত্তর দক্ষিণ'। সংকলনের সম্পাদক রমাপতি বসু ভূমিকায় বলেছেন, "প্রতিভাবান কবি আমদের দেশে অল্প। কবিতা লিখবো বলেই কবির সৃষ্টি। কবিতা লিখে কবি হওয়াকে শ্রদ্ধা করা যায়, কিন্তু কবি হবো বলে কবিতা লেখাকে শ্রদ্ধা করা যায় না। সেখানে সচেতনার অভাব হয়, অভাব হয় কবিত্বের। যাঁরা কবি হবেন বলে কবিতা লেখেন বা ছাপার হরপে নাম

ছাপিয়ে আনন্দ পান ব'লে কবিতা লেখেন, সে সমস্ত কবির কবিতা আমার এই সংকলনে স্থান পায়নি ...যাঁদের মধ্যে নূতনত্বের এতটুকু ক্ষীণ আলোরও সন্ধান পাওয়া যায় না, শুধু যে কোন কবির কবিতা অনুকরণ করে কবিতা সৃষ্টি করেন, তাঁদের কবিতা এই সংকলনের উপযুক্ত নয়।...

১৩৪৫ সালে প্রকাশিত বা লিখিত যে সমস্ত ভাল কবিতা আমার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতাকে স্পর্শ করেছে, সেই সমস্ত কবিতা চয়ন করে এই সংকলন।

এই রকম কবিতা সংকলন বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। সারা বছরে যে সব কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাই থেকে শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোকে নিয়ে এই সংকলন গ্রন্থ।"

সম্পাদকের এই উক্তি থেকে কাব্যে মানিক প্রতিভার স্বীকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

জন্ম মৃত্যুর মাঝখানে জীবনের অমসৃণ পথ। এখানে নানা জটিলতা। দুরূহ প্রশ্নে কণ্টকিত। কবির এক প্রশ্ন: 'হৃদয়ের কোন্ প্রান্তে নির্বাসিতা প্রেমিকারা থাকে'। নানা চেষ্টা করেও কবি তার সদুত্তর পান নি। ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমিকার কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন:

> সানন্দ ঘোষণা—
> প্রান্ত-ক্লান্ত নয় বন্ধু হৃদয়ের সবখানি তার
> ভিখারিণী সত্য বটে তবু তো রাণীর অধিকার।

কবি জানেন আসলে এত হলো 'প্রণয়ের রাজনীতি'। তাই তিনি তাকে অস্বীকার করে যুক্তি দিয়ে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, পরিণামে প্রেমিকার কাছ থেকে পেয়েছেন শুধু চোখের জলের আশ্বাস। তাতেও তাঁর তৃপ্তি নেই। অতৃপ্ত কবির মনে এই জিজ্ঞাসাই প্রবল হয়ে ওঠে। এর উত্তর হয়ত জানত রাবণ। তিনি জানতেন 'কোথা মন্দোদরী কাঁদে, কোন্ দিকে অশোক-কানন'। রাবণ স্বর্ণপুরী থেকে বহুদূরে অশোক-কাননে করায়ত্ত সীতাকে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। 'বুকে তার জন্ম দিতে প্রেম।' কবি তো রাবণ নয়। তাই তার প্রশ্নও রয়ে গেছে নিরুত্তর।

মানিকের এই কবিতায়ও দুরূহতা আছে। তবু এ কবিতার ব্যঞ্জনা, ভাব-ব্যাকুলতা কবি-ক্ষমতার সার্থক নিদর্শন।

তারপর মানিক মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে স্বপ্ন দেখলেন শোষণ মুক্ত সমাজের।

সামিল হলেন শ্রমজিবী মানুষের সংগ্রামে। এ পর্যায়ে লেখা তার কবিতা 'সুকান্ত ভট্টাচার্য'।[১] যক্ষারোগে মৃত্যুশয্যায় শায়িত কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে উদ্দেশ্য করে মানিক লিখেছেন এই কবিতা। সুকান্তকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। এ ভালবাসা কেবল ব্যক্তিপ্রীতি নয়। মানিকের 'প্রথম কবিতার কাহিনী'তে আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। এই কবিতায় সুকান্তকে রোগমুক্ত করে তোলার সংকল্পই ঘোষিত হয়েছে। শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের যে অভিযান শুরু হয়েছে সেই অভিযানের জন্য একান্ত প্রয়োজন কবির। বসন্তের জন্য, জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য, সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য যে যুদ্ধ কবি ছাড়া তার জয়গান গাইবে কে? কবিতাটি নিছক ব্যক্তি কেন্দ্রিক হলেও তা কবিতা হয়েছে, বিবৃতি হয়নি। শব্দ-চয়নে অভিনবত্ব এবং প্রত্যয়ের বলিষ্ঠতা পাঠককে চমৎকৃত করে। সুকান্তর যক্ষা রোগের কারণ সম্বন্ধে মানিক লিখেছেন :

এও বুঝি ষড়যন্ত্র রাত্রিজ মেঘের,
উষার যারা আজ দুর্যোগ ঘটালো।

এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে হবে। কবিকে বাঁচাতে হবে। কবিকণ্ঠে ফুটে উঠেছে সেই সংকল্প ঘোষণা :

দুর্যোগের ঘন কালো মেঘ ছিঁড়ে কেটে
আমরা রোদ এনে দেব ছেলেটার গায়ে,
আমরা চাঁদা তুলে মারব সব কীট।
কবিছাড়া আমাদের জয় বৃথা।
বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে
ঘাতকের মিথ্যা আকাশ?
কে গাইবে জয় গান?
বসন্তে কোকিল কেশে কেশে রক্ত তুলবে
সে কিসের বসন্ত?

তবু সুকান্তকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তার কণ্ঠ থেমে গিয়েছে, লেখনী স্তব্ধ হয়েছে ১৩৫৪ সালে। ঐ বছরেই মানিক লিখেছেন 'প্রথম কবিতার কাহিনী'।[২]

১। ১৯৪৭ সালের ৪ঠা মে তারিখের 'রবিবারের স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত।

২। শারদীয়া বসুমতী, ১৩৫৪ এই কবিতার প্রথমাংশ বরানগরের 'নদ' নামক একটী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

তার পরের বছর লিখলেন 'পরিচয়' কবিতা।[১] দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পটভূমিকায় এই কবিতায় আছে মিষ্টি প্রেমের বিকৃত জীবনের প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পরিচয়।

এর পর 'স্বাধীনতার স্বাদ' এবং 'ছন্দ পতন' উপন্যাসে আছে তিনটি কবিতা। এই কবিতাগুলোর মধ্যে শব্দ চয়নে এবং ভাব প্রকাশে যে বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায় প্রগতিশীল কবিদের মধ্যেও তা দুর্লভ। ছন্দ পতনের কবি নবকুমার বলে, "আমি কবিতা লিখি শব্দমদ চোলাই করি না। আকাশ চষে আমি কাব্যফুলের চাষ করি না, মাটির পৃথিবীতে মানুষেরই জীবন নিয়ে কাব্যের ফসল ফলাই। জীবন্ত মানুষের বিচিত্র কাব্যময় প্রাণবন্ত জগৎ থেকে ভিন্ন মানব জগতের অস্তিত্ব নেই আমার কাছে। ভাব চিন্তা আবেগ অনুভূতি সবই পার্থিব জীবনের রসে পুষ্ট।" এখানে কবি নিজের পরিচয়ে বলেছেন :

আমি কবি, শুঁড়ি নই।
শব্দ-মদ তৃষ্ণা নিয়ে এ লেখা প'ড়ো না।
জীবনের সব তৃষ্ণা
সব ঋণ শুধে
সৃষ্টির পেয়েছি অধিকার
দখল করেছি ভবিষ্যৎ।

কবি লিখছেন নতুন গান। প্রেমের গান। কিন্তু এ তো সাধারণ প্রেমের গান নয় :

এ প্রেমের গান,
মনে হবে তোমারই মৃত্যু পরোয়ানা।

কবিতায় খোকামি আর ন্যাকামি তিনি পছন্দ করতেন না। তার বিরুদ্ধে তিনি লিখলেন :

শব্দ-মদ বেচা শুঁড়িগুলো
কাব্য লক্ষ্মীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল
শুঁড়িগুলো সব মরে যাক্
কাব্যলক্ষ্মীর দেহে যৌবনের জোয়ার ঘনাক

স্বাধীনতা-উত্তর মধ্যবিত্তের জীবনে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। দেশ ভাগাভাগি

১। ১৩৫৫ সালের 'অভিধারা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত।

এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে তারা মৃতপ্রায়। বাজ-পড়া মৃত পাখীর মত তাদেরও মৃতাবস্থা। কত কিশোরী রাধিকা যৌবনের প্রারম্ভেই গেছে ধ্বংস হয়ে কিন্তু এই ধ্বংস নির্বিবাদে তারা মেনে নেয়নি। রেখে গেছে বজ্র-সম অভিশাপ। 'চাতকের প্রাণ গেছে' কবিতাটি খুব স্পষ্ট না হলেও এই অভিশাপই সেখানে ধ্বনিত হয়েছে।

১৯৫৩ সালের ১লা জুলাই থেকে ১ পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে কোলকাতায় দেখা দিল দারুণ বিক্ষোভ। একমাস ধরে এই বিক্ষোভ চলে। জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে দমন করবার জন্য পুলিশের অত্যাচারও চরম সীমায় উঠে। প্রতিবাদে পনের দিনের মধ্যে দুবার ব্যাপক গণ-ধর্মঘট এবং হরতাল পালিত হয়। ১৬ই জুলাই কোলকাতায় ব্যাপক হাঙ্গামা ঘটে। পুলিসের সঙ্গে জনসাধারণের খণ্ড যুদ্ধ হয়। লাঠি গুলি চালিয়েও পুলিস সাধারণ মানুষকে দমাতে পারে নি। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মানিক লিখলেন এক 'ছড়া'। পরদিন স্বাধীনতা পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে।

মানিকের মৃত্যুর পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সংখ্যা পরিচয় পত্রিকায়[১] তাঁর দুটি অপ্রকাশিত কবিতা প্রকাশিত হয়। 'দুর্ভিক্ষ' এবং 'আমি ধাত্রী'। আমি ধাত্রী কবিতাটি সামান্য পরিবর্তন ছাড়া সবটাই 'প্রথম কবিতার কাহিনী'র অংশ বিশেষ। দুর্ভিক্ষ কবিতাটি দুর্ভিক্ষাবস্থার একটি অপরূপ আলেখ্য। দুর্ভিক্ষের সময় কোন খাবার পাওয়া যায় না। অকালে মানুষগুলো সব শুকিয়ে মারা যায় অথচ তখনো বোঝাই লরী গেছে বোঝাই গুদামের পানে।' এই একটি মাত্র চিত্রকল্পের মধ্যে মানিক কত অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন! এ সংসারে যাদের প্রচুর আছে তাদের ঘরেই বোঝাই লরী যায়। যারা খেতে পায় না তাদের জন্য থাকে শুধু 'ঝাঁটানো মাঠ'। এই হাহাকারই তো জীবনের শেষ কথা নয়।

শোষণ শুষ্ক মরুতে ঘাস গজাতে চায়,
চাওয়া সম্বল করে অফুরন্ত অঙ্কুর উঁকি মারে।

অনাগত আশা নিয়েই কবি বাঁচেন হাহাকার এবং মনুষ্যত্বের পরাজয়কে অবলম্বন করে।

'শত শত বছর ধরে জীবনের সঙ্গে ধারাবাহিক যে কাব্যবোধ সকলে পেয়েছে বিচিত্র চেতনার সাথে,' ছন্দ পতন উপন্যাসের কবি নবকুমারের ন্যায় মানিকের কবিতা ও সাহিত্য চিন্তা সেই বোধকে নাড়া দিয়েছে তীব্রভাবে, সৃষ্টি করেছে সংগ্রামী

১। পৌষ, ১৩৬০।

মানুষের নতুন মূল্যবোধ। জীবনের এই নতুন মূল্যবোধে মানিক এনেছেন এক বিপ্লবের বাণী।

মানিকের মৃত্যুর পর ১৩৬৮ সালের শারদীয় স্বাধীনতা পত্রিকায় মানিকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটির নাম 'গ্রীষ্ম'[১]। খুব সম্ভব সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'প্রার্থী' কবিতাটি পড়বার পর মানিক এ কবিতা লিখবার প্রেরণা পেয়েছেন। ঐ কবিতায় সুকান্ত লিখেছিল :

"হে সূর্য।
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—
শুনেছি তুমি এক জলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জলন্ত অগ্নিপিণ্ডে
পরিণত হব।
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারব
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।"

মানিকের কবিতা আরও বলিষ্ঠ। সেখানে ভাবাবেগের কোন বালাই নেই। সূর্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি এক তীব্র ঘৃণা। অন্ধকারের সে ঘোরতর শত্রু। এই অন্ধকার মানে হিম শীতল জীবন, অন্ধকার মানে মৃত্যু, অন্ধকার মানে জীবনের সমস্ত শত্রু। এই অন্ধকারের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা আছে বলেই সূর্যের উত্তাপ এত প্রখর। কবির মনেও আছে তীব্র ঘৃণা। এই ঘৃণা অকারণ কোন ঘৃণা নয়। মানুষকে তিনি গভীর ভালবাসেন বলেই মানুষের সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য মর্যাদা যে ধণিকগোষ্ঠী কুক্ষিগত করে রেখেছে তাদের প্রতি মানিকের রয়েছে ঘৃণা। এই ঘৃণা সম্পর্কে গোর্কী লিখেছেন, "এ জগতে দুই ঘৃণা কাজ করিতেছে : এক ঘৃণা আসিতেছে লুণ্ঠনকারীর মধ্য হইতে, পারস্পরিক প্রতিযোগিতার আবহাওয়া হইতে, লুণ্ঠন-ব্যবসায়ীদের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের আতঙ্কে বিহ্বল ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্ন হইতে। অন্য ঘৃণা, শ্রমিক শ্রেণীর ঘৃণা আসিতেছে বর্তমান জীবনযাত্রার প্রতি বিতৃষ্ণা হইতে এবং শ্রমিক-শ্রেণী যে শাসনদণ্ড হাতে লওয়ার অধিকারী এই চেতনার

১। কবি বিমল ঘোষের সৌজন্যে এই কবিতাটি স্বাধীনতা পত্রিকায় ছাপা হয়। মনে হয় কবিতার নামটি বিমল ঘোষ দিয়েছেন। ১৯৬৭ সালে কালপুরুষ পত্রিকার প্রথম সংকলনে এই কবিতাটি 'ঘৃণার কবিতা লিখি আমি' শিরোনামে পুনর্মুদ্রিত হয়।

আলোকে এ ঘৃণা প্রতিদিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে। এই দুই ঘৃণা বাড়িতে বাড়িতে আজ তীব্রতার এমন এক পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে এই দুই ঘৃণার মধ্যে আপোষ অসম্ভব। এই দুই ঘৃণার দুই বাহক শ্রেণীর অনিবার্য সংঘাত ও শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভ ছাড়া এ পৃথিবীকে আর কিছুই ঘৃণামুক্ত করিতে পারিবে না।” (‘সংস্কৃতির প্রভুরা, আপনারা কার পক্ষে?’—নানালেখা)। মানিকের অনন্ত ঘৃণা এই শ্রমিকশ্রেণীর ঘৃণা ; সেজন্য সূর্যের দাবদাহে তিনি পান ‘কোটি বজ্রের সন্তোষ’ :

হে সূর্য উত্তাপে শান্তি পাও?
আমার পাঁজরে কোটি-বজ্রের সন্তোষ।
আমার অত্যুগ্র শান্তি অনন্ত ঘৃণায়।

এই সূর্য নানাভাবে কবিদের কল্পনাকে উদ্‌বেজিত করে। গোর্কী বহু লেখায় এই সূর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর গল্পের নায়কের হাসিও বর্ণনা করেছেন সূর্যের মত উজ্জ্বল করে। মানিকের এই কবিতা পড়তে পড়তে মনে পড়ে গোর্কীর ‘সূর্য’ সম্পর্কে অনুভূতির কথা। গোর্কী লিখেছেন :

“ভোর ভোর পৌঁছাতাম বনে। ফাঁদ পেতে টোপ ঝুলিয়ে দিয়ে দিনের আলো ফুটে ওঠার অপেক্ষায় বনের কিনারে গিয়ে শুয়ে থাকতাম।.. বন ছাড়িয়ে দূরে বহুদূরের মাঠের শেষে দিগন্তের কোল ঘেঁসে ধীরে সূর্য উঠছে বনের কালো কেশরে আগুন ধরিয়ে। পরক্ষণেই অন্তর মথিত করা এক আলোড়ন জেগে উঠতো। সূর্যের আলোয় রূপোলি দীপ্তিতে ঝলমল করে ওঠা ঘন কুয়াশা কুণ্ডলী পাকিয়ে যতই দ্রুত উপরে উঠে যেতো, তারই তলায় মাটির বুকে ধীরে ফুটে উঠতো গাছপালা ঝোপঝাড় আর খড়ের গাদা। মনে হতো যেন সূর্যের তাপে মাঠগুলো গলে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে সোনালী স্রোত। ইতিমধ্যে নদীর কূলের শান্ত জলের বুকে লেগেছে আলোর ছোঁয়া, মনে হতো বুঝিবা সমস্ত নদীর জল ধেয়ে এসে জুটেছে যেখানে পড়েছে ঐ সোনালী আঙুলের উষ্ণ ছোঁয়া। সোনার থালাটা যতই উপরে উঠে যেতো ততই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তো আনন্দভরা আশীর্বাদ। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা পৃথিবীকে কোমল উষ্ণতায় ভরিয়ে তুলতো। আর গভীর কৃতজ্ঞতায় পৃথিবী শরতের সুমধুর গন্ধ-ভরা নিঃশ্বাসে আমোদিত করে তুলতো চারিদিক।...বহু বহুবার এখান থেকে আমি পৃথিবীর সূর্যোদয় দেখেছি। কিন্তু প্রত্যেকবারেই আমার চোখের সামনে জন্ম নিয়েছে এক এক নতুন পৃথিবী—এক অনন্যা অপূর্ব সুন্দরী পৃথিবী।’ কেন

জানি সূর্যের উপরে আমার অন্তরে রয়েছে এক অদ্ভুত ভালোবাসা। নামটা পর্যন্ত আমার ভালো লাগে। ভালো লাগে তার সুমধুর অপূর্ব ঝঙ্কারময় উচ্চারণ। ভাঙাবেড়ার ফাটল দিয়ে কিংবা গাছের ঘন ডালপালায় ফাঁক দিয়ে যখন তলোয়ারের মতো বিঁধে এসে পড়ে সূর্যের আলোর রেখা, চোখ বুজে সেই উষ্ণ রেখার দিকে মুখ তুলে ধরে বা দুহাতের মুঠোয় চেপে ধরে অদ্ভুত আনন্দে ভরে ওঠে মন প্রাণ।" (পৃথিবীর পথে, পৃঃ ১৮৭)। গোর্কীর বিখ্যাত 'মা' উপন্যাসেও আছে সূর্য ব্যঞ্জনা। সুকান্তের অসংখ্য কবিতায় রয়েছে সূর্য বন্দনা। কারণ এই 'লাল-সূর্য' তো মুক্তির প্রতীক।

মানিকেরও সূর্য ভালো লেগেছিল। সূর্যের সঙ্গে তিনি অনুভব করেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা। সূর্যের সঙ্গে তার মিল গভীর। উভয়ের উদ্দেশ্যও এক।

আমার ঘৃণার মতো
তোমারও আদিম আলো তাপ
দিবানিশি মৃত্যু চায় জীবনের সমস্ত শত্রুর ?

'যে-সমস্ত মন্দ বস্তু জনসাধারণকে বিপন্ন করে তোলে তাকে নিন্দা করাই উচিত এবং জনসাধারণের সমস্ত বিপ্লবী সংগ্রাম হওয়া উচিত প্রসংশিত।' মানিকের ছিল অনুরূপ দৃঢ় প্রত্যয়। তাই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর প্রতি ছিল তাঁর তীব্র ঘৃণা এবং বিদ্রূপ। তিনি এই কপট শাসকগোষ্ঠীর স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়ে মানুষের সগোত্র এবং আপন কবি হওয়ার জন্য সূর্যের কাছে কামনা করেন ঘৃণার কবিতা লিখবার জন্য আরো ঘৃণা এবং আরো আলো। কবি বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে আত্মসংকল্প ঘোষণা করেন :

শান্তপ্রীত প্রেমাতুর হিংসাহীন শীত
ঘনায়েছে হিংস্র দানবেরা,
করেছে ঘোষণা
অহিংসার জয়োৎসব ত্যাগে, পরাজয়ে ;
শীতলতা ধর্ম জীবনের,
যত কম তাপ তত মহান আগুন,
ধন্য নিভে গেলে !
তাই আরও ঘৃণা চাই
দানবীয় অহিংসারে দগ্ধ করে দিতে
জীবনের আলোয় উত্তাপে।

এই প্রকাশিত কবিতাগুলো ছাড়াও আমরা পেয়েছি আরও সাতটি অপ্রকাশিত সম্পূর্ণ কবিতার পাণ্ডুলিপি। 'নূতন ঘৃণার প্রথম কবিতা'য় 'গ্রীষ্ম' কবিতার ব্যঞ্জনা আরও ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গ্রীষ্ম কবিতাটি যেন এই কবিতারই এক সংক্ষেপ রূপ।

'গুড়ের ভাঁড়' কবিতাটি খুব সম্ভব ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার পরেই লেখা। আমাদের স্বাধীনতাকে মানিক শূন্য গুড়ের ভাঁড়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন আর আমরা হলাম সব লোভী পিঁপড়ে। আসলে এই স্বাধীনতা হল গণমুক্তির একটা মোড় বিশেষ। পথ-বিপথের গোলকধাঁধা কাটিয়ে ঠিক পথে যেতে পারলেই লক্ষ্যসিদ্ধি সম্ভব। 'মোড়', কবিতায় আছে তারই ব্যঞ্জনা। প্রতিবেশী চীনের সঙ্গে তুলনা করলেই আমাদের দুর্ভাগ্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব। প্রায় একই সময়ে স্বাধীন হয়েও আমাদের পথ কত বিভিন্ন। সেজন্য চীনবাসীর সৌভাগ্যকে মানিক ঈর্ষা করেছেন 'চীন' কবিতায়।

'ডিসেম্বর', 'শ্রাবণ মাস' এবং 'তুষের আগুন' কবিতা তিনটির রচনাকাল মানিক লিখে যান নি। মনে হয় স্বাধীনতা পাওয়ার পরেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে—সিলেট, কাকদ্বীপ, মেদিনীপুর, তেলেঙ্গানায় আশাহত মানুষের মুক্তি কামনা যে আগ্নেয় রূপ ধারণ করেছিল তারই কাব্যিক অভিব্যক্তি ঘটেছে এই কবিতাগুলোতে। সেই আগুনের দাউ দাউ রূপ ক্রমে স্তিমিত হয়েছিল কিন্তু তুষের আগুনের মতই তা শোষিত মানুষের মনে ধিকি ধিকি জ্বলছে আবার একদিন সব পুড়িয়ে শেষ করবে বলে। শোষণের অবসান ছাড়া তো শোষিতের মুক্তি নেই।

ভাবাবেগ নয়, এই বলিষ্ঠ আত্ম-প্রতীতিইবোধেই আছে মানিকের স্বাতন্ত্র্য। কাব্যভাবনায় তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সম্ভবত তিনি চান নি। সেজন্য কবিতাগুলোর অনেক ক্ষেত্রে আছে অস্পষ্টতা এবং দুরূহতা। অবশ্য তার মূল কারণ নিহিত আছে যুগ-চেতনার মধ্যেও। আসলে তিনি কবি হবেন বলে কাব্য-চর্চা করেন নি। তাঁর প্রতিভা পূর্ণতা এবং সার্থকতা লাভ করেছে গল্প-উপন্যাসে, কবিতা তাঁর গৌণফসল। কথা সাহিত্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে যে সব ভাবনা তাঁর কবি প্রাণকে উদ্বেলিত করে তুলত তারই কয়েকটি উজ্জ্বল নিদর্শন তিনি রেখে গিয়েছেন বাঙলা কাব্যে। আরও বেশী কবিতা তাঁর কাছ থেকে পাইনি বলে ক্ষোভ করা যেতে পারে কিন্তু যা পেয়েছি তার মূল্যও তো কম নয়।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

॥ উপন্যাস ॥

১৩৩৫ সালে অপ্রত্যাশিতভাবে মানিকের প্রথম গল্প প্রকাশিত হলেও মানিকের যথার্থ সাহিত্যজীবন শুরু হয়েছিল ১৯৩৫ সালে। এ সময় থেকেই তাঁর বহু গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। অতসীমামী যেমন তার প্রথম প্রকাশিত গল্প তেমনি 'জননী' উপন্যাস তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

মানিকের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রথমেই ধরা পড়েছে যন্ত্রণা-জর্জর শহরতলীর মধ্যবিত্ত পরিবারের এক জননীর কাহিনী। বিয়ের পরেই শ্যামা জননী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই জননীত্বের স্বাদ সে অনুভব করে সাত বছর বন্ধ্যা জীবনের পর। তার এই সাত বছরের ইতিহাস অশেষ গ্লানি ও লাঞ্ছনায় ভরা। তার স্বামী শীতল ছিটগ্রস্ত, নেশাখোর, খেয়ালী এবং মেজাজী। শ্যামার শরীরে আছে শীতলের অত্যাচারের অনেক দাগ। কিন্তু জননী হয়ে শ্যামা সব ভুলে গেল। তার আনন্দ আর উল্লাসের সীমা নেই। এমন কি পাড়ার সবচেয়ে বড়লোক মহিম তালুকদারের স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া পর্যন্ত শ্যামার মধ্যে এক নতুন মহিমা আবিষ্কার করে তার সঙ্গে ভাব করতে আসে। শ্যামার সেই প্রথম ছেলে বিশু বেঁচে রইল মাত্র বারো দিন। তারপর অবশ্য শ্যামার পর পর তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছে। সাংসারিক নানা বিপর্যয়ে নিজের গহনা বিক্রী করে, বাড়ী বিক্রী করে নিজের বাড়ীতে দাসীর মত সারাদিন খেটে সে তার ছেলেদের লেখাপড়া শেখায়, মেয়ে বিয়ে দেয়। শীতলের সংসারে শ্যামাই সব। শীতল বাহ্য। শ্যামাই বাড়ীর সর্বময়ী কর্ত্রী। আবার খুনের দায়ে শীতলের জেল হলে, সংসারের সব বোঝা একা টেনে চলে। এক একদিন রাত্রে ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে উদভ্রান্ত শ্যামার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে। "জননীত্ব কেমন যেন নীরস অর্থহীন মনে হইত শ্যামার কাছে। কোথায় ছিল এই চারিটি জীব, কি সম্পর্ক ওদের সঙ্গে তাহার, অসহায়া স্ত্রীলোক সে, মেরুদণ্ড বাঁকানো এ ভার তার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে কেন? কিসের এই অন্ধ মায়া? জগজ্জননী মহামায়া কিসের ধাঁধায় ফেলিয়া তাহাকে দিয়া এত দুঃখ বরণ করাইতেছেন? সুখ কাকে বলে একদিনের জন্যে সে তাহা জানিতে পারিল না, তাহার একটা প্রাণ নিংড়াইয়া চারিটি প্রাণীকে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে,—কেন? কি লাভ তাহার? চোখ বুজিয়া সে যদি আজ কোথাও চলিয়া যাইতে পারিত!—

ওরা দুঃখ পাইবে, না খাইয়া হয়ত মরিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায় তার? সে তো দেখিতে আসিবে না। পেটের সন্তানগুলির প্রতি শ্যামা যেন বিদ্বেষ অনুভব করিত,—সব তাহার শত্রু, জন্মজন্মান্তরের পাপ! কি দশা তাহার হইয়াছে ওদের জন্য!"

তবু শ্যামা বেঁচে রইল। গত্যন্তর না দেখে তার বাড়ী ভাড়া দিয়ে শ্যামা বনগাঁয় ননদ মন্দার বাড়ী গিয়ে উঠল। এখানকার গ্রাম্য আবহাওয়া শ্যামার খুব ভাল লাগল। এখানে মানিক গ্রাম্য পরিবেশের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পড়ে পথের পাঁচালীর কথা স্মরণ হয়। তবে বিভূতিভূষণের ন্যায় মানিকের বর্ণনায় রহস্যময়তা নেই। আছে খাঁটি বস্তুনিষ্ঠা। শহরের কৃত্রিমতার পরিবর্তে এখানকার জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় মেশামিশি শ্যামা খুব অনুভব করল।

জননী শ্যামা সারাদিন পরিশ্রম করে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করে। ছেলের স্বাস্থ্য খারাপ হলে একটু ভালমন্দ চুরি করেও খাওয়ায়। এমনি করে শ্যামা বেঁচে রইল। মেয়ের বিয়ে দিল। মায়ের কষ্ট দেখে ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে চাকুরী নিল। শ্যামা আবার কোলকাতার ভাড়া বাড়ীতে ফিরে এল। তার ছেলের বিয়ে দিল। কিন্তু পুত্রবধূর ভরা-যৌবনের সুস্থ ও সুন্দর শরীর দেখে সে সকাতর হয়ে পড়ল। বৌয়ের সঙ্গে নিজেকে যেন মিলিয়ে নিতে পারছিল না। কিন্তু সেই বৌ সুবর্ণ যখন সন্তান সম্ভবা হোল তখন শ্যামা তাকে যেন বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে একটি দিনের অপেক্ষায় রইল। তার ক্ষুদ্র বিদ্বেষ, তুচ্ছ শত্রুতা কোথায় মিলিয়ে গেল। সুবর্ণের জননীত্ব লাভের পর গল্প শেষ হোল। শ্যামা যেন সুবর্ণের মধ্যে নতুন করে নিজেকে উপলব্ধি করল।

এই উপন্যাসে কোন ভাবালুতা নেই, রোমান্স নেই, আছে চিরাচরিত সুখদুঃখময় বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এক জননীর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের বাস্তব চিত্রণ। দৈনন্দিন জীবনের বিস্তৃত বর্ণনায়, বাস্তব পরিবেশ রচনায় শ্যামার কাহিনী অত্যন্ত স্বাভাবিকতা লাভ করেছে। এই কাহিনী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের আপন কাহিনী হয়ে উঠেছে। সাধারণ বাঙালী সংসারে আমরা এই জননীকেই দেখি। এই চরিত্র রূপায়ণে মানিকের দক্ষতা এবং বাস্তবতা বিস্ময়কর। এই উপন্যাসে তৎকালীন যৌনবিকৃতির কোন ঘটনা নেই, রোমান্টিক ভাববিলাসের কোন স্থান নেই, আছে সুস্থ এক জাগতিকবোধ। শ্যামার স্বামী নেশা করে, অনেক রাত্রে বাড়ী ফেরে, স্ত্রীকে মারধোর করে কিন্তু তার মধ্যেও যৌনবিকার দেখা যায় না। রাখাল অতি সুন্দরী গরীবের মেয়েকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে কিন্তু প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে

কোন অবনিবনা হয় না। শ্যামার আপন বলতে আছে এক বিকারগ্রস্ত মামা। বনেদী ঘরের এক মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায়, দেশ দেশান্তরে গমন করে, সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়ায়, ভাগ্নীর গচ্ছিত টাকা খরচ করে ফেলে। সে এক অদ্ভুত চরিত্র।

প্রথম উপন্যাসেই মানিক তাঁর নিপুণ ভাষা প্রয়োগ, ব্যঙ্গাত্মক রচনাভঙ্গি, নিখুঁত চরিত্র রূপায়ণ এবং অপূর্ব বাস্তবতার পরিচয় দিয়ে বাঙলা উপন্যাসের এক নতুন দিক খুলে দিলেন। তাঁর উপন্যাসে জননীর যে বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে বাঙলা সাহিত্যে তা ছিল দুর্লভ।

দিবারাত্রির কাব্য মানিকের দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রকৃতি বিচারে জননী উপন্যাসের একেবারে বিপরীত। লেখকের নিবেদনে মানিক লিখেছেন, "দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয়, বইখানি খাপছাড়া, অস্বাভাবিক তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনী। রূপকের এ একটি নূতন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা-যাবে, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেই গুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের projection—মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।"

দিবারাত্রির কাব্য তিনভাগে বর্ণিত। প্রথম ভাগে আছে 'দিনের কবিতা' দ্বিতীয় ভাগে 'রাতের কবিতা' আর তৃতীয় ভাগে 'দিবারাত্রির কাব্য'। প্রত্যেক ভাগের মুখবন্ধে একটি করে কবিতা দেওয়া হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য চর্চার এখানেই প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। এই উপন্যাসের কেবল শিরোনামেই নয়, গোটা কাহিনীই কাব্যগুণে সমৃদ্ধ। সেজন্য 'দিবারাত্রির কাব্য' কেবল নামেই নহে স্বরূপত এক দীর্ঘ গদ্য কবিতা।

'দিবারাত্রির কাব্য' অবৈধ প্রেমের এক উৎকট রোমান্টিক উপন্যাস। এ লেখার মধ্যে মানিক সমকালীন সাহিত্যের সহযাত্রীদের সঙ্গে যেন সাযুজ্য রক্ষা করলেন। কল্লোল যুগের লেখকেরা ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের দ্বারা বর্মাবৃত হয়ে যৌনবৃত্তিকে মানুষের সর্বপ্রধান বৃত্তি রূপে গণ্য করলেন এবং বাংলা সাহিত্যে অবৈধ প্রেম নিয়ে রোমান্টিক সাহিত্যের নতুন জোয়ার বইয়ে দিলেন। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ক্রমবর্ধমান ভাঙন তাঁদের সামনে এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করল এবং তারা ফ্রয়েডের যৌন সর্বস্বতাকে আঁকড়ে ধরলেন। মানিক কল্লোলীয় না হয়েও যুগের হাওয়াকে অস্বীকার করতে পারেন নি।

সুপ্রিয়ার বিয়ের ছয়বৎসর পরে পাহাড় ঘেঁষা রূপাইকুড়া থানায় হেরম্ব এসে

হাজির। সেখানে সুপ্রিয়া থাকে। তার স্বামী অশোক থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা। সুপ্রিয়া হেরম্বকে ভালবাসত। কিন্তু হেরম্বের মধ্যে সুপ্রিয়ার প্রতি সেরূপ কোন আকর্ষণ নেই। হেরম্বের কথায় সুপ্রিয়া দারোগাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল। সুপ্রিয়ার মনে হয়েছিল দারোগার আড়ালে হেরম্বই রইল। এতদিন পর তার বাড়িতে হেরম্ব মাত্র একরাত থাকতে এসেছে। সুপ্রিয়া যতটা পারে হেরম্বের কাছাকাছি থাকে। আদরযত্ন করে। তবু হেরম্বের কাছ থেকে যখন কোন সাড়া এলনা তখন রাতে সুপ্রিয়া হেরম্বের কাছে চরম আত্মনিবেদন করতে গেল। ছয় মাসের মধ্যেই তার সঙ্গে আবার দেখা হবে বলে তাকে নিবৃত্ত করে হেরম্ব বাইরে এসে হাঁফ ছাড়ল। হেরম্ব ছিল বিপত্নীক। কাহিনী শুরু হওয়ার আগেই তার স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে মারা গিয়েছে। "আকাশ মেঘে ঢাকা। ওদিকে বিদ্যুৎ চমকায়। শুকনো ঘাসে ঢাকা মাঠে হেরম্ব আস্তে আস্তে পায়চারি করে। আজ রাতে যদি বৃষ্টি হয় কাল হয়তো মাঠের বিবর্ণ বিশীর্ণ তৃণ প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।" হেরম্বের আকাশও ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, তার মধ্যে যেন সুপ্রিয়া চমক দিচ্ছে। সুপ্রিয়া বিবর্ণ বিশীর্ণ তৃণের মত। হেরম্বের প্রেম পেলে সুপ্রিয়াও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। এখানেই প্রথম ভাগের শেষ।

দ্বিতীয় ভাগে হেরম্ব এল পুরীতে। সেখানে আঠার বছর পরে তার সঙ্গে দেখা হোল অনাথ আর মালতীর সঙ্গে। অনাথ সত্যবাবুর বাড়িতে মাষ্টারি করত। তখন ষোলবছরের মেয়ে মালতী তার সঙ্গে পালিয়ে চলে এসেছে। মালতী এখন এক মন্দিরের পূজারিণী। ভক্তদের সে প্রসাদ দেয়, মাদুলি দেয়। আর ভক্তের প্রণামীতে তাদের সংসার চলে। অনাথ এখন নিস্পৃহ। কঠিন যোগাসনে সে সময় কাটায়। মালতীর প্রেমার্তি তাকে কেন্দ্র করে ব্যর্থ হয়ে ঘোরে। মালতী অনাথকে এখনো খুব ভালবাসে। কিন্তু অনাথ মালতীকে এড়িয়ে চলে। দুঃখে বেদনায় মালতী মদ ধরে। মালতী অবশ্য বলে কারণ। হেরম্ব সুপ্রিয়াকেও শুনেছিল মদ খেতে। এই মদ যেন দুঃখ বিনাশী সুধা। মালতীর মেয়ের নাম আনন্দ। বয়স মাত্র তের। আনন্দের সঙ্গে বিগতযৌবন হেরম্ব আবার প্রেমে পড়ল। আনন্দ যেন তার জীবনের শান্তি। সুপ্রিয়াকে ত্যাগ করে এসে হেরম্বের যা হয়নি এখন তাই হল। নিজের কাছে নিজের মূল্য তার অসম্ভব বেড়ে গেল। সে জটিল জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সাধারণ সুস্থ মানুষ সে নয়। মন তার সর্বদা অপরাধী, অহরহ তাকে আত্মসমর্থন করে চলতে হয়। জীবনে সে এত বেশি পাক খেয়েছে যে মাথা তার সর্বদাই ঘোরে। আনন্দ, পুলক ও উল্লাস সংগ্রহ করা আজ তার পক্ষে

অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু আনন্দ আজ তাকে আর তার দৃষ্টিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে, বিচলিত হয়ে তাকে ছেলেমানুষের মত উল্লসিত করে দিয়েছে। তার দেহমন হঠাৎ হাল্কা হয়ে গিয়েছে।

আনন্দের সঙ্গে হেরম্বের প্রেমের আলোচনা হয়। হেরম্ব বলে, প্রেম অসহ্য প্রাণঘাতী ব্যাপার। প্রেম চিরকাল টিকলে মানুষকে আর টিকতে হত না। প্রেমের জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান বেশী নয়। প্রেম যখন বেঁচে আছে তখন দু'জনের মধ্যে একজন মরে গেলে শোক হয়—অক্ষয় শোক হয়। প্রেমের অকাল মৃত্যু নেই বলে শোকের মধ্যে প্রেম চিরন্তন হয়ে যায়। কিন্তু প্রেম যখন মরে গেছে, যখন আছে শুধু মায়া, অভ্যাস আর আত্মসান্ত্বনার খেলা, তখন যদি দু'জনের একজন মরে যায়, বেশীদিন শোক হওয়া অসুস্থ মনের লক্ষণ। সেটা দুর্বলতা।

সেজন্য হেরম্বের নিকট রোমিও জুলিয়েট প্রেমের ট্র্যাজিডি। আমরা ওদের প্রেমের জন্য শোক করি, ওদের জন্য নয়। হেরম্ব বলে প্রেম মরে গেলেও দুজনের মধ্যে সুখ থাকে। সুখে শান্তিতে তারা ঘরকন্না করতে পারে। আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে হেরম্ব বলে, 'সুখ হল শুঁটকি মাছ—মানুষের জিভ হল আসলে ছোটলোক। তাই কোন রকমে সুখের স্বাদ নিয়ে জীবনটা ভরে রাখা যায়। জীবন বড় নীরস আনন্দ—বড় নিরুৎসব। জীবনের গতি শ্লথ, মন্থর। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে মানুষের জীবন কাটাতে হয়। তার মধ্যে ওই প্রেমের উত্তেজনাটুকু তার উপরি লাভ।'

অনাথ আর মালতীর নিষ্ঠুর সম্পর্কের মধ্যে আনন্দ গড়ে উঠেছে। আনন্দের মধ্যেও তাই আছে এক বিষাদ। নাচের মধ্যে সে তার বিষাদ ভুলে থাকে। আনন্দ সেদিন পূর্ণিমার নাচ নাচল। অন্যদিন সে পূর্ণিমার নাচ শেষ করে অমাবস্যায় ফিরে যায়। কিন্তু আজ আনন্দের জীবনেও পূর্ণিমা। তাই সে আজ আর অমাবস্যায় ফিরে যায় নি। হেরম্বের কোলে গিয়ে শুয়ে তার জ্বালা কমাল। প্রেমের উত্তেজনার মধ্যেই আনন্দ এবং হেরম্ব নীরস এবং বিষাদময় জীবনকে ভুলে থাকে।

তৃতীয় ভাগে দিনের কবিতা আর রাতের কবিতা এক সূত্রে এসে মিশে গেল। হেরম্ব আনন্দের অতিথি হয়ে পনেরদিন কাটিয়ে দিল। সুপ্রিয়াকেও সে চিঠি দিল আসতে। সে শুনেছিল অশোকের খুব অসুখ। পুরীর স্বাস্থ্যকর জল হাওয়ায় আরাম হতে পারে বলেই সে লিখেছে। সুপ্রিয়া এসেছে। আনন্দকেও দেখেছে। ঈর্ষা বোধ করেছে। হেরম্বকে সমুদ্রতীরে আত্মনিবেদন করেছে। হেরম্বের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার মতলব করেছে। কিন্তু হেরম্ব সুপ্রিয়াকে তার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে মালতীর মন্দিরে ফিরে এল। সেদিন ছিল মালতীর জন্মদিন। এই একটা দিন অনাথ

মালতীর কথা শুনত। কিন্তু এবার জন্মদিনে অনাথ মন্দির ছেড়ে পালিয়ে গেল। রাতে মালতীও গোঁসাই ঠাকুরের আশ্রমে চলে গেল। যাবার আগে হেরম্ব কথা দিয়েছিল সে আনন্দকে বিয়ে করবে। আনন্দ ঘুমের ভান করে সবই জানতে পারল। আনন্দের কাছে বাড়িটি মনে হোল পাগলা গারদ। আনন্দ বলে, "মানুষের ভাগ্যে তার আর বিশ্বাস নেই। হেরম্বের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তারও শাস্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। হেরম্বের অনুরোধে আনন্দ সেই রাতেও হেরম্বকে নাচ দেখাল। তবে সে নাচ চন্দ্রকলা নয়, পরীনৃত্য। ঘরের সমস্ত কাঠ জ্বালিয়ে তার সেই নিরাবরণ নিরাভরণ নৃত্য আরম্ভ হোল। নাচতে নাচতে আনন্দ সেই বিপুল ব্যাপক যজ্ঞানলে ঢলে পড়ল। হেরম্ব নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে রইল। আনন্দ অনেক আগেই মারা গিয়েছিল ; শুধু চিতায় উঠবার শক্তিটুকুই তার বজায় ছিল। উপবাসী সৃষ্টির স্বৈরিণী অঙ্গে ভস্ম মেখে মৃত্যুর মধ্যে নিজের ব্যর্থ অভিসারের গান সমাপ্ত করে দিল।

দিবারাত্রির কাব্য এক অপূর্ব রোমান্টিক প্রেমের গল্প। এই গল্পের প্রতিটি মানুষ অসুস্থ এবং বিকারগ্রস্ত। কেউ এ গল্পে সুখী নয়। এই গল্পের নায়ক হেরম্ব প্লেটোনিক প্রেম বা ভাববাদী প্রেমের প্রতীক। সে এই কঠোর কঠিন বাস্তব সংসারে বিচরণ করে কিন্তু মন তার সেখানে আবদ্ধ নয়। তার কাছে জীবন বড় নীরস, বড় নিরুৎসব। তার প্রেম যেন স্বর্গীয় চারা গাছ। মাটির গভীরে শিকড় থাকলেও তার ফুল সূর্যমুখী। বাস্তবের কঠিন আঘাত সে সহ্য করতে পারে না। তার কাছে প্রেম অসহ্য প্রাণঘাতী যন্ত্রণার ব্যাপার। সে কারণেই সে সুপ্রিয়ার প্রেমে ধরা দেয় না। সুপ্রিয়ার প্রেম রোমান্টিক হলেও সংসারকেন্দ্রিক। নীড় বাঁধার স্বপ্নে তার সার্থকতা। হেরম্ব ভুলিয়ে ভালিয়ে দারোগা অশোকের সঙ্গে তার বিয়ে দেয়, বারে বারে সুপ্রিয়ার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে পালিয়ে বেড়ায়। অথচ সুপ্রিয়া তার রোমান্টিক ভালোবাসার জন্য ক্ষুধাতুর। অশোকের সংসার তার কাছে প্রাণহীন! সে নিউরটিক, বিদ্রোহী, সুরাসক্তা। সমাজ-জীবনের বাস্তবতায় রোমান্টিক প্রেম সুপ্রিয়ার মতই রুগ্ন। আনন্দ সুপ্রিয়ার বিপরীত। এ কিশোরীর নীড় বাঁধার মতলব নেই। মাতা-পিতার অসুস্থ-সম্পর্কে সে সংসারের প্রতি বীতরাগ। অথচ তার জীবনেও আছে প্রেম। সে প্রেম উর্ধ্বমুখী। হেরম্বকে নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ননীড় সে রচনা করে না। পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে সে প্রেমিকের আরতি করে। নৃত্যের ছটায় তাকে বিমূর্ত করে তোলে। আসলে আনন্দ এক রোমান্টিক কিশোরী, ভাববাদী প্রেমে মশগুল। সেজন্য হেরম্ব এই কিশোরীর প্রেমকে স্বীকৃতি জানায়। কিন্তু এই প্রেমের পূর্ণতা তো বিবাহের মধ্যে নয়। সেজন্য বিয়ের কথা শুনে সে

পুলকিত হয় না। নিজের হাতে সাজানো চিতায় অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিমায় সৃষ্টির স্বৈরিণী মৃত্যু অভিসারিকার গানের মধ্যেই নিজের ট্র্যাজিডিকে পূর্ণ করে দিয়ে যায় আর রেখে যায় রোমান্টিক প্রেমের চিরন্তন আর্তি।

কল্লোল যুগের অধিকাংশ গল্প উপন্যাসের ন্যায় মানিকের এ উপন্যাসেও আছে যৌন প্রলেপ এবং সেন্টিমেন্টালিজম তবু এ উপন্যাস তাদের সমধর্মী নয়। মানিক সেই যুগে মধ্যবিত্ত জীবনের যে বিকার লক্ষ্য করেছিলেন এই উপন্যাসের রূপক রচনার মধ্যে তাকেই বলিষ্ঠ ভাবে রূপায়িত করে তুলেছেন। এ উপন্যাসের বক্তব্য খুব স্পষ্ট না হলেও যুগের অসংগতি এবং অসংলগ্নতাকে মানিক যে অপূর্ব শৈল্পিক সংযম এবং সুনীতির মধ্যে প্রেমের ভাষ্যে রূপান্তরিত করেছেন তা এক বিস্ময়ের বস্তু।

মানিক এই উপন্যাসের নামকরণ করেছেন 'দিবারাত্রির কাব্য'। বস্তুত ঘটনা বিন্যাসে, ভাব-জীবনের স্বচ্ছ রূপায়ণে, চরিত্র চিত্রণে তৎকালীন অন্যান্য উপন্যাস থেকে এ উপন্যাস স্বতন্ত্র। মানিক বলেছেন, এই কাহিনীর মানুষগুলো আসলে মানুষ নয়, মানসিক অংশ বিশেষ। আর এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় হোল প্রেম-জীবনের ভাব দ্বন্দ্ব। ব্যঞ্জনায়, রূপকল্পে, বর্ণনায় এই কাহিনী যথার্থ কাব্যরূপ লাভ করেছে। সেজন্য মানিক সঙ্গত কারণেই একে কাব্যরূপে অভিহিত করেছেন।

অতসীমামী এবং দিবারাত্রির কাব্য-এর মধ্যে যে অসংগতি এবং অসংলগ্নতা দেখা যায় তার মূল সন্ধান করা যায় তৎকালীন যুগজীবনের মধ্যে। অসহযোগ খিলাফৎ আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে দেশের মধ্যে তীব্র হতাশা নেমে আসে। গান্ধীজী নেতৃত্ব ত্যাগ করেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের এই আন্দোলন স্তিমিত হলেও দেশে কল কারখানা বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাশিয়ার সার্থক অক্টোবর বিপ্লবের পর এদেশেও সমাজবাদী চিন্তাধারা ব্যাপ্তি লাভ করতে থাকে। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা সত্ত্বেও ১৯২৭-২৮ সালে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে এবং বিরাট বিরাট শ্রমিক ধর্মঘট সংঘটিত হয়। দেশের মধ্যে আবার গণজাগরণের ঢেউ দেখা দিতে লাগল। গান্ধীজী আবার কংগ্রেসের সক্রিয় নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। দেশ তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। গান্ধীজী এক বছরের সময় নিলেন। তার মধ্যেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিক নেতৃত্বকে বিখ্যাত মীরাট মামলায় অভিযুক্ত এবং গ্রেপ্তার করে ফেললো। অবশেষে ১৯৩০ সালে লাহোর কংগ্রেসে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভারতের প্রত্যেকটি গণসংগ্রামের মতই এই সংগ্রামের পিছনেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। সেই সকল

অর্থনৈতিক কারণ এই সংগ্রামকে পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ ব্যাপক ও শক্তিশালী করে তোলে। ১৯২৯-৩০ সালের বিশ্বজোড়া আর্থিক সংকটের ছায়া ভারতেও গভীর ভাবে পড়ে।

এই আর্থিক সংকটে ভারতের প্রত্যেকটি শ্রেণী ভয়ংকর আর্থিক দুর্দশার কবলে পড়ে। দেশের মধ্যে ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ দেখা দেয়। স্থানে স্থানে তা সশস্ত্র হয়ে উঠে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, পেশোয়ারে সংগ্রামী জনতার সমর্থনে গাড়োয়ালী সৈন্যদের বিদ্রোহ, শোলাপুরে জনগণের স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা, যুক্ত প্রদেশে কৃষকদের খাজনা বন্ধ প্রভৃতি গণআন্দোলনের তীব্রতার নিদর্শন। গান্ধীজী এ সব আন্দোলনকে একীভূত করে ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী যে প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছিল সেই সংকল্প পূরণের দিকে গেলেন না। তিনি নিজের আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করলেন—লবণ আইন অমান্য করার জন্য ডাণ্ডি অভিযানের দিকে। তিনি ৯ই এপ্রিল (১৯৩০) তারিখের নির্দেশনামায় ঘোষণা করলেন, সরকারের লবণ আইন অমান্য করে প্রতিগ্রামে লবণ তৈরি, মদ ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং, বিদেশী বস্ত্র পোড়ানো, স্কুল-কলেজ বয়কট, সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা, অস্পৃশ্যতা পরিহার ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন করতে।

কিন্তু জনসাধারণ তাদের আন্দোলনকে গান্ধীজীর নির্দেশিত পথেই আবদ্ধ রাখলোনা। সংগ্রাম উচ্চস্তরে আরোহণ করল, গণ-সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ সারা ভারতবর্ষকে প্লাবিত করল। এই তরঙ্গ রোধ করবার শক্তি ব্রিটিশ শাসকেরও রইল না। "Even the Congress leaders had lost control over the mob, which was seeking to establish a regime of its own". (১৯৩০ সালের ১৪ই মে তারিখের The Times)[১]। গান্ধীজীর প্রতিবাদে তারা কর্ণপাত করল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণ তীব্রতর হোল। কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত হোল। নব্বই হাজার মানুষ কারাবরণ করল। অবশেষে এল গান্ধী-আরউইন চুক্তি। বাংলা দেশে নেমে এল এণ্ডারসনী জুলুম এবং বর্বরোচিত অত্যাচার। ১৯৩৩ সালে কারাবরণের সংখ্যা দাঁড়াল এক লক্ষ কুড়ি হাজার। গান্ধীজী নিজের দেশের মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য শুরু করলেন অনশন। অবশেষে ১৯৩৪ সালের মে মাসে আইন অমান্য আন্দোলন বিনাসর্তে তুলে নেওয়া হোল। তার কয়েক মাস পরে গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করলেন।

দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী হতাশায় মুহ্যমান হোল।

১ R. Palme Dutt-এর 'India To-day & To-morrow' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

লোক এই হোসেন মিয়া। তার আদিবাড়ি নোয়াখালি জেলায়। সেখান থেকে নিঃস্ব অবস্থায় সে এই জেলেপাড়ায় আসে। কিন্তু কয়েক বছরেই সে জমি-জায়গা কিনে, ঘরবাড়ি তুলে, ব্যবসাবাণিজ্য করে পরম সুখেই বাস করছে। তার গতিবিধি বা কোন মতলবের কথা কেউ জানতে পারে না। প্রথম এসে সে এই জেলেপাড়ার মাঝি জহরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, জহরের নৌকায় বৈঠা বাইত। জেলে-পাড়ার অর্ধ-উলঙ্গ নোংরা মানুষগুলোর জন্য তার খুব দরদ। তাদের আপদে বিপদে টাকা কর্জ দেয়। নোয়াখালি জেলায় সমুদ্রের বুকে 'ময়নাদ্বীপ' সে ইজারা নিয়েছে। গরীব মানুষকে সে সেখানে নিয়ে বসতি বিস্তার করে। সকলের সঙ্গেই তার মিষ্টি ব্যবহার। একবার রাসুকেও সে ময়নাদ্বীপে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্ত্রী পুত্র হারিয়ে রাসু কোনমতে সেখান থেকে পালিয়ে এসে বেঁচেছে।

জেলে পাড়ায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই বাস করে, এবং তারা সদ্ভাবেই দিন কাটায়। "ধর্ম যতই পৃথক হোক দিন-যাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক অধর্ম পালন করে—দারিদ্র্য। বিবাদ যদি কখনও বাধে, সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদ, মিটিয়াও যায় অল্পেই। কুবেরের সঙ্গে সিধুর যে কারণে বিবাদ হয় আমিনুদ্দির সঙ্গে জহরের যে কারণে বিবাদ হয়, কুবের আমিনুদ্দির বিবাদও হয় সেই কারণেই। খুব খানিকটা গালাগালি ও কিছু হাতাহাতি হইয়া মীমাংসা হইয়া যায়।

মধ্যস্থতা হয়তো করে জহর মাঝিই।"

জেলে পাড়ায় জীবনযাত্রা যেমন ভদ্রলোকদের চেয়ে স্বতন্ত্র ওদের রসিকতাও তেমনি স্থূল। কার মেয়ে কার সঙ্গে চলে গিয়েছে। কার ছেলে হবে। কারো ছেলের রঙ অত্যন্ত সাদা হয়েছে বলে কানাকানি। এ সব নিয়েই চলে তাদের রসিকতা।

এদের স্বভাব-চরিত্রও ভাল নয়। ফাঁক পেলে চুরিও করে। ঘুমন্ত হোসেন-মিয়ার পকেট থেকে কুবের পয়সা চুরি করে। রাসু তার মামার পিতলের টাকা ভরা ঘটি সিঁদ কেটে চুরি করে নিয়েছে।

তবু এ উপন্যাস কুবেরেরই কাহিনী। তার বৌয়ের নাম মালা। সে খোঁড়া। সন্তান-স্নেহের হিসাবে জেলেপাড়ার জননীদের মধ্যে মালার মৌলিকতা আছে। ছেলের বয়স আট-দশ বছর পার হইয়া গেলে তার সম্বন্ধে চিন্তা করা জেলেপাড়ার মেয়েদের রীতি নয়। চিন্তা করিবার অপরাপর বিষয়ের তাহাদের অভাব নাই। কচি ছেলে ছাড়া মায়ের খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। নিষ্ঠুর ছাড়া স্বামীও বড় একটা হয় না। দুটি কুঁড়ে ঘরের কুটীরে যে সংকীর্ণ সংসার, তারও কাজ থাকে অফুরন্ত।

পুরুষেরা মাছ ধরিয়া আনে, পাইকারী কেনা-বেচা করে ; চুপড়ি মাথায় করিয়া বাড়ি বাড়ি মাছ যোগান দেওয়া তাদের কাজ নয়। ও কাজটা জেলেপাড়ার মেয়েরা সন্তান প্রসবের আগে পিছে দু-একটা মাস ছাড়া বছর ভরিয়া করিয়া যায়। অপোগণ্ড শিশু ছাড়া আর কোন সন্তানের ছোট ছোট বিপদ আপদের কথা ভাবিবারও যেমন তাহাদের সময় নাই, ওদের স্নেহ করিবার মত মানসিক কোমলতাও নাই। নবজাত সন্তানকে তাহারা যেমন পাশবিক তীব্রতার সঙ্গে মমতা করে, বয়স্ক সন্তানের জন্য তাহাদের তেমনি আসে অসভ্য উদাসীনতা। ছেলে মরিয়া গেলেও শোক তাহারা করে না, শুধু সুর করিয়া মড়াকান্না কাঁদে। মালা পঙ্গু, অলস। ঘরের কোণায় সে স্বতন্ত্র জীবন-যাপন করে, জেলেপাড়ার রূঢ় বাস্তবতা তাই তাকে অনেকটা রেহাই দিয়াছে। ছেলেমেয়েগুলিকে ভালবাসিবার মনও তাহার আছে, সময়ও সে পায়।"

সেবারে বর্ষায় খুব জল হোল। পদ্মায় বান ডাকল। কুবেরের শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম চরডাঙ্গা এক কোমর জলের নীচে তলিয়ে গিয়েছিল। বন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের বর্ণনা মানিকের নিখুঁত। ভাষায় উচ্ছ্বাস নেই। সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার যে অন্ত থাকে না তারই একটা জীবন্ত চিত্র তিনি এখানে এঁকে দিয়েছেন। সরীসৃপ গ্রন্থের 'বন্যা' গল্পেও এমনি বর্ণনা আছে। কুবের বন্যার সংবাদ পেয়ে শ্বশুরবাড়ি গেল এবং ফিরে আসবার সময় মালার ভাই বোনগুলোকে নিয়ে এল। তার মধ্যে ছিল কপিলা। মালার ছোট বোন। "সে বড় দুঃখের কাহিনী। সুখে ঘরকন্না করিতেছিল কপিলা, কি যে শনি ভর করিল তাহার কপালে, শীতের গোড়ায় স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া সে চলিয়া আসিল বাবার বাড়ি। রাগ করিয়া তাহার স্বামী শ্যামাদাস আবার বিবাহ করিয়াছে, কপিলাকে নেয় না।"

কপিলা যেন পুতুল নাচের ইতিকথার 'কুসুম'। যেমন হাসিখুশী, রঙ্গ রসিকতায় প্রাণ ভরপুর তেমনি মজবুত শরীর। কপিলা কুবেরের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য আনে। তার ঘরে লক্ষ্মী আসে। কুবেরের মেয়ে গোপীর পা ভেঙে যাওয়ায় তাকে নিয়ে কুবের আমিনবাড়ির হাসপাতালে যায়। সঙ্গে কপিলাও যায়। সে রাত্রে তাদের আর ফিরে আসা হয় না। কুবের কপিলা থেকে যায়। কিন্তু তাতে কপিলার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, ভয় নেই। কুবেরের কাছে সে এক রহস্যময়ী নারী।

একদিন শ্যামাদাস এসে কপিলাকে নিয়ে গেল। তার দ্বিতীয় স্ত্রী মারা গিয়েছিল। তাই কপিলার খুব প্রয়োজন। কুবেরের মন খারাপ হয়। জীবন উদাস উদাস লাগে। কিন্তু সে ক্ষণিকের। কুবের হোসেন মিয়ার নৌকায় কাজ নেয়। অনেক দূরে দূরে তাকে নৌকা নিয়ে যেতে হয়। এই পদ্মায় ভেসে যেতে কুবেরের ভাল লাগে।

"আকাশের রঙীন মেঘ ও ভাসমান পাখী, ভাঙন-ধরা তীরে শুভ্র কাশ ও শ্যামল তরু, নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, এ সব কিছুই যদি না থাকে, শুধু এই বিশাল একাভিমুখী জলস্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালবাসিবে সারাজীবন। মানবী প্রিয়ার যৌবন চলিয়া যায়, পদ্মা তো চির-যৌবনা। বৈচিত্র্য? কী তার প্রয়োজন? নূতন পৃথিবীতে কে খোঁজে, কে চায় পদ্মার রূপের পরিবর্তন, শুধু ভাসিয়া চলার অতিরিক্ত মোহ?"

হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপে হিন্দু-মুসলমানের এক সুন্দর মিলিত সমাজ গড়ে তুলতে চায়। সেজন্য সেখানে সে মোল্লা নিয়ে যেতে নারাজ। মুসলমানের মসজিদ দিলে হিন্দুর মন্দিরও দিতে হবে। এবং তারই ফলে আবার দেখা দিবে বিভেদ। হোসেন মিয়া তাতে রাজী নয়। তার স্বপ্নের এই ময়নাদ্বীপে দেবতার চেয়েও মানুষ হবে বড়। মানিক যেন এই হোসেন মিয়ার মধ্য দিয়ে এক নতুন জগতের কল্পনা করেছেন।

"কুবের সবিস্ময়ে হোসেনের প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে। কী প্রতিভা লোকটির, কী মনের জোর। যেখানে যত ভাঙাচোরা মানুষ পায় কুড়াইয়া জোড়াতালি দিয়া নিজের দ্বীপে রাজ্য স্থাপন করিতেছে—প্রজাবৃদ্ধির ব্যবস্থার দিকে তাহার সজাগ দৃষ্টি। হোসেনের উদ্দেশ্যই হয়তো তাই, আমিনুদ্দির মত জীবনযুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হতাশ ও নিরুৎসাহ মানুষগুলিকে আসলে তাহার প্রয়োজন নাই, ওরা তাহার দ্বীপটি নবীন নরনারীতে ভরিয়া দিবে, সে তাহাদেরই প্রতীক্ষা করিয়া আছে।"

জেলেপাড়ার জমিদার মেজকর্তাও চেয়েছিলেন এই গরীব মানুষগুলোর জীবনকে উন্নত করতে। কিন্তু তিনি তা পারেন নি। কারণ কেবলমাত্র সহানুভূতি দিয়ে উপরতলা থেকে নীচু তলার মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে শ্রেণীবৈষম্য থেকেই যায়। সেজন্য প্রয়োজন তাদের জীবনের শরিক হওয়া। মানিক এখানে ভদ্রলোকী বদান্যতার ব্যর্থতার কারণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন।

"জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে একদিন মেজবাবুর যাতায়াত ছিল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতির জ্ঞান বিতরণ করিয়া মাঝিদের জীবনগুলি উন্নততর করিবার ঝোঁকে তিনি আভিজাত্য ভুলিয়াছিলেন। শিক্ষা মাঝিরা পায় নাই, মাঝিদের বৌ ঝিয়া শুধু পাইয়াছিল দুর্নাম, গ্রামে গ্রামে খবর রটিয়াছিল যে কেতুপুরের মেজকর্তা জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে রমণী চাখিয়া বেড়াইতেছেন—জেলেপাড়া মেজবাবুর প্রণয়িনীর উপনিবেশ। আজ আর জেলেপাড়ার দিকে যাওয়ার সময় মেজবাবু

পান না। মাঝিদের কারো সঙ্গে দেখা হইলে খবর জিজ্ঞাসা করেন। সকালে দুপুরে জেলেপাড়ার ভাঙা কুটিরে গিয়া সময় যাপন করিবার সময়েও যে দুস্তর ব্যবধান মাঝিদের সঙ্গে মেজবাবুর থাকিয়া গিয়াছিল, কোন মন্ত্রে তাহা ঘুচিবার নয়। মাঝিরা বিব্রত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ভাল করিবার খেয়ালে বড়লোক কবে গরীবের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছে! মেজবাবু ত হোসেন মিয়া নন। দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অন্তহীন সরলতার সঙ্গে নীচুস্তরের চালাকি, অবিশ্বাস ও সন্দেহের সঙ্গে একান্ত নির্ভয়, অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মকে অনায়াসে বাছিয়া চলা— এসব যাদের জীবনে একাকার হইয়া আছে, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া যারা ভাবুক কবি, ডাঙায় যারা গরীব ছোটলোক, মেজবাবু কেন তাদের পাত্তা পাইবেন? ও কাজ হোসেন মিয়ার মত মানুষের পক্ষে সম্ভব, মেজবাবুর চেয়ে বেশী টাকা রোজগার করিয়াও যার মাঝিত্ব খসিয়া যায় নাই।"

এদিকে কপিলার জন্য মাঝে মাঝে কুবেরের মন উদাস হয়। মাঝে মাঝে কুবের যায় কপিলার সঙ্গে দেখা করতে। তারপর কুবেরের মেয়ে গোপীর বিয়েতে কপিলা আসে। সেই সব কাজ করে। বিয়ের পরেই কপিলার ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু সে রয়ে গেল। কদিন পর শ্যামাদাস এসে তাকে নিয়ে যাবে। দিন দুই পরে একদিন কুবের হোসেন মিয়ার একটা চালান আনতে গেল। ফিরতে অনেক রাত হোল। তার অন্য সঙ্গীরা ফিরল না। কিন্তু কুবেরের মন পড়েছিল বাড়ীতে। সেখানে কপিলা আছে। "আর কিছু চায় না কুবের কপিলার কাছে, গোপনে শুধু সুখ-দুঃখের কথা বলিবে। একটু রহস্য করিবে কপিলার সঙ্গে, বাঁশের কঞ্চির মত অবাধ্য ভঙ্গিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কপিলা টিটকারি দিবে তাকে, ধরিয়া নোয়াইয়া দিতে গেলে বসিয়া পড়িবে কাদায়, চাপা হাসিতে নির্জন নদীতীরে তুলিয়া দিবে রোমাঞ্চ।"

কেতুপুরের ঘাটে অত রাত্রে কপিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কুবের চিন্তিত হয়। কপিলা বলে, "আজ বিকালে হঠাৎ পুলিশ আসিয়া বাড়ি তল্লাশ করিয়াছে কুবেরের, ঢেঁকিঘরের পাট খড়ির বোঝার তলে পীতম মাঝির চুরি যাওয়া ঘটিটা পাওয়া গিয়াছে। বাড়ি ফিরিলেই চৌকিদার ধরিবে মাঝিকে।" কুবের কপিলাকে নিয়ে হোসেন মিয়ার কাছে যায়। হোসেন মিয়া সেই রাত্রেই কুবেরকে ময়নাদ্বীপে চলে যেতে বলে।

"কপিলা চুপি চুপি বলে, না গেলা মাঝি, জেল খাট।

কুবের বলে, হোসেন মিয়া দ্বীপে আমারে নিবই কপিলা। একবার জেল খাইটা পার পামুনা: ফিরা আবার জেল খাটাইব।"

কপিলাও কুবেরের সঙ্গে গেল।

কাহিনী রচনায়, পরিবেশ বর্ণনায়, চরিত্র রূপায়ণে পদ্মানদীর মাঝি পূর্বেকার গল্প উপন্যাস থেকে পরিণত। কিন্তু এখনো মানিকের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা এবং জীবনদর্শনের স্পষ্টতা পূর্ণরূপ লাভ করেনি। হোসেন মিয়া এবং তার ময়নাদ্বীপ পাঠকের নিকট অস্পষ্ট এবং রহস্যময়। ময়নাদ্বীপ যদি জেলে-মাঝিদের নতুন স্বর্গ হয়ে থাকে তাহলে সেখানে কুবেরকেও কৌশলে নিয়ে যেতে হয় কেন? হোসেন মিয়া তার মতলবের মতই শেষ পর্যন্ত পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য থেকে গিয়েছে। এক এক সময় তাকে মনে হয়েছে কামুক, শঠ আবার এক এক সময় মনে হয়েছে উদার, সাধারণের হিতৈষী। আবার এক সময় মনে হয়েছে হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপের মধ্যে মানুষের জন্য সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। সেখানে ধর্মের বিরোধ থাকবে না। শ্রেণী ভেদাভেদ থাকবে না। সবাই এক মানুষ জাতি—খেটে খাওয়া কৃষক হবে। সব মিলিয়ে হোসেন মিয়া এক অপূর্ব সৃষ্টি। কুবের-কপিলার সম্পর্কও রহস্যময়। কুবের তার স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে ফেলে কপিলাকে নিয়ে ময়নাদ্বীপে পাড়ি দিল। এখানেও আছে সেই জৈবিক ষড়যন্ত্রের কাহিনী। এককথায় পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে অজানা জীবনের পরিচয় এবং জেলে-মাঝিদের জীবনের বাস্তব কাহিনী বাঙলা সাহিত্যের পাঠককে এক নতুন জগতের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিল এবং এই কাহিনী রচনায় মুন্সীয়ানার জন্য মানিক সমাদৃত হলেন। পুতুল নাচের ইতিকথার শশী আর পদ্মানদীর মাঝির হোসেন মিয়ার মধ্যে মানিকেরই আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। শশীর মত মানিক গাওদিয়ার জীবনকে গভীরভাবে ভালবেসেছেন, তাদের সুখ দুঃখে গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছেন আর হোসেন মিয়ার মত ভালবেসেছেন পদ্মানদীর মাঝিদের। তাদের জন্য গড়তে চেয়েছেন এক শ্রেণীহীন নতুন দ্বীপ। মানিকের চিন্তায় তখনো তা স্পষ্টতা লাভ করেনি, রয়ে গেছে ইউটোপীয়ান পর্যায়ে। তবু সেই গ্রামের মানুষ অন্ধ সংস্কারের গণ্ডী ভেঙে নতুনের আকর্ষণে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এই প্রাণময়তাই সবচেয়ে বড় কথা। সিসিলি উপকূলস্থ চাষী-মাঝিদের কাহিনী অবলম্বনে বিখ্যাত ইতালীয়ান লেখক জিওভান্নি ভারনার ক্লাসিক উপন্যাস 'The House by the Medlar Tree' এবং 'পদ্মানদীর মাঝি' সমগোত্রীয় বলে ভবানী মুখোপাধ্যায় মনে করেন। (নতুন সাহিত্য, ১৩৬৩)

১৯৩৬ সালের শেষ দিকে প্রকাশিত হয় **'জীবনের জটিলতা।'** এখানিও মানিক-প্রতিভার প্রথম পর্বের রচনা। এখানে আছে মধ্যবিত্ত জীবনে প্রেমের জটিলতা, বেকারত্ব এবং দারিদ্র্যের জ্বালা।

উপন্যাসের কাহিনীটি হোল : বিমল ও প্রমীলা দু ভাই বোন। তাদের পাশের বাড়ীতে থাকে অধর আর তার স্ত্রী শান্তা। বিমল কবিতা লেখে। শান্তা তার প্রতি অনুরক্ত হয়। বিমল্ কিন্তু ভালবাসত লাবণ্যকে আর নগেন ভালবাসে প্রমীলাকে। ভালবাসার টানাপোড়নে লাবণ্য বিমলের জীবন থেকে সরে যায়। বিমলও শান্তার প্রতি অনুরক্ত হয়। নগেন লাবণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অধর হঠাৎ শান্তার প্রেমে অধীর হয়ে ওঠে। সে শান্তাকে তার প্রেমের পুতুলের মত ব্যবহার করে। শান্তা অস্থির হয়ে ওঠে। তার মন পড়ে আছে বিমলের দিকে। অধর ঠিক করে তারা এই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে। যাবার আগের দিন শান্তা বিমলের সঙ্গে দেখা করতে আসে। বিমল পাগলের মত শান্তাকে প্রেম নিবেদন করে। অধর তার বাড়ি থেকে সবই দেখতে পায়। শান্তা বাড়ি ফিরলে সে তাকে ছাতে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে লাফিয়ে পড়ে মরবার জন্য প্ররোচিত করে। শান্তা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে। মুমূর্ষু অবস্থায়ও সে বিমলের জন্য ছটফট করে। বিমলের জানালার পাশে তার জানালা। সেখানে এসে বসে। শেষে শান্তা মারা যায়। অধর প্রথম প্রথম মদ খেয়ে পড়ে থাকত। পরে বিমলদের বাড়ি এসে বিমলের বাবা প্রমথের সঙ্গে আলাপ করে দাবা খেলে। শেষে প্রমীলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। প্রমথ সানন্দে রাজী হয় কিন্তু বিমলের অমত। বিমল শান্তার রক্ত মাখা ব্যাণ্ডেজটাকে স্মৃতিরূপে বালিসের তলায় রেখে দেয়।

একদিন প্রমীলা শান্তার জন্য বিমলকে অভিযোগ করে। সে বলে, "যে কীর্তি তুমি করেছ, সে বিষয়ে তোমার থিয়োরি আর প্রিন্‌সিপল তোমারি থাক,—ও রকম করার অধিকার তোমার ছিল না। যে শিশু তাপ চায়, পুড়তে চায় না, অভিজ্ঞতার অভাবে তাপের খোঁজে সে যদি আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়তে চায়, তুমি তাকে সেখানে পৌঁছে দেবে ?" শান্তা বিমলের প্রেমের তাপ চেয়েছিল, তার প্রেমে পুড়তে চায় নি। সেজন্য বিমল যখন শান্তাকে তার বিছানায় শুয়ে ঘুমুতে বলল, তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে বলল তখন শান্তা বলেছিল, তা হয় না।

এদিকে নগেন লাবণ্যকে বিয়ে করল। অধরও প্রমীলাকে বিয়ে করতে চাইল। বিমল প্রমীলাকে বলে "আমাকে কষ্ট দেবার জন্য শান্তার মত তোকেও একটু একটু করে ভাঙবে।"

শান্তাকে যখন তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে বলেছিল তখন বিমল নগেনের সুপারিশে এক চাকুরী করত। কিন্তু পরে প্রমীলার প্রতি নগেনের ব্যবহার দেখে বিমল সেই চাকুরী ছেড়ে দিয়েছিল। অনেক ঘোরাঘুরি করে শেষে "একটা দৈনিকের অফিসে

প্রুফ দেখার কাজ যোগাড়" করল। মাহিনে মাত্র সাতাশ টাকা। বাড়ি ফিরে দেখে প্রমীলাও ছাদে উঠেছে। আলসের উপর ঝুঁকে সে নীচের দিকে তাকিয়ে ছিল। বিমল প্রমীলাকে ছাদ থেকে নীচে নামিয়ে আনে। তার সব ভার নেবে বলে আশ্বস্ত করে। প্রমীলা বিমলের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বিমল শান্তার ব্যাণ্ডেজটা নিয়ে গিয়ে উঠানের একপাশে পুড়িয়ে ফেলে।

এই উপন্যাসের নায়ক নায়িকাগুলো বিকারগ্রস্ত। ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাতে তারা বিপর্যস্ত। এই উপন্যাসে আছে সেই সংঘাতেরই কাহিনী। এই সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য এখনো মানিকবাবু পথ খুঁজে পাননি।

বিমলেরও সেই ধারণা, "তার মনে হইল, বাস্তবতা সম্বন্ধে এতদিন তার কোন ধারণা ছিল না। সে জানিত, তাদের বাড়ির সেই যুবতী ঝি, মোড়ের দোকানের পানওয়ালী, বাজারের মেছুনি আর গলির অন্ধকারে কোটরবাসিনী সেই হতভাগিনী এদের জীবনের বাস্তবতাই নিষ্কলুষ—তাতে খাদ নাই। শান্তার মত জীবন যাদের নিভৃত, সংযত ও নিরাপদ, জীবনে যাদের অবসর আছে, চিন্তা আছে, ভালবাসা দেওয়া নেওয়ার সুযোগ আছে তাদের বাস্তবতা অন্য রকম। মাটি হইতে তারা শুধু প্রাণপণে রস টানে না, বর্ণ নেয়, গন্ধ নেয়, কোমলতা নেয় এবং সেই বর্ণ, গন্ধ ও কোমলতা ফাঁকি নয়।

কিন্তু আজ সে ধারণা বদলাইবার দিন আসিয়াছে। শান্তার ফাঁকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। অবাস্তবতা চোখে ঠেকিয়া গিয়াছে। কবিতা দিয়া স্তব করিয়াছে মাটির প্রতিমাকে, সংযম দিয়া মর্যাদা রাখিয়াছে ছলনার।"

সেজন্য বিমল মৃতার স্মৃতিকে দগ্ধ করেছে। তাকে উপাসনা করা মিথ্যে বলে উপলব্ধি করেছে। তার অনেক কাজ। জীবন জটিল। এই জটিলতায় মানুষও অসুস্থ। তবু তাকে বাঁচতে হবে। এই জীবনজয়ী সাধনাই মানিকের সাধনা।

॥ ৩ ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবন শুরু হওয়ার দু বছরের মধ্যেই পাঁচখানা উপন্যাস ও দু খানা গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এর জন্যে তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সেজন্য তাঁর স্বাস্থ্যহানি হয় এবং তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত হন।

এ সময়েই প্রকাশিত হল তাঁর **অমৃতস্য পুত্রাঃ** (১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে) উপন্যাস। ধনাঢ্য ব্যক্তি বীরেশ্বর দ্বিতীয়বার বিয়ে করায় তার প্রথম স্ত্রী একমাত্র

পুত্র শ্যামলালকে নিয়ে অন্যত্র চলে যান। জীবনে তিনি আর স্বামীর মুখ দেখেন নি। পুত্র শ্যামলালও পিতার সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখে নি। এটুকু হচ্ছে গল্পের আগের গল্প। এ কাহিনী শুরু হয়েছে শ্যামলালের ছেলে অনুপমকে নিয়ে। অনুপম ভাল ছেলে। তার মা সাধনা পুত্রকে পিতার আদর্শে গড়ে তোলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে অনুপমের সঙ্গে তার দাদু অর্থাৎ শ্যামলালের পিতার সাক্ষাৎ ঘটে। পরিচয় পরে ঘনিষ্ঠতা লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত বীরেশ্বরের টাকা নিয়ে বিলেত যাওয়ার মনস্থ করে। আসলে অনুপম বীরেশ্বরের কাছে তার বাবার জন্য যে টাকা খরচ হোত সেই টাকাই দাবী করেছে। সে জানে সাধনা হয়ত তার মুখ দেখবে না। তবু নিজের ফিউচারের জন্য সে যাবেই। বীরেশ্বর অবশ্য বলল, "নিজের মাকে বাদ দিয়ে মানুষের ফিউচার কি রে বাঁদর? যার জন্য একদিন তোর বাবা আমার টাকার লোভ ত্যাগ করেছিল, সেই টাকার লোভে আজ তুই তোর মাকে ত্যাগ করছিস।" বীরেশ্বর তবু শেষ পর্যন্ত রাজী হল। সাধনা সব শুনে পরদিন একটি বাক্স সঙ্গে করে একা গ্রামে স্বামীর নির্জন পরিত্যক্ত ভিটায় চলে গেলেন। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাকে সারাজীবন লড়তে হয়েছে। স্বামীর অবর্তমানে তাঁর তেজ ও অভিমানকে নিজেই যেন লালন করে রেখেছেন এবং নিজ চরিত্রের বলিষ্ঠতাকে অব্যাহত রেখেছেন।

আদর্শবানের ছেলের আদর্শচ্যুতিই এ উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। উত্তর তিরিশ পর্বে বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনে মূল্য বোধ পরিবর্তিত হয়ে গেল। পূর্বেকার আদর্শ, কর্তব্য, ন্যায়নীতি মূল্যহীন বলে প্রতীত হোল। আমাদের দেশেও ধনতন্ত্র ক্রমেই জেঁকে বসছিল। এই ধনতন্ত্রের মূল কথাই হোল অর্থ এবং লাভ। অর্থই মানুষের সকল প্রকার সম্পর্ক এবং ন্যায় নীতির মান নির্ধারণ করে। অনুপম চরিত্রের মধ্যে এই অর্থ লোভে মূল্যবোধের বিপর্যয় মানিক সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন।

অনুপমের কাহিনী ছাড়াও এ উপন্যাসে যা উল্লেখযোগ্য তা হোল মানিকের বিদ্রুপাত্মক বক্র রচনাভঙ্গি। আর এখানেই মানিকের বিশিষ্টতা। বীরেশ্বরের বাড়ী ও তার লোকজনদের অনুপম যে বর্ণনা দিয়েছে তা এখানে উল্লেখ করতে পারি। বীরেশ্বরের "বড় তিনতলা বাড়ী, সামনে ছোট একটি বাগান। সহরের এই অংশ নির্জন ও গম্ভীর, কারণ, একটা বাড়ীও বাগান-বাড়ী নয়, পথের দু দিকের প্রায় সবগুলিই সামনে বাগানওয়ালা বাড়ী। বাড়ীগুলি যেমনই হোক, বাগানগুলি বেঁটে বেঁটে উদ্ভিদের সাজান গোছান দোকান, অল্প একটু জায়গায় যতগুলি সম্ভব অরণ্যানীর প্রতিনিধিকে ঠাঁই দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া হয়ত কারও চোখ জুড়ায়। জগতে যত অন্ধ আছে, চোখ থাকিতে অন্ধের সংখ্যা তো তার চেয়ে কম নয়।" এ বাড়িতে

অনুপমের সঙ্গে আলাপ হোল 'মাঝবয়সী বিধবা' সীতা পিসীমা, খুড়তুতো ভাই শঙ্করের মা, শঙ্করের বোন-মরা ভাগ্নে সতু এবং আরও অনেকের সঙ্গে। "একুশ বছর বয়সে যে ছেলে জন্ম লইয়াছিল, আর পঁচিশ বছর বয়সে যে ছেলের সঙ্গে তার হইয়াছিল বিচ্ছেদ, আর আজ তিয়াত্তর বছর বয়সে বীরেশ্বর সেই ছেলের ছেলের মুখে পুত্র শোকের সংবাদ পেলেন। সকলেই দুঃখ করছিল কিন্তু অনুপমের মনে হোল, "এই প্রকাণ্ড অট্টালিকায় কত দামী আসবাবপত্রে সাজানো ঘরে বসিয়া তার বাবার মরণের খবরে ওদের কাতর হইবার অধিকার কি আছে, কেবল ওই ওর্গ্যানটা বেচিয়া সেই টাকায় চিকিৎসা হইলে তার বাবার যখন না মরিবার সম্ভাবনা ছিল?" সতু এ বাড়ীর যেন প্রতিবাদ। 'খাপছাড়া বিষাদ' দেখে সে হেসে ফেলল। ঘণ্টা তিনেক এ বাড়িতে কাটিয়ে অনুপমের মনে হোল, "এ বাড়ীতে অকারণে মানুষের মনে বড় কষ্ট। কোন অভাব না থাকায় সকলের স্বভাব গিয়াছে বিগড়াইয়া, জীবনে রস-কস যা আছে সব শক্ত, জমজমাট, যেমন-তেমন উত্তাপে গলিয়া জীবনকে রসাল করিতে চায় না।"

বীরেশ্বরের আরেক পুত্র রামলালের ছেলে শঙ্কর অতি মাত্রায় ভাব প্রবণ বিকারগ্রস্ত। সে বড় লোকের ছেলে। অনুপমের বাড়ী এসে সে অস্বস্তি বোধ করে। কারণ "গরীবের অন্তঃপুরে শঙ্কর বিদেশী, বেমানান। কথা ও ভদ্রতার আদান প্রদানে সেখানে নিজেও সে হোঁচট খায় বারবার, অন্যান্য সকলকেও হোঁচট খাওয়ায়। গরীব মানুষকে বড় ভয় করে শঙ্কর। গরীব মানুষের অন্দরমহলে সে জেলখানার কয়েদী, আধঘণ্টা সেখানে থাকিলে তার নিজেকে বাড়ীর ছেলে বুড়ো সকলের ঘৃণা-মেশানো কৃপার পাত্র বলিয়া মনে হইতে থাকে।" এই শঙ্কর তরঙ্গের প্রেমে প্রতিহত হয়ে ভাবের জলে হাত ধুয়ে ফেলে, জুয়াচোর নীলাম্বরের সভায় প্রলাপের মত বক্তৃতা দেয়, চৌরঙ্গীর হোটেলে গিয়ে মদ খায়, আবার তাড়ির দোকানের সামনে পিকেটিং করে একুশ দিনের জন্য জেলে যায়।

তরঙ্গ এ উপন্যাসে এক রহস্যময়ী নারী। সে অনেক বড় বড় কথা বলে অথচ তার কিছুই স্পষ্ট নয়। সে এক ব্যর্থ প্রতিভা, সংসারের খাপ ছাড়া নারী। সংসারের নিয়ম তার পক্ষে অচল। লম্বা-চওড়া অ-বাঙালী মেয়ের মত তার শরীর। পরণে সাদা থান। সে সাধনাকে বলছিল, "এখন তো উনিশ বছর বয়স তার, চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত ঘরের কোনে সে দেহ মনকে বশ করিবার শক্তি অর্জনের জন্য তপস্যা করিবে, ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ী বাড়ী শুধু অন্তঃপুরে ঘুরিয়া মেয়েদের বাঁচিয়া থাকিতে শিখাইবে, আর সেই সঙ্গে নিজেও শিখিয়া লইবে কি করিয়া অজানা অচেনা

মেয়েদের নানা কথা শিখাইতে হয়, তারপর আরম্ভ করিবে আসল কাজ—প্রবল এবং প্রকাশ্য আন্দোলন, দেশকে যা ভাষাইয়া লইয়া যাইবে, ঘরে ঘরে হৈ চৈ বাধাইয়া দিবে—" শঙ্কর এবং অনুপম দু জনের প্রেমকেই সে অস্বীকার করে না অথচ প্রশ্রয়ও দেয় না। তারপর একদিন তরঙ্গ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বে সে অনুপমের নামে এক মস্ত চিঠি লিখে রেখে গিয়েছে। তার চিঠিটা যেন প্রলাপ এবং প্রহেলিকা। প্রেমের জন্য সে আত্মহত্যা করে নি। প্রেমকে সে বুকভরা ঘেন্না করত। সে লিখেছে, "কেবল এটুকু বুঝতে পারছি, অনেক যত্নে যে তাসের ঘর রচনা করেছিলাম, আমার নিজের নিঃশ্বাসে হুড়মুড় করে সে ঘর ভেঙে গিয়েছে। আমি এমন সৃষ্টিছাড়া কাল-নাগিনী যে, নিজের লেজ কামড়ে নিজের মাথায় বিষে নিজেই মরে গেলাম।" তার আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে তরঙ্গ লিখেছে, "জগতের সমস্ত মানুষের ভাগ্য পরস্পরের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত, জগতের কোথাও একটি মাত্র মানুষ যদি না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করে সেটাকে আমরা বিভিন্ন স্বতন্ত্র ঘটনা বলে গ্রহণ করতে পারি না, তার আত্মহত্যার কারণ সমগ্র জগতে নানা রকম রূপ নিয়ে ছড়িয়ে থাকবেই থাকবে।...এ কথাটা সত্য যে তোমাদের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে বেঁচে থাকার মত শিক্ষা আমাকে কেউ দেয় নি। আমাকে মরতেই হবে।... সকলের জীবনেই আজ অন্যায় বেশী, অভাব বেশী, অপরাধ বেশী, অনাচার বেশী, বিশৃঙ্খলা বেশী। মানুষ যদি সজ্ঞানে জীবনে এ সব সঞ্চয় করত, তারও একটা মানে বোঝা যেত, না জেনে না বুঝে মানুষ নিজের জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, মহা আড়ম্বরের সঙ্গে করছে নিজের সর্বনাশ। অন্ধ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে অন্ধকে। যারা এ রকম করছে তারাই আবার দশজনকে উপদেশ দিচ্ছে, এই কর, ওই কর, তাই কর।"

আসলে তরঙ্গ ভাববাদ এবং বাস্তববাদের সংঘাতে বিপর্যস্ত। অন্ধের মত এরা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানিকবাবু নিজেও এখন পর্যন্ত কোন বলিষ্ঠ পথের সন্ধান পান নি। মানুষের মুক্তির পথ তিনি জানেন না সেজন্য অন্ধের মত কেবল হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁর চিন্তায় আছে অস্পষ্টতা, অসংলগ্নতা।

তাঁর চিন্তায় অসংলগ্নতার পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসের লিখন-শৈলীর মধ্যেও। এ উপন্যাসের ৬, ৪২, ৪৬, ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠায় বহু জায়গায় শঙ্করের পরিবর্তে জহর লেখা আছে। আবার একই পৃষ্ঠায় শঙ্কর এবং জহর মুদ্রিত আছে। মানিকের শেষ জীবনের অনেক উপন্যাসেও এ রকম অসংগতি দেখা যায়। এগুলোকে নিছক

মুদ্রণ প্রমাদ বলা সঙ্গত হইবে না। সম্ভবত অতিরিক্ত সুরাপান এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি সংগতি রক্ষা করতে পারেন নি।

॥ ৪ ॥

১৯৩৯ সালে মানিকের বঙ্গশ্রীর চাকরি চলে যায়। বঙ্গশ্রী পত্রিকা এবং বঙ্গশ্রী কটন মিলসের মালিক সচ্চিদানন্দ বাবুর সঙ্গে মতান্তর হওয়াও এই চাকুরী যাওয়ার অন্যতম কারণ। 'ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্যা ও তাহার প্রতিকারের উপায়' এই শিরোনামে দীর্ঘকাল ধরে সচ্চিদানন্দ বাবু বঙ্গশ্রী পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করেন। এ ছাড়াও তার লেখার বাতিক ছিল।

'বঙ্গশ্রীর চাকরী ছাড়বার পর মানিক ঐ পত্রিকার মালিকের অনুরসণে এক অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি করলেন। তার কাহিনীই দুই খণ্ডে 'সহরতলী' উপন্যাসে বহিপ্র্কাশ লাভ করল। এই উপন্যাসের সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী মানিকের এক অনবদ্য সৃষ্টি। এই উপন্যাসেই মানিক প্রথম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় জীবনের সমস্যাকে বিচার করতে চেয়েছেন। এখান থেকেই যেন তিনি বুঝতে পারলেন যৌনবৃত্তিই মানুষের নিয়তি নয়। আবিষ্কার করলেন যৌনবৃত্তির চেয়েও শক্তিশালী মানুষের অর্থনৈতিক জীবন। প্রজনন প্রবৃত্তির চেয়েও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি অনেক বেশী প্রখর। যৌন প্রবৃত্তিকে মনে হয়েছিল অন্ধকার গুহাবাসী এক রহস্যময় শক্তি। মানুষ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কিন্তু অর্থনৈতিক জীবন মানুষের আয়ত্তাধীন। সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের দ্বারা তাকে নিরূপিত করা সম্ভব। সহরতলী উপন্যাসের পর মানিকের এই বোধ আরও স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সহরতলী উপন্যাসটি দুই পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে এবং দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। মানিকের বহু গল্প উপন্যাস সহরতলী মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত। সহর থেকে সহরতলীর প্রতি মানিকের আকর্ষণ বেশী। তার প্রথম উপন্যাস জননীও সহরতলীর মানুষেরই জীবন-কাহিনী।

সহর থেকে সহরতলীর প্রতি মানিকের আকর্ষণের কারণ হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে সহরতলী উপন্যাসের জ্যোতির্ময়ের উপলব্ধির মধ্যে :

"সহরের চেয়েও এখানকার সহরতলীর জীবনের গতি তার যেন মনে হয় অনেক বেশী ঊর্ধ্বশ্বাসী। কাছাকাছি অনেকগুলি কল কারখানা থাকার জন্য নয় কেবল,

কাছাকাছি অনেকগুলি কলের চাকা ঘুরিতেছে বলিয়াই মানুষ জীবনের গতি বাড়ায় না, কলের চাকার গতিবেগ হাজার মাইল দূরে মানুষের জীবনেও সঞ্চারিত হইতে জানে। দুপুরবেলা বড় রাস্তায় গাড়ীগুলি যেভাবে পরস্পরের গতিবেগ সংযত করে, থামিয়া থামিয়া যেভাবে অগ্রসর হয় শ্লথ গতিতে, তাতে বরং মনে হওয়ার কথা জীবনের গতি এখানে কল-কারখানার কল্যাণেই বুঝি মন্থর। কিন্তু জীবনের গতিতো চলাফেরা ছুটাছুটি নয়, বিমানে যে বোঁ করিয়া পৃথিবীটা পাক দিয়া আসিল জীবন হয়তো তার অলস ও শান্ত, ছোট একটি ডিঙ্গি ভাসাইয়া গা এলাইয়া পৃথিবীটা পাক দিতে জীবনের বেশীর ভাগ ব্যয় হইয়া গেলেও হয়তো তার কিছু আসিয়া যায় না। সহরের চেয়ে সহরতলীর মানুষের জীবনীশক্তি বেশী, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের উগ্রতা বেশী, অভাবও বেশী। বাস্তব অভাব, পার্থিব অভাব, রক্ত-মাংসের মানুষের জীবনকে যে অভাব করিয়া দেয় একেবারে অভিশপ্ত। অভাবের তাড়নায় সহরের চেয়ে সহরতলীর সমবেত জীবনীশক্তি অনেক বেশী তাড়াতাড়ি নিজেকে ক্ষয় করিয়া ফেলে। নূতন জীবন সে ক্ষয়ের পূরণ করিয়া চলে ক্রমাগত, সে নূতন জীবন এখানে যত না সৃষ্টি হয় তার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণে আসে বাহির হইতে, নিকট ও দূর হইতে।"

মানিক নিজেও থাকতেন সহরতলীতে। তাঁর সহরবাসের জীবন সমস্তটাই কেটেছিল সহরতলীতে। কখনো কোলকাতার দক্ষিণে আবার কখনো উত্তরে। এই সহরতলীর জীবন ও মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর সম্পর্ক। বর্তমানে কোলকাতার সহরতলীর যে অবস্থা তিরিশ বছর আগে তা ছিল না। সহরতলীর বড় রাস্তায় বিদ্যুতের আলো জ্বলত অনেকটা দূরে দূরে। ছোট গলিতে ছিল আলকাতরা মাখানো কাঠের থামের মাথায় টিমটিমে তেলের বাতি। এই সহরতলীর পথের দু পাশে স্বচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের, স্বাচ্ছন্দ্য ও দুর্ভোগের, রুচি ও অরুচির, সুন্দর ও কুৎসিতের, পরিচ্ছন্নতা ও নোংরামির, সম্মুখ ও পিছনের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কত যে আশ্চর্য ও গলাগলি ভাব। আর কিছু দূরে আছে বড় বড় কল কারখানা।

সহরতলী উপন্যাসে আছে এই সহরতলীর মানুষেরই কাহিনী। এখানে একদিকে আছে পুঁজিপতি তুখোড় মিল মালিক আর অন্যদিকে আছে শ্রমসম্বল শ্রমিক সাধারণ আর তার মধ্যে আছে বস্তী অঞ্চলের প্রাণস্বরূপিণী শ্রমিক হিতৈষিণী এক অদ্ভুত নারী। এই পুঁজিপতি মালিক কি করে সেই শ্রমিক নেত্রীকে শ্রমিকদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল এবং কি করে এই মিল মালিকের চক্রান্তে তার বস্তীর

কুঁড়ে পর্যন্ত রাস্তার নামে গ্রাস করে তাকে উচ্ছেদ করে দিল তারই এক অপরূপ কাহিনী এই সহরতলী উপন্যাস।

এই উপন্যাসের একদিকে আছে সত্যপ্রিয় মিলস্ এবং আরও কতকগুলি ব্যবসার মালিক সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী। সহরতলীর পাশে এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়িতে তিনি বাস করেন। তার চাল চলন সবই আলাদা। সবই যেন হিসেব করে একেবারে মাপা। তিনি দেশপ্রেমিক। পাঁচশ টাকা চাঁদা দিয়ে পাড়ার ছেলেদের 'মডার্ণ ক্লাব ও লাইব্রেরী'র প্রতিষ্ঠা দিবসে সভাপতি হন। স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাতে আছে দেশের জন্য হা হুতাশ, আর ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া না করে দেশের প্রকৃত উন্নতি করার কথা।' সত্যপ্রিয় কর্মচারীদের ফাঁকি ধরতে পারলেও রাগেন না। তাদের সঙ্গে হেসে কথা বলেন। কিন্তু কর্মচারীরা জানে তা কতদূর গড়াবে। হয়ত সপ্তাহ কেটে যাবে, মাস কেটে যাবে, লোকেরা সব ভুলে যাবে। হঠাৎ দেখা যাবে কয়েকটা পরিবর্তন, কয়েকটা নতুন নিয়ম বিনা সমারোহে চালু হয়ে যাবে। তার মতলব সাধারণের বোধগম্য নয়। তার ব্যবহারে কোন খুঁত নেই। খুবই মিহি এবং ভদ্র। কিন্তু তার পরিণাম সুদূর প্রসারী। সত্যপ্রিয়র চরিত্রটি কেমন তা সুন্দর প্রকাশ লাভ করেছে বড়বাজারের এক বড় ব্যবসায়ীর কথায়। সত্যপ্রিয়র মেয়ের বিয়েতে বহু সাদা ও কালো রাজকর্মচারী এবং বহু ব্যবসায়ী নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে। সত্যপ্রিয় যখন রাজকর্মচারীদের বিয়ের আসর দেখাচ্ছিল তখন ব্যবসায়ীটি তার প্রচারসচিব জ্যোতির্ময়কে বলল, "দেখিয়েছেন জ্যোতীরমোয়বাবু! মেয়ের সাদি দিতে দিতে কেমোন নিজের কাম বাগিয়ে নিয়েতেছেন। কি চীজ আছেন আপনার সত্যবাবু! কি বলিয়েতেছেন জনিসন সাহেবকে জানেন? হামি জানি! বলিয়েতেছেন—সায়েব, ইয়ংম্যান স্বদেশী করবে আর তোমরা তাদের জেলে ভেজবে, তোমরা তাদের জেলে ভেজবে আর ইয়ংম্যান স্বদেশী করবে—হামারা বাত শুনিয়ে, জেলে কখুনো দিও না, একঠো নরম-গরম মেয়ের সাথে জবরদস্ত, সাদি দিয়ে দাও, স্বদেশী না করে ইয়ংম্যান তখন সে তিশ রূপেয়ার কেরাণী বনে যাবে।" (পৃ ১৭১)

সত্যপ্রিয় কী রকম কথা বলেন ব্যবসায়ীটি তার সুন্দর নমুনা দিয়েছেন। "সত্যবাবুর জবাব না শুনেন?—হাসিয়ে হাসিয়ে উনি কোতোবার বলছেন, সাধুকে দারু পিলাবে তো মন্দিরমে ঘটা করে পূজা দিয়ে চরণামৃত বোলকে পিলায়ে দেও। দশ রোজ পিলায়ে দিলে সাধু মাতাল হয়ে যাবে, চোরকে সাধু বানাবেতো আসলি সাধু বনে' থাকলে চুরির কতো সুবিস্তা সমঝিয়ে দিয়ে দশ রোজ ধরে সাধু বানাও—চোর আর চুরি না করবে।" এমনি লোক হলেন সত্যবাবু।

আর তার বিপরীত চরিত্র হচ্ছে যশোদা। লোকে ডাকে চাঁদের মা। তার শরীর খুব মজবুত। "সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের গোটা কয়েক পরম স্বাস্থ্যবতী যুবতীকে অনায়াসে গড়া চলিত এতখানি মাল-মশলা দিয়া ভগবান তাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" যশোদার বাড়ীতে বিশ বাইশজন ভাড়াটে এবং পোষ্য আছে। তাদের জন্য সে একাই রান্না করে। সকলকে পরমাত্মীয়ের মত দেখাশুনা করে। ভাড়াটের মধ্যে যাদের দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার জন্য যশোদা খুব কড়াকড়ি করে কিন্তু যাদের কাজ গিয়েছে, কাজের খোঁজে এসে যারা কাজ পায় না, তাদের সে বিনা পয়সায়ও থাকতে দেয়, খেতে পরতে দেয়, এতটুকু অবহেলা করে না, চেষ্টা করে কাজও জুটিয়ে দেয়। যশোদা সত্যই একটু খাপছাড়া। তার রীতিনীতি চালচলন অনন্য সাধারণ। সে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। "কারও কাছে তার কোন প্রত্যাশা নাই, নিন্দা প্রশংসা সে গ্রাহ্য করে না, কারও দরদের জন্য কাঁদিয়াও মরে না। বিপদে আপদে তারই কাছে মানুষ উপকার পায়, পুরুষের কাছে যে কাজ পাওয়া কঠিন যশোদার কাছে তাই পাওয়া যায়। লম্বা-চওড়া শক্ত-সমর্থ শরীরটাতে তার নারীসুলভ লাবণ্য ও কোমলতার চিরদিন এমন অভাব যে, বয়স যখন আরও কম ছিল তখনও কোনও পুরুষের সঙ্গে তার বৈধ বা অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক থাকিতে পারে একথাটা মনে আনিতেও লোকের কেমন সঙ্কোচ বোধ হইত, মনে হইত, না, তা হয় না।"

যশোদা তার বাড়িতে ভদ্র গৃহস্থ ভাড়াটে রাখত। কিন্তু তারপর সব বাছ-বিচার তুলে দিয়েছে। তার কাছে "ভদ্রলোকেরা নাকি বড় বেশী ছোটলোক, যারা পুরো ভদ্রলোকও নয় খাঁটি ছোটলোকও নয়, তারা নাকি একটু অপদার্থ জীব। তার চেয়ে কুলি-মজুর ভাল।", শক্ত সমর্থ যে লোক মুখ বুজে সব সহ্য করে তার হয়ে কিছু করতে যশোদার ভাল লাগে না। যশোদা নিয়ম করে দিয়েছিল তার হোটেলে বাস করলে মদ খাওয়া চলবে না। অবশ্য তার নিয়মটা কঠোর নয়। কারণ সে জানে, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এরা বাস করে তার মধ্যে নিয়ম মেনে চলা শক্ত। কি দরকার সে নিয়ম মানিয়া চলিবার জীবন যাদের সবদিক দিয়া ফাঁকিতে ভরা? কেবল একটা বিষয়ে সাধু হইলেই কি দিনগুলি ওদের সুখে আর আরামে ভরিয়া উঠিবে। অতিরিক্ত অবিশ্রাম খাটুনি, পেট ভরা খাদ্য আর বিরাম ও আরামের অভাব, সমস্তই যাদের বিষের সমান, দু-এক চুমুক বাড়তি বিষ পান করিলে তাদের কি আসিয়া যায়?" সেজন্য তার নিয়ম কেউ ভাঙলে যশোদা তাদের ভৎ‍র্সনা করে কিন্তু হোটেল থেকে বের করে দেয় না।

'প্রকৃত পক্ষে যশোদা শ্রমিকদের জীবনের সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িত। অনেকেই তার হোটেলে থাকে। যারা থাকে না তারাও তাকে তাদের নেত্রী বলে জানে। কারখানা মালিক এবং তার ম্যানেজার নানা ছুতোয় মিথ্যা অভিযোগ এনে শ্রমিক নেতাদের বরখাস্ত করে দেয়। স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। সেই ধর্মঘটকে সফল করার বুদ্ধি এবং পরামর্শও দেয় যশোদা। মালিকরাও জানে যশোদাই ধর্মঘটের মূল। সেজন্য তার উপস্থিতিতেই শ্রমিকদের সঙ্গে মীমাংসা করে নেয়।

যশোদার আপন বলতে ছিল একমাত্র ভাই নন্দ। স্বভাব চরিত্রে নন্দ যশোদার বিপরীত। কঠোর বাস্তবের মধ্যে মানুষ হয়েও সে শক্ত হতে পারল না। সে বেশ ভাবপ্রবণ। শিশু ভিখারী আর কিশোরী মেয়ের মত ভয়, লজ্জা, অভিমান, বিনয়, নির্ভরশীলতা, সংকোচ, স্বপ্ন তার খুব আছে। সে চমৎকার কীর্তন গায়। বড় আসরে অনেকক্ষণ জমজমাট কীর্তন করে আসবার পর দু তিন দিন নন্দ হাসে না, কথা বলে না, খাইতে চায় না, নড়াচড়া করতে পারে না, প্রাণহীন জড়পিণ্ডের মত শুয়ে বসে থাকে। যশোদা নন্দর ভাবপ্রবণতা আর অবরুদ্ধ উত্তেজনায় ভয় পায়। যশোদার মনে হয়, "একি অপদার্থ একটা জন্মিয়াছিল তার ভাই হইয়া? এর চেয়ে কোকেনখোর আফিমখোরেরাও ভাল, তারা নিজেদেরই সর্বনাশ করে, এ ছোঁড়া আরও কত ছেলেমেয়েকে গোল্লায় পাঠাইতেছে তার হিসাব নাই।"

কীর্তন শোনার নাম করে নন্দকে চাকরী দিয়ে সত্যপ্রিয় ধীরে ধীরে যশোদাকে শ্রমিকদের নিকট অবিশ্বাসিনী করে তুলল। যশোদার সহজ বুদ্ধি সত্যপ্রিয়র কুটিলতার প্যাঁচ ধরতে পারে না। সে মানুষ বুঝে নিজের বেশ পরিবর্তন করে, আচার আচরণ বদলে ফেলতে পারে। যশোদা স্বীকার করে, 'এমন তুখোড় লোক সে কখনো দেখেনি।' প্রয়োজনবোধে সে যশোদার খাতির করে, সত্যপ্রিয়র ম্যানেজার কাশীবাবু তাকে ইতর রসিকতা করায় যশোদা কাশীবাবুর মুখটা রাস্তায় জোরে জোরে ঘষে দেয় এবং তার ফলে তাকে হাজতে যেতে হয়। কিন্তু সত্যপ্রিয়ই তাকে ছাড়িয়ে আনে এবং পুলিশ ডাকার জন্য তার সামনেই ম্যানেজারকে বকুনি দেয়। সত্যপ্রিয়র প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে যশোদা মিলের ধর্মঘট তিন মাস পিছিয়ে দেয়। এমনি করে একের পর এক কৌশলে সে যশোদাকে শ্রমিকদের কাছে অপ্রিয় করে তুলল। তারপর শ্রমিকনেতাদের একের পর এক বরখাস্ত করল। মিলে চাকরি যাওয়ার মরশুম পড়ে গেল। তবু মিলে কোন গোলমাল হল না। শ্রমিকরা সকলে যশোদাকে শত্রু মনে করতে লাগল। যশোদাও অনেক কষ্টে ব্যাপার বুঝতে পারল, "খুবই সহজ একটা চাল দিয়া যশোদাকে সত্যপ্রিয় কুপোকাৎ

করিয়াছে। প্রথমে রটিয়াছে এই যে যশোদা ভিড়িয়াছে উপরওয়ালাদের সঙ্গে, যশোদা বিশ্বাসঘাতিনী। প্রমাণ? আগে একবার ধর্মঘট থামাইয়াছিল কে সকলের ক্ষতি করিয়া? গতবার ধর্মঘট থামাইয়াছে কে সকলের ক্ষতি করিয়া? সত্যপ্রিয়র সঙ্গে, কাশীবাবুর সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা কিসের যশোদার, দুবেলা সত্যপ্রিয়র মোটর চাপিয়া কেন সে সত্যপ্রিয়র বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখিতে যায়? নন্দর মত একটা ছোঁড়া যে মিলে অমন চাকরী পাইল, ওটা কিসের পুরস্কার? এক একটা ছুতা দিয়া একে একে ধর্মঘটের সাত আটজন পাণ্ডাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল এটা কার পরামর্শ?"

কাশীবাবু নিজে বলেছেন যশোদার পরামর্শেই এসব হয়েছে। যশোদা সব ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলবার জন্য সকলকে ডাকল। কিন্তু কেউ এল না। তাকে আর কেউ বিশ্বাস করে না। শ্রমিক প্রতিষ্ঠান দুটি থেকেও যশোদা সম্পর্কে সাবধানে থাকবার জন্য সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। যশোদা নন্দকে চাকরীতে যেতে নিষেধ করল। নন্দ কিন্তু তা শুনল না। যশোদা বলে, সে যদি নন্দকে তাড়িয়ে দেয় তাহলে সকলে তাকে বিশ্বাস করবে কি না। কিন্তু কেউ উত্তর দেয় না। সকলে তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। তার বাড়ী থেকে একে একে সব শ্রমিকেরা পালিয়ে যায়। সত্যপ্রিয়র মিল ছাড়াও যারা ছিল তারাও চলে গেল। কাশীবাবু তার শ্রমিকদের আগাম টাকা দিয়েছেন। তা দিয়ে তারা যশোদার পাওনা মিটিয়ে দেয়। যশোদার দুটি বাড়ীতে রইল মাত্র চারজন। সুধীর ছাড়া অপর সকলে বেকার। সুধীরেরও যশোদার ধার শোধ করার ক্ষমতা নেই। যশোদা আগে তিনটি উনানে আঁচ দিত। এখন একটি উনানেরও প্রয়োজন নেই। অথচ ছোট একটি উনান করার উৎসাহ বা শক্তিও তার নেই।

এখানেই প্রথম পর্বের শেষ। সহরতলী দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। এই পর্বে সহরতলীর রূপান্তর বড্ড তাড়াতাড়ি ঘটে। চারিদিকে হু হু করে বড় বড় বাড়ী উঠছে। জমির দামও এত বেড়ে গিয়েছে যে বড়লোক ছাড়া ও অঞ্চলে বাড়ী করে থাকা সম্ভব নয়। অনেক বস্তীর চিহ্নও লোপ পেয়েছে। যশোদার বাড়ীর তিনদিকে নতুন বাড়ী উঠেছে। যশোদার বাড়ি বিক্রী করবার জন্যই তাকে অনেক খোসামোদ করা হচ্ছে। সকলে বাড়ী বিক্রী করে চলে যায় যশোদা কিন্তু বাড়ি বিক্রী করে না। কারণ, সত্যপ্রিয় এ অঞ্চলের বাড়ীগুলো স্বনামে বেনামে কিনে নিয়েছে। যে সত্যপ্রিয় তার এত ক্ষতি করেছে তার কাছে সে বাড়ি বিক্রী করতে পারবে না। যশোদা বাড়ী বেচবেনা শুনে সবচেয়ে গোলমাল করে তার সই কুমুদিনী এবং তার স্বামী রাজেন।

একদিন রাজেন যশোদার বাড়ীতে একজোড়া ভাড়াটে নিয়ে আসে। তারা অজিত আর সুব্রতা। অজিত বিনাপণে সুব্রতাকে বিয়ে করায় এবং কুলি-মজুরের কাজ নেওয়ায় অজিতের দাদা তাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। যশোদা একটা অবলম্বন পায়! সে খরচ নিয়ে নিজেই সকলের রান্নাবান্না করে।

যশোদার ভদ্রলোকদের সম্বন্ধে ধারণা খুবই খারাপ। সে বলে "ভদ্রলোক কাকে বলে জানো না? চাষা মজুরকে যারা ঘেন্না করে, বড়লোকের পা চাটে, ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়, আধপেটা খেয়ে দামী দামী জামা কাপড় পরে, আরাম চেয়ে চেয়ে ব্যারামে ভোগে, খালি নিজের সুখ খোঁজে, মান অপমান বোধটা থাকে টনটনে কিন্তু যত বড় অপমান হোক দিব্যি সয়ে যায়, কিছু না জেনে সবজান্তা হয়"—আর সত্যপ্রিয়কে সে মানুষ বলেই মনে করে না। যশোদা বলে, "ও হল মানুষের রূপ ধরা দৈত্য—কিংবা দানোয় পাওয়া মানুষ।" তবু যশোদা রাজেনকে আরো ভদ্র ভাড়াটে এনে দিতে বলে।

সুব্রতা খুব মিশুক। পাড়ার কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছে। কয়েক-দিনের মধ্যেই দুপুরবেলায় তাদের বাড়ীতে মেয়েদের ভীড় লেগে যায়। একটা মহিলা সঙ্ঘ গড়ে ওঠে। সুব্রতার ঘরে যায় অল্পবয়সী মেয়েরা আর যশোদার ঘরে বড়রা। এরা সকলেই মধ্যবিত্ত ভদ্র-পরিবারের গিন্নি। যশোদার সামনে এসে এরা নিজেদের শ্যাওলা ধরা জীবন মেলে ধরে। এদের নিজেদের মধ্যে প্রায়ই বনিবনা থাকে না। এরা বড্ড পরশ্রীকাতর, স্বার্থান্ধ। /এরা সকলেই যেন বিকারগ্রস্ত। সেজন্য বনলতা মনে করে তার মেয়ে খুকুই ভাল গান গায়। অনুরূপার মেয়ে অলকার গলা মিষ্টি হলেও তার মনে হয় প্যানপ্যানানি। যশোদা জানে, "এ ধরণের বিকার শুধু এদের মধ্যেই দেখা যায়, কুলি-মজুরদের বৌ-রা এ হিষ্টিরিয়ার ধার ধারেনা। অভাবের চাপে আর ঝাঁঝালো নিষ্ঠুর বাস্তবতার তাপে তারা শুকাইয়া যায়। এদের মত পচিতে শুরু করে না।"

শ্রমিকেরা তার বাড়ি থেকে চলে গেলেও যশোদার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক একেবারে চে যায় নি। চাঁদ মারা যাওয়ার পর যখন তার জন্য যশোদার মনটা কেবল হুহু রত তখন যশোদা এই কতগুলো বয়স্ক শ্রমিক শিশুকে নিয়ে তার শোক কতকটা লছিল। কিন্তু সত্যপ্রিয়র কারসাজিতে আর তারা যশোদাকে বিশ্বাস করেনা। ী তাকে আরও বেশী কাবু করে দিয়েছে। সেজন্য পরে শ্রমিকদের কেউ কেউ ন তার কাছে এসেছে তাদেরও সে তাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য অন্যদিক দিয়ে বার কুলি মজুরদের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়ে গেল। রাজেন একদিন শ্রমিকনেতা

বিধুবাবুকে নিয়ে এল। তার নিমন্ত্রণে যশোদা এক শ্রমিক সমিতির সভায় যোগ দেয়। তাদের সকল বক্তব্য যশোদা স্পষ্ট বুঝতে পারে না। কারণ, "এরা সমস্ত জগতের শ্রমিকদের অবস্থা জানে, শ্রমিক সমস্যা এরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়াছে, এদের সমস্ত তর্কবিতর্ক পরিষ্কার বুঝিবার মত জ্ঞান সে কোথায় পাইবে? তার মত ঠেক্‌নো দিয়া দশ বিশজন শ্রমিককে কোন রকমে খাড়া রাখিবার ব্রত এদের নয়, ধনিকতন্ত্রের চোরাবালির গ্রাস হইতে সমস্ত শ্রমিককে বাঁচাইয়া শক্ত মাটিতে তাদের দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা ওদের কাজ।

সে কাজের বিরাটত্ব কল্পনা করিয়া যশোদার মাথা ঘুরিয়া যায়। কুলি-মজুরের সঙ্গে সে মিশিয়াছিল, তাদের কয়েকজনকে ভালবাসিয়াছিল, একটা শ্রেণী হিসাবে তাদের কথা কখনো ভাবিয়া ছাখে নাই। আজ সকলের আলোচনা হইতে শ্রমিক সমস্যার স্বরূপ তার কাছে যতটুকু প্রকট হইয়া উঠিল তাতেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।"

সত্যপ্রিয়র ছেলে বা জামাই কেউ তার মনের মত নয়। টাকা খরচ করে সে গরীব ছেলে এনে জামাই করেছে। কিন্তু মেয়ে জামাই সত্যপ্রিয়র বাড়ী ছেড়ে একদিন যশোদার বাড়িতে ঘর ভাড়া করে চলে আসে। সত্যপ্রিয়কে একটু আঘাত দেওয়ার জন্য যশোদা রাজী হয়ে গেল। কিন্তু তার বাড়ীতে সত্যপ্রিয়র কন্যা যোগমায়ার কষ্ট হচ্ছে দেখে যশোদাই একদিন সত্যপ্রিয়র সঙ্গে দেখা করে। সত্যপ্রিয় খুব কড়া মেজাজের লোক। শেষ পর্যন্ত যশোদার কথায় সে মেয়ে জামাইকে ক্ষমা করল। কিন্তু তাদের আনতে গাড়ী পাঠাতে রাজী হল না। সত্যপ্রিয়ের মত 'হিসাবী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ফন্দিবাজ, সংযমী আর স্বার্থপর মানুষ' যশোদা খুব কমই দেখেছে।

কয়েকদিন পর যশোদা এক নোটীশ পেল। শহরতলীর উন্নতির জন্য যশোদার বাড়ির উপর দিয়ে রাস্তা যাবে, যশোদার বাড়ি উপযুক্ত মূল্যে কিনে নেওয়া হবে। যশোদা বুঝল, এবার তার পাততাড়ি গুটোতে হবে। রাজেন বলে মেয়ে-জামাইকে ঘরে ঠাঁই দেওয়ার জন্যই সত্যপ্রিয় এ কাজ করেছে। সত্যপ্রিয়র মেয়ে-জামাই সত্যপ্রিয়র বাড়ি ফিরে যাবার স্থির করে। কিন্তু যশোদা কোথায় যাবে! যেখানেই যাক্ যশোদার উনুনগুলো আবার ভাঙতে হবে।

সত্যপ্রিয় প্রথম যশোদাকে শ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করল এবার একেবারে ভিটে ছাড়া করে ছাড়ল।

প্রতিভার স্বীকৃতি তার নতুনত্বে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে একের পর এক নতুন বিষয়বস্তু, নতুন চরিত্র, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থিত করে চলেছেন, পুতুল

নাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, মহাকালের জটার জট, প্যাক, দিবারাত্রির কাব্য প্রভৃতি গল্প উপন্যাসেই মানিক বাংলা সাহিত্যে গতানুগতিকের পথ অতিক্রম করে নতুনের আস্বাদন এনে দিয়েছেন। কিন্তু শহরতলী উপন্যাসে শ্রমিক জীবন, শ্রমিক মালিক সম্পর্ক এবং বিশেষ করে সত্যপ্রিয় এবং যশোদার মত অভাবিত চরিত্র সৃষ্টিতে মানিক যে অনন্যসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। মানিক ইতিপূর্বে ভদ্রজীবনের বিরোধ, বিকার এবং ভণ্ডামির অনেক চিত্র ও চরিত্র রূপায়িত করেছেন কিন্তু ভাবাবেগহীন অথচ প্রাণধর্মে প্রোজ্জ্বল বাস্তব সরল শ্রমিক জীবনের কাহিনী পূর্বে আর রচনা করেননি।

চাঁদের মা যশোদা চাঁদের শোক ভুলতে গিয়ে বয়স্ক শ্রমিকদের তার অফুরন্ত মাতৃত্বের দরদ দিয়ে স্নেহ ও শাসন শুরু করেছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাদের সংগ্রামী জীবনেরও অংশীদার হয়ে পড়ল। যশোদার মত বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভরশীল, আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন, দৃঢ়প্রত্যয়ী, বাহ্যিক রূঢ়তা এবং কঠোরতার অন্তরালে মমতাময়ী, স্নেহশীলা নারী বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। দুর্লভ সত্যপ্রিয়ের ন্যায় জটিল, দুর্বোধ্য, হিসাবী, ফন্দিবাজ এক ধনপতির চরিত্র। বিষয় নির্বাচন এবং চরিত্র রূপায়ণে মানিকের মৌলিকতা অনস্বীকার্য।

১৯৩৭ সাল থেকে ভারতের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে দারুণ শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৯৩৭ সালে কানপুরে চল্লিশ হাজার শ্রমিক পঞ্চাশ দিন ধরে ধর্মঘট করেছিল। ১৯৩৮ সালে বোম্বাইতে নব্বই হাজার শ্রমিক প্রতিবাদ দিবস পালন করে এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের চল্লিশ হাজার শ্রমিক এক মাসের উপর ধর্মঘট করে। ১৯৩৮ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংগঠিত সভ্যসংখ্যা ছিল সোয়া তিন লক্ষ। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এবং ঐ বছরের ২রা অক্টোবর বোম্বাইতে নব্বই হাজার শ্রমিক যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ দিবস পালন করে একদিনের ধর্মঘট করে। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে বোম্বাইয়ের পৌনে দু লক্ষ সূতাকল শ্রমিক মাগগি ভাতার দাবীতে চল্লিশ দিন ধর্মঘট করে এবং তাদের সমর্থনে ১০ই মার্চ সাড়ে তিন লক্ষ শ্রমিক একদিনের ধর্মঘট করে সংহতি দিবস পালন করে।

ভারতজোড়া এই শ্রমিক বিক্ষোভ মানিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং তাদের এই প্রতিবাদী, বলিষ্ঠ জীবনধারা অবলম্বন করেই দুই পর্বে 'শহরতলী' উপন্যাস রচনা করেন। প্রথম পর্বে সাধারণ সহানুভূতি থেকে যশোদা শ্রমিক নেত্রীরূপে

পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু কেবল দরদ ও মমতা দিয়ে শ্রমিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তার জন্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শ্রেণী হিসেবে তাদের সমস্যাকে উপলব্ধি করতে হবে। এভাবে নিছক ভাবালুতার বশবর্তী হয়ে নহে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শ্রমিক সমস্যাকে সাহিত্যে রূপায়িত করার প্রশ্ন মানিকই প্রথম উপলব্ধি করেন। এবং সহরতলী উপন্যাস থেকেই তার শুরু। সেজন্য সহরতলী উপন্যাস মানিক সাহিত্যে এক নতুন যুগের উদ্বোধন করে দিল। ভদ্রলোকী সেন্টিমেন্টালিজমকে জয় কোরে ভাবাবেগহীন সুস্থ এবং বলিষ্ঠ জীবন রূপায়ণের যে স্বপ্ন মানিকের মধ্যে ছিল তা এ উপন্যাস থেকেই সত্য হতে চলেছে, সেজন্য মানিকের জীবনেও এই উপন্যাসের গুরুত্ব অনেক বেশী।

॥ ৫ ॥

অহিংসা (১৯৪১) মানিকের একটি বিতর্কিত উপন্যাস। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একে দুর্বোধ্য বলে বর্ণনা করেছেন।

অহিংসা দুই বন্ধু বিপিন এবং সদানন্দের আশ্রমিক ব্যবসার কাহিনী। তীক্ষ্ণ ব্যবসায় বুদ্ধি বিপিনের। প্রায় হাজার খানেক বিঘা জুড়ে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে বিপিন এক আশ্রম খুলেছে। এই আশ্রমের মালিক বিপিন। সদানন্দ তার বন্ধু। সদানন্দের সে নাম ধরে ডাকে। তবে প্রকাশ্যে সদানন্দের শিষ্যত্বের খোলসটা বজায় রেখে চলে। "মানুষটা সে বড় চালাক, ভাবিয়া চিন্তিয়া ফন্দি না আঁটিয়া কখনও সে কিছু করে না, যদি বা করে, অন্তরালে করে। জীবনের সমস্ত অসংযম তার গোপনীয়।" আর সদানন্দ বোকা, একগুয়ে। "দেবতার মতই তার মূর্তি, বটতলার ছবির মহাদেবের ছাঁচে ঢালিয়া যেন তার সৃষ্টি হইয়াছে।" তার সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি স্থৈর্যের নিখুঁত প্রতীক। কিন্তু কখনো তার সঙ্গে বিপিনের মনের মিল হয় না। সদানন্দের গুরুগিরি করবার মত প্রচণ্ড ক্ষমতা আছে। সেজন্য বিপিন তাকে আশ্রমের সাধু নিয়োগ করেছে। আশে পাশের গ্রামের বহু মানুষ ভিড় করে আসে সদানন্দের দর্শন কামনায়, তার বাণী শোনার জন্য। তার কথা "কাঁটার মত বেঁধে, মধুর মত মাখা হইয়া যায়, মধুপের মত গুঞ্জন করে, শুনিতে শুনিতে থাকিয়া থাকিয়া হয় রোমাঞ্চ।" কিন্তু এ সবই যেন অভিনয়। সাধারণ মানুষের ভক্তিভাবকে এরা অর্থাগমের কাজে লাগায়। আসলে ভগবৎভক্তি বলে এদের কিছু নেই। তাদের এই ধর্মের মুখোসটা খুলে গেল মাধবীলতাকে কেন্দ্র করে। অবশ্য তার

আগেও আশ্রমে যে মেয়ে মানুষের আগমন হয় নি তা নয়। মাঝে মাঝে বিপিন এক একটি খাপছাড়া মেয়েকে আশ্রমে এনে হাজির করে। সদানন্দ এতে বিরক্ত হয়। তবু বিপিন এ কাজ করে। আশ্রমের মধ্যে অনাথ স্ত্রীলোকদের একটি আবাসও আছে। এই আশ্রমটা মহীগড়ের রাজাসাহেবের দান। মাধবীলতাকে ফুসলে নিয়ে এসেছে রাজপুত্র। মাধবীও একগুঁয়ে। সদানন্দ অবশ্য মাধবীর প্রতি প্রথমে খুবই বিরূপ ছিল। আর বিপিনের উপর হয়েছিল তার প্রচণ্ড রাগ। বিপিন যেন তাকে প্রতিকারহীন অপমান করে চলেছে। সদানন্দের মনের শান্তি দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় এল মাধবী। সে কুমারী, পুরুষের সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই তার ছিল না। এই মাধবী সদানন্দের জীবনেও প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল। অবশ্য প্রথম প্রথম বিপিনের চক্রান্তে মাধবীকে পাঠিয়ে দেওয়া হোল সদানন্দের ঘরে। তারপর এই মাধবীকে কেন্দ্র করেই বিপিন এবং সদানন্দের মধ্যে মনোমালিন্য তীব্র হয়ে উঠল।

সন্ধিক্ষণে দেখা দিল আর একটি রহস্যময় চরিত্র মহেশ। দারুণ ভক্ত সে। রাজাসাহেবের অপছন্দ বলে বিপিন এই লোকটিকে আশ্রমে ঢুকতে দিত না। কিন্তু অনশন করে ধর্ণা দিয়ে সে বিপিন এবং সদানন্দের প্রতিকুলতাকে জয় করল। মহেশ সদানন্দের নিষ্ঠবান ভক্ত হয়ে উঠল।

সদানন্দ এবং তার আশ্রমের মুখোস খুলে দিল এই দু জন—মহেশ আর মাধবী। একজন তার সহজ স্বাভাবিক ভক্তি দিয়ে আর একজন তার নারী যৌবন দিয়ে। এদের সঙ্গে যুক্ত হোল মহেশের ছেলে বিভূতি। তার চরিত্র প্রতিবাদী। তার ভয় ভক্তি কিছু নেই। সে সমাজকর্মী, ব্যায়াম চর্চা করে, ক্লাব গড়ে তুলে। জেল খাটে। সে সদানন্দের ভণ্ডামি সহ্য করতে পারে না। পিতার অপমানে ক্রোধান্বিত হয়ে সদানন্দকে অপমান করে। পরে মাধবীকে বিয়ে করে সদানন্দের প্রতিপক্ষতা করে। সদানন্দের প্রতিহত প্রেম আক্রোশে পরিণত হয়। আশ্রমের দাঙ্গায় বিভূতি প্রাণ হারায়।

মহেশ কিন্তু স্নেহান্ধ নয়। তার ধৈর্য আছে, ভক্তি আছে, বিশ্বাস আছে। তার বিচার নীরব এবং নির্মম। মাধবীর প্রতি সদানন্দের তীব্র লালসা জেনেও সে তার পুত্রের সঙ্গে মাধবীর বিয়ে দেয়। সদানন্দের ভণ্ডামী জেনেও তাকে সে গুরুর মতই ভক্তি শ্রদ্ধা করে। সদানন্দকে কেন্দ্র করে নতুন আশ্রম খোলে। ফলে বিপিনের আশ্রমের অবস্থা কাহিল হওয়ায় বিপিন মহেশের শরণাপন্ন হয়। মহেশের বুদ্ধিতেই

সদানন্দকে মাধবীর সঙ্গে আশ্রমের খিড়কি দরজা দিয়ে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আর মহেশ বিপিন আশ্রমটাকে নতুন করে গড়ে তোলে।

এই উপন্যাসের সবগুলো চরিত্রই বিকারগ্রস্ত। সাধু সদানন্দ একগুঁয়ে। সে বড় ভয়ানক মানুষ। মানুষকে বশ করবার তার অসামান্য ক্ষমতা। "সদানন্দর সংযম সত্যই অসাধারণ ছিল, কারণ তার মধ্যে সমস্তই প্রচণ্ড শক্তিশালী, অসংযম পর্যন্ত।" তার আকাঙ্খা যেমন তীব্র, বিরাগও তেমনি তীব্র। সেজন্য তার কার্যকলাপ এবং পতন এত গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। বিপিন ফন্দিবাজ। ভীরু কাপুরুষ। আশ্রমকে কেন্দ্র করে সে ব্যবসা করতে চায়। তার চিন্তা ঈশ্বরকেন্দ্রিক নয়, অর্থ কেন্দ্রিক। মহেশ এক অদ্ভুত চরিত্র। তার জীবনে কোন উত্তেজনা নেই। সে-ই একমাত্র অহিংসার পূজারী। অহিংস পথেই সে তার সমস্ত কাজ যুটিয়ে নয়। সে মিথ্যে কথা বলে না। ছেলের মৃত্যুর পরও আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সে সত্যকথা বলে। নিজের ছেলের উপরই সব দোষ চাপিয়ে দেয়। লোকেরা তাকে বুঝতে পারে না। কিন্তু মহেশ নিজ লক্ষ্যপথে অনড়, অচল।

আমাদের জীবনে ধর্মকে কেন্দ্র করে যে অনাচার এবং ভণ্ডামি গড়ে উঠেছে অহিংসা উপন্যাসে তার একটা চমৎকার বিবরণ আছে। মানিক নির্মোহ দৃষ্টি-ভঙ্গীর সাহায্যে এর ক্লেদাক্ত দিক, ব্যবসায়ী দিকটাই যে প্রবল তা সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। দূর দূরান্তের নিরীহ সরল গ্রামের মানুষের ভক্তিপরায়ণতার এমন নির্মম পরিহাসের কথা মানিকের পূর্বে কোন লেখক প্রকাশ করেন নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই উপন্যাসখানি লেখা। যুদ্ধের প্রচণ্ড ধাক্কায় মানুষের চিরায়ত অনেক বিশ্বাস এবং ধ্যানধারণা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়াছিল। পুরানো মূল্যবোধ সবই বিপর্যস্ত। সেখানে ছিল শুধু লোভ, মুনাফা আর নারীমেধের যজ্ঞ। এই উপন্যাসে আছে সেই ভাঙ্গনেরই চিত্র। মানিক নিজেই লিখেছেন, "সমস্ত অন্যায় আর দুর্নীতির মূল ভিত্তি জীবনীশক্তির দ্রুত অপচয়—ব্যক্তিগত অথবা সংঘবদ্ধ জীবনের। যতই বিচিত্র আর জটিল যুক্তি ও কারণ মানুষ খাড়া করুক, ভালমন্দ উচিত অনুচিত মানুষ ঠিক করিয়াছে এই একটি মাত্র নিয়মে।" আবার লিখেছেন, "সীমাবদ্ধ সংক্ষিপ্ত জ্ঞানের জগতের সমগ্রতার আশীর্বাদ মানুষ ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। সংশয়বাদের রোগ ধরিয়াছে মানুষকে।" এই উপন্যাসে আছে এই সংশয়বাদেরই কথা।

আঙ্গিকের দিক থেকে একটি অভিনবতা লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের মধ্যে কাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে লেখকের কতগুলো মন্তব্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলো আসলে কাহিনীকে সংক্ষেপ করানোর জন্য লেখকের জবানীতে অল্পের মধ্যে

কাহিনীর পরিবর্তন বা রূপান্তর বিবৃত হয়েছে। চরিত্রের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করতে অধিক সময়ের প্রয়োজন। সেজন্য লেখক স্থানে স্থানে ঘটনার সংক্ষেপ করে দিয়েছেন। শিল্প বিচারে একে ত্রুটি বলেই মনে হয়।

এই উপন্যাসেও চরিত্র বিশ্লেষণ চমৎকার। সদানন্দের চরিত্র কী সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। মাধবীলতা আসার পর কখনো তার অনুরাগ কখনো বিরাগ। কিন্তু সব মিলিয়ে নিজের জীবনে শূন্যতা, ব্যর্থতার অনুভূতি কী প্রচণ্ডভাবে সে অনুভব করতে আরম্ভ করল। সে মহেশ চৌধুরীর কাছে স্বীকার করল, সে তো কখনো সাধন ভজন করেনি। ভগবানকে সে বিশ্বাস করে না একথা বলতে তার বাধেনি। তার মধ্যে নতুন করে দেখা দিয়েছে, মানুষের জীবনের ব্যর্থতার অনুভূতি। "ব্যর্থতার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর নাই। জীবনের প্রতিকারহীন জীবনব্যাপী ব্যর্থতা।" মাধবী বিকার গ্রস্ত। বিকার ছাড়া স্বাভাবিক মায়া মমতা জোরালো হয় না। এ ছাড়াও আছে মহেশ চৌধুরী, বিভূতি, বিপিন, রত্নাবলীর চরিত্র। মহেশ চৌধুরী একটি চমৎকার চরিত্র। সদানন্দর সে বিপরীত। তবে "মহেশ চৌধুরীর মধ্যে যে অচেতন মননশক্তি সকলের প্রীতি অর্জন করিয়াছে এবং সদানন্দের মধ্যে যে সচেতন মননশক্তি সকলের মধ্যে জাগাইয়াছে সভয় শ্রদ্ধা মূলত তার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। "মহেশ চৌধুরীর মধ্যে প্রচণ্ডতা নেই তবে অনুভূতির গভীরতা আছে। সেজন্য মহেশ চৌধুরীর মনে হয়, "পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অনেকদিন হইতে রোগে ভুগিতেছে। মাঝে মাঝে দু একজন মহাপুরুষ এবং সব সময় অনেক ছোট খাট মহাপুরুষ এই রোগ সারানোর চেষ্টা করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, কিন্তু সে চেষ্টায় বিশেষ কোন ফল হয় নাই, এখনও হইতেছে না। কারণ, তাদের চেষ্টা শুধু ভালর আড়ালে মন্দকে চাপা দেওয়ার, কেবল দুধ ঘি খাওয়াইয়া রুগীকে স্বাস্থ্যবান করার।

মানুষের রোগের কারণ তারা জানে না, অর্থ বোঝে না, চিকিৎসার পথও খুঁজিয়া পায় না। তারা নিজেরাও রুগী।·········

তাই মানুষের রোগের চিকিৎসার উপায় কেউ খুঁজিয়া পায় না, পাওয়া সম্ভবও নয়। তাই মানুষকে সুস্থ করার সমস্ত চেষ্টা গরীবকে স্বপ্নে বড়লোক করার চেষ্টার মত দাঁড়াইয়া যাইতেছে ব্যর্থ পরিহাসে।"

কাহিনী বর্ণনায়, ভাষা ব্যবহারে, সংলাপ রচনায় মানিকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গরীবের প্রতি মানিকের যে স্বাভাবিক মমত্ববোধ ছিল এই উপন্যাসেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের সমাজ যে দ্বিধাবিভক্ত বড়লোক আর গরীব লোকে

সেকথা তিনি বহু উপন্যাসেই বিবৃত করেছেন। গ্রামে আনন্দ উপভোগের সাধারণ উপকরণ হোল 'যাত্রা' গান। সেখানেও আছে এই শ্রেণীভেদ। গ্রামের ভদ্রলোকেরা গরীবলোকদের সতরঞ্চিতে বসতে দেয় না। জায়গা থাকলেও নয়। কারণ এরা "যাত্রা শুনিতে যায় গামছা কাঁধে", সেজন্য আসরে সামনের দিকে ভদ্রলোকদের মধ্যে বসতে দিলে উভয়েই যেন অস্বস্তি বোধ করে।

সমাজের একশ্রেণীর লোক থাকে যারা নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে ওস্তাদ। এরা চোর, বদ লোক। আশ্রমে দাঙ্গার মধ্যে "যারা চ্যালা কাঠ ছুড়িয়া মারিতেছিল, দাঙ্গার শেষের দিকে হঠাৎ সে কাজটা বন্ধ করিয়া মেয়েদের ভিড়ে ঢুকিয়া কয়েকজনের গলার হার, কানের মাকড়ি, হাতের চুড়ি ছিনাইয়া নিয়া তারা সরিয়া পড়িয়াছিল। সকলে পলাইতে পারে নাই, একটা চ্যালা কাঠ কুড়াইয়া নিয়া রত্নাবলী দু' জনের মাথা ফাটাইয়া দেওয়ায় তারা এখনও আহতদের সারির একপ্রান্তে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।"

খবরের কাগজে যা রোজ প্রকাশিত হয় তা যে সব সময় সত্য নয় তারও একটি সুন্দর নিদর্শন এই উপন্যাসে আছে। আশ্রমে দাঙ্গার ব্যাপারে খবরের কাগজে যা ছাপা হোল তা সম্পূর্ণ অসত্য এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

সব মিলিয়ে অহিংসা উপন্যাসটি মানিকের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এই কাহিনীর মধ্যে আছে মানিকের দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিচয়, ধর্মের নামে ব্যবসায়ের কথা।

১৯৪৩ সালে বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশ করে তাঁর বহু বিতর্কিত উপন্যাস **'প্রতিবিম্ব'**। উপন্যাসে গ্রন্থ প্রকাশের কোন তারিখ নেই। এ সম্পর্কে উপন্যাসের প্রারম্ভে লেখকের বক্তব্যে মানিক লিখেছেন, "তেরশ' পঞ্চাশের যুগান্তর পূজাবার্ষিকীতে 'প্রতিবিম্ব' প্রকাশিত হবার পর অনেকের কাছ থেকে অনেক রকম মন্তব্য ও অভিযোগ শুনতে হয়েছে। বলাই বাহুল্য, লেখাটির নিছক সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কে অভিযোগ নয়। কারণ, তাহলে বই-এর গোড়ায় আমার এই বক্তব্য জুড়ে দেবার প্রশ্নই উঠত না।

তাই গোড়াতেই আপনাদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া কর্তব্য মনে করছি যে প্রতিবিম্বের মধ্যে কোন বিশেষ পার্টির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন ইঙ্গিত খুঁজবার চেষ্টা করবেন না, কল্পনা করবার চেষ্টা করবেন না যে প্রতিবিম্বে যে পার্টির কথা আছে সেটি 'অমুক পার্টি'।

বিশেষ একটা পার্টিকে কেন্দ্র করে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাহিনী রচনা করবার ইচ্ছা যদি আমার থাকত সেটা সোজাসুজি স্পষ্টভাবেই করতাম।

লেখা হিসাবে 'প্রতিবিম্ব' কেমন হয়েছে সেটা আমার বলার কথা নয়। নিজেকে সমর্থন করে একথা বলার অধিকার আমার আছে যে প্রতিবিম্ব পড়ে ভুল ধারণা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকার কারণ লেখার ত্রুটি নয়। বইখানা যে-মনের বিব্রত দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনার আপেক্ষিক সঞ্চরণশীলতার প্রান্তবাহী প্রতিবিম্ব, সেই চেতনাশ্রয়ী মনই এজন্য দায়ী। পরিবেশের দ্রুত আবর্তনশীল আকর্ষণ ও বিকর্ষণের চাপ মনকে এই অবস্থায় এনে দেয়। অতিক্রান্ত মনের সংখ্যা বেশী নয়।······

মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত জাতীয়তাবাদী সাধারণ কর্মী যুবকের মনে নবযুগের নতুন ভাবধারার প্রভাবে কি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, ভাবপ্রবণতা ও বাস্তববোধের দ্বন্দ্ব কি রূপ নিয়েছে, সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কোন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করা উচিত এই নিয়ে যে দ্বিধা ও সংশয়ের ভারে সে ব্যাকুল হয়েছে, সোজা ভাষায় তারকের মত ছেলেদের মধ্যে যুগ পরিবর্তনের সূচনা কি রূপ নিয়েছে 'প্রতিবিম্ব' তারই একটা দিককে রূপ দেবার চেষ্টা।

বলা বাহুল্য, তারক বদলে যাবে। ইতিমধ্যেই কিছুটা বদলেছে। কিছুকাল পরে 'প্রতিবিম্ব' হয়ে যাবে 'পুরাণো ছবি।'"

প্রতিবিম্ব এক শিক্ষিত যুবক তারকের কাহিনী। তার বাবা পেনসনপ্রাপ্ত। যা পেনসন পান আর যেটুকু জমিজমা আছে তা দিয়েই কোনক্রমে সংসার চলে। তারক লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে কিন্তু চাকরী করে না। চাকরীর জন্য চেষ্টাও করে না। তার দাদা বিদেশে প্রায় হাজার টাকা মাইনের চাকরী করে। তারক চাকরীর চেষ্টা করে না বলে তারও রাগ। তারক কেবল রামবাবুর পার্টি করে আর চায়ের দোকানে বসে চা খায়। শেষ পর্যন্ত তারকের বাবা তারকের বিয়ে দেয়।

তারকের শ্বশুর তারকের চাকরী জুটিয়ে দেবে বলে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। তিনি উকিল। একদিন তারককে তিনি পরিচিত এক লোকের কাছে যুদ্ধের অফিসে কেরাণীর চাকরীর জন্য পাঠিয়ে দিলেন। কোলকাতায় তার খুড়ো শ্বশুরের বাড়ী উঠতেও বলে দিলেন। কিন্তু তারক রামবাবুর কাছ থেকে এক চিঠি নিয়ে কোলকাতায় পার্টি কেন্দ্রে উঠল। সেখানে পার্টির সেক্রেটারী, পুষ্প, মনোজিনী, সীতানাথ প্রভৃতির সঙ্গে তার আলাপ হোল। মনোজিনীর স্বামী কলেজের এক অধ্যাপক। রাজনীতিক কারণে জেলে গিয়েছেন। মনোজিনী স্কুলে শিক্ষকতা করে। সেখানে ছেলে মেয়েদের অবাধ মেলামেশা দেখে তারক বিস্মিত হয়। মনোজিনীর বাড়ীতেই পার্টির কর্মীরা একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে। একই ঘরে ছেলেমেয়েরা শোয়। সেদিন রাত্তে তারকও শুয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ সীতানাথ এসে মনোজিনীকে

প্রেম নিবেদন করে। তারক সীতানাথের এই বেয়াদবীতে অসন্তুষ্ট হয়ে সীতানাথকে মারধোর করে। পরে মনোজিনী তাকে বুঝিয়ে দেয়। সীতানাথের এটা রোমান্টিক বিকার। মনোজিনী সীতানাথের দুর্বলতা সম্বন্ধে বলেছিল, "মেয়েদের সম্বন্ধে এখনও ওর রোমান্সের বিষ ঝরে যায়নি। মেয়েদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা এখনো ওর অভ্যস্ত হয়নি।'

তারক দ্বিধাভরে বলল, "ও যে সমাজের ছেলে শুনলাম, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ তো ওর কম হওয়ার কথা নয়।"

মনোজিনী বিদ্বেষহীন স্বরে বলল, "সে তো ড্রয়িংরুমী রোমান্টিক মেলামেশা, মেয়েরা রহস্যের আড়াল ছেড়ে আসে না। হ্যাঁ, সেকস্ নিয়ে পর্যন্ত অবাধে আলোচনা করে—তবে আলোচনাটা কোনদিন সেকসের দণ্ড নিয়ে কাব্যমন্থন ছাড়া আর কিছু হয় না। আমাদের মেলামেশায় সব কৃত্রিম ব্যবধান ভেঙ্গে দেওয়া হয়। কাজে-কর্মে চলা-ফেরার সময়ে-অসময়ে সব অবস্থায় সব সময় সমানভাবে আমরা মেলামেশা করি। এই জন্যেই বাইরে আমাদের বদনাম রটে কিন্তু আসলে এই জন্যেই সমাজের উঁচু থেকে নীচু পর্যন্ত সমস্ত স্তরের চেয়ে আমাদের মধ্যে বিকার কম, অসংযম কম। আজকের কাণ্ড দেখে কথাটা আপনার বিশ্বাস করা কঠিন হবে, কিন্তু সত্যি কথাই বলছি আপনাকে। ভাই বোনের মধ্যে যৌন আকর্ষণ হয় না কেন আপনি নিশ্চয় জানেন। আমাদের মধ্যেও অনেকটা তাই ঘটে। মেলামেশায় যদি আমাদের বিধি নিষেধ আইন কানুন থাকত পরস্পরের সম্বন্ধে, সেই চেতনা থেকে মোহ জন্মাত, কামনা জন্মাত। কিন্তু সর্বদা খোঁচা দিয়ে যৌন চেতনাকে জাগিয়ে রাখার সব ব্যবস্থা আমরা বাতিল করে দিয়েছি। তাছাড়া, আমরা সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকি, মস্ত একটা উদ্দেশ্য আছে আমাদের, দুদণ্ড বসে উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবার অবসরও আমাদের জোটেনা।"

তারক সঠিক বুঝতে পারেনা। মনোজিনীর সহজ স্বাভাবিকতায় সে বিস্মিত হয়।

তারক যুদ্ধের অফিসে চাকরীর জন্য যায়। কিন্তু সেখানে নিজেকে বোবা হাবার মত করে রাখে। প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয় না। তারকের চাকরী হয় না। তারকও তাই চেয়েছিল। কিন্তু সে বিস্ময়ের সঙ্গে উপলব্ধি করে পার্টির লোকেরাও চেয়েছিল সে চাকরী করুক। তারপর অবসর সময়ে সে পার্টির কাজ করুক। তারক ব্যথিত হয়। কিন্তু সে বুঝতে পারে এতকাল সে যা ভেবে এসেছে সবই ভুল। এমনকি কৃষক-মজুরকেও সে ভালভাবে চিনতে পারেনি। সে তাদের সঙ্গে রোজ মিশেছে কিন্তু কী তারা ভাবে, কী তারা চিন্তা করে সে সঠিক বুঝতে পারেনি। সে এতকাল

যেন তাদের মুখে রুশের ছবি দেখতে পেয়েছিল। রাশিয়ার ভাবদৃষ্টি দিয়েই সে তাদের দেখত। সে তাই ফিরে এল গ্রামে মানুষ চিনতে।

তারক বাবাকে বলল, হার্টের রোগ বলে তার চাকরী হয়নি। স্ত্রীকে বলল, তার পাহারায় সে তার হার্টের রোগ সারিয়ে তুলবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। তার আগে আর সে ঘর ছেড়ে নড়ছেনা।

আসলে তারক মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত জাতীয়তাবাদী যুবক। সে একদিন খেটে দশখানা গ্রামের লোক যোগাড় করতে পারে। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে রয়েছে তার ভাবপ্রবণতার দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বেরই প্রতিবিম্ব এ কাহিনী।

॥ ৬ ॥

'দর্পণ' উপন্যাসের আরম্ভ ঝুমুরিয়া গ্রামের বদমেজাজী এবং জেদী বীরেশ্বর এবং তার তেজী ও জবরদস্ত চেহারার মেয়ে রম্ভাকে নিয়ে। স্বদেশী বাবুদের সংসর্গে এসেই বীরেশ্বরের এই বেপরোয়া মনোভাব দেখা দিয়েছিল। আর পুলিশও তাকে সন্দেহ করে কয়েকবার টেনে নিয়ে গিয়েছিল। একবার তো দাঙ্গা করার অভিযোগে তার দু বছর জেল হয়েছিল। রম্ভাও তার বাপের ন্যায় জেদী। বয়স হলেও সে যাকে তাকে বিয়ে করতে রাজী হোল না। এই গল্পে রম্ভার বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে বাঙলা দেশে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অসন্তোষ যে বিক্ষোভে পরিণতি লাভ করছিল রম্ভা তারাই জীবন্ত প্রতীক।

ঝুমুরিয়ারই এক ধনী ব্যক্তি লোকনাথ। লোকনাথের দূর সম্পর্কের ভাইপো শশাঙ্ক তার গ্রামের বাড়ী দেখাশুনা করে। একবার এই শশাঙ্কের সঙ্গে বীরেশ্বর রম্ভাকে নিয়ে কোলকাতায় বেড়াতে গেল। সে সময় লোকনাথের কাঠের গোলা ও আসবাব তৈরির মস্ত কারখানায় ভীষণ গণ্ডগোল বেধেছিল। লোকনাথের ভাগ্নে উমাপদ অন্যায়ভাবে একজন শ্রমিককে মারার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষ দেখা দেয়। রামপাল নামে এক শ্রমিক সেদিন উমাপদকে না বাঁচালে সে খুন হয়ে যেত। কিন্তু পরিণামে উমাপদ পুলিশ ডেকে রামপালকেই ধরিয়ে দিল। স্বদেশী নেতা কৃষ্ণেন্দু তখন লোকনাথের ছেলে হীরেন, আরিফ আর মমতাকে নিয়ে পাটনায় এক কনফারেন্সে গিয়েছিল। লোকনাথের বাড়িতেই এই রামপালের সঙ্গে বীরেশ্বর আর রম্ভার পরিচয়। রম্ভাকে দেখে উমাপদর লালসা জাগল। এক রাত্রে শশাঙ্কের যোগসাজসে রম্ভাকে শশাঙ্কের শোবার ঘরে আটকে ফেলে কিন্তু রম্ভা ওসব পুরুষকে

ভয় করে না। শশাঙ্কের স্ত্রী দিগম্বরীর বিরোধিতায় ব্যাপারটা বেশীদূর এগোল না। রম্ভা দিগম্বরীর ঘর থেকে বেরিয়ে লোহার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে গিয়ে দেখে লোকনাথের বিধবা বোন কালীতারা রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। পরে সেখানে আসে ঝাড়ুদার সুখলাল। দেখতে সে খুব সুপুরুষ।

পরদিন সকালে কৃষ্ণেন্দু, হীরেন, মমতা ও আরিফ কোলকাতায় ফিরে আসে। মমতার বাবা অধ্যাপক এবং নামকরা বৈজ্ঞানিক। আরিফ তাঁর প্রিয় ছাত্র। তার "ব্রিলিয়াণ্ট ফিউচার। কিন্তু হঠাৎ ডক্টরেটের চেয়ে দেশের স্বাধীনতা বেশী মূল্যবান মনে করে সে রিসার্চ বন্ধ করে স্বদেশীপনা আরম্ভ করে দেয়। আরিফ বলে, ব্রিলিয়াণ্ট? ডক্টরেট ডিগ্রি পাব, একটা প্রফেসারি পাব, ছেলেখেলার একটা ল্যাবরেটারীতে কাজ পাব। হয়তো ভিটামিন সম্পর্কে মস্ত একটা আবিষ্কার করে নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাব। আমার দেশের কোটি কোটি কঙ্কালের গায়ে এক আউন্স মাংস বাড়বে?" মমতা আরিফের বাল্যকালের বন্ধু কিন্তু সে ভালবাসে লোকনাথের ছেলে হীরেনকে। মমতা নিজেও দেশের কাজ করে। সে হীরেনকে তার কাজের উপযোগী করে তুলবে বলে তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়।

হীরেন এবং কৃষ্ণেন্দুর মধ্যস্থতায় লোকনাথের কাঠগোলার সমস্যা মিটে যায়। উমাপদকে লোকনাথ সরিয়ে দিয়েছে অন্য কাজে। যারা চোট পেয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতেও রাজী হয় লোকনাথ। তারপর রম্ভার সঙ্গে রামপালের বিয়ে হয় এবং হীরেনের সঙ্গে মমতার।

রামপাল রম্ভাকে নিয়ে আসে এক বস্তীতে। এই পরিবেশে বাস করার অভিজ্ঞতা রম্ভার পূর্বে ছিল না। একদিকে অপস্থান, নর্দমা ও পচা আবর্জনার দুর্গন্ধ অন্যদিকে কোন্দল, উদাসীনতা, ছলচাতুরী, হীনতা, দীনতা, নির্মম পাশবিকতা। সে রামপালকে বলে তাকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে। এখানে থাকলে সে মরে যাবে। তাকে বুঝিয়েছিল দুর্গা। বলেছিল কোথায় যাবি? ভদ্রপাড়ায়! "কোলকাতায় ভদ্রপাড়া নেই!" "উমাপদর কথা, কালীতারা সুখলালের কথা মনে পড়ে যায়, রম্ভার গা জ্বালা করে।"

"ভাবপ্রবণতার আক্রমণে রম্ভাও কাবু হয়ে পড়ে। কিন্তু সামলে নেয়, সইয়ে নেয় রম্ভা, চারিদিকের সঙ্কীর্ণ কুঁকড়ে যাওয়া বিকৃত জীবনের কুৎসিত কদর্যতাকেই একমাত্র চরম সত্য বলে মেনে না নিয়ে সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য খুঁজে বার করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে যায়। তখন সে সাহস পায়, তার ধৈর্য আসে। বিরোধ ও বিতৃষ্ণা উবে যায়। কষ্ট থাকে; মনের মধ্যে প্রতিবাদের নিরুপায় নালিশের কষ্ট, কিন্তু

তাতে আর তীব্র জ্বালা থাকে না। গাঁয়ের জীবনে নোংরামি কম নেই। তবে সেখানে মানুষ ছড়িয়ে থাকে, ধীরে সুস্থে গড়িয়ে গড়িয়ে বাঁচে, জীবনের গ্লানি ও আবর্জনা ছড়িয়ে থাকে তফাতে তফাতে। এখানে সঙ্কীর্ণ স্থানে গাদাগাদি করে আছে ঊর্ধ্বশ্বাস স্বার্থপর নিষ্পিষ্ট মানুষ। এই স্তূপীকৃত পাপ ও বিকারের মধ্যে এসে পড়ায় প্রথমে রম্ভা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল, ক্রমে ক্রমে সে ভাবটা তার কেটে যায়। একদিন দুপুর-বেলা যেচে পাড়ার কয়েকটি দেহবেচা মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে এসে সে অনেকটা স্বস্তি বোধ করে। এদের সম্বন্ধে তার একটা উদ্ভট, বীভৎস ধারণা ছিল। তার মনে হত এদের কাছাকাছি দাঁড়ালেই বুঝি পচা গন্ধ এসে নাকে লাগবে। বরং দেখে সে অবাক হল, গেরস্ত অনেক মেয়ের চেয়ে এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, অন্য মানুষের মতই এদের সুখদুঃখ স্নেহ মায়া আছে, ভালমন্দ উচিত অনুচিত বোধ আছে, এমন কি উদারতা পর্যন্ত আছে খানিকটা।"

নতুন জীবনের নতুন আবেষ্টনীতে এসে রামপাল সম্বন্ধেও রম্ভা হতাশ হয়ে পড়ে। আর এই দিক দিয়ে তার আঘাত আসে সবচেয়ে কঠিন। কাঠগোলার সেই রামপালকে যেন চেনা যায় না। তার তেজ বীর্য সবই মেকী মনে হয়। কৃষ্ণেন্দু রম্ভার আদর্শনিষ্ঠার কথা শুনে বিস্মিত হয়। সে রম্ভাকে রামপাল সম্বন্ধে অনুপ্রাণিত করে তোলে। রম্ভাকেই তাকে তৈরি করে নিতে হবে। অতএব তার হাল ছাড়া উচিত নয়।

ঝুমুরিয়ার ক্রোশ দুই তফাতে বিরাট এক শালবনে সাঁওতালি মেয়ে পুরুষেরা হেরম্বের ঠিকাদারিতে বন কাটতে এসেছে। তারা "সুস্থ সবল সুশ্রী কালো দেহ আর সরল স্বাধীন দৃঢ় মন নিয়ে হিংসাদ্বেষহীন নির্ভয় নিশ্চিন্ত নির্লোভ শান্তিপূর্ণ জীবন কাটায়। ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা আছে ব্যক্তিগত সম্পদের বোধ নেই, ভেদাভেদ বোঝেনা। দলের প্রধান দলেরই দান, দলের ইচ্ছায় সে প্রধান, অনিচ্ছায় নয়। মেয়েরা স্বাধীন, সমান, সম্মানীয়া—সভ্য জগতের স্বাধিকারচ্যুতা সমস্ত নারী যখন পরাধীন পণ্যা মাত্র। "(এখানে মানিকের দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষণীয়। সভ্যজীবনের কৃত্রিম জীবনযাত্রার প্রতি আছে তাঁর তীব্র অবজ্ঞা আর আদিম সরল এবং সুস্থ জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা।) হেরম্ব সাঁওতালি মেয়ের উপর জোর খাটাতে গিয়ে সব সাঁওতালকে ক্ষেপিয়ে তুলল। সাঁওতালরা সব চলে গেল। হেরম্ব অগত্যা লোকের জন্য ঝুমুরিয়ায় এল। ফসল কাটার সময় সে অনেক চেষ্টা করেও বেশী লোক যোগাড় করতে পারল না। কিন্তু ওর রাগ গিয়ে পড়ল বীরেশ্বরের উপর। তার ধারণা বীরেশ্বরের জন্যই সে লোক পাচ্ছে না। মিথ্যে মোকদ্দমায় বীরেশ্বর আর

জালালুদ্দিনের জেল হয়ে গেল। হেরম্ব সেখানেই চুপ করে থাকেনি। সারাদিন লরী চালিয়ে তার পাকা ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে ফেলল। জেলেই জালালুদ্দিন নিমুনিয়ায় মারা গেল আর বীরেশ্বর যেদিন বেরিয়ে এল সেদিন গ্রামের লোকেরা বিরাট শোভাযাত্রা করল।

একদিন ঝুমুরিয়া থেকে বীরেশ্বর এসে কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে দেখা করে গেল। ঝুমুরিয়ার পাশ দিয়ে একটা বড় রাস্তার কন্ট্রাক্ট নিয়েছিল হেরম্ব চক্রবর্তী। সে কুলির জন্য, রাস্তার মাটির জন্য চাষীদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেছে। ফসলের জমি খুঁড়ে মাটি তুলছে, জমির মালিককে দিয়ে খতে সই নিচ্ছে, কুলিদের জন্য কম দামে জবরদস্তি চাল কেনা হচ্ছে। বীরেশ্বরের সঙ্গে হেরম্বের সংঘর্ষ আরম্ভ হোল। রাস্তার কবলে বীরেশ্বরের কিছু ভাল জমি পড়েছিল। হেরম্ব মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে ঐ চাষের জমিও অনাবাদী দেখিয়ে কম দাম দিয়েছে। বীরেশ্বরের পুকুর থেকে হেরম্ব জোর করে বহু টাকার মাছ তুলে নিয়েছে। আসলে বীরেশ্বর গাঁয়ের অনেকের সঙ্গে একত্র হয়ে হেরম্বের অত্যাচারে বাধা দিচ্ছিল সেজন্য তার উপর হেরম্বর এত রাগ।

কয়েকদিন পর কৃষ্ণেন্দু ঝুমুরিয়া পৌঁছে খবর পেল দুদিন আগে বীরেশ্বর খুন হয়েছে। বীরেশ্বরের দলের সঙ্গে হেরম্বর দলের যখন দাঙ্গা বাধো বাধো হয়েছিল তখন বীরেশ্বরের দলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ ফাঁকা গুলি ছোড়ে কিন্তু সেই ফাঁকে হেরম্ব নিজের গুলিতে বীরেশ্বরকে খুন করে। সেদিন কৃষ্ণেন্দু ফিরে এল। আবার পরদিন সে হীরেনকে নিয়ে ঝুমুরিয়ায় গেল। এদিকে কৃষ্ণেন্দুর কাছে খবর পেয়ে রম্ভা এবং রামপালও ঝুমুরিয়ায় গেল। বীরেশ্বর খুন হওয়ায় পুলিশ উল্টে বীরেশ্বরের দলের কয়েকজনকেই গ্রেপ্তার করেছে। বীরেশ্বরের বড় ছেলে শ্যামলাল হেরম্বর হাতে পায়ে ধরে ওদের তিন ভাইয়ের গ্রেপ্তার এড়িয়েছে। মেরুদণ্ডহীন চাষীর প্রতিনিধি শ্যামলাল। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার বদলে সে নিজেদের নিরাপত্তার কথাই বেশী ভাবে।

হেরম্ব এত বড় অত্যাচার করল, একটা লোককে খুন করল, উল্টে আবার কয়েকজনকে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দিল তবু হেরম্বর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের তেমন বিদ্রোহ দেখা যায় না। অনেকের ধারণা হেরম্ব লোকটা খুব ধার্মিক, একজন বড় তান্ত্রিক সাধুর শিষ্য। নিজেও সাধন টাধন করে, অমাবস্যার রাত্রে মড়ার বুকে আসন পিঁড়ি হয়ে কাটিয়ে দেয়। তাদের কাছে সে ভয়ঙ্কর ধার্মিক। কৃষ্ণেন্দু বিমর্ষ ও চিন্তিত হয়। হীরেন বলে, "ধর্ম আর সংস্কার যে এদেশের মনে কি ভাবে গ্রাস করে

আছে খেয়াল থাকলে কেন ওকে সকলে এত খাতির করে তুইই সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারতিস। এদেশে ধর্ম ছাড়া কথা নেই, চারিদিকে তার প্রমাণ তো দেখতেই পাস সর্বদা। ধর্মের দোহাই ছাড়া এদেশে রাজনীতি হয় না, আন্দোলন চলে না। এদেশে নেতাকে হতে হয় মহাত্মা। আধ্যাত্মিকতার সুরে টেনে তুলতে না পারলে এদেশে কিছুই করার উপায় নেই।"

কৃষ্ণেন্দু ঠিক করেছে বীরেশ্বরের মৃত্যুর প্রতিবাদে কাল দুপুরে শোভাযাত্রা নিয়ে একেবারে নতুন রাস্তায় হাজির হবে। সে হেরম্বর দানে গড়ে তোলা ক্লাবের ছেলেদের হেরম্বর দানের স্বরূপ বুঝিয়ে দেয়। শোভাযাত্রা নিয়ে কৃষ্ণেন্দু হীরেন আলোচনা করে। শশাঙ্কের স্ত্রী দিগম্বরী আড়াল থেকে তা শুনতে পায়; পরে হীরেনের কাছে গোপন রাখার প্রতিজ্ঞা করে সব জেনে নেয়। পরে তার স্বামী শশাঙ্ক পুলিশে সব জানিয়ে দেয়। সেই রাত্রেই পুলিশ এসে কৃষ্ণেন্দু আর বীরেশ্বরের ছোট ছেলে মোহনলালকে ধরে নিয়ে যায়।

কৃষ্ণেন্দু আর মোহনলালের গ্রেপ্তারে চারিদিকে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিনা কারণে এই গ্রেপ্তারে সর্বত্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। মমতা আর আরিফও ঝুমুরিয়ায় রওনা হয়। হীরেন অবশ্য কোলকাতায় চলে যায়।

ঝুমুরিয়ায় সেদিন বিরাট শোভাযাত্রা হল। শোভাযাত্রার সামনে ছিল জালালুদ্দিনের ভাই মহীউদ্দিন। "বীরেশ্বরের অপমৃত্যুতেও চারিদিকে এমন সাড়া জাগেনি। চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল যথেষ্ট, কিন্তু এমন উত্তেজনা দেখা দেয় নি। ও যেন খানিকটা ছিল হেরম্ব ও বীরেশ্বরের ব্যক্তিগত কলহের ব্যাপার। হেরম্ব অত্যাচার করেছিল সত্য, বীরেশ্বর একা নিজের জন্য লড়তে যায়নি তাও সত্য, কিন্তু তবু হাঙ্গামাটা হয়েছিল বীরেশ্বরের জন্যই। হেরম্বের মত অত্যাচারীকে প্রকৃতির একটা অনিবার্য উৎপাতের মত মেনে নেবার সংস্কার আজও লোকের কেটে যায়নি। জমিদার, ধনী আর প্রতিপত্তিশালীদের সঙ্গে আজও তো লড়াই একরকম হয় নি দেশের লোকের, ওদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়বার প্রেরণাও যোগাননি নেতারা। সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু হেরম্বদের সঙ্গে সংগ্রামের ঐতিহ্য তো নেই-ই বরং আছে মুখ বুজে সব সয়ে যাবার অভ্যাস।"

কৃষ্ণেন্দুর গ্রেপ্তারের পর হেরম্বর টাকা নিয়ে যারা ক্লাব করেছিল তাদেরও অনেকেই মোহনলালের দলে চলে এল। চতুর্দিকে রটে যায় আজ বিরাট এক হাঙ্গামা হবে। গ্রামের স্কুলে ধর্মঘট। রম্ভাও এলোচুলে ভৈরবীর মত রাস্তায় বেরিয়েছে। একেবারে মহিষ-মর্দিনী মূর্তি। ছোট ছেলেরাই নেতৃত্ব নিয়েছে। বটতলার

মাঠে ওবেলা সভা হবে। এ সভা তাদের বাঁচার লড়াই। তাদের বাঁচাতে যারা এসেছিল তারা নেই। এখন নিজেদেরই লড়তে হবে। এখানে হিন্দু মুসলমানের কথা নেই। সবাই যাবে এই সভায়। বাংলার গাঁয়ে বাঘ থাকে। এতদিন পর সেই বাঘ জেগে উঠেছে। রম্ভা সহ দশ বারজনের একটি দল ঘুরে ঘুরে সভার কথা ঘোষণা করতে থাকে। প্রচার করতে করতে তারা থানা পর্যন্ত চলে যায়।

থানায় তখন রিপোর্ট লিখছিল দারোগা শৈলেন দাস। মানিক এই দারোগা জীবনের দ্বন্দ্বও খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের মত তারও আদর্শ, ছিল, স্বপ্ন ছিল, উত্তেজনা ছিল। কিন্তু এখন "তার মন ভার, বুকে একটা অনির্দিষ্ট জ্বালা, কার বা কিসের বিরুদ্ধে জানা নেই। দু বছর প্রমোশন বন্ধ। জীবনে বুঝি কিছু করা গেল না।...মহীউদ্দিনের আওয়াজ তার কানে আসে। মাত্র দশ পনের জন শুনে সে তাদের যেতে দিল। দুপুরে হেরম্ব এসে সভাটার ব্যবস্থা করার জন্য দারোগাকে একমুঠো নোটের তাড়া দিয়ে গেল।

দুপুর থেকেই লোক আসতে থাকে বটতলার মাঠে। অপরাহ্নে লোকারণ্য হয়ে ওঠে বটতলার মাঠ। ঝুমুরিয়ায় আজ পর্যন্ত কোন সভায় এতলোক জমতে কেউ ছাখেনি। উত্তেজিত মানুষের এমন ভীড়। ভীরু ও দুর্বল একক মনে সমধর্মী মানুষের বিরাট্ সান্নিধ্য তেজস্কর সঞ্জীবনীর কাজ করে। ভীরুতা, দুর্বলতা চাপা পড়ে জাগে বেপরোয়া সাহস।" মহীউদ্দিন শম্ভুও এতটা ভাবতে পারেনি। সে বুঝতে পারল, সমবেত এই জনশক্তিকে ঘাঁটাতে গেলেই আজ বিপদ হবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। সে তাড়াতাড়ি হেরম্বকে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেয়। অবস্থা গুরুতর, নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। চিঠি পড়ে হেরম্ব মনে মনে হাসে। সে তো দাঙ্গামাই চায়। ভরা বন্দুকের মসৃণ নলে হাত বুলিয়ে হেরম্ব গ্রাস মুখে তোলে।

"সূর্য যখন ডুবু ডুবু, হেরম্বেরই গাঁইতি কোদাল শাবল দিয়ে তৈরি রাস্তা খোঁড়া আরম্ভ হল, পেট্রল ফেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল তার লরী আর তাঁবুতে, হেরম্বের বন্দুকের গুলি খেয়ে তার হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে রামপাল মারা গেল, হেরম্বকে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে পোড়ানো হল তার বাড়ির দক্ষিণের চালা ঘরের আগুনে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আগুন ধরল বীরেশ্বর ও ঝুমুরিয়ার আরও পাঁচটি বাড়ির চালায়। একদল লোক গিয়ে পাঁচনিখের থানা পুড়িয়ে এল। শৈলেন আগেই বটতলার মাঠে মারা গিয়েছিল। সভায় আরও মরেছিল তেরজন লোক আর দুজন পুলিশ।...জখম হয়েছিল বহু লোক।"

দুদিন পরে আরিফ ও মমতা এল ঝুমুরিয়া ষ্টেশনে। বাইরে লোককে তখন

গাঁয়ে যেতে দিচ্ছে না। রম্ভাকে ধরে নিয়ে গেছে। সমস্ত মানুষের মধ্যে একটা থমথমে ভাব।

এই মূল কাহিনীর পাশাপাশি রয়েছে হীরেন মমতা ও আরিফের কাহিনী। দুই বিরোধী ভাবদ্বন্দ্বে হীরেন ও মমতা দোলায়িত। বড়লোকের ছেলে ভাবাবেগে রাজনীতি করতে এসে শেষকালে বিশ্বাসঘাতকতা করে ছিটকে গেল। এরা সংগ্রামের পূর্ব পর্যন্তই কেবল আন্দোলনের সঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু ঝড় উঠলে তখন নিজেরাই বেসামাল হয়ে পড়ে। ভাবপ্রবণ উচ্চবিত্ত একটা দাম্পত্য জীবন বাস্তবতার সংস্পর্শে এসে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। মমতা হীরেনও উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারল না। আরিফের মধ্যে কোন বিকার নেই। সে দেশের জন্য জেল খাটে। আবার সংগ্রামের কথা শুনলে সেদিকে এগিয়ে যায়। মমতার আগ্রহ আছে কিন্তু বাস্তববোধের অভাবে তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেজন্য সে বস্তীমানুষের ভালো করতে গিয়ে শেষকালে নিজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরে সে বুঝতে পারে উপর থেকে চেষ্টা করে এদের জীবনযাত্রার ধরণ বদলানো যায়না, জীবনযাত্রার আর্থনীতিক মান না বদলিয়ে কোন পরিবর্তনই সম্ভব নয়। তবু বাস্তবের কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচাই করে নেবার সুযোগ পায় মমতা। হীরেন চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানিক দেহ-বেচা মানুষদের, উঁচুতলার মানুষদের সুন্দর আলেখ্য এঁকেছেন। এদের কাহিনী মূল কাহিনীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে, চমৎকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন।

উপন্যাসটির নাম দর্পণ। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের এই দর্পণ। একদিকে লোকনাথ, উমাপদ, হেরম্ব, হীরেন, শশাঙ্ক, দিগম্বরী আর অন্যদিকে কৃষ্ণেন্দু, রম্ভ, বীরেশ্বর, মহীউদ্দিন আর শম্ভুর দর্পণ। অত্যাচারী ধনী হেরম্বদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত ঝুমুরিয়া গ্রামবাসীর বিক্ষোভের দর্পণ। এককালে আদর্শবাদী, হতাশায় ম্রিয়মান ঘুষখোর দারোগা শৈলেন দাসের দর্পণ। বস্তী জীবনের, বাগ্দীপাড়ার, দেহ-বেচা রূপজীবী অশিক্ষিত নিম্নস্তরের মানুষদের দর্পণ। এই উপন্যাসে নেতা কৃষ্ণেন্দু হলেও নায়িকা রম্ভা। মানিকবাবুর বাস্তবনিষ্ঠ মার্কসবাদীয় দৃষ্টিতে শোষণ জর্জর সমাজের এক অনবদ্য দর্পণ। স্বাধীনতা পূর্ব জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহের মধ্যে হেরম্বদের বিরুদ্ধে নতুন ঐতিহ্য মানিক এই উপন্যাসে সৃষ্টি করেছেন।

মানিকবাবু যে পথের সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলেন এই উপন্যাসে যেন তার সন্ধান পেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে মানিকবাবু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন বিষয়বস্তু আনয়ন করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন, নতুন জীবনের আস্বাদ দিয়েছেন।

১৯৪৬ সালে মানিকের পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশ লাভ করে। এর মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হোল 'সহরবাসের ইতিকথা'।

'সহরবাসের ইতিকথা' গ্রামীণ এক ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র মনোমোহনের গ্রাম ছেড়ে সহরে এসে বসবাস করারই কাহিনী। পিতার সহরে বাস চাপা পড়ে মৃত্যুর পর মনোমোহন মাতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থির করে সে পরিবারের সকলকে নিয়ে সহরে গিয়ে বসবাস করবে। তার সহরে যাবার কারণ কি একথা সেও স্পষ্ট জানে না। কেবল তার মনের মধ্যে একটা গভীর অসন্তোষ অনেকদিন থেকে জমে আছে এবং তার ধারণা হয়েছে কোলকাতায় গিয়ে বাস করতে না পারার জন্যই তার এই অসন্তোষ। সেজন্য সে কোলকাতায় গিয়ে বন্ধুর সাহায্যে তিনশ টাকা দিয়ে হাল ফ্যাসনের এক বাড়ী ভাড়া করে মা, স্ত্রী এবং ভাইবোনকে সঙ্গে নিয়ে সহরবাসী হোল। সহরে গিয়ে সে হাল ফ্যাসনের আসবাব কিনল, নতুন ডিজাইনের গাড়ী কিনল এবং সোসাইটিতে মিশবার জন্য ঘন ঘন পার্টি দিল। নানা মানুষের সঙ্গে সে মিশল। তাদের মধ্যে তার মনে বেশী রেখাপাত করল কর্মকুশল এবং আত্মপ্রত্যয়ী জগদানন্দ। সহরের তিনি এক সুন্দর সংজ্ঞা দেন, "সহর মানে বড় বড় বাড়ী, ট্রাম বাস লোকের ভিড় নয়। শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি সমস্ত বিষয়ে প্রতিভাবান মানুষেরা যেখানে একত্র থাকে সেটা হল সহর।" সে দেখে সহর জীবনের নানা জটিলতা। বিশেষ করে বন্ধু চিন্ময় এবং বান্ধবী সন্ধ্যার বিকারগ্রস্ত জটিল জীবনের সঙ্গে পরিচয় হয়ে তার অসন্তোষ বাড়ল বই কমল না। এখন নতুন করে অসন্তোষ দেখা দিল তার পরিবারের মধ্যে। জলের মত টাকাগুলো খরচ হয়ে যাচ্ছে দেখে মা অসুখী। ভাই পিতার সম্পত্তি ভাগের জন্য দাবীদার হয়ে উঠেছে। সন্তানহীনা স্ত্রী লাবণ্যের জীবনে দুর্বোধ্য বিকার দেখা দিল। তার পারিবারিক জীবনে ভাঙন ধরেছে, তাকে আর ঠেকানো চলে না তবু প্রাণপণে মোহন সংঘর্ষকে এড়িয়ে চলে। সে এই শহরের জীবন-স্রোতে কুটার মত ভেসে চলেছে, নোঙরের সে ব্যবস্থা করে নি। সে বুঝতে পেরেছে, টাকা আনতে পারলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তার জন্য সে অনেক বাস্তব পরিকল্পনাও করে রেখেছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারে, "ওসব পরিকল্পনার প্রচুর নিরপেক্ষ সংস্কার প্রয়োজন, নিজের তার প্রয়োজন অনেক অভিজ্ঞতার, অনেক সময়ের এবং অনেক মূলধনের।

সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, অনিবার্য্য প্রয়োজন, তার নিজের অন্য ধরণের মানুষ হওয়া।" যেমন হয়েছে গুরুদেবের ভ্রাতা জগদানন্দ এবং বৃদ্ধ পীতাম্বর। কর্মকুশলতায় এবং আত্মপ্রত্যয়ে জগদানন্দ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। পীতাম্বর গ্রামে ছিল প্রায় ভিক্ষাজীবী। সহরে এসে সে নিজেই নিজের কাজ যোগাড় করে নিয়েছে। সে একেবারে সহরের বাবু হয়ে পড়েছে। মোহনের সঙ্গে গ্রাম থেকে আরেকজন লোক এসেছে। সে শ্রীপতি কামার। শ্রীপতি মোহনের সুপারিশে এক কারখানায় চাকরী নিয়েছে। তাহলেও তার মন পড়ে থাকত গ্রামে যেখানে তার স্ত্রী আছে। কিন্তু সেও বদলে গিয়েছে। আগের মত আর সে বিচলিত হয় না, তুচ্ছ কারণে নয়, বড় কারণেও নয়। তার মধ্যে সর্বহারার চেতনা জেগে উঠেছে। সে পুরুষ মানুষ কারখানায় খেটে খায়, তার ত হারাবার মত কিছু নেই। কদম বা দুর্গার জন্য নেশাও তার কেটে গিয়েছে। সে কারখানার শ্রমিকদের সম্বন্ধে মিশে শ্রমিকের লড়াইর গল্প শোনে। নিজের অধিকারবোধ সম্বন্ধে সচেতন হয়।

এই উপন্যাসে মোহনের কাহিনীর সঙ্গে আছে চিন্ময় সন্ধ্যার কাহিনী। চিন্ময় মোহনের বন্ধু। সন্ধ্যা তার স্ত্রী। সে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী এক নারী। চিন্ময়কে সে বিয়ে করে শুধু অর্থের জন্য। কিন্তু বিবাহের পরেও সে জীবনযাপন করে স্বাধীন নারীর মত। মোহন তার বন্ধু। মোহনকে সে তার মনের কথা বলে। কিন্তু পরে চিন্ময় টাকা কমিয়ে দেওয়ায় সন্ধ্যা চিন্ময়ের কাছে ফিরে যায়।

মোটের উপর সভ্যতার সুখ সুবিধা ভোগ করতে আর যারা সেই সুখ সুবিধা পুরোমাত্রায় ভোগ করে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে এবং অর্থোপার্জন করতে এক গ্রামের বিত্তবান যুবকের সহরবাসের ব্যর্থ কল্পনার কথা মানিক তার সহজ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন। সহরবাসের কল্পনার মধ্যে যে প্রয়োজনের তুলনায় মোহনের বিকারই ছিল প্রধান সেটা মানিক চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। মানিক এই উপন্যাসে সহর জীবনের জটিলতার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। তবে বিভূতিভূষণের মত সহর থেকে গ্রামের রহস্যময়তায় আত্মবিস্মৃত হননি।

চিন্তামণি দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পটভূমিকায় গ্রাম বাংলার এক কাহিনী। দেশে আকাল দেখা দিয়াছে। চিন্তামণি পেটের ক্ষুধায় মধুবনী গিয়েছে। হরমণি রাইস মিলের নীলকণ্ঠ বাবুর বাড়ীতে ঝি গিরি করছে। চাঁপাবালাকে শ্বশুর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে; হেমীকে জোর করে বিয়ে করেছে। ডাকাতের হাতে হেমীকে বিয়ে দিয়েছে এই শোকে হেমীর মা পাগল হয়েছে।

নীলকণ্ঠ ঘোষাল মধুবনীর দুপুরুষের হরমণি রাইস মিলের মালিক। চিন্তামণি

এসেছিল কোলকাতার কালীঘাটে গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে। পটল তাকে নিয়ে এল বাবুর কাছে! এখানের চাঁদ গোয়ালা ভাইপো গৌরকে ঠকিয়ে অনেক জমিজমা করেছে। গৌর মাঠেও কাজ করে। দুধের কারবারও করে। ধানের দাম হঠাৎ চড়ে যাওয়ায় ওরা দু পয়সা দেখেছে। কিন্তু জমিদার মহাজনের শোষণে তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। "এবার সব উল্টোপাল্টা, গোলমেলে, অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। হাতের মুঠোয় এসে লাভ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে লোকসানে। ভাল ফসল ঘরে তুলে বেড়ে যাচ্ছে খিদের যাতনা ভোগ। জমিদার মহাজন উকিল ডাক্তার দোকানী পশারী আত্মীয় পরিজন বন্ধু ও পর নিয়ে যত মানুষের সঙ্গে ছিল তাদের কারবার, কটা মাসে যেন কেমন হয়ে গেছে তারা সকলে, কথা ও ব্যবহার যেন বদলে গেছে আগাগোড়া, লেনদেনের স্বাভাবিক হৃদয়হীনতা যেন দাঁড়িয়ে গেছে উলঙ্গ কুৎসিৎ নিষ্ঠুরতায়, লোভের যে অত্যাচার ছিল শুধু আদায়ের জন্য—আদায়ের পরে যেন তা বজায় থাকছে আরো তীব্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়ে।" চিন্তামণির দিদির জমিটুকু তার ভাশুর গায়ের জোরে দখল করে নিয়েছে। আপন দাদা তার আংটি চেয়েছে। আংটিটা বন্ধক ছিল বলে দিতে পারে নি। তাই দাদা রাগ করেছে। হেমীর জামাই শাশুড়ীকে প্রণামী একখানা কাপড় দিয়েছে গামছার মত। সোনার গহনা ইত্যাদি চেয়ে অনেক গোলমাল করে হেমীকে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছে। কাকী চাঁপাবালা আর হেমীকে রাখতে পারবে না বলে দিয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

গ্রামের মধ্যে রঘুর অবস্থা একটু ভাল। তার দুই বৌ। ছোট বৌ দুর্গার শরীর খারাপ। এবার ছেলে হবার সময় সে বাঁচবে না অনেকেই বলেছে। ডাক্তার এসে একটা ফুডের কথা লিখে দিয়ে গেল। কিন্তু চোরাকারবারে তার দাম ক্রমশঃ বাড়ছে বলে কোথাও তা পাওয়া যায় না। নীলকণ্ঠের বাড়ীতে কোন প্রয়োজন নেই। তবু সেখানে দুটো ফুড রয়েছে। চিন্তামনি গোপনে একটা ফুড এনে গৌরের হাতে দেয়। নীলকণ্ঠ চিন্তামণিকে গৌরের বাড়ী থেকে খাঁটি দুধ আনবার কাজে লাগায়। তারপর থেকে গৌরের সঙ্গে চিন্তামণির আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়। অনেক সময় রাতেও তাদের দেখাশোনা হতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ দুজনেরই মনে হোল ব্যাপারটা ভাল হচ্ছে না। তাই গৌর কিছুদিনের জন্য চলে যায় মামাবাড়ি।

পেটের ক্ষুধায় চিন্তামণি এসেছে মধুবনী আর তার দিদি এসেছে বড়মিহিপুরে ভূষণ বাবুর বাসায়। সে লিখেছে, "ভূষন বাবুরে তুমি চিনিবা তিনি মোদের গাঁয়ের

হালদার মশায়ের বড় জামাই। তোমার হাত ধরিয়া টানিতে দেখিয়া যাহাকে গালমন্দ করিয়াছিলাম কিন্তু কেলেঙ্কারীর ভয়ে প্রকাশ করি নাই।···বড়মিহিপুরে যে মস্ত কারখানা আছে তাহাতে ইনি কাজ করেন। কারখানা তুমি কি দেখিয়াছ এখন কি হইয়াছে। সিং পাড়া গাঁয়ের চিহ্ন নাই সেখানে কারখানা বসিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া থ বনিয়া গিয়াছি।"

বিশ্বমহাযুদ্ধের খবর মধুবনীতে এসে পৌছেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে জিনিষপত্রের দাম। জিনিষপত্র দুর্লভ হয়ে উঠেছে। "বঞ্চিত নিষ্পেষিত জীবন এদের কাছে স্বাভাবিক সঙ্গত ও অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, সুদূরের বিদেশের যুদ্ধের চাপটা তারা অনুভব করে ধীরে সুস্থে। কোনমতে বেঁচে থাকার সামান্য প্রয়োজনগুলি এলোমেলো হয়ে থাকার চাপ। কোনদিকের চাপটা বাড়ে ক্রমে ক্রমে কোনদিকের চাপ অকস্মাৎ বেড়ে গিয়ে তাদের দিশাহারা করে দেয়। তেল নুন মসলার দোকানে আধলা ছিদামের বিক্রী বন্ধ হওয়ার মধ্যে তারা ব্যক্তিগত ভাবে টের পায় যুদ্ধের ধাক্কা।" চাল পাওয়া যায় না, মিলের কাপড় পাওয়া যায় না। পুরানো রূপার টাকা নিয়ে গিয়ে সেখানে ছাড়ে কাগজের নোট। একটা রূপার টাকার দাম এক টাকার চেয়ে বেশী। চারদিকে আক্রা দেখা যায়। পেট ভরে লোকে খেতে পায় না। এমন সময় চিন্তামণি আবার তার দিদির চিঠি পেল। সে লেখেছে, 'ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। কী দুঃখ পাইয়াছি না খাইয়া উপাস করিয়াছি এখানে পোড়া পেটের জ্বালায় বজ্জাত ডাকাইতগুলার দাসী হইলাম ইহা অদেষ্টে ছিল। কিরূপ হৈ চৈ হইয়াছে লম্বা লম্বা কত বাড়ী উঠিয়াছে অবাক কাণ্ড দেখিয়া তুমি চোখের পলক ফেলতে পারিবা না। ইহাকে বারাক বলিয়া জানিবা। ইহার মধ্যে গাদায় গাদায় মাতাল গুণ্ডা গিজ গিজ করিতেছে। আমার মত শতাবধি পোড়াকপালী ঝি কাজ করিতে আসিয়াছে কাহারো ধর্ম নাই সতীত্ব নাই এরূপ কাণ্ড। বয়স হইয়াছে তথাপি আমারে টানাটানি করে কোনমতেই ধর্ম রাখিয়াছি। না খাইয়া মরিবার দাখিল হইয়াছিলাম ইহা ভিন্ন গতি কি। দুই স্থানে বাসন মাজিয়া তের টাকা করিয়া ছাব্বিশ টাকা পাই। যেরূপ কাণ্ড তোমারে আসিতে বলিতে ভরসা পাই না।"

গৌরের ঘরে চাল নেই। তার চাঁদ কাকা না খেয়ে মরে গেছে। গৌরেরও গেল জমিজমা ঘরদুয়ার বাসনপত্র। তারপর গেল পুঁটু ও গৌরের মা। চিন্তামণি বলল, এখানে কেন শুকিয়ে মরবে। তারচেয়ে চল বড়মিহিপুরে চলে যাই। সেখানে বড় কারখানায় আমরা দুজনে কাজ করব। দুজনে একসাথে থাকব। কোনমতে চলে যাবে।

"আজ গৌরের আত্মীয় নেই, ঘরবাড়ী নেই, জমিজমা নেই, পেটের ভাত নেই—কাকে তার ভয়, কিসের তার লজ্জা। তারা দুজনে বড়মিহিপুর যাবার ঠিক করে।"

চিন্তামণি একটা অবক্ষয়ের উপন্যাস, ভাঙনের উপন্যাস। গ্রাম ভাঙা অসহায় মানুষের কলে কারখানায় মজুরগিরি করার ইতিহাস। গ্রামে চাষ আর ধান কাটার মধ্যে অনেকখানি সময় আলস্যে কাটাতে হয়। তবু চাষীরা মজুর হতে চায় না। "মজুর হতে খাঁটি চাষী মরমে মরে যায়। ভূমিহীন চাষী পর্যন্ত। পরের জমিতে মজুরগিরিই সে করে। তবু চাষ আবাদ ছাড়া আর কিছু করে না চাষী।" সেই চাষী গৌরকেও শেষ পর্যন্ত কারখানায় কাজ করার জন্য গ্রাম ছেড়ে যেতে হয়। চিন্তামণির স্বভাব চরিত্র ভালো নয়। লোকে তাই বলাবলি করত। গৌরের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমানোর চেষ্টায়, পটলের সঙ্গে কথাবার্তায় তা মনে হয়। আসলে অভাবের তাড়নায় চিন্তামণি কোথাও স্থায়ী হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত গৌরকে কেন্দ্র করে ঘর বাঁধার স্বপ্নে তার কাহিনী শেষ হয়েছে। গৌর এই যুদ্ধের ধাক্কায় সর্বহারা হোল। চিন্তামণি তো ছিলই। সর্বহারা দুটি মানুষের মিলনে তো জাত কুলের ভেদ থাকতে পারে না। দুজনেই খেটে খায় আবার প্রয়োজনে দুজনেই একসঙ্গে মিলিত হয়।

উপন্যাসের আরম্ভ চিন্তামণির দিদির চিঠি দিয়ে। উপন্যাসে তাঁর পাঁচখানি চিঠি আছে। উপন্যাসের শেষও হয়েছে দিদির চিঠি দিয়ে। চিন্তামণি অবশেষে বড়মিহিপুরে দিদির কাছে রওনা হোল। সেখানকার মস্ত কারখানায় গৌর কাজ করবে, চিন্তামণি কাজ করবে। সেখানে তারা দুজনে একসঙ্গে থাকবে।

১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে দেশব্যাপী তুমুল বিক্ষোভ দেখা দেয়। এবছরের নভেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনজন নায়কের বিচার ও দণ্ড হওয়ায় সমগ্র দেশে বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। কোলকাতার রাস্তায় গুলি চলে। জনতার বিক্ষোভ চরমাকার ধারণ করে। এই বিক্ষোভ ক্রমে পুলিশ এবং সৈন্য বাহিনীর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। মুসলীম লীগ তখন পাকিস্থানের দাবীতে মুখর। কংগ্রেস এবং মুসলীমলীগ দুই বিবদমান শিবিরে বিভক্ত। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির। দেশবাসী কিন্তু তাতে বিভ্রান্ত না হয়ে প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে যোগ দেয়। এই আন্দোলনের তখন প্রধান সমর্থক এবং সংগঠক কমিউনিষ্ট পার্টি। কোলকাতার রাস্তায় এই তিনদলের পতাকা নিয়ে জনতা ঐক্যের দাবী জানায়। আর সোচ্চার হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদের ভারত ছাড়ার দাবী। ভারতের মানুষ আর পরাধীন থাকতে রাজী নয়।

এই আন্দোলনের চরম রূপ ধারণ করল ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ভারতীয় নৌ-সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বোম্বের সাধারণ শ্রমিক এই বিদ্রোহী সেনাদের সমর্থনে হরতাল পালন করল। ভারতীয় সৈন্য এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে অস্বীকার করল। বোম্বের ক্যাসল ব্যারাকের বাইরে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যদের যখন সাত ঘণ্টা ব্যাপী তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে তখন কোলকাতার বুকেও দেখা দিলো দারুণ উত্তেজনা। রসিদ আলি দিবসে ছাত্র-যুবক ধর্মঘট করে মিছিল নিয়ে বেরোল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাশে ধর্মতলার মোড়ে পুলিশ সেই মিছিল আটকে দিল। খবর পেয়ে বিভিন্ন সান্ধ্য কলেজের ছাত্ররাও ধর্মঘট করে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। পুলিশের ব্যারিকেডের সামনে ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে বসে পড়ল। তারপর রাত্রির অন্ধকার যখন নেমে এল তখন পুলিশও দানবের মত তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গুলি চালাল। মারা গেল 'রামেশ্বর'। ছাত্ররা কিন্তু স্থান ত্যাগ করেনি। আবার বসে পড়ল সেখানে। সারারাত এবং পরদিনও সকালে তারা পথ অবরোধ করে রাখল। জনস্রোত দুর্বার হয়ে উঠল। অবশেষে পরদিন বিকেলে পুলিশ ব্যারিকেড তুলে নিল। কোলকাতার রাস্তায় তিনলক্ষ লোকের শোভাযাত্রা বেরোল।

এই ঘটনার পটভূমিতে মানিক রচনা করলেন 'চিহ্ন' উপন্যাস। এই উপন্যাস কোন এক ব্যক্তি বিশেষের কাহিনী নয়। সেদিনের রাজপথের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের ভীড় হয়েছিল। সেদিনের পুলিশের অত্যাচারে বহু ঘরে ঘরে মায়েদের বুক ভেঙে গিয়েছিল। অতি দ্রুত ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে তাল রেখে মানিক লিখে চললেন রাজপথের অপরূপ কাহিনী। এ যে মিছিলের কাব্য। সেজন্য কোন এক বিশেষ চরিত্রকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাসের ঘটনার মালা গাঁথা হয়নি। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের মধ্যে যে বিচিত্র আলোড়ন দেখা দিয়েছিল মানিক অপূর্ব কৌশলে তাকে প্রকাশ করে তুলেছেন। মানিকই প্রথম এই নতুন টেকনিকে উপন্যাস লিখলেন। জনতার বিচিত্রতা এবং বিভিন্নতা রেখেও তাকে উপন্যাসে গ্রথিত করা যায় তারই এক চমৎকার নিদর্শন সৃষ্টি করলেন।

কাহিনীর আরম্ভ গণেশকে নিয়ে। বহু মানুষের মধ্যে সে একজন। রাজপথে জনতা আর পুলিশ নিয়ে এত বিরাট এত মারাত্মক ঘটনা আর দেখা যায়নি। গণেশ অবাক হয়ে যায়। "হাঙ্গামা যে এমন অনড় অটল ধীর স্থির হয়, বন্দুকধারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষ এদিক ওদিক এলোমেলো ছুটোছুটি করে না, এ তার ধারণায় আসে না।

এ কেমন গণ্ডগোল যেখান থেকে কেউ পালায় না। তাই চলে যাবার কথা মনে হয়, তার পা কিন্তু অচল।"

রাজপথের এই শোভাযাত্রায় এসেছে অনেক মানুষ। তাদের মধ্যে আছে গণেশ, ওসমান, হেমন্ত, সীতা, শিবনাথ, রসুল, আবদুল এবং আরও অনেকে। হেমন্ত কলেজের ভাল ছাত্র। সে কখনো রাজনীতির তর্ক-বিতর্কে যোগ দিত না। সীতা তার সহপাঠিনী। সে তার এই ভুল বুঝিয়ে দিয়েছে। হেমন্তও রাজপথের ফুটপাথ ছেড়ে আসতে পারেনি। "দেশের মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে, ছেলেদের মধ্যেও। নতুন ভাব, নতুন চিন্তা, নতুন আদর্শ, নতুন উদ্দীপনা এসেছে।" স্কুলের ছেলে রজতের মধ্যেও তার সাড়া জেগেছে। সেও বুঝে পুলিশ তাদের উত্তেজিত করে তুলতে চাইছে। তাহলে তাদের উপর অত্যাচার করবার একটু অজুহাত পাবে। দেশের লোককে বোঝাতে পারবে এরা দাঙ্গা করতেই এসেছিল। অতএব রজতও বুঝে পুলিশের শত প্ররোচনা সত্ত্বেও তাদের ধীর স্থির ভাবে আন্দোলনে সামিল থাকতে হবে। রজতের দিদিও আছে জনতার মধ্যে। নারায়ণ রজতের কথা শুনে বিস্মিত হয়। "পুঞ্জ পুঞ্জ সঞ্চিত যে ঘৃণা, জীবন্ত মর্মান্তিক ঘৃণা, অস্থির চঞ্চল করে রাখে তাকে সব সময়. নতুন করে নাড়া লাগলে যেন উন্মাদ করে তোলে, নিজে বয়লারের মত শক্ত হয়ে সেই প্রচণ্ড ঘৃণার বাষ্পকে সে যেন আয়ত্ত করেছে এখন, চাকা ঘুরবে এগিয়ে যাবার, তারই মত এদের সবার বুকে ঘৃণা, এতটুকু ছেলেটির পর্যন্ত। কিন্তু সে আর পরাজিতের পদদলিতের নিস্ফল আক্রোশে জ্বলে পুড়ে মরার ঘৃণা নেই, তা এখন জয়লাভের প্রেরণার উৎস।"

পুলিশের গুলিতে গণেশ মারা যায়। রসুলের গুলি লেগেছে। হাসপাতালে তার ডান হাতটা কেটে ফেলেছে। তবু সে বাঁ হাত দিয়েই কি করে কাজ চালিয়ে যাবে সেই কথা ভাবে।

রাজপথের গণ্ডগোল থামাতে আসে বসন্তরায়ের চেলা অমৃত মজুমদার। ছাত্ররা কিন্তু তার কথা শোনে না। অমৃতও অনুভব করে, তার এতদিনকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খায় না আজকের অবস্থা, তার জানাশোনা ধরাবাঁধা পুরানো নিয়মে আজকের ঘটনা ঘটেনি।"

এদিকে বাড়ী বাড়ীতে গণেশের মা গণেশের খবরের জন্য ছটফট করে। ছটফট করে রসুলের মা, হেমন্তের মা। গণেশ কাজ করতো চোরাকারবারী দাসগুপ্তের দোকানে। তার সব রকমের ব্যবসা ছিল। মদ মেয়ে মানুষেরই বেশী। লুকিয়ে মদ চালান দিত। আর সেই চালান নিয়ে যেত গণেশ কুলি হিসেবে। সেদিনও

নিয়ে যাচ্ছিল ক্যামারণের বাড়ী। পথে মাথায় গুলি লেগে হঠাৎ সে মারা যায়। ওসমান গণেশকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিল। সেখানে তার সঙ্গে দেখা হোল রসুল আর বিশ্বনাথের সঙ্গে। "কত রোগ আঘাত যাতনা মৃত্যু শোক দুঃখ হতাশা ভরা হাসপাতালের এলাকা, হৃদয় ভারি তিনজনেরই। তবু তারা সহজভাবে কথা কয়, জীবন্ত মানুষের যেন জীবনের অকারণ অর্থহীন অভিশাপগুলির জন্য বিচলিত হতে নেই, ব্যাকুল হতে নেই, ব্যথাও পেতে নেই!"

হেমন্তের মা অনুরূপা বিধবা। নিজে গান শিখিয়ে রোজগার করে সংসার চালান। অনুরূপা চিন্তা করে, "সত্যি, যুদ্ধ থামল কবে,—ভাবলাম যাক, এবার নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। অবস্থার উন্নতি হল ছাই, দিন দিন আরও যেন খারাপ হচ্ছে। খ্যাওরের চাকরিটা যাবে সামনের মাসে।" হেমন্ত অনেকরাতেও বাড়ী না ফেরায় দুশ্চিন্তা জাগে। তিনি সীতার কাছে যান হেমন্তর খোঁজ নিতে। অনুরূপার সঙ্গে আলাপ করে সীতা হেমন্তের অনেক অন্ধতা আর কুসংস্কারের কারণ অনুভব করে। 'সজ্ঞান সাধনায় পরবর্তী জীবনে চিন্তা ও অনুভূতির জগতে নূতন ধারা আনা যায় আপোষহীন অবিশ্রাম কঠোর সংগ্রামের দ্বারা। নিজের সঙ্গে লড়াই করার মত কষ্টকর, কঠিন ব্যাপার আর কি আছে জীবনে। বুদ্ধি দিয়ে যদি বা আদর্শ বেছে নেওয়া গেল, কর্তব্য ঠিক করা গেল, সে আদর্শ অনুসরণ করা, সে কর্তব্য পালন করা যেন ঝকমারি হয়ে দাঁড়ায় যদি তা বিরুদ্ধে যায় প্রকৃতির। ই ন্টেলেক্‌চুয়ালিজমের ব্যর্থতার কারণও তাই। বুদ্ধির আবিষ্কার, বুদ্ধির সিদ্ধান্ত কাজে লাগানোর চেয়ে অন্ধ অকেজো ভালো-লাগা ও পছন্দকে মেনে চলা অনেক সহজ; অনেক মনোরম। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাই অধঃপতন এত বেশী। এত বেশী হতাশা। ক থার এত মার প্যাঁচ। এত ফাঁকিবাজী। বিশ্বাসের এমন নিদারুণ অভাব।"

সেই হেমন্ত গুলি চালাবার সময়েও রাজপথে ছিল। তারও অল্প চোট লেগেছে। সীতা অনুরূপাকে বলে, "মুক্তি-সংগ্রামে ছাত্রদেরও যে একটা অংশ আছে, সাধারণ অবস্থায় সে অংশ গ্রহণ করা যে পড়াশুনার এতটুকু বিরুদ্ধে যায় না, বরং চরিত্র গঠনে আর মানসিক শক্তির বিকাশে সাহায্য করে, এই সহজ কথাটা মাথায় আসে না কেন আপনাদের মাসীমা?"

হেমন্ত বাড়ী ফিরে আসে কিন্তু পরদিনই আবার প্রতিবাদ দিবসে মীটিং-এ যোগ দিতে যায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা মনুষ্যত্বের ধর্ম আর লেখাপড়া শেখাও মনুষ্যত্ব বৃদ্ধির জন্য। অতএব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লেখাপড়ার চেয়ে কম গুরুতর নয়। হেমন্তের এ পরিবর্তনে অনুরূপা বিস্মিত হয়।

গুলির আঘাতের জন্য রসুলের ডান হাতটা হাসপাতালে কেটে বাদ দিয়েছে। উপরন্তু তাকে ঐ অবস্থায় গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। রসুল রাতের অন্ধকারে পালিয়ে মাকে দেখতে এসেছে। রসুলের মা আমিনা তার কাটা হাত দেখে আর্ত-চীৎকারে ফেটে পড়ল। কিন্তু সব শুনে আমিনার মনে হয়, "দেশের সব ছেলেই তার রসুলের মত—অন্য কোন পথ তাদের নেই।" আব্দুল এসে ভোর রাতে আবার রসুলকে ডেকে নিয়ে হাসপাতালে চলে যায়।

অক্ষয় রোজ মদ খায়। সেদিন বাড়ী থেকে বেরোবার সময় সে প্রতিজ্ঞা করেছিল আর সে খাবে না। কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতে তার খাবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠে। কিন্তু "সারাদিন রাজপথের ও দৃশ্য দেখার পর মদ খেলে বড়ই নোংরামি করা হবে সেটা।" সেজন্য তার আর মদ খাওয়া হয় না। অনেক রাতে অক্ষয় নেশা না করে বাড়ী ফিরেছে। "তার নেশা করার জন্য সুধা কষ্ট পায় সে জানত, কিন্তু কত তীব্র, কি অসহ্য যে হত সে কষ্ট তা সে শুধু আজকে, এখন, সুধাকে চোখে দেখবার পর, প্রথম পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছে।···পশুর মত কিভাবে সুধাকে সে নির্যাতন করে এসেছে, এতকাল পরে আজ প্রথম পশুর মত জমজমাট নেশা না করে বাড়ী ফিরে হঠাৎ সেটা অনুভব করে, আজ প্রথম আন্তরিক অনুতাপ দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।"

অক্ষয় আজ প্রথম উপলব্ধি করে, "প্রায়শ্চিত্ত বাকী আছে তার, অনেক প্রায়শ্চিত্ত। নিজেকে অনেক দিন ধরে দলে পিষে ছিঁড়ে ধুনে চলতে হবে। নেশা করার দুরন্ত, অবাধ্য দৈহিক মানসিক- সর্বাঙ্গীন সাধ শুধু নয়, সে যে মাতাল হওয়া বরবাদ করেছে এ বিষয়ে বহুকাল ধরে ঘরে বাইরে সকলের অবিশ্বাসের পীড়ন। মাথাটা আজ যেন আশ্চর্য রকম সাফ মনে হয় অক্ষয়ের। জগতের যাবতীয় সমস্যার মর্ম যেন তার আজ মদ খাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও না খাওয়ার এবং এ নেশা যে ভাবেই হোক ত্যাগ করায় প্রতিজ্ঞার বিদ্রোহে অকস্মাৎ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে জীবনে—কঠিন, কঠিন এ কাজ।

কিন্তু অন্য এক ভয়ঙ্কর নেশাতে একেবারে সচেতন অচেতন মন নিয়ে মশগুল হওয়ার মজাও টের পেয়েছে অক্ষয়, বাঁচার জন্য বাঁচাবার জন্য গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে মরা। এই প্রথম ও নতুন নেশা এত সাফ করে দিয়েছে তার মাথা যে সে জেনে গিয়েছে মদ হয়তো সে খাবে দু' একবার নিজের দুর্বলতায় কিন্তু সেটাও দু'একবারের বেশী আর খাবে না, কারণ, ফেনিল গ্লাসে চুমুক দিতে গেলে তার মনে হবে যে জীয়ন্ত তাজা ছেলের রক্ত খাচ্ছে—গেঁজানো রক্ত।"

সুধা (প্রথমে কিন্তু অক্ষয়ের স্ত্রীর নাম বলা হয়েছে অলকা। এরকম অসংলগ্নতা মানিকের গ্রন্থে অনেক দেখা যায়) কিন্তু প্রথমে ভাবতেই পারেনি অক্ষয় নেশা করে আসে নি। সে যে নেশা না করে থাকতে পারে এটা আর কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। পরে জানতে পেরে সুধা বিস্মিত হয়েছিল। অক্ষয় তখন সুধাকে তার নেশা না করার কারণ বলল : "এমন ব্যাপার আজ দেখলাম, যাদের মেয়ে-শোঁকা ভাবপ্রবর্ণ-ফাজিল ছোকরা বলে জানতাম, তাদের এমন অদ্ভুত মনের জোর দেখলাম, আমি একেবারে থতমত খেয়ে গেলাম সুধা। বুঝলাম যে, আমি যা ভাবি সব ভুল। মদ খেতে হোটেলের দরজা পর্যন্ত গেলাম কিন্তু তখনো ভাবছি, গুলি খেলে মরতে হবে জেনেও সাধারণ একটা ছেলে যে গুলি খাবার জন্য তৈরি, ওটা কিসের নেশা? মদ না খেয়েও যদি মানুষের ও রকম নেশা হ'তে পারে, আমি তবে কেন বোকার মত গাঁটের পয়সা খরচ করে এই সস্তা বিশ্রী নেশা করি? ওই ছেলেগুলোর জন্য আজ খেতে পারলাম না। আমার মনের জোরের জন্য নয়।"

অক্ষয় ত মানিক নিজে। ধর্মতলার মোড়ে যেদিন ছেলেরা পথ আটকে পুলিশের মুখোমুখি বসেছিল সেদিন মানিক ওদিকে গিয়েছিলেন রোজকার নেশার তাগিদে। সেদিনের ব্যাপার দেখে তিনি মদ না খেয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। এখানে মানিকের মদ খাওয়ার জন্য সুন্দর আত্মসমালোচনা এবং অনুশোচনা ফুটে উঠেছে।

পরদিন গুলি চালানোর প্রতিবাদে সহরে হরতাল এবং সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হলো। গুণ্ডারা এ সুযোগ গ্রহণ করে দোকান লুটের চেষ্টা করে কিন্তু সাধারণ শ্রমিকেরা তাতে বাধা দেয়। হেমন্তও রাস্তায় নামে। "পরিবেশ গড়ে মানুষকে, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলাই সহজ মানুষের পক্ষে, অতি দরকারী লড়াইও এড়িয়ে চলতে মানুষ এত ব্যাকুল, পলাতক মনোভাব তাই এত প্রবল। পালিয়ে পালিয়ে এড়িয়ে চলার দিন তার পক্ষে ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু কি করতে হবে তাকে আগামী দিনগুলিতে ঠিকমত তার জানা নেই।"

আজ কালের ছেলেমেয়েদের বেপরোয়া ভাব দেখে অনন্তের তাক লেগে যায়। "আগে যখন আরও সহজে সংসার চলত, অজয়ের পড়া চালানো, মাধুর বিয়ে দেওয়া, এসব ব্যবস্থা এক রকম করে করা যাবে মরে বেঁচে এ ভরসা করা চলত; তখন যেন কেমন হতাশ, মনমরা ছিল সকলে, রাগারাগি চুলোচুলি কাঁদাকাটা অশান্তি লেগেই ছিল ঘরে—এখন আরও শোচনীয় অবস্থায় এসে ভবিষ্যতের সব আশা ভরসা হারিয়ে আধপেটা খেয়ে ছেঁড়া কাপড় জামায় দিন চালিয়ে নিয়েও সবাই যেন জীয়ন্ত বেপরোয়া

হয়ে উঠেছে—ভয় নেই ভাবনা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা সব ঠিক করে নেব, এই ভাব সকলের।"

গুলি চালানোর পরদিন কোলকাতায় ভীষণ কাণ্ড চলেছে, চারিদিকে লড়াই শুরু হয়েছে সারা শহরে। পাড়ায় পাড়ায় ব্যারিকেড সৃষ্ট হয়েছে। মিলিটারি ট্রাকে আগুন দিয়েছে। লোকেরা ইঁট ছুড়ছে, গাড়ী পোড়াচ্ছে। পুলিশ গুলি চালাচ্ছে। এর মধ্যে গণেশের মা বোন যাদবকে নিয়ে গণেশের খোঁজ করতে আসে। কিন্তু গণেশের কোন সংবাদ পায় না তারা। দাশগুপ্ত সঠিক কথা তাদের বলে না। ব্যর্থ হয়ে হাওড়ার এক পরিচিত ঠিকানায় যাওয়ার সময় তারা দেখে বিরাট এক শোভাযাত্রা তিন রকমের বড় পতাকা নিয়ে লালদীঘির ওদিকে মোড় ঘুরছে। তারা তাদের পরিচিত অজয়কে দেখতে পায়। সে যেন নিজের মনে বলছে, আমরা এগিয়েছি। ঠেকাতে পারে নি। আমরা এগিয়েছি।

ঘাড় উঁচু হয়ে গেছে অজয়ের। দুটি চোখ জ্বল জ্বল করছে আনন্দে, উত্তেজনায়। যাদব চেয়ে দেখে, সে হাসছে। মুখে যেন তার সূর্য উঠেছে মেঘ কেটে গিয়ে।

রসিদ আলি দিবসে কোলকাতার জীবনে যে নতুন উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল মানিক এ উপন্যাসে তাকেই ভাষারূপ দিয়েছেন। এযেন মিছিলের মহাকাব্য। নানা মানুষের ভীড়ে এ উপন্যাসের গ্রন্থন এগিয়ে চলেছে। মিছিলের অগ্রগতির মধ্যে তাদের জয়ধ্বনির মধ্যে তার শেষ হয়েছে। এ সত্যি এক নতুন টেকনিকের উপন্যাস। কাহিনীর রস কিন্তু ব্যাহত হয় নি। শেষ পর্যন্ত একটি কাহিনীর মত পরিণতি লাভ করেছে। এখানেই মানিকের কৃতিত্ব।

'আদায়ের ইতিহাস' (১৩৬৮) 'অস্থিরমতি, একঘেয়ে, বিকারগ্রস্ত এক যুবকের কাহিনী। ছাব্বিশ বছর বয়সে তার খেয়াল হোল 'জীবনে সে পাওয়ার মত কিছুই পায় নাই।' জীবনে সে বড় কিছু করবে বলে বাবার অফিসে পঁচাত্তর টাকার কেরানীর কাজে যোগ দিতে চাইল না। কিন্তু সে যে বড় কী করবে তাও সে কখনো ভেবে দেখে নি। পাড়ার মনীশদা ওর চিন্তায় অসংলগ্নতা দেখিয়ে দিল। সে কাজে যোগ দিল। মনীশের বাড়ীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হোল।

মনীশের বোন রমলা এবং তার স্বামী ধীরেনকে দেখে ত্রিষ্টুপের মনে হোল তারা সুখী। তাতে তার মন বিরূপ হোল। কারণ, "চারিদিকে সে দেখতে পায় মানুষের মুখে দুঃখের কালো ছায়া, দেহে ক্ষয়, জীবনে অপচয়, সঙ্কীর্ণ নিঃস্ব আবেষ্টনীর পেষণ। এই পরিচয়েরই ছাপ মারা তার বর্তমান।" সে আগে ভেবেছিল অনেক ঐশ্বর্য নিয়ে সে সুখী হবে। কিন্তু রমলা ও ধীরেন তার মনে খটকা জাগায়। মাত্র

ত্রিশ টাকা মাইনের কেরানীর জীবনেও সুখ এবং আনন্দ দেখে তার বিস্ময় জাগে। ওদের বাড়ী গিয়ে ত্রিষ্টুপ প্রথম বুঝতে পারে—"অন্যে তুচ্ছ করিলে নিজের কাছে মানুষ কি ভাবে তুচ্ছ হইয়া যায়, অন্যে দাম দিলে কি ভাবে দাম বাড়ে। জীবনকে রমলা শ্রদ্ধা করে। ধনীকে নয়, মানীকে নয়, গুণীকে নয়, জীবনের প্রতীক মানুষকে সে সম্মানের অর্ঘ্য দিয়া পূজা করে। তার কাছে থাকিলে ব্যর্থতার ক্ষোভ মানুষের তুচ্ছ হইয়া যায়। কারণ কিছু না বলিয়াও সে যেন ক্রমাগত বলিতে থাকে, ব্যর্থতা ও সার্থকতার চেয়ে মানুষ অনেক বড়, যে অবস্থায় জীবন যাপন করুক, মানুষ চিরদিনই মানুষ।"

ত্রিষ্টুপ তার বাবার বাধ্য ছেলে। মাইনের টাকা বাবাকে দিয়ে দেয়। কিন্তু একবার মাইনে পাওয়ার পর বন্ধুদের অনুরোধে একটু ফুর্তি করতে যায়। দেহ-বেচা এক মেয়ে মানুষের বাড়ীতে সে মদ খেয়ে অনেক রাতে বাড়ী ফেরে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠার পর তার মনে হল, "কি অদ্ভুত, কি বিচিত্র, কি বীভৎস একটি রাত তার কাটিয়াছে কাল।" তবে "এটুকু ত্রিষ্টুপ বুঝিতে পারে যে এসব অভাবের ফল, মাস কাবারের পর অফিসের তিন বন্ধুর ফুর্তি করার বিকৃত সখ ওই ধরণের বিকার। কিন্তু তার কতখানি তনুগত আর কতখানি মানসিক অভাব-বোধের চাপ, ঠিক কি ধরণের সেই অভাব এবং তার কারণ কি, এ সব সে ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না।"

ত্রিষ্টুপ ঠিক করে সে ভবিষ্যৎকে গড়ে উঠতে দেবে। অবশ্য সে জানে না ভবিষ্যৎটা কি রকম হলে সে সুখী হবে। সে আর নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না। অতএব এখন থেকে সে তার পাওনা আদায় করতে করতে চলবে। সে মনীশের কাছে কুন্তলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে। মনীশ রাজী হয় না। কুন্তলাও নয়। সে ক্ষেপে গিয়ে কুন্তলাকে নষ্ট করতে চায় কিন্তু পারে না। কুন্তলা ত্রিষ্টুপের ভুল ধরিয়ে দিল। মনীশ টাকা পয়সা, মানসম্ভ্রম থাকলেই তাকে বড় বলে মনে করে না। মনীশ কুন্তলাদের জীবনের ছক আলাদা। তারা জীবন দিয়ে টাকা পয়সা চায় না, চায় স্বাধীনতা। কুন্তলা বলে, "বুঝতে পারছেন আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে কেন অসম্ভব? আপনি যা' চান সে সব আদায় যারা করেছে, তারা হল এক জাত, আর তাদের পায়ের নীচে যারা চ্যাপ্টা হয়ে মরছে, তারা হল আরেক জাত। আমরা ওই জাতের। বেজাতের হাতে দাদা কখনও বোনকে দিতে পারে?"

ত্রিষ্টুপ অবশ্য বলে সেও তো কেরানী। কিন্তু কুন্তলা বলে "কেরানীর কোন জাত নেই। জামাই বাবু আমাদের জাতের লোক পেটের জন্য কেরানীগিরি করছেন।

জামাইবাবু দু' বছর পরে এই সে দিন ফিরেছেন, জানেন না ?" স্বাধীনতার জন্ত যে জীবনাদর্শ ত্রিষ্টুপ আজ তা বুঝতে পারে। সে বলে সে যদি নতুন ছক কাটে, সে যদি কুন্তলাদের জীবনের আদর্শের সঙ্গে এক হতে পারে তা হলে কুন্তলা তাকে বিয়ে করবে কি না। কুন্তলা রাজী হয়। এই স্বীকারোক্তির মধ্যেই গল্পের শেষ। ত্রিষ্টুপ এতদিন মনে করেছিল কুন্তলা বুঝি মনীশের চিন্তার প্রতিধ্বনি। আজ তার সেই ভুল ভাঙল।

আসলে ত্রিষ্টুপ বিকারগ্রস্ত এক অস্বাভাবিক যুবক। সে যেমন কুন্তলার মত আদায় করে নিল তেমনি কুন্তলাও ত্রিষ্টুপের এই বিকারগ্রস্ত অবস্থা থেকে এক সুস্থ জীবনাদর্শ অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল।

॥ ৮ ॥

অতি তীব্র রোমান্টিক উপন্যাস 'দিবা রাত্রির কাব্য'-এর পর মানিকের আর একটি উগ্র রোমান্সের কাহিনী 'চতুষ্কোণ' প্রকাশিত হল ১৯৪৮ সালে। তবে দিবা রাত্রির কাব্যে প্রেম অপ্রাকৃত কল্পলোকের এক সামগ্রী আর চতুষ্কোণে তা যান্ত্রিক দেহসীমায় আবদ্ধ। জীবন সংগ্রাম এবং বাস্তব বোধ থেকে প্রেমকে পৃথক করে নিলে যে বিকৃতি দেখা দেয় এই উপন্যাসে আছে তারই এক সুন্দর চিত্র। মধ্যবিত্ত সমাজে প্রেমকে কেন্দ্র করে আত্মঘাতী এক বিকার অবস্থা বর্তমান। প্রেম এদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু জীবনের স্বাভাবিকতা এবং বাস্তববোধ থেকে বিচ্যুত হলে এক উদ্ভট অবস্থার সৃষ্টি হয়। রাজকুমারকে কেন্দ্র করে গিরি রিণি মালতী সরসীর এই উদ্ভট প্রেমের কাহিনীই মানিক এই উপন্যাসে অঙ্কিত করেছেন।

রাজকুমার এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার সম্পর্কে ভূমিকায় মানিক লিখেছেন, "রাজকুমারের মত অসংখ্য ছেলে দেখেছি। তারা নানা রকম, কিন্তু আসলে এক। রাজকুমারকে 'টাইপ' বলে ধরলে ভুল করা হবে। একজনের মধ্যে অনেককে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। এই 'অনেক' যারা তাদের মধ্যে মূলগত মিল আছে, তাই এটা সম্ভব হল। রাজকুমার একটু বেলুনের মত ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু তাতে কিছু আসবে যাবে কি ? আমার উদ্দেশ্যও তাই ছিল।"

রাজকুমারের অবস্থা ভাল। বাড়িতে দূর সম্পর্কের দিদি ছাড়া আর কেউ নেই। সেজন্ত তার সম্পর্কে যুবতী মহলে বিশেষ আগ্রহ। রাজকুমার কিন্তু তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে যান্ত্রিক ভাবে। তার মধ্যে আবেগ অনুভূতির বিশেষ

বালাই নেই। সরসীর কাছে সে পরে নিজেই স্বীকার করেছে, "কারো সঙ্গে আমার বনে না, সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। অন্য সবাইকে দেখি, খুব যার সঙ্কীর্ণ জীবন, তারও কয়েকজনের সঙ্গে সাধারণ সহজ সম্পর্ক আছে, আত্মীয়তার, বন্ধুত্বের, ঘৃণা বিদ্বেষের সম্পর্ক। কারো সঙ্গে আমার সে যোগাযোগ নেই। কি যেন বিকার আমার মধ্যে আছে সরসী, আর দশজন স্বাভাবিক মানুষ যে জগতে সুখে বিচরণ করে আমি সেখানে নিজের ঠাঁই খুঁজে নিতে পারি না। আমার যেন সব খাপছাড়া উদ্ভট।" সে তাই গিরির নাড়ী দেখবে বলে হার্ট পরীক্ষা করতে চায়। আর গিরির মার বকুনি খেয়ে বাড়ী থেকে তাকে চলে আসতে হয়। বিরাট অভিজাত স্যার কে. এল. এর মেয়ে রিণি খেয়ালের বসে রাজকুমারের চুম্বন প্রত্যাশায় মুখ বাড়িয়ে দিলে সেটা তার কাছে বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মালতীকে সে পড়ায়। কিন্তু তার সঙ্গে তার সম্পর্ক গুরু শিষ্যার সম্পর্ক নয়। রাজকুমারের প্রতি মালতীর শ্রদ্ধা ভালোবাসায় পরিণত হয়। মালতীর কথায় সে হোটেলের রুম ভাড়া করে মালতীকে নিয়ে যায়। তবু মালতীর প্রস্তাবে রাজকুমার এগোতে পারে না। মালতীর প্রণয়ী শ্যামল রাজকুমারকে শ্রদ্ধা করত। মালতীর সঙ্গে রাজকুমারের আচরণ এবং গিরির কেলেঙ্কারী তার সেই শ্রদ্ধা নষ্ট করে ফেলে। সে সোজাসুজি রাজকুমারকে জিজ্ঞেস করে সে মালতীকে বিয়ে করবে কি না। কিন্তু রাজকুমার স্পষ্ট উত্তর দিতে পারে না।

গিরির আচরণ এবং শ্যামলের প্রশ্ন রাজকুমারের জীবনে নাড়া দেয়। দূর সম্পর্কের দিদি মনোরমা কালীর সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে তাকে রাজকুমারের বাড়ী আনিয়ে রাখে। সাজিয়ে গুজিয়ে রাজুর কাজ করার জন্য সে কালীকে পাঠিয়ে দেয়। রাজকুমারও কতকটা কালীর সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠে। কালী যেন নীরব আত্মনিবেদনের জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। রাজকুমারের জীবনে একটা পরিবর্তন আসে। কিন্তু তখনো সে নারীদেহের মধ্যে সৌন্দর্যের পরিবর্তে থিয়োরীর সন্ধান করে। তার যেন 'সব বাঁকা সব জটিল।' সে মেয়েদের দেহের গড়নের সঙ্গে মনের গড়নের প্রকৃতি বুঝবার চেষ্টা করে। সেজন্য রিণির কাছে প্রস্তাব করে তার বাথরুমে থেকে রিণির স্নান প্রত্যক্ষ করবে। রিণি তাকে পানাসক্ত মনে করে তাদের বাড়ী আসতে নিষেধ করে। সরসী রিণির কথা শুনে রাজকুমারকে বাড়ী ডেকে নিয়ে নিজের নিরাবরণ দেহ দেখিয়ে রাজকুমারের কৌতূহল নিবৃত্তি করে। রাজকুমারের অশোভন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও রিণি তারপর থেকে নিজেকে ভীষণ বিচলিত বোধ করে। ফলে সে উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হয়।

সরসীর কাছে খবর পেয়ে রাজকুমার দেখা করতে যায়। রাজকুমারকে দেখলে রিণি যেন একটু সুস্থ থাকে। যখন সুস্থ ছিল তখন রিণির সঙ্গে তার বনত না। কিন্তু পাগল হয়ে সকলের আশ্রয় ত্যাগ করে রাজকুমারকেই সে আশ্রয় করেছে। আগে রাজকুমারও ওকে পছন্দ করত না। কিন্তু এখন রিণির জন্য রাজকুমারের মন কাঁদে। রিণির সঙ্গে রাজকুমার স্বামী-স্ত্রীর মত দিনরাত একত্রে কাটায়। রিণির পিতাও মেয়েকে কিছুটা সুস্থ দেখে তাতে মত দিয়েছেন।

এভাবে উন্মাদিনী রিণির সাহচর্য নিয়ে রাজকুমার নিজেকে সকলের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। সরসীকেও সে মুক্তি দিতে চেয়েছে। কিন্তু সরসী মুক্তি নেয় নি। রিণির সঙ্গে রাজকুমারের ঘনিষ্ঠতা তার কাছে কোন দোষের মনে হয় নি। সরসীর আন্তরিকতা অকৃত্রিম।

মনোরমা এ উপন্যাসের একমাত্র স্বাভাবিক চরিত্র। কিন্তু সেতো উপলক্ষ। একটি উদ্ভট চরিত্রের চতুষ্কোণিক প্রেমের কাহিনী এই উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে। মানিক এই কাহিনীর মধ্যে রাজকুমারের খাপছাড়া উদ্ভট স্বভাবের কথা রূপায়ণের দিকেই লক্ষ্য রেখেছেন। সেদিকে মানিকের সাফল্য স্বীকার করেও একথা অনস্বীকার্য যে উপন্যাস হিসেবে চতুষ্কোণ উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি হয় নি। রাজকুমারের চরিত্রের দ্বন্দ্ব খুব তীব্রতা লাভ করেনি। কাহিনী গঠনে শৈথিল্য তো আছেই। তথাপি মানিক সংযত ভাবে এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সেজন্য মানিকের দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়। বর্তমানের অন্য কোন লেখক হলে এই উপন্যাসেই আদিরসের প্রাবল্য সৃষ্টি করে দিতেন।

প্রেম জীবনের সহচর। প্রেমহীন জীবন মনে হয় দুর্বিষহ। কিন্তু প্রেমকে সমগ্র জীবনধারার সঙ্গে সমন্বিত করে না নিলে জীবন মনে হয় তিক্ত, বিষাদময়। মনে হয় ধরা বাঁধা জীবনের মধ্যে এই প্রেমের বিকাশ নেই, আছে অপমৃত্যু। সেজন্য প্রেম সহজ স্বাভাবিকতার মধ্যে ধরা দিতে চায় না। কিন্তু এই চিন্তাধারা খণ্ডিত, অপূর্ণ। প্রেম তো জীবনেরই এক বিশেষ অনুভূতি। এই অনুভূতিকে বাদ দিয়ে জীবন-বিচার অসম্ভব। তা ছাড়া জীবনের দুটো দিক অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন। অন্তর্জীবনে আছে অন্তরের রাজ্য—হৃদয়ের সেখানে প্রাধান্য আর বহির্জীবনে কর্মের। এই হৃদয় এবং কর্মকে একত্রিত করতে না পারলে জীবনে বিড়ম্বনা দেখা দেয়। একটি বাদ দিয়ে অন্যের উপর বেশী প্রাধান্য দিলে জীবনে বিকার দেখা দেয়। অতএব জীবনকে দেখতে হবে সামগ্রিকভাবে। মানুষের ভাবনা, অনুভূতি ও দর্শনকে তার কর্মজীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। এই সামগ্রিকভাবে দেখাই মার্ক্সবাদের মূল লক্ষ্য।

'ধরা-বাঁধা জীবন' উপন্যাসে মানিক জীবনকে এই সামগ্রিকভাবে দেখার উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সামগ্রিকভাবে দেখতে পারেনি বলেই ভূপেন ছিল অসুস্থ। জীবন তার কাছে মনে হয়েছিল বড় ভোঁতা আর তিক্ত। তার জীবনে প্রথমে এসেছিল সরমা তারপর মনে এসেছিল বন্ধু প্রসন্নের বোন লেডী ডাক্তার প্রভা। সরমার সঙ্গেই তার জীবন কেটেছে বছরের পর বছর অবশ্য তখনও সে মনে মনে চেয়েছে প্রভাকে। তারপর একদিনেই সরমা আর তার ছেলে নন্তু মারা গেল। ভূপেনের কল্পনা প্রভাকে ঘিরে রইল। প্রভাকে সে বিয়ে করে আনতে চাইল। কিন্তু তখনো ভূপেনের মনে হয়েছে তার ধরা-বাঁধা জীবনে সরমার অভাব সহ্য করে বাঁচা অসম্ভব। প্রভাকে কাছে না পেলে তাকে কেন্দ্র করে কল্পনার জাল বোনা যায়। প্রভারও ভয় বিবাহের সূত্রে তাদের ধরা-বাঁধা জীবনে হয়ত তাদের এই প্রেমময় জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। মনে হবে আগের জীবনই ছিল ভাল। ভূপেনেরও মনে হয়েছে "হয়তো তাই, সংসারে ভালবাসার স্থান নাই। সুখ-শান্তির সঙ্গে সম্পর্ক নাই ভালবাসার।" প্রভা ভূপেনের কথায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল না। তাছাড়া ভূপেনের সিদ্ধান্ত করার আগে প্রভারও মতামত নেওয়া উচিত ছিল। প্রভা তাই পরে একদিন ভূপেনের ভুল ধরিয়ে দিল। কেবল নিজের কথা ভাবলেই চলবে না, তার দিকটাও ভেবে দেখতে হবে। তারপর অবশ্য প্রভা বিয়েতে সম্মত হয়। তখনো প্রভা নিঃশঙ্ক নয়। অনেক ভেবে চিন্তে প্রভা বলে, "আমি ভাবছি, বিয়েতে কাজ নেই। অত ধরা-বাঁধার মধ্যে আমরা যেতে পারব না।" তবে প্রভা তাকে জানিয়ে দিল, "আজ থেকে আমি তোমার হয়ে রইলাম। যেদিন খুশী যখন খুশী, আমাকে চাইলেই পাবে।" প্রভার জীবনে কোন বিকার নেই। তার জীবনের অনুভূতির সঙ্গে কর্মের নেই সংঘাত। সেজন্য সে সহজভাবে জীবনকে গ্রহণ করেছে। তার জীবনে হাসি আনন্দের অভাব নেই। কিন্তু প্রভার এই অপ্রত্যাশিত কথায়ও ভূপেন যেন শান্তি পাচ্ছিল না। সাময়িকের জন্য তার মন প্রশান্ত হলেও পরে তার মনে প্রভার বিরুদ্ধে ক্ষীণ একটা প্রতিবাদ জেগে উঠল। জীবনে আবার অপার শূন্যতার পীড়ন আরম্ভ হল। তার মনে হল প্রভার ঐ কথাগুলো ছলনা। আসলে সে ভূপেনের জীবনের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের সাথী হিসেবে যোগ দেবে না বলেই নিজেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ভূপেনকে সে মুক্তি দিয়েছে। তাদের ভালবাসাকে সে চিরদিনের মত ধ্বংস করে ফেলেছে। প্রভার এ মিথ্যা ধরিয়ে দিতে গিয়ে প্রভার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে ভূপেনের সম্বিৎ ফিরে এল। সে তার নিজের দোষ দেখতে পেল। সে-ই তো প্রেমকে অনাবশ্যক এত বড় করে তুলে জীবনে ব্যর্থতা ডেকে

এনেছে। প্রেম ছাড়াও জীবনে অনেক কিছু আছে তাকে অস্বীকার করবার তার কোন কারণ ছিলনা। অতএব প্রভার জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করে সে নিজেকেও সুস্থ মনে করল।

॥ ৯ ॥

একুশের অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থতায় শেষ হয়েছে। অনেক আশা আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়েছে। কিন্তু যুবচিত্তের বিক্ষোভ থামেনি। তা বহিপ্র্রকাশ লাভ করল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মধ্যে। দেশের এখানে সেখানে অত্যাচারী সাহেব খুন হতে লাগল। আর ফাঁসীর মঞ্চে উঠল দেশের কত সাহসী তরুণ যুবক। তারা চৌরিচোরার ঘটনার পর আন্দোলন তুলে নেওয়ায় ক্ষুব্ধ। গান্ধীর তারা কড়া সমালোচক। তাদের ধারণা, "আন্দোলন নেই কিন্তু নেতারা আছেন। সাধারণ খাটিয়ে গরীব মানুষ বঞ্চিত হয়েছে কিন্তু নেতারা মুনাফা লুটেছেন জনপ্রিয়তার।"

এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পটভূমিকায় মানিক লিখলেন নতুন উপন্যাস 'জীয়ন্ত' (১৯৫০)। কালীনাথ তার নেতা। সে নিজে ঐ আন্দোলনের নতুন ব্যাখ্যা করে, "লোকে আজ বড় কিছু চায়, ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংস, এখানে ওখানে ঘা মেরে গায়ের ঝাল ঝেড়েই তারা সন্তুষ্ট নয়।···ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের একটা চাকরকে মারলে, গভর্ণমেণ্টটা তো মরল না! লোকের মনে যদি বিশ্বাস আনতে পার যে এটা নিছক ঘটনা নয়, এটা বিপ্লবের আহ্বান, প্রস্তুতি, বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা লাভের আয়োজন চলছে, এ রকম ছোট ঘটনার চেহারাও সঙ্গে সঙ্গে লোকের কাছে বদলে যাবে।" কালীনাথ তার ক্লাবের ছেলেদের এ ভাবেই দীক্ষিত করে।

পাকা বা প্রকাশ রায় এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। সহরের নামকরা লোক রায়বাহাদুর ভৈরবের ভাগ্নে। পাকার বাবাও নামকরা সরকারী চাকুরে। মামার বাড়ীতে থেকেই সে স্কুলে লেখাপড়া করে। বড় চাকুরের ছেলে এবং বড় লোকের ভাগ্নে পাকার সব বড়লোকী বদগুণ দেখা যায়। মধ্যবিত্ত জীবনের বিকার এবং দুর্বলতা তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। তার চরিত্রের বলিষ্ঠতা নষ্ট হয়। নতুন মামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক-বিরোধী এবং অল্পবয়সী প্রেমের মূলেও আছে এই দুর্বলতা এবং বিকার গ্রস্ততা। পাকা নিজেই তার এই দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন। সেজন্য নানা মধ্যবিত্ত সুলভ অপরাধের জন্য কালীনাথ যখন তার দল থেকে পাকার নাম কেটে দেয় পাকা ক্ষুব্ধ হয় না। কালীনাথদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

এক স্বদেশী ডাকাতির পর পুলিশ তাকে ভীষণ মারধোর করেও কোন কথা বার করতে পারেনি। পরবর্তী কালেও পাকা কালীনাথের দলের প্রতি সহানুভূতি এবং সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু কখনো তাদের দলের একজন হওয়ার চেষ্টা করেনি।

পাকা তাড়ি খেতে এসে নদীর ধারের চামড়ার কারখানায় মুচিদের সঙ্গে মিশে যায়। এদের কাছে এসে সে যেন মুক্তি পায়। তার মনটা এত সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারে। "কে কি ভাববে ভাবতে হয় না, নিজেকে জাহির করতে হয় না, বিদ্যাবুদ্ধির বাহাদুরি বজায় রাখতে হয় না, মান অভিমানের পালা গাইতে হয় না। দরদ দেখাতে হয় না। যাকে দেখলে গা জ্বলে তার সঙ্গে হাসিমুখে আর যাকে দেখলে গায়ে থুথু দিতে ইচ্ছা হয় তাকে সম্মান করে কথা কইতে হয় না।···

ওদের সুখী, স্বাধীন মনে করে পাকা, কি সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন! ওদের মধ্যে সে যে অপূর্ব মুক্তির স্বাদ পায় তারই মাপকাঠিতে সে বিচার করে ওদের জীবনকে।"

পাঁচু পাকার সহপাঠী। পাকা একদিন পাঁচুর সঙ্গে ওদের গ্রামে বেড়াতে যায়। এই গ্রামের জমিদার বসন্ত নন্দী। তার উপর কংগ্রেসের পাণ্ডা। রায় বাহাদুর ভৈরব বাবুর ভাগ্নে এসেছে চাষী ধনদাসের বাড়ী। বসন্ত এ কথা শুনে বিস্মিত হয়। ধনদাসের ভাই জ্ঞানদাস খাজনা বন্ধ আন্দোলনের সময় এই গ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল। আর সেদিনই জ্ঞানদাসকে পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে যায়। বসন্তের চক্রান্তে তাকে থানায় মারধোর করে এবং চুরির দায়ে সদরে পাঠাবে ঠিক করে। কিন্তু সদর থেকে রায় বাহাদুর ভৈরবের আত্মীয় তাদের বাড়ি এসেছে শুনে, জ্ঞানদাসকে তারা ছেড়ে দেয়।

পাকা এবং পাঁচু দু জনেই একসঙ্গে ভালভাবে ম্যাট্রিক পাশ করে। পুলিশী নির্যাতনের ফলে পাঁচুর মনও বিদ্রোহী হয়ে উঠে। সে তাদের বাড়ীর কাছের পুরানো বিপ্লবী শ্যামল জানার শিষ্য হয়। পাকাও সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করে। বাবার পিস্তল এবং সংমার গহনা সে পাঁচুর সাহায্যে কালীনাথকে পাঠিয়ে দেয়। পাঁচু নিজের গ্রামেই তার কাজ ছড়িয়ে দেয়। গ্রামের ছেলেদের নিয়ে দল গড়ে, গ্রামের কৃষকদের সাহায্য করে। গণেশ সাঁতরার বালবিধবা মেয়ে দুকলিকে বসন্তের ছেলে হেমন্তের হাত থেকে উদ্ধার করে। হেমন্তকে তারা খুব মারধোর করে। তারপর গ্রামে নেমে আসে পুলিশের সন্ত্রাস। পাঁচু অবশ্য তখনো ব্যাপার বুঝতে পারে নি। কিন্তু জ্ঞানদাসের একুশ সালের গাঁ জ্বালানোর অভিজ্ঞতা আছে। সে পাঁচু আর দুকলিকে নিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়। এদিকে পাঁচুর বাবা মিথ্যা ডাকাতির অভিযোগে আরো অনেকের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়।

মানিকবাবু সমাজ সচেতন উপন্যাস রচনা করেছেন। পুলিশ এবং জমিদারের সন্ত্রাসে সাধারণ মানুষের জীবন সশঙ্কিত হয়ে পড়েছে। পুলিশের দুর্নীতি এবং অত্যাচারের কথাও তিনি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বাধীনতার লড়াই কেবল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নহে এই সব অত্যাচারী জমিদার আর পুলিশরাজের বিরুদ্ধেও। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-দৃষ্টির এই স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেও বলতে হয় জীয়ন্ত উপন্যাস সুগ্রথিত হয় নি, বিচ্ছিন্ন ভাবে অনেক ঘটনা এবং বর্ণনা উল্লেখযোগ্য হলেও সামগ্রিক বিচারে এর বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেনি, কাহিনী-বন্ধন দৃঢ় হয় নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত জীবনের বিভিন্ন দিককে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিকার, অসঙ্গতি এবং বিপর্যয়কে ফুটিয়ে তুলে সেখানে তিনি এক নতুন মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ডাক্তারি জীবন সম্পর্কে তার নতুন ধারণার ফলশ্রুতি **'পেশা'** উপন্যাস।

কেদার ডাঃ পালের সাহায্যে বেশ ভাল ভাবেই ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করে। ডাক্তার পালের মেয়ে গীতার সঙ্গে তার বিয়ে হবে ঠিক হয়েছে। বিয়ের পর ডাঃ পাল কেদারকে নিজ খরচায় বিলেতে পাঠাবেন। কিন্তু পাশের খবর বের হওয়া সত্বেও কেদার ইতস্তত: করে। নানা রোগী নিয়ে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা জন্মে আর একের পর এক মৃত্যুর মধ্যে তার ডাক্তারী শাস্ত্রের অল্পজ্ঞান সম্বন্ধে অসহায়তাবোধ জন্মে। তার পরীক্ষার খবর পাওয়ার পূর্বেই তার মা শুভময়ীর মৃত্যু হয়। তার যে ব্লাড প্রেসার ছিল কেদার নিজে পর্যন্ত তা কোনদিন লক্ষ্য করেনি। ডাক্তার হওয়ার অধিকার সম্বন্ধে তার প্রথম প্রশ্ন জাগে।

পাড়ার হর্ষ ডাক্তার বিলেত ফেরৎ। তিনি কেদারকে খুব স্নেহ করেন। কেদার পাশ করে হর্ষ ডাক্তারের ডিসপেন্সারীতে নিয়মিত গিয়ে বসে। হর্ষ ডাক্তার তৃতীয় মেয়ে জ্যোতির সঙ্গে কেদারের বিয়ে দেবেন মনে মনে ঠিক করেছেন। কিন্তু জ্যোতি কেদারদের দোতালার ভাড়াটে পরিমলকে ভালবাসে। পরিমল কবরেজ। হোক তাই। জ্যোতি খুব জেদী মেয়ে। শেষ পর্যন্ত জ্যোতি পরিমলকেই বিয়ে করে। ছেলে হওয়ার সময় ভীষণ যন্ত্রণায় জ্যোতি মারা যায়। তাদের বাড়ীর একসময়ের ভাড়াটে সীতাংশুর বৌ ছায়ার অসহ্য কানে ব্যথা, তাকেও অজ্ঞান করে অপারেশন করা হবে। সে প্রাণে বাঁচবে কিন্তু ভোঁতা হয়ে যাবে তার মাথা। আরও কত সাধারণ গরীব মধ্যবিত্তের কঠিন রোগ আর মৃত্যুর সঙ্গে কেদারের যোগ হয়। অনেকেই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বড় বড় ডাক্তাররা এই জীবন-মৃত্যুর জন্য মাথা ঘামান না। চতুর্দিকে ওষুধে নানা ভেজাল। কেদারের মনে বিতৃষ্ণা

আসে। শুধু ব্যবসা করার জন্য, বেশী ফি নেওয়ার জন্য বিলেতে গিয়ে ডাক্তার হতেও তার আর মন চায় না।

"পাড়ার ত্রৈলোক্য মজুমদার ধনী ব্যবসায়ী, স্বদেশী বলেও নাম আছে। কয়েক রকম ব্যবসা তার আছে, তার মধ্যে জীবনবীমা কোম্পানী ও কটন মিল প্রধান। জাতীয় শিল্পের উন্নতির দ্বারা স্বদেশ সেবার ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করায় প্রচুর পুরস্কার সে পেয়েছে, যা ধরেছে এবং ধরছে তাই সোনা হয়ে গিয়েছে এবং যাচ্ছে।" সে কেদারকে পেটেন্ট ব্যবসায় অংশীদার করে নেওয়ার লোভ দেখায়। কি কি পেটেন্ট ওষুধ বেশী চলবে ত্রৈলোক্য তা বলে দেবে আর কেদার তার জন্য লাগসই প্রেসক্রপশন তৈরী করে দেবে। কেদার বুঝতে পারে এ তার জুয়াচুরির ব্যবসা। সে তাতে যোগ দেয় না।

"ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই সত্যটা কেদারের কাছে যে মধ্যবিত্ত ঘরের অনেকগুলি দামী টাকা আর কতগুলি বছরের দামী সময় খরচ করে ডাক্তার হয়ে এ দেশের গরীব জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সম্ভব হয় না ডাক্তারের পক্ষে।

গরীব মানুষগুলির একমাত্র অবলম্বন ম্যাজিকওলা চিকিৎসক, টোটকা পদ্ধতির চিকিৎসক, টোটকা পদ্ধতির চিকিৎসা আর মাদুলি কবচ ঝাঁড় ফুক।

কেদার ভাবে, হায় ভগবান, গীতাকে বিয়ে করে ওই বিলাতে গিয়ে মস্ত ডাক্তার হয়ে আসবার স্বপ্ন দেখছি, ওই বিলাত আমার দেশটাকে রেখে দিয়েছে টোটকা আর মাদুলির চিকিৎসার স্তরে।" কেদার এখন বুঝতে পারে, "মানুষের দারিদ্র্য তো ঘুচে যাবে না তার চিকিৎসার সেবা-ব্রতে! দেশ প্রকৃত স্বাধীনতা না পেলে কারো একার চেষ্টায় কোন দেশের মানুষের কোন দুঃখই ঘুচতে পারে না। ডাক্তারি পেশার মধ্যেও যে গলদ আর অনিয়ম, তার জন্যও কোন ডাক্তার ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী নয়, ওটাও দেশের লোককে অন্নবস্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত রাখার ব্যবস্থার ফল।" ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই সে জীবন ও জীবিকার সমন্বয় খুঁজে পেল।

কেদার গীতার কাছে গিয়ে তার সঙ্কল্পের কথা জানায়, "বড় ডাক্তার হব আমি যত বড় হতে পারি। জগতে যেখানে যত জ্ঞান আছে কুড়িয়ে আনব। শুধু বিলেত নয়, আমি সোভিয়েটে যাব, চীনে যাব। দেশে ফিরে এত বড় ডাক্তার আমাকে হতে হবে, এত প্রভাব অর্জন করতে হবে যাতে করতে চাইলে সত্যি কিছু করার সাধ্য হয়।" ডাক্তার পালের মত বড় ডাক্তার সে হতে চায় না। পয়সার বদলে সে তার আহৃত জ্ঞানকে সত্যিকার দেশের কাজে লাগাতে চায়। গীতাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

"কেদার বলে, আমি ভাবতাম যেটুকু শিখেছি এই পিছানো গরীব দেশে তাই নিয়ে কাজে লাগাই যথেষ্ট। কিন্তু দেখছি আমার ভুল হয়েছিল। আমি যা করতে চাই তার জন্য যত শেখার আছে আমাকে শিখতে হবে। পিছানো দেশ বলে শিক্ষাতেও পিছিয়ে থাকলে আমার চলবে না।" গীতার মুখে হাসি ফোটে। গীতার সঙ্গে তার মিলনের পথ সুগম হয়।

কতগুলো পরিচিত চরিত্রের সান্নিধ্যে ডাক্তারি পেশা সম্বন্ধে কেদারের প্রতিক্রিয়াই এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। পন্থাকার এই উপন্যাসের গঠন। নানা চরিত্রের ঘাত সংঘাতে মূল চরিত্রের ভাব-বিকাশই তিনি মালার মত করে ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনকে দেখার দৃষ্টি মানিকের রোমান্টিক-বাস্তব। গীতা-জ্যোতি-ছায়া-অঞ্জলি-মায়াকে ঘিরে কেদারের সেই পরিক্রমা সুন্দর।

॥ ১০ ॥

১৯৪৭ সালে ভারত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ব্রিটিশের কাছ থেকে কমনওয়েলথীয় স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কোলকাতায়, বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্র এবং বিহারে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। **'স্বাধীনতার স্বাদ'** উপন্যাসটি সেই দাঙ্গার পটভূমিকায় একটি শ্রেণী-সচেতন উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। বাঙলা উপন্যাসে এমন রাজনৈতিক সচেতনতা আর দেখা যায় না। রাজনীতি প্রাধান্য লাভ করলেও উপন্যাসের রস ব্যাহত হয় নি। ঘটনা বিন্যাসে এবং চরিত্র রূপায়ণে মানিকের দক্ষতা বিস্ময়কর।

কোলকাতার ব্যাপক পৈশাচিক দাঙ্গার 'তীক্ষ্ণ কুৎসিৎ হিংসার ধার' চারিদিকের আতঙ্কের মধ্যে খুবই স্পষ্ট। সহরের মানুষ যখন এক দারুণ দুশ্চিন্তায় প্রহর গুণছে তখন মধ্য-ভারতের এক বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র সহর থেকে মণিমালার মামা প্রমথ তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসে বেঘোরে প্রাণ দেয়। প্রণব কোন রকমে পালিয়ে গিয়ে মণিমালার স্বামী সুশীলকে খবর দেয়। প্রণব সুশীলের ভাই। মণির বিয়ের পর থেকেই প্রণবের সঙ্গে তার বেশ খাতির ছিল কিন্তু পরে তাকে উপলক্ষ করে সুশীল এবং মণি ভিন্ন বাড়িতে উঠে যায়।

দিন কাল বড্ড বদলে গেছে। সেই সঙ্গে মানুষের মনগুলোও। "আগের দিনের সে ঘরোয়া সুখ দুঃখ অবশ্য আর অবশিষ্ট নেই, বাইরের বিরাট দুঃখ যাতনার বন্যা বেনো জলের মত জবরদস্তি ঘরে ঢুকে ঘোলাটে আবর্ত করে ছেড়ে দিয়েছে

ঘরের জীবন।...সেই জাপানী বোমার দিন থেকে পথে-ঘাটে ছড়ানো সস্তা অপমৃত্যু দুর্ভিক্ষ, বিক্ষোভ, আন্দোলন, পুলিশের গুলি, দাঙ্গা-হাঙ্গামার ধাক্কা অন্দরে অন্দরে সুরক্ষিত মনগুলি ঘুঁটে দিয়েছে। চরম করেছে এই দাঙ্গা। দিনের পর দিন এক মুহূর্তের শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। বাইরে যে যায়, সে ফিরবে কিনা জানে না বাড়ীর লোক। ফিরে এসে বাড়ির লোককে দেখবে কি না জানে না বাড়ী থেকে যে বাইরে যায়। বাড়ীতে সকলে একত্রে উদ্বেগ আতঙ্কের পল গুণে সময়ক্ষেপ করে, উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে কখন আবির্ভাব ঘটে দলবদ্ধ ধ্বংসের। কখন কারফিউ নামে, কখন বন্ধ হয় রেশন, হাট বাজার, হাঁড়ি চড়া বাতিল হয়ে যায় সংসারে।"

এই অবস্থায় প্রণব আলাপ করে মণিদের সাথে। প্রমথর টেলিগ্রাম পেয়ে প্রণব স্টেসনে গিয়েছিল। তখন সে জানত না তার সঙ্গে তাকেও এ বাড়িতে আসতে হবে। সুশীলেরা পণ করেছিল প্রণবের সঙ্গে আর তারা থাকবে না। কারণ প্রণব রাজনীতি করে। একদিন ইংরেজের পুলিশ তার ঘরটা সার্চ করেছিল। তাকেই অজুহাত করে সরকারী কলেজের অধ্যাপক নিজের পরিবার নিয়ে সকলের সঙ্গে থাকার দায়িত্ব আর বিড়ম্বনা দুইই এড়িয়ে গিয়ে অন্য বাড়িতে উঠেছিল। "স্বদেশী ছেলে স্বদেশী ভাই-এর বাপ ভাই হওয়ার জন্য কেন, আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব হওয়ার জন্যও এদেশে অনেকের ভাগ্যে কম লাঞ্ছনা জোটে নি।"

মণির ছেলে মেয়েরা এখন বড় হয়েছে। ছেলে সুধীন এখন কলেজে পড়ে আর মেয়ে আশা ষোলয় পা দিয়েছে। সহরে তখন ছত্রিশ ঘণ্টার কারফিউ। সেজন্য প্রণবকে সেদিন ওখানে থেকে যেতে হয়। হঠাৎ শোনা যায় চীৎকার, 'আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে।' ছাতে উঠে দেখে বড় রাস্তার ওপারে অল্প দূরে বস্তিতে আগুন ধরেছে। পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক সুশীলকে বলে, কাল "দুপুরে গলির ভেতর এসে তিন জনকে সাবাড় করে দিয়েছিল না, এই তার জবাব দেওয়া হল।" প্রণব অনুমান করে "ওটা মজুর বস্তি নয়। মজুররা এ দাঙ্গায় নামেনি, তাদের বস্তিতে সহজে আগুনও লাগতে পায় না, পালা করে দল বেঁধে তারা পাহারা দেয়।"

পরদিন প্রমথর দেহ সংক্রান্ত হাঙ্গামা মিটিয়ে এসে প্রণব বিকেল বেলা একটা লরী ঠিক করে এনে সকলকে নিয়ে আবার নিজেদের বাড়ী নিয়ে এল। মণি মামার কাছে যাবার স্বপ্ন দেখছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন জায়গায় আসে যে বাড়ীতে ফেরার কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

মণির মনে পড়ে প্রণব একদিন বলেছিল: জানো জীবনে যার বিশ্বাস নেই, সে মরেও সুখ পায় না। মণি অবশ্য তখন এ কথার ঠিক অর্থ বুঝতে

পারে নি। সাধারণ বাপের বাড়ীতে সাধারণ ভাবে মানুষ হয়ে সাধারণ শ্বশুর-বাড়ী আসা, কিছু দিন বৌ সেজে সকলের সঙ্গে ঘরকন্না করে স্বামীর সঙ্গে অন্য বাড়ীতে ভিন্ন হওয়া, ছেলে মেয়ে স্বামী নিয়ে সংসার করা এই ছিল তার জীবন। কিন্তু এ বাড়ীর মানুষের ভীড়ে এসে শুরু হোল মণির নতুন জীবন। ধরা-বাঁধা পারিবারিক নিয়মের বাঁধুনি এ বাড়ীতে চিরদিনই শিথিল। "এ যেন খেয়াল খুসীর হাটে এসে পড়েছে মণি!" কি খাবে, কোথায় শোবে, কি করে একটু আড়াল পাবে কারো তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই, যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা এবং সেটা অকাতরে মেনে নেওয়া যে তাই সই, তাই সই!"

মণিদের জন্য তারা একটা ছোট ঘর খালি করে দেয়। সেই ঘরে আগে ছিল নীলিমা। তার স্বামী গিরীন এক ইংরাজী দৈনিকের সহকারী সম্পাদক। তারা ছাতে একটা অস্থায়ী চালা তুলে নিয়ে উপরে চলে যায়। এ পাড়ায় প্রথম প্রথম দাঙ্গা থামাবার চেষ্টা করেছে প্রণব আর দশ বারোটা ছেলে। তাই এ বাড়ীতে মুসলমান মিস্ত্রী অতি সহজে এখনো কাজ করে যায়।

একদিন সকালে গিরিন অফিস থেকে বাড়ী ফেরেনি। অনেক চেষ্টা করে খবর পাওয়া যায় মারাত্মক আহত এক বন্ধুর সঙ্গে সে হাসপাতালে গেছে। নিজে সুস্থ এবং অক্ষত আছে গিরীন। গিরীনের বন্ধু কবি মনসুর একদিন পত্রিকা অফিসে নিজের কবিতা পৌঁছে দিতে যাবার সময় বেপাড়ায় দাঙ্গাবাজদের হাতে পড়ে। গিরীন দূর থেকে দেখতে পেয়ে তাকে রক্ষা করে। কিন্তু ততক্ষণে মনসুর মারাত্মক ভাবে আহত। প্রাণটা শুধু বেঁচে আছে। গিরীন নিজেও এক ঘা ডাণ্ডা খেয়েছে।

এই দাঙ্গার সময় সুস্থ মানুষের বিবেকও অনেক সময় খারাপ হয়ে যায়। তাই মনসুরের স্ত্রী রশোনাও বাড়ী বয়ে এসে হিন্দু জাতটাকে গাল দিয়ে গেল। তার বিশ্বাস মনসুরের এ আঘাতের জন্য গিরীনই দায়ী। পরদিন হাসপাতালে গিয়ে গিরীন মনসুরের কাছেও অনুরূপ অভ্যর্থনা লাভ করে। গিরীন বলে এর জন্য মনসুর দায়ী নয়। আমাদের ধর্মপ্রবণতার মধ্যেই রয়েছে এ বীজ। আর তাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ ধাপ্পাবাজির ভেলকি দেখাচ্ছে। ষোলই আগষ্টের সংগ্রাম ঘোষণার মধ্যে সেই বিকারেরই পরিচয় পাওয়া যায়। (১৯৪৬ সালের ষোলই আগষ্ট মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ-সংগ্রামদিবস পালন করে। তাকে কেন্দ্র করে ষোলই আগষ্টে যে দাঙ্গা শুরু হয় পুরো এক বছর পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের দেশ-ভাগাভাগী-স্বাধীনতার মধ্যে তা শেষ হয়)। গিরীন অফিসে গিয়ে 'দাঙ্গার ভিত্তি' নাম দিয়ে সম্পাদকীয় লেখে। তাতে ধর্মের নামেই যে জাল-জুয়াচুরি চলছে তা

প্রকাশ করে। কিন্তু "প্রাণের কথা স্বাধীন ভাবে ছাপাবার সাধ প্রাণে থাকে।" গিরীন লেখাটি ছিঁড়ে ফেলে।

পাড়ায় ঘুঁটে বিক্রী করে এক মুসলমানী বুড়ী। পাড়ায় সকলেই তাকে নানী বলে। সে পর্যন্ত জানে এ দাঙ্গা কার কারসাজি। সে বলে, "দাঙ্গা হানাহানি কর্তাদের লীলা, চাকররা মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রাকে চেপে টহল দিয়ে তা থামাবে! হায়রে তামাসা!" নানীর ছেলে নাজিম তার সুন্দরী বৌ নিয়ে মাকে ফেলে অন্য বস্তীতে উঠে গিয়েছে।

সর্বত্র এখন জাল-জুয়াচুরি। রেশনের দোকানে পর্যন্ত। আর আজকাল রাজা হোল গুণ্ডারা। সহরের এই অঞ্চলের খ্যাতনামা গুণ্ডারাজ হোল সুবোধ কুমার সিংহ।" সুবোধ সিংহ একা মানুষ, তার বিয়ে করা বৌও নেই, আইনসঙ্গত বাচ্চা-কাচ্চাও নেই, কিন্তু তার তেত্রিশখানা রেশন কার্ড! সাথী অনুগতদের সে একশোর উপর বাড়তি কার্ড বিতরণ করেছে। প্রত্যেকটি কার্ড রেজিস্ট্রি করা।"

এই সুবোধ রাজাকে বড় বড় লোক খাতির করে। গভর্ণমেণ্ট তাকে ভুলেও ছোঁয় না। তাকেও একদিন নানী ছেড়ে কথা কয় না। ফলে এক রাতে গুণ্ডাদের হাতে তাকে প্রাণ দিতে হয়।

বাড়িতে একদিন চাল ছিল না বলে মণি সুশীলকে তার বন্ধু চোরাকারবারী যতীনের কাছে পাঠায়। যতীন আনন্দের সঙ্গে সুশীলকে দু মণ চাল দিয়ে দেয়। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সুশীলও তার অজানিতে যতীনের খপ্পরে পড়ে। বাড়ির লোকেরা অবশ্য এ চাল পেয়ে সুখী নয়। এ ভাবে চাল কেনা তারা ঠিক মনে করে না।

রাত্রে এ বাড়িতে রোজই একটি আসর বসে। তাতে নানা রকম আলোচনা হয়। তার মধ্যে রাজনীতিই বেশী। সেদিন এসেছিল "দুটি অল্পবয়সী তরুণ; দেখে প্রথমেই অনুমান হয় যে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী। কারণ, কম খেয়ে বেশী খাটার রুক্ষ কঠোরতার সঙ্গে অদ্ভুত দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা মেশানো চিরন্তন ছাপটা আছে, গান্ধীজীও যে ডিসিপ্লিনের প্রশংসা করেছেন তার সঙ্গে গভীর আত্মবিশ্বাস মেশার যা বাইরের রূপ।" সে দিন আলোচনা হচ্ছিল দাঙ্গা নিয়ে। সাধারণ লোক এ দাঙ্গা করে না। আসলে তাদের দিয়ে করানো হয়। কারণ, "সাধারণ মানুষকে আজও কম বেশী ভোলানো যায় ক্ষেপানো যায় কিন্তু সহজে সস্তায় না ভুলবার না ক্ষেপবার ঝোঁকটাই বেশীরকম জোরালো। আজ তাদের একটা যুদ্ধে নামাতে পৃথিবী জুড়ে ওলট পালট ঘটনার মত বিরাট ব্যাপার ঘটাতে হয়।" সে জন্য দেখা যাবে যেখানে ছোট ভাই দাঙ্গা করছে সেখানে বড় ভাই দাঙ্গা থামাতে নিজের প্রাণ

বিসর্জন দিচ্ছে। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে আবার "মজুর শ্রেণী সবচেয়ে বেশী দাঙ্গাবিরোধী।" শ্রেণীগত ভাবে চিন্তা করলেই বিচারটা স্বচ্ছ হয়। কারণ প্রণব বলে "ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আঁকড়ে থাকলেই বরং হিন্দু মুসলমান বলে কিছু থাকে না। শ্রেণী মেশানো জনসাধারণকে ধরে বিচার করলে সমস্যাটার বাস্তব চেহারা ধরা পড়ে। নীচের তলার মানুষেরা একাকার, মিলটাই তাদের সবচেয়ে বড় স্বার্থ—তবু দাঙ্গা হচ্ছে।" "এটা ওপর থেকে চাপানো দাঙ্গা, ওপরওলাদের স্বার্থে। দুশো বছর যারা শোষণ করেছে প্রথম দায়িত্ব তাদের।" নীচের তলায় বাঁচার স্বার্থে হিন্দু মুসলমান একাকার। "নমাজ পড়ে পূজো দিয়ে তো মানুষ বাঁচেনা, বাঁচে বলেই নমাজ পড়ে, পূজো দেয়। ভেদ যা আছে সব ওপর থেকে চাপানো। কত জন্ম ধরে পায়ের তলায় পিষে মারছে, পেটের ধান্দায় কাবু, তার ওপর হাজারটি কুসংস্কারে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা, এদের ভুল বোঝানো কঠিন ? তবু একটু চেতনা এলেই আর ভেদ চাপানো যায় না। চোখের সামনে প্রমাণ আছে, ছাখো। মজুররা মারামারি করছে না। এখনো যে এই সহরে ট্রামে বাসে বেড়াও, হিন্দু মুসলমান মিলে মিশে ওই ট্রাম চালাচ্ছে।"

সেজন্য মানিকের মত "আশা ভরসা রাখো নীচের তলায়।" "বেহেস্ত বা স্বর্গের নেশা থাকলেও সেখানে সবটা পুরস্কার পাবার আশায় থাকতে মানুষ আর রাজী নয়, কিছু নগদ বিদায়ও চায়। পৃথিবীতে বেঁচে থেকে ভাত কাপড়ের সুখ পেতে হলে এটা করা চাই-ই, এ বিশ্বাস জন্মিয়ে তবে সাধারণ লোকের একটা অংশকে দাঙ্গায় মাতানো গেছে। এখন বাস্তবচেতনাটাই আশা ভরসা এবং ভবিষ্যৎ। হিন্দু মুসলমান যারা পরস্পরকে শত্রু ভাবছে যে ওরা আমার ধর্মের পথে কাঁটা, তাদেরও সত্যি সত্যি এটা আসল চিন্তা নয়। এ আদর্শবাদে মত্ত হওয়ার আসল কারণও বাঁচা মরার সমস্যা। যে মুহূর্তে ভুল ভাঙবে, টের পাবে যে বাঁচার পথের কাঁটার চাষটা শুধু ওপর তলায় হয়, সেই মুহূর্তে শত্রু মিত্র চিনতে পারবে,"

সেই আশা নিয়েই কাজ করে যেতে হবে। আর ওপরতলার মানুষ তার স্বার্থে ঘা লাগবে বলে ক্রমাগত বাধা দেবে। সেজন্যই গিরীনদের কাগজে দাঙ্গা-বিরোধী প্রচার হয় বলে তাদের পত্রিকার অফিস আক্রমণের চেষ্টা হয়েছিল।

একদিন খবর এল ওদের পাড়ায় ইয়াসীন এসেছিল। "ইয়াসীন অন্য এক এলাকার শক্তিশালী গুণ্ডা-রাজ বা গুণ্ডা নবাব।" সুবোধ সিংহকে তুলে নিয়ে তারা চৌরঙ্গীর বড় হোটেলে খানাপিনা করেছে। (আশ্চর্য গুণ্ডাদের পর্যন্ত ওপরতলায় কেমন মিল)।

সহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ কেবল মন্ত্রী মিশন, দাঙ্গা, কংগ্রেস লীগ-কম্যুনিষ্ট নিয়ে মেতে আছে। নীলিমা বলে, "সত্যি আমরা সবাই যেন মহাপাপ করেছি, দিনরাত খালি জপ করছি দেশ আর সমাজ, সাম্রাজ্যবাদ আর স্বাধীনতা, বিপ্লব আর সমাজ-তন্ত্র। বস্তির গরীব মানুষগুলি পর্যন্ত হৈ-চৈ ফূর্তি করছে। আমাদের যত দায়।"

একদিন ভোর বেলায় নানীকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে তার ছেলে নাজিম এসেছে দেখতে। আচমকা অনেকগুলি লাঠি এসে তাদের উপর পড়তে থাকে। রসময় পুলিশকে টেলিফোন করে। কিন্তু তাদের কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। "ঘরের কোণে খেলার ঝোঁকে সাত বছরের ছেলে 'বন্দে মাতরম' বললে যারা শুনতে পেয়ে তাকে সায়েস্তা করে" তারা দাঙ্গার বেলায় কিছু শুনতে পায় না। যখন সব কাজ শেষ হয়ে যায়, বহু লোক হতাহত হয়, লুঠপাট হয়ে যায়, ঘরে দাউ দাউ করে আগুন ধরে যায় তখন দিগন্ত কাঁপিয়ে মিলিটারি আসে আর পথের নিরীহ মানুষকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করে।"

এ পাড়ায়ও দাঙ্গা দেখে মণি বিস্মিত হয়। কিন্তু গিরীন বলে, "উপায় কি বলুন? যারা ধনের মালিক মনের মালিক তারা যদি এই খেলা চান, পাগল করার কল টেপেন, আমাদের পাগল হতে হয়। ওদের হাতেই চাবিকাঠি দিয়ে রেখেছি।"

দেশের এ দুর্দিনে কংগ্রেস-লীগ ইংরেজেরই পক্ষ নিয়েছে। তারা আসলে ইংরেজদের শত্রু নয়, বিপক্ষ। "ইংরেজ এ দেশে বিপক্ষ গড়তে দিয়েছে। কখনো শত্রুতা বরদাস্ত করেনি, শত্রুকে ফাঁসি দিয়েছে—দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে। আজ সাধারণ লোক নিজেরাই শত্রু হয়ে উঠেছে, এখন বিপক্ষরাই ইংরাজের ভরসা। চারিদিকে লাখ-লাখ শত্রু মাথা তুলছে, বোম্বেতে নৌ সেনা বিদ্রোহ করল, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী মিশন—" এসে হাজির হয়েছে। গিরীন বলে, "স্বাধীনতার আশা আপাতত বেশ কিছু কালের জন্য ঘুচে গেল, যে পথে এত দূর এগোলাম সেই পথ আগুনের প্রাচীর তুলে বন্ধ করে দিলাম—এটাই আমার সবচেয়ে বড় জ্বালা! নইলে হিন্দু-মুসলমান অনেক-শো বছর ধরে এদেশে আছি, আজ নয় কাটাকাটি করে একটা সম্প্রদায় শেষ হয়ে যেতাম, হয় হিন্দু থাকতাম নয় মুসলমান থাকতাম—তাতে আমার এত কষ্ট হত না। রাজনৈতিক সংগ্রাম যে দেশে ধর্মের লড়াই-এ দাঁড়ায় সে দেশের বরাত বড় খারাপ। শেষ পর্যন্ত কি হবে আমি জানি না, কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, দাঙ্গা থামার পরেও দেখা যাবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসা হয়নি, স্বাধীনতার সমস্যা রয়ে গেছে। আবার আমাদের আদা-জল খেয়ে দুটো সমস্যারই মীমাংসার জন্য লড়তে হবে, প্রাণ দিতে হবে।"

মণি এসব কথা ঠিক বুঝতে পারে না। পারে না তার মত লক্ষ লক্ষ মা বোনেরা, ঘরের মধ্যে যারা আবদ্ধ। শিক্ষার আলো যাদের কাছে নিষিদ্ধ। এর জন্য কে দায়ী? ইংরেজই দায়ী। "বিদেশী কর্তারা শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করে নি, শতাব্দীর অন্ধকারে দু' একটা বিশ্ববিদ্যালয়রূপী চোখ ঝলসানো আকাশ প্রদীপ জেলে রেখে ভাঁওতা দিয়ে এসেছে, জীবনের মান নামিয়ে এনেছে একটানা শোষণে, মিলিটারী বুটের লাথি আর জগতের সেরা ব্যবসায়ী মাথার কৌশলে জীবনের রূপান্তর ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে বিংশ শতাব্দীর এই মাঝামাঝি পর্যন্ত।"

মণির নিজের উপরই ঘৃণা হয়। সে আসলে অন্ধকারের জীব। এ বাড়িতে সবাই যেন আলোর আর সে শুধু অবজ্ঞার। নিজেকে তার অত্যন্ত ছোট মনে হয়। আসলে এ সবই তার মন গড়া! প্রণব তা তাকে বুঝিয়ে দেয়। আসলে সে অনেক পিছিয়ে আছে। ঘরের কোণ থেকে তার মনে কতগুলো দুর্বলতা সঙ্কীর্ণতা জন্মেছে।

যতীন সুশীলকে হাত করার চেষ্টা করে। প্রণবদের কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ভাল পাড়ায় একটা ফ্ল্যাটে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। মণি কিন্তু ও বাড়িতে যেতে নারাজ। প্রণবদের সঙ্গে থেকে মণির অনেক জ্ঞান হয়েছে। সে নিজের ভাল মন্দ বুঝতে পারে। এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তার মতান্তর ঘটে।

বাড়িতে নীলিমার ভাই গোকুলকে কবি জেনে মণি বিস্মিত হয়। গোকুলের চরিত্রও এ উপন্যাসে চমৎকার। সে সচেতন রাজনীতিক ও কবি এবং নির্ভীক কর্মী। পরোপকার এবং উপস্থিত বুদ্ধিতে তার তুলনা হয় না।

সহরে শেষ পর্যন্ত দাঙ্গা বিরোধী শান্তি কমিটি কাজ শুরু করে। এই কমিটি দাঙ্গার আসল কারণ লোকের কাছে প্রকাশ করে দেয়। এক সভায় নাজিম বলে :

"এই দাঙ্গার পিছনে, ধর্মের নামে এই খুনোখুনির পিছনে কি কারসাজি আছে, কাদের কারসাজি আছে, এখনো না সমঝালে গরীব মানুষকে—খাটুয়ে মানুষকে হাড়ে হাড়ে টের পেতে হবে। তাদের কত খুন কত জান দিয়ে কারা কি বাগিয়ে নিল, তাদের নসিবে কি জুটল। ইংরেজ বাদশা, কংগ্রেসী বড় বাবুরা আর লীগের বড় সাহেবরা উপরতলায় মরিয়া হয়ে লেগেছে আপোষ লড়াই আদায় নিকাশের ব্যবসাদারী খেলা—পেটেও যারা খেতে পায় না, তাদের জাত ধর্ম হয়েছে এই জুয়াবাজির এক বড় চাল। মজুরজীবী গরীব ক্ষেপে গেছে, ক্ষেপে গেছে জাহাজের দেশী ফৌজ, ইংরেজ চোখে অন্ধকার দেখছে। কংগ্রেসী বড় বাবুদের, লীগের বড় সায়েবদের বুক ধড়ফড় করছে। মজুর চাষী, গরীব মানুষ একবার চোখ মেলে মাথা তুললে, নিজেদের ক্ষমতা টের পেলে, তিন পক্ষের সর্বনাশ। ইংরেজ বাদশার অবস্থা কাহিল বটে, দেশের মানুষ

তাকে সাগর-পারে তাড়াবেই তাড়াবে, কিন্তু সে জয়টা যে হবে গরীব খুটুয়ের—সর্বনাশ! তার চেয়ে ইংরেজ বাদশার সাথেই আদায়—নিকাশের ঘরোয়া আপোষ ভালো।

দাঙ্গা হল এই আপোষের একটা দর কষাকষি! ইংরেজের সেরা চালবাজি।"

নাজিমের পর এই সভায় বক্তৃতা দিতে উঠে এক বুড়ো। তার বাচ্চা ছেলেটা সেদিন দুধের অভাবে মারা গেছে। তার সৎকার করে বাড়ী ফেরার পথেই সে বক্তৃতা দিতে উঠেছে। বুড়ো বলছে, "মোর বাচ্চাটা তো মোল, মোকে এসে বলে কি. তোর ওই ছেলেটাকে দে, মরা ছেলেটাকে দে, টাকা পাবি। মরেই তো গেছে। কি করবি ছেলেটাকে দিয়ে? মোদের কাজে লাগবে, দিয়ে দে; মাথাটা ছেঁচে, গা কাটাকুটি করে দশ জনকে দেখাবে, দাঙ্গা বাধাবে। শুনলে? মোর মরা বাচ্চাটাকে ছেঁচে কেটে দাঙ্গার উস্কানি দেবে? না ভাই, হিন্দু-মোছলমান এক না দুই জানি না বাবা, দাঙ্গায় মোদের কাজ নেই!"

সভার পর শোভাযাত্রা বেরোয়। তাতে ধ্বনি উঠে, "হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই; দাঙ্গা চাই না, রুটি চাই; সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক; আপোষকারীরা বৃটিশের গোলাম, মোদের খুন ওদের সরবৎ··"

"বাজারের কাছে শান্তি কমিটির সভার খবর শুনে উদ্যত আক্রমণকারীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, এ এলাকায় লরী বোঝাই সশস্ত্র পুলিশ এসেছে শুনলেও তারা এতটা ভড়কে যেত না। জমায়েত যখন শোভাযাত্রায় পরিণত হল, তারা তখন অস্ত্র আর পেট্রোলের টিন গোপন করে ফেলে ছত্র ভঙ্গ হয়ে গেছে। মানুষ সমবেত হয়ে বজ্রকণ্ঠে শুধু ঘোষণা করেছে, শান্তি চাই। সে আওয়াজ শুনেই অবশ হয়ে গেছে গোপন হিংসার ছোরা-ধরা হাত—শিকার ধরতে ওৎপাতা বাঘ দল-বাঁধা মানুষের সাড়া পেয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছে ইঁটের জঙ্গলের গোপন অন্ধকারে!"

মণি মধ্যবিত্ত ঘরের স্ত্রীলোক। ঐ শোভাযাত্রার সামনে তাদের বাড়ীর পূর্বের ঝি দুর্গা যে পয়সার জন্য নাজিমকে একরাত্র ঘরে থাকতে দিয়েছে তাকে দেখে মণির ভ্রূ কুঁচকে আসে, গোকুল বলে, "আপনি আমি মধ্যবিত্ত। মজুর-বিপ্লবের চাড় যখন বাড়ছে, তখন আমরা যে আসলে কি, তার কতগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়।" মনি বাপের আদুরে ছিল তাই তার লক্ষণ হোল, "কি চাই জানি না, যা চাই তা পাই না, যা পাই তা চাই না। জীবন মনের মত নয়, জগৎ মনের মত নয়। আমি একদিকে আর সমস্ত জগৎ আর এক দিকে।"

গোকুল আরও বলে, "জীবনের বন্যায় ধরা পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি বলেই না

আপনার আমার রেহাই পাবার সাধটা এমন উগ্র হয়েছে ? বদ্ধ-জলায় পচা-নালায় যারা আটকে গেছে, তারা পচে গেঁজে বাষ্প হয়ে মহাশূন্যে উপে যেতেই ভালবাসবে ; কিন্তু কোটালের জোয়ার আমাদের ভাসিয়ে এনেছে জীবন নদীর স্রোতে। এই স্রোতে মিশে না গিয়ে আমাদের উপায় কি ? স্রোতে এসে পচা নালার ঘোলাটে জল কতক্ষণ আমিত্ব বজায় রাখতে পারে ?"

গোকুলও আগে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে জীবন গেল বলে অনেক কবিতা লিখেছে। কিন্তু শেষে যখন বুঝতে পেরেছে ও সব ফাঁকি দিয়ে চলে না তখন একদিনেই তার শ চারেক কবিতা পুড়িয়ে ফেলেছে। সে দিনের কথা গোকুল বলে, "একটা কারখানায় ধর্মঘট হয়েছিল। আমার চোখের সামনে শুধু ধর্মঘট করার জন্য তিন জন মজুর গুলি খেয়ে মরে গেল। প্রাণে আমার আগুন ধরে গেল।" গিরিনের বন্ধু মনসুর একটা মোটা বেতনের কাগজের সম্পাদক হয়ে হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচারে কোমর বেঁধে লেগেছে। আসলে "কবি হয়ে, প্রগতিশীল হয়ে সুবিধা ছিল না, একটা অজুহাত খাড়া করে ভোল পাল্টেছে।"

"মন কিন্তু মানে না গিরীনের। সে জানে, সংসারে বেঁচে থাকার বাস্তবতাই মানুষকে চালায়, যে শ্রেণীর যার যেমন বাঁচা। তারও অনেক আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব আছে, যারা সামান্য একটা চাকরীর জন্য গরীব শোষিত মানুষের শত্রুর দলে ভিড়তে পারে—কিন্তু সে আর তা পারে না।" কারণ যে সমাজের সঙ্গে তার এখন মেলামেশা তাকে বাতিল করে দিয়ে অন্য শ্রেণীর সঙ্গে মিশতে গেলে "সে একা হয়ে যাবে, নিজের বিকার দিয়ে নিজেকে কুরে কুরে মারবে, অভিশপ্ত প্রেতের মত একাকীত্বের মহাশূন্যে ঝুলে থাকবে।" গিরীন কিন্তু মনসুরের জন্য মন খারাপ করে। তার এভাবে বিগড়াবার কারণ খুঁজে পায় না। কিন্তু সাধারণ শ্রমিক কাল্লু চটকরে সেই ভুল ধরতে পারে। সে বলে, "লিখাপড়া জানা আদমি কমজোর হবে ভুলচুক করবে।" মনছুরের টি. বি. হয়েছে শুনে গিরীনের আরও দুঃখ হয়।

প্রণবও খুব চিন্তিত। বাংলা দেশের মানুষ এমনকি কমিউনিষ্ট পার্টিও তখন গান্ধী-জিন্না বৈঠকের উপর জোর দিয়েছিল। তারা আশা করেছিল এর দ্বারাই সমস্যার সমাধান করা যাবে। কিন্তু মানিক ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাই তাঁর প্রণব বলে, "আমার মনে হয়, আমরা ভুল করছি। গান্ধী-জিন্না আপোষ চেয়ে জনসাধারণের স্বার্থ নষ্ট করছি। ঐ স্তরে আপোষ হবেও না সে আপোষে সাধারণ মানুষের লাভও নেই। গরীব খাটুয়ের মধ্যে খাঁটি হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি আছে, ওটাই মিলনের আসল ভিত্তি করা উচিত ; কংগ্রেস-লীগ মিলন হয়। কংগ্রেস-লীগ-বৃটিশ

এই তিন পক্ষে আপোষ হতে পারে, কংগ্রেস-লীগ আপোষ হবে না। বৃটিশের আপোষ আদরে কংগ্রেস-লীগ দু ভাই লায়েক হয়েছে, সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে নিজেরা লাঠালাঠি করতে পারে, বৃটিশের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, কিন্তু বৃটিশকে বাতিল করতে তো পারে না।

ওদের পলিসির ফলে এই দাঙ্গা, ওদের মধ্যে আপোষ চাওয়া মানেই এই বৃটিশের ফরমাসী পলিসি সমর্থন করা।" গোকুল আরও স্পষ্ট করে বলে, "নেতাদের মর্জির উপর নির্ভর করে আমরা সাধারণ খাটুয়ে মানুষদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।"

মণির সঙ্গে সুশীলের বিরোধও বাড়ে। মণি বুঝতে পারে, "এতকাল এক সাথে মিলে-মিশে ভালবেসে হেসে কেঁদে ন্যাকামি করে দু'জনে তারা ফাঁকিতে ফাঁপানো পারিবারিক কর্তব্য আর দায়িত্ব পালন করার নামে ঝকমারি করে আসছিল।" একদিন "সুশীল একটু মত্ত অবস্থায় ফিরে আসে। ভূমিকা পর্যন্ত না করে সে চিরকালের অভ্যস্ত প্রথামত মণিকে ভোগ করতে উদ্যত হয়। এ বিষয়ে চিরকালই সে ছিল নিরঙ্কুশ।" মণি বিষাদ-অবসাদে মৃতের মত নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু সকালে উঠেই সুশীলের প্রতি ঘেন্নায় তার মন ভরে উঠে।

রাতের তর্ক সম্বন্ধে সকালে মণির সঙ্গে গোকুলের আলাপ হয়। গোকুল বলে, "কংগ্রেস বা লীগ সে রকম স্বাধীনতা চায় না যা মজুর-চাষী সাধারণ লোককে স্বাধীন করবে। ইংরেজের আপোষে ও-রকম স্বাধীনতা মিলতেই পারে না। নইলে ইংরেজের ভারত ছাড়া নিয়ে এত মারামারি কেন ? এত সর্ত কিসের ? বিদেশী তোমরা ভাগো, ফাঁকির স্বাধীনতা, তাই নানা রকম সর্ত নিয়ে দর-দস্তুর।"

আসলে "উপরতলার এক দল লোক নামে দেশ-শাসনের এক ধরণের কিছুটা ক্ষমতা পাবার লোভে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে ভেজাল স্বাধীনতা কিনছেন। আপোষে দর-দস্তুর করছে তারাই। দেশে আগুন জ্বলছে, সৈন্যরা পর্যন্ত বিদ্রোহী। সোজাসুজি এদেশের ঘাড়ে চেপে বসে রক্ত শোষার সাধ্য আর ইংরেজের নেই, তাই প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা দিয়ে পরোক্ষ দাসত্বে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা চলছে। সে ব্যবস্থা মেনে নিয়ে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চলেছে কংগ্রেস আর লীগ।"

সেদিন সুধীন ছাত্রদের ডেমনেষ্ট্রেশনে যোগ দিতে চায়। মণি রাজী। কিন্তু সুশীল তাকে নিষেধ করে। সুশীল নিষেধ করায় মণির জেদ চেপে আসে। সে আশাকেও যোগ দিতে বলে। সুশীল তার সংসারটা ভেঙ্গে গেল বলে আপশোষ করে। গিরীন বলে, এমনি কালের গতি। সকলেরই আগেকার ধরণের সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে। নতুনভাবে গড়ে উঠবার জন্যই ভাঙ্গছে। সুশীলের ধারণা গিরীনদের

আড্ডায় এসেই তার যত ঝকমারি হয়েছে। গিরীন বলে, তা না হলে আজ সুশীলকে সপরিবারে অক্কা যেতে হত।

গিরিন বলে, "আপনি কেবল একমুখো নীতিকথা বোঝেন, সদা সত্য কথা বলিবে। জীবন কিন্তু চলে, দুমুখী নীতিতে সেজন্য চিরন্তন সত্যটা আসলে মিথ্যা। এ ভাবে না ধরলে জীবনের মানেই বোঝা যায় না।"

বিকেলে সুধীন ও আশা ফিরে আসে, তার একটু পরে সুশীলও বাড়ী ফিরে আসে। মণিকে বলে, সে কাল সকালেই নতুন বাড়ীতে চলে যাচ্ছে। জিনিস পত্রও সে সব নিয়ে যাবে। মণি বা ছেলেমেয়েদের উপর সে কোন জোর করবে না। ইচ্ছে করলে তারা যেতে বা না যেতে পারে।" সুশীল মণির বিয়ের গহনা ছাড়া আর যা সে দিয়েছে সবই নিয়ে যাবে। মণি সুশীলের এ চালকে বলে দাসখৎ। "এখানে এসে অবধি ছাঁটাই আর লক-আউটের কথা শুনছে ক্রমাগত, মালিক চায় খুশী মত ছাঁটাই করার স্বাধীনতা, মালিক না কি তার-স্বরে নালিশ জানায় যে কি এমন দাসখৎ লিখে দিয়েছে যে গাঁটের পয়সা দিয়ে লোক রাখা বা না-রাখার স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত থাকবে না! এতদিন পরে আজ যেন প্রথম মণি বুঝতে পারে, মজুর-কেরাণীরা কেন কাজ করার অধিকারকে বলে স্বাধীনতা, ছাঁটাই করার অধিকারকে বলে মানুষকে দাস করে রেখে রক্ত চোষার ভাঁওতা।"

মণি ঠিক করতে পারে না কি করবে। পরদিন সকালে সে সুধীন আশাকে বলে, "আজ আমরা ওনার সঙ্গে অন্য বাড়ীতে যাব।" কিন্তু সুধীন বা আশা কেউ নতুন বাড়ীতে যেতে রাজী নয়। মণি তাই ভেবে চিন্তে সুশীলের কাছে দু দিনের সময় চেয়ে নেয়। সুশীল খুশী হয়েই এ অনুমতি দিয়েছে। সে পাকা ঝানু লোক। সে জানে কখনও শক্ত হতে হয়, কখনও নরম হতে হয়। "বহুকাল ধরে সে তার জীবন্ত সম্পত্তি বিয়ে করা বৌটিকে ভোগ-দখল করেছে, স্ত্রী বশে রাখার কোন কৌশল তার অজানা নয়।" মণি তবু আকুল হয়ে ভাবে কি করে বাকী জীবনটা এই মানুষটার সঙ্গে কাটাবে?

দেশে তখন একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। চারিদিকে বিদ্রোহ ফেটে পড়ছে। পুলিশ আর সৈন্যের মধ্যে পর্যন্ত এ আগুন ছড়িয়েছে। "এমনই দেশের অবস্থা যে নেতা মশায়েরা একটিবার কোমর বেঁধে হাঁক দিলেই ব্রিটিশ-শাসক জনতার ফুৎকারে উড়ে যায়।" জনতার ফুৎকারে ব্রিটিশ পাছে ঝলষে পুড়ে উড়ে যায় এই ভয়ে নেতারাই হয়েছে সন্ত্রস্ত, মুস্কিল হয়েছে ওইখানে। এত বেশী বিদ্রোহ দেখে নেতারা খুশী নন। বিদ্রোহ হবে মৃদু, অহিংস-আয়ত্তে থাকবে। নইলে নেতৃত্ব থাকে কিসে?"

স্বামীর সাথে আপোষ করে মণি সাগ্রহে ভোর থেকে মাঝরাত্রি পর্যন্ত দেশের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক শোনে। গোকুলের সঙ্গে সে সুশীলের সম্বন্ধে আলোচনা করে। মণি নিজে কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারে না। গোকুল বলে, সুশীলদা কিন্তু নরম হবেন না। ওঁর মতি গতি অন্য রকম। সংসারের চেয়ে ওঁর কাছে সংসারের দখলি স্বত্ব বড়, তার চেয়ে বড় টাকার সুখ, আরাম-বিলাস। মনে-প্রাণে টাকার কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছেন, বড় বড় ডাকাতরা যে লুট চালাচ্ছে উনি তার ছিটে ফোঁটা ভাগ চান, অন্ততঃ যাতে একখানা বাড়ী একখানা গাড়ীর মত আরাম-বিলাস মান-সম্মান হয়।"

সেদিন কুৎসিৎ কালো কানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় যোগ দিতে গোকুল, সুধীন আশার সঙ্গে মণিও গেল। "অতিনিরীহ শান্তপশ্চাৎপদ মানুষেরও তার দেশে যে আইন চালু আছে ভাবলে গা-জ্বালা করে, রক্ত গরম হয়ে ওঠে। অমানুষিক আইন মাথার উপর ঝুলছে জেনে সাধারণ মানুষের সাধ্য কি নিজেকে পুরোপুরি মানুষ মনে করে।"

ভূষণ যখন বলে যে, এই ফ্যাসিস্ত আইন দেশের মানুষকে পদানত দাস করে রাখার অস্ত্র ; তখন তার মনের মধ্যে ঝলক মেরে যায় এই কথাটা যে, তাকে আর তার ছেলে-মেয়েকে সুশীলের গায়ের জোরে দাস-দাসী বানিয়ে রাখার চেষ্টাও অনেকট। এই রকম। কিন্তু এরকম জোরালো প্রতিবাদ কি সুশীলের সইত, এ রকম স্পষ্ট নির্ভীক সমালোচনা ?

প্রতিবাদ ও সমালোচনা। "দেশটা বিভক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাবে, সব আয়োজন প্রস্তুত। আংশিক আপেক্ষিক স্বাধীনতা, রক্ত-মাংস বাদ দিয়ে ছাড়ানো চামড়ায় খড়-কুটা-জঞ্জাল পোরা মেকি স্বাধীনতা। যে আইন চালু থাকলে চামড়া শুধরে না নেওয়া স্বাধীনতার মৃত প্রতিমূর্তি অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়ায়, জ্যান্ত বাঘ পোষ মানবার সাধ মেটার বদলে চামড়ার মরা বাঘে ঘর সাজিয়ে সখ মেটানো পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে যায়।"

সভার উপর লাঠি ও গুলি চলে। তাতে আশা, গিরীন এবং ভূষণ আহত হয়। ভূষণের অবস্থাই হয় মারাত্মক। মণিদের পাড়ার অসীম ডাক্তার ঘটনাচক্রে মীটিং-এ থাকায় সেই বাঁচায় ভূষণকে এবং গিরীনকে।

অসীম ডাক্তারের গাড়ীতেই মণি গোকুলকে বলে, "সন্তানের রক্তপাতের মধ্যে স্বাধীনতা পেলাম। তোমাদের বলিনি, আজ বলছি। না বলে পারব না। স্বামী দেবতা বড়লোক বন্ধুর চোরা-কারবারের এজেন্ট হবেন, বন্ধু বাড়ী জুটিয়ে দিয়েছে। আমি বলেছিলাম, যাব না। স্বামী দেবতা নোটিশ দ্যান, না গেলে ত্যাগ করবেন, বিয়ের গহনা দান-সামগ্রী ছাড়া যা কিছু দান করেছেন সব বাজেয়াপ্ত করবেন।"

মণি আরও বলে, "আমি আজ তোমার সুশীলদাকে নোটিশ দেব গোকুল, ভাল বাড়ীতে গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে বজ্জাতি করার মতলব যদি না ছাড়ে, আমিই ওকে জন্মের মত ত্যাগ করব।"

গোকুল বলে, স্বামী ত্যাগ করলেই যদি স্বাধীনতা পাওয়া যায় তাহলে ডাইভোর্স মামলায় মানুষ স্বাধীন হয়ে যেত। হাঙ্গামার খবর পেয়ে সুশীল ভয়ে ভাবনায় দিশেহারার মত ছটফট করছিল। আশার খবর শুনে সে হাহাকার করে ওঠে। প্রচণ্ড ক্রোধে মণির উপর সব দোষ চাপিয়ে দেয়। আজ কিন্তু মণিও ছেড়ে কথা কয় না। সে আজ সমান সম্মানের দাবী করে। সুশীল গুম খেয়ে যায়। "এতদিন এখানে বিপ্লবীদের সঙ্গে বসবাস করেও সুশীলের মন প্রাণ রয়ে গেছে যতীনদের সঙ্গে ভীড়ে কিছু চুরি-চামারির পয়সা করার দিকে—উঁচু গাছের ডালে বসেও শকুনের দৃষ্টি যেমন আটক থাকে ভাগাড়ে।"

পরদিন মনসুর রশোনা মাপ চাইতে আসে। মনসুর বুঝতে পারে, খুনে বজ্জাতদের সঙ্গে আপোষ করে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব হোল না। সেখানেও একই প্রশ্ন—"হয় মান দাও, নয় জান দাও।" কবি নিজেই সিদ্ধান্তে এসেছে, "আপোষের পথে হয় না, এযুগে মাঝামাঝি পথ নেই, হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার।"

শেষ পর্যন্ত সুশীল চলে যায়। মণির তোলা গয়নাগুলোও সে নিয়ে গিয়েছে। যেখানে যা ছিল কুড়িয়ে সে যতীনের কারবারে ঢেলেছে। লাখপতি হবার ভূত তার ঘাড়ে চেপেছে। এদিকে সে আদালতে নালিশ করেছে।

সুশীলের প্রতি মণির ঘৃণা প্রচণ্ড বিক্ষোভরূপে দেখা দিয়েছে। তার কাছে কেবল দাম্পত্য জীবনের ফাঁকিটাই বড় হয়ে উঠেনি। "এখানে এসে জীবনের আরও একটা সত্য বড় হয়ে উঠেছে তার কাছে, দেশের ও দশের মুক্তির জন্য যার যেটুকু সাধ্য না করলে সে মানুষ থাকে না, পশু হয়ে যায়। প্রকারান্তরে পোষা পশুর মতই মেনে নেওয়া হয় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর প্রভুত্ব, যার যেটুকু লড়াই সেটুকু যদি সে না করে।" সেজন্য নিজের ভুল ত্রুটি আর দুর্বলতার হিসাব-নিকাশটাও এবার সে করতে পারে। তার নিজেরও দোষ কম হয় নি। তাহোল তার কাণ্ডজ্ঞান হারানো। "এটা নিছক তাদের দাম্পত্য কলহ নয়, আদর্শের লড়াই বটে, অথচ ক্রোধে—ঘৃণায় দিশে হারিয়ে সুশীলকে সে শুধু আঘাত করেছে, দূরে ঠেলে দিয়েছে। তার সামনে আদর্শকে তুলে ধরেনি, স্নেহ আর উদারতা দিয়ে তাকে বাঁধবার চেষ্টা করেনি, পক্ষে রাখতে চায় নি। সে চেষ্টা করলে চোরা-কারবারী বন্ধুর উস্কানিতেও সুশীল হয়তো এতটা বিগড়ে যেত না।"

প্রণব বলে তারা সুশীলের মামলার অভিযোগ স্বীকার করে নেবে। তিনি এসে স্ত্রী-পুত্রের অভিভাবক হোন, বাড়ীর অংশ দখল করুন তাতে কারুর আপত্তি নেই। মণি ভাবে এ হার স্বীকার, কিন্তু পরে মণি ব্যাপার সব বুঝতে পারে। গোকুল আশাকে ভালবাসে। তার চেহারা কুৎসিৎ হওয়ার পরও গোকুলের মনোভাব পরিবর্তন না হওয়ার জন্য মণি গর্ববোধ করে। গোকুল মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে।

দেশ ভাগ হয়ে যাবার দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঝিমিয়ে গিয়ে ওলট পালটের রূপ নিয়েছে। মানুষের জীবন হিন্দুস্থানে আর পাকিস্তানে ভাগ হয়ে গিয়েছে। শহরে আবার যে যার বাড়ী ফিরে যেতে আরম্ভ করছে। বৃটিশের মতলব হাঁসিল হয়েছে। ঘর ভাগাভাগি করে তারা শেষ চাল দিয়ে গিয়েছে। গিরীন একটু সুস্থ। হাসপাতাল থেকে সোজা জেলে গেছে—'স্বাধীনতা দাতা ব্রিটিশরাজের বে-আইনী বিনা বিচারে আটক রাখার আইনে।" গোকুল প্রণব কিন্তু আশা ছাড়ে না। "যাদের গর্জনে ব্রিটিশ পিছু হঠেছে, আবার তাদের গর্জন শোনা যাবে হিন্দুস্থানে, পাকিস্তানে—সত্যিকার স্বাধীনতা চাই"

সেদিন প্রণব খবর নিয়ে আসে সুশীলের। যতীন সুশীলকে সর্বস্বান্ত করে দারোয়ান দিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দিয়েছে। সুশীল যতীনকে খুন করতে গিয়েছিল। যতীন তাকে পুলিশে দেয়। সুকুমার তাকে জামিন দিয়ে নিয়ে আসে। সুশীল তাদের পুরাণো বাড়িতেই রয়েছে শুনে মণি, সুধীন, আশা, প্রণব এবং গোকুল সুশীলের কাছে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সির জন্য রাস্তায় নামে। প্রণব বলে, যতীন যেমন সুশীলকে ফতুর করেছে তেমনি যতীনও হবে তার কোটিপতি পার্টনার জীবনলালের কাছে। আগে একবার স্বাধীনতা আসুক। স্বাধীনতা লাভের বাইশ বছর পরেও মানিকের উপন্যাসের এই সত্য আমরা বাস্তবে উপলব্ধি করছি।

মধ্যবিত্ত সংসারে 'সোনার' একটা বিশেষ মূল্য আছে। মধ্যবিত্ত গৃহিণীরা তাকে মনুষ্যত্বের অঙ্গ বলেই মনে করে। গহনার অভাবটা তাদের কাছে অসহ্য। সাধনা এমনি এক মধ্যবিত্ত গৃহিণী। তার স্বামী রাখাল বেকার অধ্যাপক। ট্যুইসানির আয়ে কষ্টে ক্লিষ্টে সংসার চলে। সাধনার গলার হারটা ছিঁড়ে গিয়েছে। আর পরা যায় না বলে সাধনা তা খুলে রেখেছে। তার গলায় হার না থাকায় কেউ কিছু না বললেও সে যেন লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। সে যে অভাবে পড়ে হারটা বেচেনি, খুলে রেখেছে এ কথাটা বলার জন্য তার মন আকুপাকু করে। এই হার তার জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করে দিয়েছে। স্বামীর সঙ্গে শুরু হয়েছে তীব্র সংঘাত। রাখালের ভাগ্নী রেবার বিয়েতে যাওয়া উপলক্ষে ওদের মধ্যে মনোমালিন্য চরমে ওঠে।

রাখাল জানে বেকার জীবনের দারিদ্র্যই তার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কারণ, "দারিদ্র্য, রসকস শুষে নেয় জীবনের, জ্বালা আর অশান্তি রুক্ষতা এনে দেয় মাধুর্য কোমলতার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে।" বেকার হলেও দারিদ্র্যের চাপে সে তার চরিত্র নষ্ট করে না, মনুষ্যত্ব হারায় না। রাজীবের দেওয়া চাকরীকে জালিয়াতি জেনে সে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে। রাখাল সব বুঝেও একটু ভাবপ্রবণ। "আজও তার মন মজে রয়েছে আগের দিনের ফুরিয়ে আসা জীবন ধারার রসে।" যদিও সে জানে জগৎ পাল্টে যাচ্ছে, তাদের ঘর-সংসার ভেঙ্গে পড়ছে সেই পরিবর্তনের অঙ্গ হিসেবে, শেষ হয়ে আসছে তাদের মত মানুষের পুরাণো ধাঁচের জীবনযাত্রা। তবু একটি চাকরি, ছোট একটা ঘর বেঁধে সীমাবদ্ধ জীবনের ছোটখাট সুখ দুঃখ নিয়ে দিন কাটাবার অভ্যাস আজও তার নেশার মত লেগে রয়েছে। বাসে ফেরার পথে তার দেখা হয় সাধনার ছেলেবেলার বন্ধু বেলার স্বামী ধীরেনের সঙ্গে। ধীরেনও বেকার। রামরাজ্যে তারও একই অবস্থা। তাতে তারা ভেঙ্গে পড়ে নি। বেলা পাড়ার লোকদের জামা সেলাই করে পয়সা রুজি করে।

এদিকে সাধনা শেষ পর্যন্ত নিজেও হারটা বিক্রী করে দেয়। হারটা চলে যাওয়ার পর তার নিজেরও যেন মন মেজাজ বদলে যায়। তার উপর তাদের বাড়ীর কাছের কলোনীটা ঘুরে এসে যেন তার চোখ খুলে যায়। "এত অসহায়, এত নিরুপায় হয়ে পড়েও মানুষ হাল ছাড়ে না, এমন ভাবে আবার আশ্রয় গড়ে নেয়, অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবনের নতুন ভাবে ভিত গাঁথে।" সাধনার মনে প্রশ্ন জাগে কেন তারা বিরোধ আর অশান্তি মিটিয়ে মিলেমিশে দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে পারে না। তার আকণ্ঠ সাধ জাগে সকলের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে।

আসলে সংসারের সুখ, ভালোবাসা, স্বাচ্ছন্দ্য সোনার চেয়েও দামী। সোনার গহনায় তা কখনো পাওয়া যায় না বরং যাদের আপাত সুখী এবং ধনী মনে হয়েছিল যেমন আশা বা বাসন্তীকে তাও যে মেকী এবং ফাঁকি তাও শেষ পর্যন্ত সাধনা এবং রাখালের কাছে ধরা পড়ল। আশার স্বামী সঞ্জীব আশাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখার জন্য প্রচুর দেনা করে। ফলে একদিন তার মালপত্র ক্রোক করতে আসে আদালতের লোক। ধনী বলে আশা এতকাল যে সাধনা রাখালকে অবজ্ঞা করত সেই রাখালের কাছেই আশা সাহায্যের জন্য ছুটে আসে। বাসন্তীর স্বামী রাজীব ব্যবসা করে বেশ অর্থ সাচ্ছল্যে ছিল কিন্তু একদিন তার অংশীদারের চক্রান্তে সব নষ্ট হয়ে গেল। এদের দারিদ্র্যে সাধনার মোহ-মুক্তি ঘটল। হারের মোহ তার ঘুচে গেল। সে তার সোনার নতুন হারটি বাক্সে তুলে রেখে খালি গলায় থাকতে আরম্ভ করল। যে বিয়েতে

রেবার যাওয়া নিয়ে তাদের মতান্তর হয়েছিল সাধনা শেষ পর্যন্ত সেখানে না যাওয়াই ঠিক করল ; ভোলার মাদের সহজ জীবন যাত্রা তার হারের চেয়েও দামী মনে হোল। সেখানেই সত্যিকারের সুখ। জীবনকে সহজ ভাবে নিতে না পারলে তাতে নানা জটিলতা বিকার এবং বিভ্রান্তি দেখা দেয়।

'সোনার চেয়ে দামী' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে একটি বেকার মধ্যবিত্তের জীবন চিত্র হিসাবে রাখালের এবং সাধনার চরিত্র নিখুঁত। এই খণ্ডের নামকরণও করা হয়েছে বেকার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাধনাকে সুখী করতে গিয়ে রাখালের বিশুর মার হার চুরি না করলেও চলত। অবশ্য মানিক বলেছেন, "ভাঙন ধরলে এমনি তির্যক গতি পায় মধ্যবিত্তের বুদ্ধি বিবেচনা। ধরাবাঁধা পথ ছেড়ে দিতে হলেই শুরু হয় তার এঁকে বেঁকে পাক দিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে চলা। যতক্ষণ না নতুন পথ সুনিশ্চিত হয়ে যায়, সোজা চলার পথ সে খুঁজে পায় না।" রাখালের ধারণা হয়েছিল দারিদ্র্যই তার পারিবারিক অশান্তির মূল। তাই হার চুরির টাকায় রাখালের মনে একটু শক্তি এবং সহজ ভাব এসেছিল। পরে সঞ্জীব আর রাজীবের অবস্থা দেখে তার মনে বিপরীত ক্রিয়ার সৃষ্টি হোল। সে যেন জীবনে কতকটা ধাতস্থ হোল।

তবে রাখাল চোর নয়। "এ জগতে কারো কোন ক্ষতি না করে এক জনের লোক ঠকানো একস্তূপ অকেজো এবং অকারণ সোনার একটু অংশ না বলে নেবার সুযোগই সে গ্রহণ করেছে। তবে সে স্বীকার করে, নিজের হিসেবে যাই হোক, দশজনের হিসেবে তাকে চোরই বলা হবে। আসলে সাধনার স্বামী হয়ে থাকবার জন্য তার যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই করেছে। রাখালের এই চিন্তা নিয়েই **'সোনার চেয়ে দামী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড 'আপোষ'** শুরু হয়েছে।

চুরি করা গহনা বিক্রী করে রাখাল 'দু হাজার টাকা পেয়েছে। তা দিয়ে সে এখন রাজীবের সঙ্গে বিড়ির দোকান দিয়েছে। সংসারে সাচ্ছল্য আসে। কিন্তু রাখালের মনে সুখ আসে না। সে মদ ধরে।

এদিকে সাধনার পরিবর্তন হয়েছে অনেক। খুব পাড়া বেড়ায়। ধ্বংসের পথে কোন নতুন অবস্থায় জীবন আবার নতুন রূপ নিতে চলেছে জানবার বুঝবার জন্য কৌতূহলের সীমা নেই সাধনার। সাধারণ মেয়েদের মধ্যেও বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তারা আজ আন্দোলন করে, সংগঠন গড়ে, সভায় বক্তৃতা দেয়। সাধনাও সভায় যায়।

পাশের কলোনীর মালিক প্রভাতবাবু কলোনিটাকে উঠিয়ে দেওয়ার মতলব করেছেন। ভয় দেখিয়ে যখন পারলেন না তখন কৌশল অবলম্বন করলেন। প্রভাতবাবু

কলোনীর জায়গায় একটা কারখানা করেন এবং সেই কারখানায় কলোনীর মানুষগুলোকেই চাকরী দেবেন। সেজন্য কলোনীকে তিনি তারই এক দূরের জলা জমিতে উঠিয়ে দিতে চান। রাখাল প্রভাতবাবুর চালাকি ধরতে পারল না। সাধনার কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল। সভার মধ্যেই সে আপত্তি করল এবং তার কথায় শেষ পর্যন্ত প্রভাতবাবু লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। এ নিয়ে রাখালএবং সাধনার মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে উঠল। রাখাল ভাবল প্রকাশ্য সভায় সাধনা তাকে অপমান করেছে।

সাধনার এখন জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছে। অন্যান্য পাবলিক মিটিংএ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ আসে। তাতে রাখাল আরও বিব্রত বোধ করে। রাখাল বুঝে, চারদিক থেকে তাদের জীবনে ভাঙন আসছে। তবু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তো আছে। আর সেই সম্পর্কের মূল নিয়ম হোল স্বামী স্ত্রীর স্বার্থ এক হবে। কিন্তু সাধনা কেবল তার বিরোধিতা করে চলেছে। তার ধারণা সাধনার মন বিগড়ে গেছে, জীবনে বিতৃষ্ণা এসেছে। স্ত্রী হওয়ার জন্য সে হয়ত কত অপমান পরাধীনতা অসম্পূর্ণতা মনে করছে। সাধনা চায় সভাসমিতিতে যোগ দিতে, কিছু কিছু আন্দোলনে যোগ দিতে। রাখালের তাতে সম্মতি নেই। সে সাধনাকে বলে, "আমি সন্ন্যাসী নই, আদর্শ নিয়ে আমার দিন কাটেনা, জীবনটা আমি ভোগ করতে চাই। কিন্তু এ জীবনটার উপরে তোমার বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। প্রাণ দিয়ে এত চেষ্টা করলাম—সব গেল ভেস্তে। মনের দুঃখে অবশ্য মদ খাচ্ছি না—কদিন থেকে ভাবছি একটা হেস্ত নেস্ত করে ফেলব। কিন্তু মনস্থির করতে পারছিলাম না। এ ভাবে চলেনা, একটা ব্যবস্থা করতেই হবে—তবু মনটা ঠিক করতে পারছিলাম না। ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। রাজীবের সঙ্গে একদিন খানিকটা গিলে দেখলাম—প্রাণটা ঠাণ্ডা করা যায়। রাত্রে তোমার কথা ভুলে গিয়ে ঘুমানো যায়।"

সাধনা এখন আর কোন বিষয়ে অত সোজা সিদ্ধান্ত করে না। সে তলিয়ে বুঝতে চায়। সে জানে, "এ ভাঙনে মিশেছে অকথ্য মিথ্যা ও ফাঁকি, অকারণ কুৎসিৎ বিড়ম্বনা! দেশ জুড়ে গায়ের জোরে যেভাবে বিষাক্ত করা হয়েছে জীবনকে, তারাও তার ভাগীদার হয়েছে বৈকি!

রাখালদের বেকার হয়ে না খেয়ে মরার দশা হয় কিন্তু বেকারত্বের প্রতিকারের বদলে বিরাট তোড়জোড়ের সঙ্গে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চলে ভদ্র জীবনের কৃত্রিমতা অবাস্তবতা সম্পর্কে মিথ্যা মোহ। রাখালের মত ভদ্রলোকদের জীবনের বাস্তবতা যেখানেই দাঁড়াক, ভদ্র থাকাই অসম্ভব হয়ে যাক, ভদ্র জীবনের নিছক সাজানো

গোছানো খোলসগুলি, কৃত্রিমতাগুলি, অবাস্তব ভাবাবেগগুলি জীবনের সেরা সম্পদ হিসাবে মহাসমারোহে বাঁচিয়ে রাখা হয়।...

ভদ্রঘরের ছেলে বাধ্য হয়ে কারখানায় খাটছে, কণ্ডাক্টরি করছে, ফেরিওলা হয়েছে—সেটা যেন জীবনটাকে খাপ খাইয়ে নিয়ে বাঁচার জন্য নয়, ভদ্রজীবনটাকে কোনরকমে বাঁচাবার জন্য।"

কিন্তু নীচের তলার সাধারণ গরীব মানুষদের এরকম হয়না। তাদেরও সব রকম দুর্দশা আছে কিন্তু মৃত জীবনের ভূতের বোঝা তাদের বইতে হয় না।

চারিদিকের ভাঙনের ছবি রাখালের চোখ খুলে দেয়। মালতী-রাজীব, আশা-সঞ্জীবের অবস্থান্তর রাখাল প্রত্যক্ষ করে। রাখাল সবচেয়ে আহত হয় প্রভাতের প্রবঞ্চনায়। প্রভাতের প্রতিশ্রুতি সব মিথ্যা প্রমাণিত হল। রাখাল স্বীকার করল তারই ভুল হয়েছে। কি ভাবে যেন সাধনার উপর রাগ আর অভিমান জুড়িয়ে গেছে। তাদের সামনে আদর্শ ছিল নতুন ভাড়াটে সুমতি-অশোকের জীবন। ওদের নব বিবাহিত জীবনেও কোন উচ্ছ্বাস নেই, গদগদ ভাব নেই। অথচ তারা কেমন সতেজ এবং হাসি খুশী। রাখালের কাছে সাধনার স্বামীভক্তির জন্য অস্থিরতা মিথ্যা প্রতীত হয়। সে সাধনাকে বলে, "বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোন রকম সম্পর্ক সম্ভব নয়। এটাই হবে শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ-ভালবাসার মূল কথা যে তুমিও মানুষ আমিও মানুষ। আমরা এক দেহ এক প্রাণ, আমি খেলে তোমার পেট ভরে, এসব ফাঁকি আর চলবে না।"

তারা প্রভাতের ভাঁওতার বিরুদ্ধে একত্রে সংগ্রাম করবে ঠিক করে। এতদিন পর তাদের নতুন জীবন আরম্ভ হয়েছে। নতুন দর্শনই তাদের নতুন জীবনপথ তৈরী করেছে। সে পথের আলোচনা তাদের সারাজীবনেও ফুরাবে না। এগিয়ে চলার পথেই তা শেষ করতে হবে। আজ সংগ্রাম কেবল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধেই নয়, সংগ্রাম পুরাণো ভাবধারার বিরুদ্ধে, পুরাণো সংস্কারের বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রাম শুরু হয়েছে ঘরে ঘরে। এই উপন্যাসে মানিক তারই এক সুন্দর আলেখ্য রচনা করেছেন। সোনার চেয়ে দামী মানিকের সমাজ সচেতন একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস আর সাধনা যশোদা রম্ভারই পরিণত রূপ। বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সৃষ্টি।

ছন্দপতন (১৯৫০) একজন কবির আত্মপ্রতীতির ইতিবৃত্ত। এ যেন মানিকেরই আত্মকাহিনী। কবি নিজেই তার কাহিনী বলেছেন। তার নাম নবকুমার। বয়স পঁচিশ। দু'খানা কবিতা সংকলনের রীতিমত নামকরা কবি। সে স্নায়ুপ্রবণ বা ভাবপ্রবণ পরম বেহিসেবী কবি নয় অতএব জীবন ও জগৎটা তার কাছে নিছক

স্বপ্নাত্ম ব্যাপার নয়। সে বস্তুবাদী কবি। তার কাছে 'বস্তুই সত্য, সত্যই বস্তু।' গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সে বলে :

"আমি কবিতা লিখি, শব্দ মদ চোলাই করি না। আকাশ চষে আমি কাব্যফুলের চাষ করি না, মাটির পৃথিবীতে মানুষেরই জীবন নিয়ে কাব্যের ফসল ফলাই। জীবন্ত মানুষের বিচিত্র কাব্যময় প্রাণবস্তু, জগৎ থেকে ভিন্ন মানব জগতের অস্তিত্ব নেই আমার কাছে। ভাব চিন্তা আবেগ অনুভূতি সবই পার্থিব জীবনের রসে পুষ্ট।

ছেলেবেলা থেকেই কবিতায় খোকামি আর ন্যাকামি আমার পিত্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে। মনে পড়ে পনের বছর বয়সে লিখেছিলাম—

শব্দ মদ বেচা শুঁড়িগুলো
কাব্যলক্ষীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল।
শুঁড়িগুলো সব মরে যাক,
কাব্যলক্ষীর দেহে যৌবনেব জোয়ার ঘনাক।"

শুধু কবিতায় নয়, জীবনেও সে বস্তুবাদী। কবিরা সাধারণত একরকম, জীবনে অন্যরকম—এটা তার কাছে "উদ্ভট ব্যাপার মনে হয়। এ যেন ব্রহ্মচারীর নারী অঙ্গ স্পর্শ না করেও শুধু ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে পুত্রোৎপাদন।" তার কবিতায় হতাশা আর অভিমানের কোন স্থান নেই। সুময়ের মতো জনপ্রিয় কবি না হলেও তার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন তার কবিতা মানুষের মনে এক উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করবে।

বিচিত্র মানুষের সম্পর্কে কবি আসে। বড়লোক ডাক্তারের কলেজে পড়া মেয়ে মানসী, মস্ত ব্যবসায়ীর বাড়িতে গৃহ-শিক্ষকতা, গরীব তৃপ্তি, অশোক-আলেয়া-মলয়াদের উদ্বাস্তু পরিবার। নবর নিজের পরিবারে অবশ্য তার কবিতা লেখা নিয়ে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। তবু নব কবিতা লেখে। মানুষের সংগ্রামী-জীবনের মর্মবাণীকেই সে ভাষা দিতে চায়।

একদিন সে লেখে এক নতুন কবিতা, 'প্রতিকার চাই'। কবিতাটা সে নানা লোককে শোনায়। তার কড়া সমালোচক অধীর বলে কবিতাটার প্রাণ আছে, ক্লাবের শ্রোতারা বলে নাড়া দেয় ঠিক কিন্তু কেন ও কিসের আবেগ ধরা যায় না। মানসী, অশোক, আলেয়া, মলয়া, নিখিল সবাই শোনে কিন্তু তারা কেউ সন্তুষ্ট হতে পারেনি। যে তমালকে উপলক্ষ করে কবিতাটা লেখা তার কাছেও কবিতাটিকে কেমন নীরস বোধ হয়। শেষ পর্যন্ত বিড়ি শ্রমিক বন্ধুরাও তাকে অনুমোদন করতে পারে না। নব কবিতাটি ছিঁড়ে ফেলে। সে বুঝতে পারে, "শত শত বছর ধরে জীবনের সঙ্গে ধারাবাহিক যে কাব্যবোধ সকলে পেয়েছে বিচিত্র চেতনার সাথে, আমার কবিতায়

সেই বোধকে নাড়া দিয়েছি। কিন্তু এদের প্রাণের ভাষা জানি না বলে বোধগম্য মানে দিতে পারি নি।"

সত্যিকারের কবি হবার জন্য নব কঠোর সাধনা করে। অবশেষে সে তৃপ্তির কাছে হারানো সূত্রের সন্ধান পায়। সে বুঝতে পারে, মানুষকে না ভালবেসে মানুষকে না শ্রদ্ধা করে কেবল পুঁথিগত এবং বুদ্ধিচর্চায় মানুষের প্রাণের কথা বলা যায় না। সত্যিকারের মানুষের কবিতা লিখতে হলে মানুষকে ভালবাসতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে তবেই সে খাঁটি মানুষের কবি হতে পারবে।

সে বুঝতে পেরেছে, "ভালবাসা ছাড়া শ্রদ্ধা নেই—শ্রদ্ধা ভালবাসা ছাড়া আত্মীয়তা হয় না। শ্রদ্ধায় ভালবাসায় মানুষের আপন না হয়ে কি করে জানব সেই প্রাণের ভাষা—যে ভাষা ছাড়া জীবন কথা কয় না।"

ছন্দ পতন তাই নব-কবির জীবনবোধের কাব্য। কবির আত্মসমালোচনার এক কাব্যিক প্রকাশ। মানিক স্বনির্বাচিত গল্পের ভূমিকায়ও এই কথা বলেছেন, "জীবনকে জানা আর জীবনকে মায়া করা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। একটাকে বড় করে অন্যটাকে তুচ্ছ করা জীবনদর্শীর পক্ষে বীভৎস অপরাধ।" মানিক প্রথমে এ উপন্যাসের নামকরণ করেছিলেন 'কবির জবানবন্দী' পরে নাম বদলে রাখেন 'ছন্দ পতন'।

ইতি কথার পরের কথা উপন্যাসের নায়ক বারতলা গ্রামের জমিদার জগদীশের পুত্র শুভময় বৈজ্ঞানিক। 'উচ্চ শিক্ষার মহান আদর্শের খাতিরে যৌবনের সেরা বছরগুলি সাধনায় খরচ করে দেশবিদেশ থেকে সঞ্চয় করা বিজ্ঞানের জ্ঞান এদেশে কিভাবে কোন কাজে লাগালে কিছু পয়সা আসবে, তার স্বপ্ন তার সাধনার সফল হবে'—এটাই তার জীবনের সমস্যা। নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলা তার খেয়াল। বিলেত যাওয়ার আগে গত যুদ্ধের হিড়িকে শুভময় গ্রামে স্টোভ ল্যাম্প লণ্ঠনের কারখানা খুলেছিল। যুদ্ধের পর তা বেশীদিন চলে নি। তারপর সে বিলেত গিয়েছে। বিলেত ঘুরে আবার সে গ্রামে তার 'নব শিল্প মন্দির'কে নতুন করে গড়ে তুলতে চায়। এ কাজে সে পরামর্শ করে একদা সহপাঠী পাশ না করা গ্রাম্য ডাক্তার নন্দের সঙ্গে।

দেশের সামাজিক অবস্থার তখন অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। নিরীহ মুখ-বোজা কৃষকগুলো জোতদারের ধান-লুঠ করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। দেশের শোষিত মানুষ তাদের পারিপার্শ্বিক শ্বাস রোধকারী অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প। সেখানে তাদের বাধা প্রতিপক্ষ শ্রেণী স্বার্থ। সেই স্বার্থের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে নিরন্তর সংগ্রাম।

শুভময় জমিদার জগদীশের ছেলে হলেও সমাজের নীচুতলার মানুষদের প্রতি

সহানুভূতিপ্রবণ। সে নন্দ ডাক্তারের বাড়িতে আড়াল থেকে সংগ্রামী চাষীদের কথাবার্তা শোনে। কারণ জমিদার পুত্র বলে সাধারণ মানুষের তার প্রতি রয়েছে স্বাভাবিক অবিশ্বাস।

অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে লক্ষ্মীর আলাপ আলোচনা শুনে শুভ অবাক হয়ে যায়। হবারই কথা। কারণ গজেনের বাল-বিধবা লক্ষ্মী এখন কৃষক আন্দোলনের নেত্রী। শুভর মনে হয়, "এদের বাদ দিয়ে দেশ কথাটার মানে হয় না, দেশের স্বাধীনতার বা এগিয়ে যাবারও মানে হয় না।" সে মিশতে চায় গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে, জানতে চায় তাদের সুখ-দুঃখের কথা। গড়তে চায় দেশে নতুন নতুন শিল্প। সে অত্যাচারী শোষক জমিদার পিতার প্রতিবাদী। কিন্তু গ্রামের চাষী-সাধারণ ভিন্ন শ্রেণীর। তারা সহজেই জমিদার জগদীশের ছেলেকে বিশ্বাস করে না। সেজন্য সে তাদের জীবনের শরিক হতে পারে নি। শেষকালে শুভ "স্পষ্টই অনুভব করে যে হাজার আবেগ আর আন্তরিকতা নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করলেও...এই মানুষগুলির সঙ্গে আত্মীয়তা জমাতে পারবে না। জগদীশ মাঝখানে এক দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে।"

এই উপন্যাসে কাহিনী হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে কৈলাশ এবং লক্ষ্মীর কথা। কৈলাস কালীসাধক ত্রিভুবন দত্তের পুত্র। আর লক্ষ্মী খুনের বৌ। কৈলাসের সঙ্গে তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে। এই কৈলাস লক্ষ্মী অগ্রসর কৃষক সমাজের প্রতিনিধি। তারা জানে জীবন সার্থক করা সবচেয়ে বেশী সম্ভব হয়েছে সোভিয়েট আর চীনে। তারা সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়।

ভূদেব-কন্যা মায়াকে শুভ ভালবাসে। এই মায়ার সঙ্গে শুভর মিলনের আভাস দিয়েই কাহিনীর ইতি।

পুতুল নাচের ইতি কথায় ডাক্তার শশী গ্রামে বাস করে কৃষক কন্যা কুসুমের হৃদয়াবেগের পরিচয় পেয়েছে আর ইতিকথার পরের কথায় বৈজ্ঞানিক শুভ কৃষক কন্যা লক্ষ্মীর মধ্যে সংগ্রামী চেতনার পরিচয় পেয়েছে। শশীর গ্রাম ছিল নানা অন্যায় আর কুসংস্কারে পরিপূর্ণ আর শুভর গ্রাম নতুন সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। গ্রামের জমিদার সেখানে অবজ্ঞেয়। কিন্তু উপন্যাস হিসাবে ইতিকথার পরের কথা পুতুল নাচের ইতিকথার মত সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। সেখানে আছে সমগ্রতার অভাব, আবেগের অভাব।

পাশাপাশি (১৯৫২) রোমান্টিক রিয়ালিজমের উপর ভিত্তি করে একটি আদর্শবাদী মানুষের কাহিনী। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুনীল। 'বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে, স্বাস্থ্য ভাল, চেহারা ভাল, চাকরী করে ছাঁকা তিন শ' টাকা মোটা

বেতনের।' তবু সুনীল বৌ চায় না, নেশা করে না, সিনেমা দেখে না, জুয়া খেলে না। মা বাবা ভাই বোনের বিরাট সংসারে দায়িত্ব সে হিসাব কষে কষে সানন্দে চালিয়ে যায়। সেজন্য বাড়ীর লোকেরা পর্যন্ত তাকে বলে রসকসহীন ভোঁতা মানুষ। সংসারের দায় সামাল দিতে সুনীলকে পার্ট-টাইম এবং ট্যুইসানিও করতে হয়।

পার্ট-টাইম করতে গিয়ে আলাপ হয় মায়ার সঙ্গে আর ট্যুইসানি করে নন্দার। সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়েও সুনীল এবং মায়া পরস্পরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে অথচ ভালোবাসা বলতে যা বোঝায় তা ওদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। মায়াও সুনীলের মত কর্তব্যনিষ্ঠ। সংসারের সব দায় তার ঘাড়ে। মায়াকে অসুস্থ পিতা এবং সংসারের দায়িত্ব পালন করতে হয়। আর পিতার কাগজ যাতে দেখাশুনা করতে পারে সেজন্য নন্দা সুনীলের কাছে ইংরেজী শিক্ষার পাঠ নেয়।

সুনীল কাজ করে কালোবাজারী অঘোরের অফিসে। তাঁর মেয়ে বিভা। বয়স কম করে ধরলেও পঁচিশের নীচে নয়। গতবার বি. এ. পাশ করেছে। তিনবারের চেষ্টায়। রং একটু কালো, পা খোঁড়া। লাবণ্যে ঢল ঢল মুখ। কিন্তু মুখে ঘন রোমের বাড়াবাড়ি। অঘোরবাবু জামাই করবেন বলে ভাল ভাল ছেলেকে ধরে বড় পোষ্ট দেবার লোভ দেখান। ছেলেরা বিয়ে করতে রাজীও হয় কিন্তু বাধ সাধে বিভা। সে সুনীলেরই ছাত্রী। সুনীলের নীতিবোধ এবং সততায় সে প্রভাবিত। সেজন্য শুধু টাকার লোভে যারা বিয়ে করতে আসে বিভা তাদের বিয়ে করতে রাজী নয়। সে বিপদে আপদে পরামর্শের জন্য সুনীলের কাছে আসে।

সুনীলের পড়াশুনা আছে, লেখায় হাতও আছে। নন্দার কাগজে সে রবীন্দ্র কাব্য নিয়ে প্রবন্ধ লেখে। কাগজটার মালিক নন্দাই চালায় তবে বেনামী সম্পাদক নিখিল। নন্দার স্বামী প্রমোদই 'দি পিপলস ভয়েস' নামে কাগজটা বের করেছিল। "দেশ ভাগ হয়ে স্বাধীনতা আসবার সময় প্রমোদের খবরের কাগজ বার করার ঝোঁক চাপে। এই তো উপযুক্ত সময়। যে বিরাট পরিবর্তন ঘটতে চলেছে চারিদিকে, ভবিষ্যতের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা যেন কোন দলের স্বার্থে ব্যক্তির স্বার্থে ব্যাহত না হয়, ক্ষুণ্ণ না হয়।" দেশের মানুষের স্বার্থে একটা নির্ভীক সংবাদ পত্রের প্রয়োজন মনে করেই সে এই কাগজ প্রকাশ করে। "যে কাগজ সহজ স্পষ্ট পরিষ্কার ভাষায় দেশের লোকের কাছে খুলে ধরবে সমস্ত দল আর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির স্বরূপ, তাদের প্রত্যেকটি কার্যকলাপের আসল উদ্দেশ্য, চিনিয়ে দেবে কে দেশের শত্রু কে মিত্র, তীব্র তীক্ষ্ণ আঘাতে নস্যাৎ করে দেবে মতলববাজ সুবিধাবাদী মানুষদের।"

সুনীল অবশ্য বলে। "অদলীয় মানুষ হয় না, অদলীয় কাগজও হয় না। মানুষ

হোক, কাগজ হোক, একটা পক্ষ নিতেই হবে।" সে নন্দাকে আরও স্পষ্ট করে বলে, "নিজেকে আপনি নিরপেক্ষ মনে করেন। কিন্তু মনে করলেই তো সেটা সত্যি বা সম্ভব হয় না। রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামালেও রাজনীতি বাদ দিয়ে আপনার চলতেই পারে না, আপনার জীবনে রাজনীতি এঁটে থাকবেই। আপনি একটি কাগজের মালিক কিন্তু ধরে নেওয়া যাক্ আপনি কাগজ পর্যন্ত পড়েন না। কিন্তু শোনেন তো চালের দর কোথায় উঠেছে? লোকে না খেয়ে মরছে? উদ্বাস্তুরা কি রকম কষ্ট পাচ্ছে? কত মানুষ বেকার বসে আছে? সব কিছু কালো-বাজারের গ্রাসে গেছে? দেশের লোকের সভায়, শোভাযাত্রায় লাঠি গুলি চলছে? শুনে নিশ্চয় গা জ্বালা করে আপনার। তার মানেই পক্ষ নিলেন।"

পক্ষ তো দুটো। শোষক আর শোষিত। রাজনৈতিক দলও আসলে দুটোই। শোষকের দল আর শোষিতের দল। "বাকী সব উপদল। যতই বড় বড় বুলি কপচাক আর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য দেখাবার চেষ্টা করুক, হয় এ পক্ষ নয় ওপক্ষের স্বার্থে চলতেই হবে। একটা শ্রেণী উপরে চেপে আছে, আরেকটা শ্রেণী উঠছে, আসল সংগ্রাম এই দুটো শ্রেণীর মধ্যে।"

নন্দার কাগজে সুনীলের ইংরেজী প্রবন্ধটা নিয়ে বেশ হৈ চৈ হয়। পরে আধুনিক কবিতা সম্বন্ধেও সে একটা প্রবন্ধ লিখেছে। এ ভাবে নন্দার কাগজের সঙ্গে সুনীল জড়িয়ে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজের দায়টাও সুনীলকেই নিতে হয়। সুনীলের চেষ্টায় কাগজের বিক্রী অনেক বেড়ে যায়। এবং কাগজের একটা নীতিও গড়ে ওঠে। এতদিনে যেন কাগজটার উদ্দেশ্য সফল হয়ে ওঠে। নানা লোক আসে কাগজের অফিসে। নন্দা তাই সুনীলকে কাগজের মালিকানার অংশ নিতেও বাধ্য করে। কাগজের জনপ্রিয়তা বাড়ে। কিন্তু আর্থিক অবস্থা বিপজ্জনক। সুনীলকে টাকার সন্ধানে ঘুরতে হয়। এ দিকে কাগজের অতিরিক্ত খাটুনির জন্য সে অঘোরের চাকরী ছেড়ে দেয়। অঘোরবাবু অবশ্য কাগজে টাকা ঢালতে চান তবে দুটি সর্তে। "এক, তার অমনোনীত লেখা ছাপা চলবে না এবং দুই, কাগজে আমেরিকাকে গাল দেওয়া চলবে না।" সুনীল এই সর্তে রাজী হয় না।

সুনীল অনেক কষ্টে কাগজের গুডউইল বাঁধা রেখে হেমন্তবাবুর কাছ থেকে হাজার আষ্টেক টাকা ধার করে। বিভা অবশ্য সুনীলকে টাকা ধার দিতে চায়। কিন্তু অঘোরবাবু পূর্বেই বিভার চেকে যেন টাকা না দেওয়া হয় তার জন্য ব্যাঙ্কে advise করে রাখেন। তিনি জোর করে মেয়ের বিয়ে দেবেন বলে ঠিক করেন।

কিন্তু বিভা বিয়ে করবে না বলে সুনীলের বাড়ী পালিয়ে আসে। অঘোরবাবু মেয়ের কাছে হার স্বীকার করে বিভাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যান। পর দিন সুনীল বিভাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে। মায়ার কাছেও সে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল কিন্তু মায়া ভাববার সময় নেয়। বিভা সানন্দে স্বীকৃত হয়। সুনীল ভাবে বিভাকে বিয়ে করলে তার টাকার অংশীদার হবে আর কাগজের টাকার জন্য তাকে ভাবতে হবে না। বিভাও বলে দরকার হলে ন্যায়ের জন্য সে পিতার বিরুদ্ধে স্বামীকেই সমর্থন করবে। বিভার রূপ না থাকলেও, দৈহিক খুঁত থাকলেও তার মনুষ্যত্ববোধ প্রখর। অর্থ নয় ব্যক্তিত্ব এবং মনুষ্যত্ববোধের জন্যই সুনীল বিভাকে স্বীকার করে নেয়।

এখানেই সুনীলের প্রেমের মহত্ব। বাইরে থেকে তাকে রসকসহীন মনে হলেও সুনীল হৃদয়াবেগ বর্জিত নয়। কোন মানুষই তা হতে পারে না। আসলে দুর্বল ভাবালুতা থেকে মুক্ত করে মনকে সে প্রসারিত করে দিয়েছে। সে বলে, "আমার হৃদয় ভাবলে হৃদয়টা ছোট হয়ে যায়, হাল্কা হয়ে যায়। দশজনের হৃদয়ের সঙ্গে কারবার করার জন্য হৃদয়—এ রকম ভাবলেই হৃদয়টা ছোট না বড় সে চিন্তা চুকে যায়, অনেক মিথ্যা যন্ত্রণা থেকে হৃদয় বেচারা রেহাই পায়।"

এই উপন্যাসের মূল কথা প্রেমের চেয়ে তার জীবন বড়। জীবনের চেয়ে নীতি। কাহিনীর গঠন শৈলী মালার মত। কতগুলো মানুষের ভীড়ে একটি চরিত্রের বিকাশই এখানে মুখ্য।

"সমাজের ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমা ভেঙ্গে গিয়ে সার্বজনীন ব্যাপকতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার যে নতুন গতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে" তাকেই ভিত্তি করে **সার্বজনীন** উপন্যাস (১৯৫২) রচিত হয়েছে। "সমাজের কোন শ্রেণীতে ভাঙ্গন ধরার অর্থ অনেকে মনে করেন মানুষগুলিরও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে শেষ হয়ে যাওয়া—আসলে মানুষগুলির জীবনও নতুন দিকে গতি পায়, নতুন রূপ গ্রহণ করতে থাকে। সমাজ জীবনে ভাঙ্গন ধরার সঙ্গে গড়ন চলাও থাকবেই।"

পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক উদ্বাস্তু আগমনের পটভূমিকায় এই উপন্যাস লেখা। এই উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে অনেক গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অবক্ষয়ের চিত্রই বেশী। আশ্রয়হারা অসহায় উদ্বাস্তু মানুষেরা বিশেষ করে মেয়েরা লোভী মানুষের শিকারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এটাই সমাজের বাস্তব অবস্থা নয়। একদিকে যেমন ভাঙন অন্যদিকে তেমনি নতুন গড়ন। মানিক এই বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। যত রাষ্ট্রিক এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই আসুক না কেন মানুষ ধ্বংস হতে পারে না। টিকে থাকবার, নিজেকে বিকশিত করবার

তারা নতুন উপায় ঠিক বের করে নেয়। মানুষের উপর মানিকের অগাধ বিশ্বাস। সমাজের নীচুতলার মানুষ, মেহনতী মানুষ নিজেদের বাঁচার তাগিদে নতুন উদ্যমে অগ্রসর হয়। বাঁচার সেই পথ আত্মকেন্দ্রিকতার নয়, সামগ্রিকতা, সর্বজনীনতার। এই উপন্যাসে তিনি সেই বক্তব্যই পরিস্ফুট করে তুলেছেন। উদ্বাস্তু জীবন অবলম্বনে এমন বলিষ্ঠ বক্তব্য আর কেউ বাঙলা সাহিত্যে উপস্থাপিত করতে পারেন নি। সেখানেই মানিকবাবুর অনন্যসাধারণতা, তার মার্কসবাদী জীবনাদর্শের গভীর প্রত্যয়ের ফল।

মার্কসবাদ ব্যক্তিত্ব স্বীকার করলেও তার প্রাধান্যকে স্বীকার করে না। সমগ্রতা, শ্রেণী সচেতনতাই সেখানে বেশী স্বীকৃত হয়। সেজন্যই দেখা যায় মানিক বাবুর উপন্যাসে সাধারণত কোন ব্যক্তি চরিত্র প্রাধান্য লাভ করে না, তাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে জট পাকায় না। অনেকগুলো মানুষকে নিয়ে তার উপন্যাস। এ যেন মিছিলের কাহিনী। ব্যক্তির কাহিনী নয়। সার্বজনীন উপন্যাসেও সেই কথা সত্য।

মহেশ্বরদের পরিবার পাকিস্তান থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানে ওদের অবস্থা ভালই ছিল। বাড়ীতে সাতপুরুষ ধরে দুর্গাপূজা হোত। বিধুভূষণের বাড়ীটা কিনে সেখানেই তারা বাড়ির দুর্গাপূজোও করতো। বিধুভূষণের ছেলে সমীর তিন শ টাকা মাইনের চাকরী করে। তার সঙ্গে মহেশ্বরের বড় মেয়ে সুরমার বিয়ে হয়। বিয়ের কিছু কাল পরেই সমীরের স্বভাব বদলে যায়। চাকরি ছেড়ে ব্যবসায়ে নামে। রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে। চোরা কারবারীদের বদগুণও তার মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু তার ব্যবসা ফেল পড়ে। অর্থাভাবে শেষ পর্যন্ত শ্বশুরের টাকা চুরি করে। লোকেদের সঙ্গে তঞ্চকতা করে। সমীরের জন্যই মহেশ্বরদের অবস্থাও খুব খারাপ হয়ে পড়ে। গহনা পত্রও শেষ হয়। সাতপুরুষের একটানা পূজা বন্ধ হয়ে যায়। দাদা পরমেশ্বরের বুদ্ধিতে তাদের সাতপুরুষের পূজা হয়ে গেল ভদ্রপাড়ার বস্তির এবং উদ্বাস্তু কলোনীর সার্বজনীন পূজা। এদিকে রিক্ততা ও হতাশায় যখন সমীর একেবারে কাবু হয়ে পড়েছিল তখন শিয়ালদহের উদ্বাস্তুদের মধ্যে থেকে তাদের বাঁচার লড়াই দেখে সে হতাশাকে জয় করতে শিখেছে। সে আবার নতুন করে উঠে দাঁড়ায়। এতকাল ধরে ভাইয়ের টাকায় আত্মকেন্দ্রিক চিরকুমার পরমেশ্বর আপন আনন্দে দিন কাটায়। সেও একটি চাকরি যোগাড় করে পরিবারের হাল ধরতে চেষ্টা করে। মহেশ্বরের ছেলে সাধন সবিতার সঙ্গে মিলে ফেরি করে রোজগার শুরু করে।

এ উপন্যাসের আরেকটি চমৎকার চরিত্র সবিতার। অপূর্ব বলিষ্ঠতার মধ্যে নিজে পুরুষ সেজে পরিবারের সকলকে পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসে। কারুর কৃপায়

না থেকে নিজে 'গতর খাটিয়ে ফসল ফলিয়ে জিনিষ বানিয়ে মানুষের উপোসী থাকার গান গেয়ে' আর ফিরি করে সংসার চালায়।

॥ ১১ ॥

আরোগ্য উপন্যাস (১৯৫৩) থেকেই মানিকের উপন্যাসের অন্তিম পর্ব শুরু। এই সময়কার উপন্যাস গুলোতেও মানিকের সমাজ সচেতনতার পরিচয় আছে, বলিষ্ঠ বাচনভঙ্গী আছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ পর্বের উপন্যাসগুলোতে এসেছে চিন্তার অসংলগ্নতা, নামের অসঙ্গতি। যে ভাবে কাহিনী আরম্ভ করছেন সে ভাবে শেষ করতে পারছেন না। আদর্শ-চিন্তার মধ্যেও অসংগতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফলে অধিকাংশ উপন্যাসই সুগ্রথিত হতে পারেনি। এ সময় মানিক খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তার উপর দেখা দিয়েছিল চরম দারিদ্র্য। এ অবস্থায় সুস্থভাবে একমনে বেশীক্ষণ লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সে জন্য এ উপন্যাসগুলোতে নানা দুর্বলতা দেখা দিয়েছে।

আরোগ্য এই পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। অবস্থার চাপে পড়ে অনেক মধ্যবিত্ত যুবককে শ্রমিক জীবন গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং চরম ভাঙ্গনের মুখে দাঁড়িয়েও তারা তাদের পুরানো সংস্কারকে সহজে বর্জন করতে পারে না। ফলে নিজের বর্তমান অবস্থাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না এবং তারা বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আরোগ্য উপন্যাসের নায়ক কেশব ড্রাইভার। চোরাকারবারী মুনাফার অংশভোগী অনিমেষের সে গাড়ী চালায়। তার মেয়ে ললনাকে তার ভাল লাগে। অথচ তাদের প্রতি কেশবের গভীর বিতৃষ্ণা এবং অশ্রদ্ধা। তা সত্ত্বেও কেশব ললনাদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় মশগুল হয়। ললনার পড়া হয়ে গেলে সে বইগুলো চেয়ে নিয়ে পড়ে। ললনা যে তাকে অশিক্ষিত ছোটলোক ড্রাইভার মনে করে না সেজন্য সে গর্ববোধ করে, উৎসব আসর সভাসমিতির যত কাছে ঘেঁষা সম্ভব ঘেঁষে গিয়ে সে যেটুকু পারে গান শোনে, আলাপ-আলোচনা তর্ক বিতর্ক বক্তৃতা শোনে, গাড়ী চালাতে চালাতে অর্ধেক মন দিয়ে শোনে আর বুঝবার চেষ্টা করে এদের কথাবার্তা। এই ভাবে সে নিজেকে অংশীদার করতে চায় এদের জীবনের।" আবার কেশব ভালবাসে মায়াকে। সে গরীব বিধবা। সে থাকে শহরতলীতে। অসুস্থ কেশবকে সে চুরি করেও দুধ খাওয়ায়। আর মায়াকেও কেশব বিয়ে করতে ইতস্তত বোধ করে। তার ধারণা মায়ার প্রেম স্বার্থ প্রণোদিত, কৃত্রিম। কেশব

ডাক্তার দেখায়। এমন কি বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ দত্তকেও দেখায়। সে জানে ভুল ধারণা আর বাঁকা কামনা থেকেই তার হিষ্টিরিয়ার উৎপত্তি। ডাঃ দত্ত বলেন, "তুমি আপোষ করলে না—ছুটো জীবনকেই ভোগ করতে চাইলে। অসম্ভবকে চাইলে, স্বপ্নকে বাস্তব করার সাধটা আঁকড়ে ধরলে। ফল দাঁড়ালো হিষ্টিরিয়া।" কিন্তু ডাঃ দত্তের চিকিৎসায় তার কোন লাভ হোল না। অবস্থার বিপর্যয়ে ললনাকে সিনেমায় গান গেয়ে তাদের সংসারের অনেক দায়িত্ব নিতে হয়। ললনার সিনেমায় গান গাওয়াকে কেশব অনুমোদন করতে পারে না। তবে ললনা বা মায়ার প্রতি তার ঘৃণাও নেই। কেশব বুঝতে পারে তাদের চারিদিকের সংসারের মধ্যে যে অনিয়ম রয়েছে তার জন্যই তার রোগ। ললনা মায়াও সেই অনিয়মের ফলেই বিকৃত হয়েছে। অতএব সেই সংসারটাকে না পাল্টালে অনিয়মটা যাবে না। তার রোগও আরোগ্য হবে না। কেশব উপলব্ধি করে, "তার মানেও খুব সোজা। সংসারটা পাল্টাবার লড়াই তাকেও করতে হবে। শুধু নিজের রোগ নিজের সুখ দুঃখের হিসাব নিয়ে মেতে থাকলে কিছুই হবে না কস্মিন কালেও।"

মানিক প্রথম জীবনে মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনী রচনা করেছেন। অনেকদিন পর আবার মনোবিজ্ঞানের সমস্যা উত্থাপিত করেছেন। তবে প্রথম জীবনের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। মানিক এখন মার্কসীয় জ্ঞানের ফলে উপলব্ধি করেছেন সামাজিক কারণেই মানসিক রোগ দেখা দেয়; অতএব সামাজিকভাবেই তার আরোগ্য করতে হবে।

এই উপন্যাসের সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র কেশবের বন্ধু কালু মিস্ত্রীর। অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং বাস্তব। সে কেশবের মত বিকারগ্রস্ত নয়। তার প্রেম সুস্থ ও জাগতিক। সে কেশবের নতুন উপলব্ধির কথা উল্লেখ করে বলে, "সবার জীবন শুধরে দেবার লড়াই শুরু করব ঠিক করতে রোগ যেন অর্দ্ধেক কমে গেছে। লড়াই আরম্ভ করলে নিশ্চয়ই আরোগ্য!" কাহিনীর এই উপসংহার স্বাভাবিক ভাবে পরিণতি লাভ করে নি।

আরোগ্য উপান্যাসটি আরেক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। মানিক এ উপন্যাস থেকে একাধিক ছোট গল্প বাছাই করেছেন। আঙ্গিকের দিক দিয়ে তা অভিনব।

তেইশ বছর আগে পরে উপন্যাসটি দু ভাগে বর্ণিত। প্রথম ভাগে আছে তেইশ বছর আগেকার লেখা 'ব্যথার পূজা' নামে এক করুণ কাহিনী। দ্বিতীয় ভাগে তেইশ বছর পরে বর্ণিত ঐ কাহিনীরই উপসংহার।

'ব্যথার পূজা' কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত। এক জমিদার পুত্র জগদীশ পিতার প্রচুর অর্থে বিলাতে কাম রূপের যথেচ্ছ সাধনা করে দেশে ফিরবার পথে এক ধনী

কন্যা চিত্রার সঙ্গে পরিচিত হয়। চিত্রা জগদীশের কীর্তিকলাপ জানত। তাই প্রথমে আমল না দিলেও পরে সে জগদীশকে ভালবাসল। কিন্তু সে চেয়েছিল জগদীশ যেন তার রূপকে গ্রহণ না করে তার ভালবাসাকেই যথার্থ মূল্য দেয়। জগদীশ ভুল বুঝল। একদিনের ভ্রান্তিতে সে চিত্রাকে চিরতরে হারিয়ে ফেলল। রাঁচির হুড্রু জলপ্রপাতে হঠাৎ জগদীশকে দেখে চিত্রা ভয়ে পিছোতে গিয়ে একেবারে প্রপাতের তলদেশে পড়ে হারিয়ে গেল।

তারপর শুরু হোল দ্বিতীয় অধ্যায়ে জগদীশের জীবনের ট্র্যাজিডি। প্রপাতের নিকটেই এক বুনো গ্রামে জগদীশ আত্মগোপন করে শুরু করল তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। নানা পানীয়ের দ্বারা সে তার জীবন ধ্বংসের চেষ্টায় লেগে গেল। জগদীশ জানে, "সে যোগীও নয়, সাধকও নয়! বরং অতি অপদার্থ মানুষ। সে তো শুধু চিত্রার জন্য নিজের অসহনীয় মনোবেদনা নিয়ে কাতরায়, নিজেকে অভিশাপ দেয়, সোজাসুজি আত্মহত্যা করতে পারে না বলেই বেপরোয়া নেশা চরমে তুলে চব্বিশ ঘন্টার অর্দ্ধেকের বেশী সময় ব্যথাবোধের শক্তি হারিয়ে দিন কাটিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মরে যেতে চায়—সচেতন থাকার সময়টুকু শুধু আবোল তাবোল এলোমেলো চিন্তা করে।" কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে সে হয়ে উঠল সাধু। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সাধু-বাবা জগদীশের নাম। যোয়ান বয়স, টকটকে গায়ের রং। নেশা আর উচ্ছৃঙ্খলতার বাড়াবাড়িতেও একেবারে ধ্বংস করে ফেলতে পারেনি বহু পুরুষ ধরে গড়া তার দেহের বুনীয়াদী বনেদ। জগদীশ কিন্তু সন্ন্যাসী হতে চায় নি। সে শুধু চিত্রার জন্য নিজের ব্যথার পূজাটি প্রচণ্ড আত্ম নিগ্রহের প্রক্রিয়ায় চালিয়ে নিজেকে শেষ করে ফেলতে চেয়েছিল। সেজন্য ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সে শঙ্কিত হয়। তার তিনদিক ঘিরে আছে আদিম অসভ্য মানুষের গাঁ। তারা জগদীশকে ভয় করে, ভক্তি করে। গ্রামের চেয়েও বেশী ভক্ত আসে খোদ সহর থেকে। শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের মানুষ। কিন্তু শান্ত নির্বিকার আত্মস্থ জগদীশ নির্বিকল্প। সে নিসঙ্কোচ। নেশার উপকরণও থাকে সাজানো। সে অনেক ভক্তকে তিরস্কার করে। সে যে মহাপুরুষ নয় একথা জানায়। কিন্তু তাতে ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধিই পায়।

জগদীশের কাছে আসে বিচিত্র দর্শনার্থীর ভীড়। ছাত্ররাও আসে। তাদের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, "ধর্ম মানে কুসংস্কার। ভগবান...হলেন আঁধার ঘরের বোকা মানুষদের ভোলাবার জন্য আলোর ঘরের মানুষদের কল্পনা—বিরাট একটা ধাপ্পা। বিজ্ঞান তো ডাল-ভাত। ...ধর্ম দিয়ে যা হয় নি, ভগবান দিয়ে যা হয় নি—বিজ্ঞান তাই করেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা করেছে, কিসে কি হয় কেন হয়

মানে বুঝিয়ে দিয়েছে—⋯হাতে-নাতে বিজ্ঞান নিজেকে প্রমাণ করে করে এগোয়।⋯ বিজ্ঞান জানে মানুষের প্রয়োজনেই ধর্ম, মানুষের প্রয়োজনেই ভগবান—প্রয়োজনটা বাতিল না করে ধর্ম বিশ্বাস বা ভগবানকে দুটো যুক্তি দিয়ে আক্রমণ করে বাতিল করার ছেলেমানুষী কি বিজ্ঞানের পোষায়?”

জগদীশের কাছে ক্রমে আসে রত্নাকর। দুটো মানুষকে সে খুন করেছে। একটি নির্দোষ মেয়ে আর একটি ছেলেকে। মেয়েটিকে রত্নাকর ভালবাসত। তারপর ভবঘুরে রত্নাকর ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হয় জগদীশের আশ্রমে। রত্নাকরই প্রথম মানুষ যে জগদীশের ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। তারপর আসে ধনী প্রতাপ, তার পুত্রবধূ ললিতা এবং তার বান্ধবী সুদর্শনা। এই রত্নাকর এবং ললিতা-সুদর্শনাই জগদীশের অনেক বাস্তববিমুখ ভাবাতিশয্যের মোহ দূর করে দিয়েছে। তাকে বাস্তব জীবন সম্বন্ধে সচেতন হতে সাহায্য করেছে। জগদীশ মানব সমাজ থেকে পালিয়ে আত্ম-নিগ্রহের পথ ধরেছিল কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের ভীড় দেখা দিল। অবশেষে এল জলধি রায়। চিত্রার পূর্ব প্রেমিক। আদিবাসীদের বিদ্রোহ দমনের ভার নিয়ে আসে। সে জগদীশকে জড়াতে চায়। কিন্তু পারে না। জগদীশের সঙ্গে এই আদিম মানুষগুলোর ছিল গভীর ভালবাসা। এ ভাবে গল্পে নানা ঘটনার ঘাত সংঘাত সৃষ্টি করে তার গতিকে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে।

জগদীশ অনেক সময় নিজে নিজেই ভাবে, অনেক মেয়ের সঙ্গে খেলা করে একটি মেয়েকে সে ভালবেসেছিল। নিজের দোষে তাকে হারিয়ে প্রাণের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে, নেশা করা-বিষের আগুনে পুড়তে পুড়তে মরতে চাওয়ার কী অদ্ভুত পরিণাম! এ যেন বিচিত্র মহামানবতা তার কুঁড়ে ঘরের দরজায় এসে হানা দিয়ে দাবী জানায়— শান্তি দাও, জীবন দাও, বাঁচাও। রত্নাকর অবশ্য বলে তার মধ্যে যে ত্যাগ আছে, মহাপুরুষ হতে না চাওয়ার যে প্রবল বাসনা আছে তাই তাকে মহাপুরুষে পরিণত করেছে। রত্নাকরের স্পষ্টোক্তিতে জগদীশের আধ্যাত্মিক জীবনের নিষ্ফলতা ধরা পড়ে। মানসিক ব্যাধি দূর করার জন্য সে অধ্যাত্মজীবনের চোরা মোহ থেকে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাকেই শ্রেয় জ্ঞান করেছে। আশ্রমের পরিবর্তে সে তাই হাসপাতাল খোলার পরিকল্পনা করে। জগদীশ ঠিক করে সে যদি তার পৈত্রিক অর্থের কিছুটাও উদ্ধার করে আনতে পারে তাহলে সে সহরের কাছে একটা মানসিক ব্যাধির হাসপাতাল স্থাপন করবে। জগদীশ উপলব্ধি করেছে দৈহিক ব্যাধির ন্যায় মানুষের মানসিক রোগও সামাজিক। সেজন্য তার চিকিৎসার জন্য সামাজিক ভাবেই মানসিক হাসপাতাল খুলতে হবে। সে বুঝতে পেরেছে এলোমেলো ভিক্ষা দিয়ে গরীবের

দুঃখ দূর করা যাবে না। "তার চেয়ে দশটা প্রাণের জ্বালা জুড়িয়ে, লোকের এত দারিদ্র্য কেন বুঝিয়ে দিলে, কিসে মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য কমবে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিলে ঢের বেশী কাজের কাজ হবে!"

অবশেষে জগদীশের ইচ্ছা পূরণ হতে চলেছে। সহরের কাছে নির্জন স্থানে জমি কিনে ভিত্তি স্থাপনের উৎসব হয়েছে। জগদীশও বনের আর প্রপাতের মায়া কাটিয়ে সেখানে চলে যাবে। জগদীশের মনে দেখা দিয়েছে নতুন চিন্তা, নতুন সঙ্কল্প। জগদীশ নেশা করা বন্ধ করেছে। কিন্তু হঠাৎ এই উগ্র নেশা বন্ধ করায় সে 'ডিলিরিয়াম ট্রেমনেস'-এ আক্রান্ত হয়েছে। জগদীশ অবশেষে হাসপাতালে যায় বিষ খাওয়া রোগটা সারিয়ে আসার জন্য। মানিকবাবুও গিয়েছিলেন। জগদীশ হাসপাতালে ডাক্তারের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে। ডাক্তারের উপদেশ মত সে চলে। কিন্তু তখনও তার ভক্ত ললিতা বলে এও যেন মহাপুরুষ জগদীশের আর এক খেলা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'অহিংসা' উপন্যাসেও সদানন্দ নামে আরেক সাধুর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। আসলে আমরা যাদের সাধু বা মহাপুরুষ বলে মনে করি তারা নিজেদের জীবন যন্ত্রণায় কাতর। এ সংসারে মানুষের নানা দুঃখ দুর্দশা আছে। মানুষ তার যন্ত্রণায় দিশেহারা। তখন তাদের মধ্যে নানা বিকার দেখা দেয়। আসলে সদানন্দ বা জগদীশ এরাও মহাবিকারগ্রস্ত মানুষ। তবে এদের আকাঙ্ক্ষা যেমন অত্যুগ্র তেমনি তাদের আত্মনিগ্রহের পথও সাঙ্ঘাতিক।

মানিক জগদীশের মুখেই প্রকাশ করেছেন, মানুষের প্রয়োজনেই ধর্ম আসে। বিজ্ঞানের সঙ্গে তার বিরোধ নেই। তার প্রয়োজনকে দূরীভূত করতে পারলেই ধর্মের মোহ কেটে যাব। মানিক এ উপন্যাসে এই প্রয়োজনের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন। মাটির কাছাকাছি আদিম মানুষ এবং গ্রাম্য মানুষের চেয়ে সহরের মানুষের কৃত্রিমতায় অনেক বিকার দেখা যায়। সেই বিকারের ফলেই তারা মহাপুরুষের কাছে ভীড় করে। সেই মহাপুরুষও যে তাদের মতই একজন যন্ত্রণাকাতর মানুষ সেই বোধ থেকেই এর ফাঁকিটা ধরা পড়ে। এই বিকারের কারণ কেবল মানসিক নহে, সামাজিক। তার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার জন্য মানসিক হাসপাতালে যাওয়া প্রয়োজন। মানিকের এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আরও স্বচ্ছ হয়েছে আরোগ্য উপন্যাসে।

'ব্যাথার পূজা' কাহিনীটি রোমান্টিক। জগদীশের পরবর্তী ঘটনায় নানা তর্ক আছে, বাস্তববোধ আছে। ব্যথার পূজা কাহিনীর উপর শরৎচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট। ব্যথার পূজা এবং পরবর্তী কাহিনীতে মানিকের চিন্তাধারার পরিবর্তন লক্ষণীয়।

রোমান্টিকতার পরিবর্তে মানব জীবনকে পর্যবেক্ষণ এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যথার পূজায় আছে ভালবাসার গল্প আর জগদীশের পরের গল্পে আছে বাস্তববিমুখ ভাবাতিশয্যের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার স্বীকৃতির কাহিনী।

নাগপাশ কতকগুলো বেকার উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের জটিল জীবনাবর্ত। বাস্তবতা ছিল অনেকেরই বিদ্যালাভের বিরুদ্ধে। তবু মস্ত বড় বিদ্বান হবার আশায়, মোটা মাইনের চাকরী পাওয়ার স্বপ্নে তারা শেষ পর্যন্ত বিদ্যাচর্চা করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রি লাভ করে। নরেন এমনি এক শিক্ষিত যুবক। তার "প্রথম বয়সটা গেল পরীক্ষা পাশ করার ধান্ধায়, বাকী জীবনটা কাটবে জেলখানার কয়েদীর মত কলম পিষে"। সে চাকরী করে। অনেক ডিগ্রিওয়ালা মাধব কলেজে অধ্যাপনা করে। নন্দন এম. এ. পাশ করে বেকার বছরের পর বছর ধরে। দীননাথের ছেলে মণ্টু পড়াশুনায় খুবই ভাল। কিন্তু হঠাৎ দীননাথের চাকরী চলে যাওয়ায় তার বিদ্যে ম্যাট্রিকের পর এগুতে পারে নি। সে বাড়ী বাড়ী ঘুরে ডিম বিক্রী করে।

কোম্পানীতে একবার স্ট্রাইক হয়। সেজন্য নরেন সহ তেরজনের চাকরী যায়। নরেন বেকার। গোবিন্দ বাপের ছোট দোকানটাকে বড় করতে গিয়ে চালিয়াৎ বড়বাজারের বড় ব্যবসায়ী ভুবন এবং বিপিনের কারসাজিতে দোকান বিক্রী করে দিয়ে আত্মহত্যা করে। এদের জীবনে বেকারীদের প্রভাব হয় নানারকম। এই যে বেকারী এবং অব্যবস্থা এর কারণ কি? নরেনের এই প্রশ্নের উত্তরে মাধব বলে, "আপনি গোড়ার গলদটা ভুলে যাচ্ছেন—অনেক লোকের জীবিকা অর্জনের কোন ব্যবস্থাই নেই। যে সিস্টেম চালু আছে তাতে এরা বাড়তি লোক, ফালতু লোক—সিস্টেমটা না পাল্টালে একটা মোট সংখ্যা মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা হতেই পারে না, তিন হাত চাদর দিয়ে কি চার হাত বিছানা ঢাকা যায়?"

"লাখ লাখ পাশ করা আর মূর্খ মানুষের জন্য চাকরী আর কাজের কোন ব্যবস্থাই নেই—জেনেও খেয়াল হয় না যে চাকরী আর কাজের ব্যবস্থা না হলে পাশের লড়াই চালিয়ে যাওয়া বোকামি।"

মাধব বলে, জীবিকার জন্যই অবশ্য লেখাপড়ার দরকার নয়। সেটা আসল হলেও মানুষের একটু সংস্কৃতিও দরকার। এই সংস্কৃতি সব মানুষেরই। "সংস্কৃতির মানে ছোট করে ধরা হয়। প্রকৃতিকে জয় করে জীবনকে ক্রমাগত উন্নত করার জন্য যা কিছু করা দরকার যা কিছু থাকা দরকার সব কিছুই মানুষের সংস্কৃতি।"

নরেন বস্তীতে বাস করে। তার গৃহজীবনের শান্তি নষ্ট হয়েছে। নানা

অশান্তিতে তার জীবন ভরে উঠেছে। নরেনের বোন সন্ধ্যা। তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে অশোকের। বিয়ের সময় কথা ছিল অশোকের এম এ পড়ার খরচ নরেনরাই দেবে। সেজন্য ওরা পণের টাকা নাম মাত্র নিয়েছিল। অশোক হঠাৎ চাকরী পাওয়ায় তার আর এম এ পড়া হয় নি। এখন ঐ টাকাটা সে নিজের পাওনা বলে শ্বশুরের কাছে দাবী করে এমনকি ছোটলোকের মত ঝগড়া করেছে। টাকা না পেলে সন্ধ্যাকে আর ফিরিয়ে নেবেনা বলেছে।

একদিন ছাত্র ও রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মাধবের চাকরীটাও চলে গেল। তার স্ত্রী মানসী রাগ করে ধনীগৃহিণী-বোনের বাড়ী চলে যায়। মাধব শান্তভাবেই তা মেনে নেয়। নিজে শিশুদের যত্ন নেয়। অবসর করে নতুন বই লেখে। তার বাস্তববোধ সজাগ হয়েছে। সে কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাকে অন্যায় ভাবে বরখাস্ত করার জন্য মোকদ্দমা করে। নরেনকে তার বইয়ের প্রুফ দেখা এবং তার সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করে পারিশ্রমিক দেয়। দারিদ্র্য জীবনের কেবল অভিশাপ নয়। তার মধ্যে প্রবল শক্তির সম্ভাবনাও থাকে। মাধব নরেন দীননাথ প্রাত্যহিক সংগ্রামে তা বুঝতে পারে। অবশেষ গোবিন্দ আত্মহত্যা করায় নন্দনকে রাধার মা চাকরী দেয়। গোবিন্দের কর্মচারী দীননাথও চাকরী পায়। মানসী অনেকদিন পর মাধবকে চিঠি লিখে। সে খুব অসুস্থ। মাধব ছেলে মেয়েকে নিয়ে মানসীকে দেখতে যায়। গোবিন্দের বোন ছবিরাণী নরেনকে ভালবাসে। নরেনের চাকরী নেই বলে তাদের বিয়ে হতে পারে নি। নরেনও আর যায় না। শেষ পর্যন্ত ছবিরাণী নিজেই নরেনের কাছে চলে আসে। সে নরেনকে বলে, "তোমার চাকরী বাকরী নেই বলে কোথায় আরও বেশী করে তোমায় আঁকড়ে ধরব, তোমার হয়ে সবার সাথে লড়াই করব, তার বদলে তোমায় বাতিল করে দিলাম। একেবারে উল্টো হিসাব নয়? কি বোকাই ছিলাম আমি।" নরেন ছবিরাণীর মিলনের মধ্য দিয়ে তাদের বেকার, দারিদ্র্য এবং আশাহত জীবনেও নতুন আশার সঞ্চার হয়। এদের মিলন সেই আশাবাদেরই প্রতীক।

নাগপাশ উপন্যাসে নানা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের বাস্তব চিত্র আছে কিন্তু সব মিলিয়ে একটা বলিষ্ঠ বক্তব্য ফুটে উঠেনি। এক জায়গায় মানিক বলেছেন, "গ্রাজুয়েট যুবক একটা চাকরী পেলেই শেষ হয়ে যায় মানুষ হিসেবে তার অন্য সব কিছু পাওয়ার ঝোঁক ;—চাকরী করে কোনরকমে বেঁচে থাকতে পারলেই যেন জীবনটা ধন্য হয়ে যায়। এই দাসত্ব ঘুচিয়ে সকলের এগনো ছাড়া, শিক্ষা সভ্যতা বাড়ানো ছাড়া, সুন্দর সুস্থ আনন্দময় জীবন চাওয়া ছাড়া মানেই হয় না তার বা অন্য যে কোন

মানুষের জ্ঞান নিয়ে যেতে থাকবার”। কিন্তু মানিকবাবু এই বক্তব্যকে উপন্যাসে স্পষ্ট রূপায়িত করতে পারেন নি। জ্ঞান চর্চার ব্যর্থতার কারণ কিছুটা দেখালেও সুন্দর সুস্থ আনন্দময় জীবন গঠনের কোন কল্পনা এই উপন্যাসে ফুটে উঠেনি। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত কতগুলো মানুষের কিছু আর্তনাদের মধ্যে শোনা গিয়েছে এক ক্ষীণ আশার কথা। উপন্যাসের সমাপ্তিও খাপছাড়া। চরিত্রের নাম ব্যবহারেও কতকগুলো অসংগতি দেখা যায়। নরেনের পরিবর্তে সমীর, মাধবের পরিবর্তে নন্দন ছাপা হয়েছে। এই অসংগতির জন্য মাঝে মাঝে হোঁচট খেতে হয়।

‘চালচলন’ উপন্যাস মধ্যবিত্ত জীবনের চালচনের ইতিবৃত্ত। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুনীল। সে ভাল বাঁশী বাজায়। রোজ ভোরে বেড়াতে যায়। ফুল তোলা এবং একে ওকে তা বিলি করা ওর সখ। সে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের চাকুরে ছেলে। বিবাহে তার বিতৃষ্ণা। ভাই বোন মা বাপ নিয়ে সংসারের মূল দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হয়। কিন্তু এই উপন্যাসে সুনীলের চরিত্রের কোন পরিবর্তন বা পরিণতি দেখান উদ্দেশ্য নয়। তাকে কেন্দ্র করে কতগুলো চরিত্রের পরিণতি অঙ্কনই লেখকের উদ্দেশ্য। গল্প উপন্যাস পড়তে বসলে সুনীলের মনে প্রশ্ন জাগে মানুষের জীবনে এত সংঘাত কেন, কেন মানুষ নিজেদের জীবনকে এভাবে জটিল করে, অশান্তিতে ভরে দেয়।

সুনীল ছাড়া আর দুটি চরিত্র প্রধান—রেণু এবং মিলনী। রেণু তার বাপের আদুরে ছোট মেয়ে। অমানুষ ভাইবোনদের মধ্যে সেই একমাত্র মানুষ। স্কুলে শিক্ষকতা করে আর টুইশানি করে। রেণু এবং সুনীলের খুব ভাব কিন্তু রেণুর সঙ্গে বিয়ে হোল শেষ পর্যন্ত এক অধ্যাপকের। সুনীল খুব চাপা তবে তার ব্যবহার খুব আন্তরিক। তার মনের ভাব খুব ঘনিষ্ঠ মানুষও টের পায় না। মিলনী বড়লোকের একমাত্র মেয়ে। সেও সুনীলকে গভীর ভাবে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। তারও বিয়ে ঠিক হয়ে আছে বিলাতফেরৎ অনাদির সঙ্গে। অভিভাবকেরাই এ বিয়ে ঠিক করে রেখেছে। তবু একালের রীতি অনুযায়ী বিয়ের পূর্বে অনাদি মিলনীর পরস্পরকে জানবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। মিলনী রোমাঞ্চের ছোঁয়ায় একে রমণীয় করতে চেয়েছিল কিন্তু অনাদি তার ছেলেমানুষী ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিল না। অনাদির উপর মিলনীর খুব রাগ। মিলনীর কাছে অনাদির পরিচয় পেয়ে সুনীলের মনে হয়েছিল অনাদি একজন অর্থলোভী, প্রতারক। পরে অনাদির বাড়ী গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে সুনীলের ভুল ভাঙ্গল। অনাদিকেই বিয়ে করার জন্য সে মিলনীকে সুপারিশ করল।

উপন্যাসের মধ্যে মাঝে মাঝে গরীব দুঃখীর কথা আছে, মার্কিনী সভ্যতার অপদানের কথা আছে। মনোজদের কারখানায় পুলিশী হাঙ্গামার কথা আছে। কিন্তু সব মিলিয়ে একটি বলিষ্ঠ বক্তব্য মানিক এ উপন্যাসে রাখতে পারেন নি। তবে একটা ভাব জাগে যে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের চালচলন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। পুরানো ভাবধারার সঙ্গে আর তাকে মানিয়ে চলা যায় না। মিলনী যাকে বলে ভালবাসা তাকেই অনাদি বলে ন্যাকামি। সুনীল তাদের মতিগতি বুঝতে পারে না। আর সুনীলের চরিত্রে আছে একটু পরিবর্তনের ইঙ্গিত। যে সুনীল ছিল বিয়ের সম্পর্কে বিতৃষ্ণ সে এখন তার বিয়ের কথা শোনে হাসে। মৃদু সম্মতির লক্ষণ যেন প্রকাশ পায়।

গল্পরস বলতে সুনীল-রেণু এবং সুনীল-মিলনী-অনাদির কাহিনীর মধ্যেই কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। কিন্তু রেণু এবং মিলনীর সঙ্গে সুনীলের বন্ধুত্ব ভালবাসার স্তরে গিয়ে পৌছয়নি। মিলনী অবশ্য এক সময় ভেবেছিল অনাদি যেরকম তাকে অবজ্ঞা করে যৌতুকের টাকাকেই ভালবাসতে আরম্ভ করেছে তাতে তাকে নিয়ে সে সুখী হতে পারবে না। অনাদির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সে সুনীলকে বিয়ে করতে পারে। সে হোল ঝোঁকের কথা, মনের কথা নয়। সুনীলের মধ্যেও মিলনীকে ভালবাসার মত গভীর অনুরাগের প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেজন্য এই প্রেমের গল্পে গভীরতা নেই। অনাদির স্পষ্ট বাস্তব বুদ্ধি প্রণোদিত সংযত হৃদয়াবেগের মধ্যেই লেখকের প্রেমাদর্শের পরিচয় আছে। সুনীল ভাবপ্রবণতায় এবং মধ্যবিত্ত আবেগে তাকে প্রথমে চিনতে পারে নি।

উপন্যাসের মধ্যে কিছু কিছু অসংগতির পরিচয় পাওয়া যায়। অনাদির জায়গায় অজিত এবং অনিলের জায়গায় অমিয় লেখা হয়েছে। এরকম নামের অসংগতি মানিকের অনেক উপন্যাসে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলেও যুদ্ধের পায়তারা কিছু কমেনি। ১৯৫০-৫১ সালেই যখন চারিদিকে আবার যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তখন সাধারণ মানুষ এই ভয়াবহ মৃত্যুযজ্ঞ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য, শান্তির জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হতে লাগল। দেশে দেশে অনুষ্ঠিত হল শান্তি সম্মেলন। ষ্টকহলমে হোল বিশ্বশান্তি সম্মেলন। মানিকের **শুভাশুভ** উপন্যাস এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। এই উপন্যাসের প্রধান নায়ক সমরেশের পিতা মহিম চৌধুরী ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। কিন্তু তখন তাদের কারবারের চারদিকেই দেখা দিয়েছিল ভাঙন। মহিম চৌধুরীর মৃত্যুর পর তার প্রধান কর্মচারী বনমালী আরেকটি যুদ্ধের অপেক্ষায় দেনার পর দেনা করে এই ভাঙন রোধের চেষ্টা চালাচ্ছিল। সমরেশের মামা ভবানীও বড় ব্যবসায়ী। তিনিও যুদ্ধের দিন গোনেন। যুদ্ধ লাগলে

সাধারণ মানুষের যত দুর্গতিই হোক না কেন ব্যবসায়ীর মুনাফা লোটার তখন চরম সুযোগ। ক্ষুদ্রাস্ফীতি, চোরাকারবার আর ভেজালের এমন অপূর্ব সুযোগ তারা আর পাবে কোথায়?

শুভাশুভ উপন্যাস এই ধনবাদী ব্যবসায়েরই কাহিনী। তার মূল কথা হোল অর্থ। অর্থই সকল সম্পর্কের নিয়ামক। ভবানী সমরেশের পিতার মাত্র তিনশ টাকা চুরি করে নিয়ে তাকে খাটিয়ে এখন বিরাট বড় লোক হয়েছে। সে তার টাকার জোরে পর পর তিনটি বিয়ে করে বৌ নিয়ে আসে। কিন্তু তাদের কারুর সঙ্গে যে তার হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল তার পরিচয় এই কাহিনীতে নেই। প্রথমা স্ত্রী সরমা আত্মনিগ্রহের পথ ধরে বড়ি খেয়ে খেয়ে নিজেকে শেষ করে দিল। তার মৃত্যুর পর এল আধুনিক লেখিকা, আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী নন্দিতা। চরম আধুনিকা। তার সঙ্গেই ভবানীর সংঘাত বাধে। সে ভবানীর কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে থাকে। তৃতীয়া হোল সরমার বোন অনিমা। চমৎকার মেয়েটি। বুদ্ধি আছে, ব্যক্তিত্ব আছে, হৃদয় আছে। কিন্তু তাকেও বাঁচবার জন্য শেষ পর্যন্ত মদ ধরতে হয়েছিল।

এই তিন মামীরই প্রচেষ্টায় ভবানী সমরেশকে আর্থিক সাহায্য দিতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমরেশের ব্যক্তিত্ব দেখা দিল। সে মামার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চাইল না। স্বাধীনভাবে নিজের ব্যবসা গড়ে তুলবার চেষ্টা করল। নিজের ছাপাখানায় ভবানীদের মুখোশ খুলে লেখা বই ছাপাতে লাগল। সমরেশ নিজের পথ খুঁজে পেল। সে পথ ভবানীর পথের চেয়ে পৃথক। এ পথের লক্ষ্য যে কোন উপায়ে অর্থস্ফীতি নয়, কাজের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রত্যয়, কর্তব্য ও আবেগের সমন্বয়। সেজন্য সে আর তার কারবারে ভবানীর নাম জড়াতে চায় না। ভবানী অবশ্য ধরে নেয় এ হোল স্রেফ হিসাব নিকাশের ব্যাপার। যা করলে কারবার ভাল চলবে তাই করতে হবে। সেজন্য সে সমরেশের কথায় রাগ করে না।

উপন্যাসে চরিত্রগুলোর গভীর মনোবিশ্লেষণ অপূর্ব। মানবজীবনের জটিল মনোগহনের পথেই মানিকের যাত্রা। এ পথে মানিকের শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীত।

মানিক লিখেছেন, "এটি আমার পরীক্ষামূলক উপন্যাস। আমার বিশ্বাস, প্রধান নায়ক ও নায়িকাদের প্রধান করে বজায় রেখেও সংশ্লিষ্ট আরও অনেক চরিত্র আমদানি করলে উপন্যাসের শ্রেণীগত সামাজিক বাস্তবতা রূপায়ণে সাহায্য হয়।"

এ উপন্যাসের প্রধান নায়ক সমরেশ এবং নায়িকা নন্দিতা। সমরেশকে কেন্দ্র করে মানিক বহু মানুষের আমদানি করে শ্রেণীগত বাস্তবতার সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বিলাতী কোম্পানীগুলো রাতারাতি ভোল পাল্টে

ভারতীয় কোম্পানী বনে যাবার পর থেকে এদেশীয় ছোট ছোট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমাগত আছাড় খেতে আরম্ভ করছিল। তারই পরিণামে সমরেশের বাবার কারবার দেনার দায়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভবানীর কারবারও মার খেতে আরম্ভ করেছে। সমরেশ নতুন কারবার খুলেও আশানুরূপ কাজ করতে পারছেনা।

এই উপন্যাসে একটি প্রেমের বাতাবরণ আছে। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র নন্দিতা। শিক্ষিতা, আধুনিকা মেয়ে। উপন্যাস লেখে। এই উপন্যাসের তিনটি চরিত্র সমরেশ, কুমার এবং ভবানীর সঙ্গেই তার ভালবাসার সম্পর্ক। পরে ভবানীর অর্থের জন্য তার সঙ্গে বিবাহের সূত্রে আবদ্ধ হয়েও নন্দিতা জীবনের ধারা পরিবর্তিত করেনি। সে তেমনি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। সমরেশ কুমারের সঙ্গে পূর্বের মতই আলাপ আলোচনা করে। তার চরিত্রে বিকার নেই। সে খুব বাস্তবভাবেই জীবনকে গ্রহণ করে। ভালবাসা-বাসি নিয়ে তার কোন ন্যাকামি নেই। ভবানী তৃতীয়বার বিয়ে করায় সতীনের উপর তার কোন বিদ্বেষ ভাব নেই। বরং ভবানীর হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাবে জেনে খুশী হয়েছে। সে বিয়ের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ক্রীতদাসী হতে চায় না। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সে সঙ্গত ভাবেই স্বীকার করে। নন্দিতা মানিকের এক অপূর্ব সৃষ্টি। আজ যারা আধুনিক সাহিত্যের বাড়াবাড়ি করেন নন্দিতা তাদের লজ্জা দেবে। নন্দিতার চরিত্রে বলিষ্ঠতা আছে, কোন ফাজলামি বা অসভ্যতা নেই। সে সমরেশের চরিত্রের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট দেখিয়ে দেয়।

নন্দিতার মুখে মানিক প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন : "দেহ দিয়ে প্রেম হয় না, সেটা পাগলের উদ্ভট কল্পনা। শুধু মন দিয়েও প্রেম হয়না সেটা মানসিক ছ্যাবলামি। প্রেম হল দেহমন মিলে মিশে দৈহিক আর ওই দেহগত মনটার মানসিক যোগ বিয়োগ সৃষ্টি করা। জীবন জটিল হলে এ ক্রিয়াটাও জটিল হয়।"

ভবানী এক বিকারগ্রস্ত মানুষ। অর্থই তার জীবনের সার। এই অর্থের জোরে সে সকলকে তার বশীভূত করে রাখতে চায়। নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে সে সন্দেহ পোষণ করে। সেজন্য ঝিকে বেশী টাকা দিয়ে স্ত্রীর গতিবিধির খোঁজ রাখে। সে বড্ড হৃদয়হীন এবং অহঙ্কারী। তার হিসেব সোজা স্পষ্ট অঙ্কের হিসেব। সে এক বিশেষ ধাতের মানুষ—সেকেলে সংস্কারও আছে আবার অনেক কিছু ড্যামকেয়ার করার একেলে গোয়ার্তুমিও আছে।

মানিকের উপন্যাসের আঙ্গিকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হোল তিনি উপন্যাস লেখার পুরানো রীতি নীতি ভেঙ্গে দিয়েছেন। উপন্যাস লেখার পুরানো রীতি হোল উপন্যাসে কোন চরিত্র আনলে তার একটা গতি ও পরিণতির সম্পূর্ণতা দিতেই হবে। মানিক

পুতুল নাচের ইতিকথায় প্রথমে এই নিয়ম ভেঙ্গে দিলেন। এই উপন্যাসেও চরিত্রগুলোর গতি ও পরিণতির সম্পূর্ণতা দেন নি। পিতার মৃত্যুর পর সমরেশের পিতার দেনা আর লোকসানে ভরা সংসারটার শেষ পর্যন্ত কি পরিণতি হল তাই দেখিয়েছেন। সমরেশ শেষ পর্যন্ত নিজের উপর ভরসা করতে শিখেছে। তার বোনেরাও নিজেদের আভিজাত্য ছেড়ে দিয়ে বাঁচবার তাগিদে যেমন তেমন কাজও জুটিয়ে নিয়েছে। ধনী ব্যবসায়ী পিতার পরিবারের মানুষগুলো শ্রমজীবী মানুষে পরিণত হয়েছে এটুকু ইঙ্গিত দিয়ে কাহিনীর ইতিবৃত্ত শেষ করেছেন।

মানিকের উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের প্রভাব দেখা যায় তবে শরৎচন্দ্রের মত হৃদয়াবেগ তাকে চালিত করে না। বুদ্ধি এবং চিন্তার জটিলতায় মানিকের উপন্যাসের যেমন দ্রুতগতি পাঠককে আকর্ষণ করে তেমনি গভীরভাবে ভাবিয়েও তোলে।

হরফ (১৩৬১) উপন্যাসটি কম্পোজিটর কালাচাঁদ আর তার মেয়ে আত্তির বলিষ্ঠ কাহিনী। ছাপাখানার মালিক এবং নির্মম শোষক ধনদাসের কারবার আর তার ভদ্রলোকী পালিশের অন্তরালে যে ক্লেদ, অন্যায় ও ব্যভিচার আছে তাকেই এই উপন্যাসে প্রকাশ করা হয়েছে। সংগ্রামী শ্রমিক কালাচাঁদ তার অপটু লেখায় মালিকের মুখোশ খুলে দিয়েছে। তার সত্যিকার রূপ সমাজে বেরিয়ে পড়ায় ধনদাস আঁতকে উঠেছে। তার লোভ এবং পাপের কাছে অনেক মানুষ বলি হয়েছে। সাহিত্যিক উমাকান্ত মুমূর্ষু স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য উপন্যাস বিক্রী করতে এলে ধনদাস বাগে পেয়ে মাত্র দেড়শো টাকায় তার কপিরাইট কিনে নেয়। টাকা পেতে দেরী হওয়ায় উমাকান্ত তাঁর স্ত্রীকে বাঁচাতে পারেনি। কালাচাঁদের স্ত্রীও বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে। পোড়াবার খরচের জন্য আগাম চেয়ে ধনদাসের কাছে অপমান পেয়েছে। কম্পোজিটর কালাচাঁদ অবশ্য মুখ বুজে তা সহ্য করেনি। প্রেসের অন্য কর্মচারীরা কালাচাঁদের সমর্থনে একজোট হয়েছে। কালাচাঁদকে হটাবার সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছে।

ধনদাস 'রস-সাহিত্য' নামে এক পত্রিকারও মালিক। মহেশ ছিল তার সম্পাদক। কিন্তু মানব আর খালেকের বিদ্রোহী কবিতা ছাপানোর জন্য ধনদাস মহেশকে অপসারিত করে সেই জায়গায় উমাকান্তকে নিযুক্ত করে। অবশ্য উমাকান্ত এই পদ গ্রহণ করলো ভিতর থেকে ধনদাসকে আঘাত করার জন্য। কর্মচারীরা শেষ পর্যন্ত তার এই পত্রিকার মধ্যেই ধনদাসের স্বরূপ, তার কাম লালসা এবং তার বংশের কলঙ্কজনক ব্যাপার প্রকাশ করে দিয়েছে। কালাচাঁদ কেবল সংগ্রামী শ্রমিক নয়, সংগ্রামী জীবনের সে রূপকার। মহেশ নতুন পত্রিকা বের করল, তার নাম 'হরফ'। এই নামে প্রথম গল্প লিখলো কালাচাঁদ। এই পত্রিকার ব্যাপক প্রচারে ধনদাস

ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলো। অবশ্য কালাচাঁদকে শেষ পর্যন্ত মিথ্যা অভিযোগের দায়ে জেলে যেতে হয়েছিল। মানব, উমাকান্ত, খালেক, মহেশ এরা সকলেই প্রগতিশীল লেখক। কালাচাঁদকে তারা অনুপ্রেরিত করেছে, উৎসাহ দিয়েছে, স্বীকৃতি দিয়েছে, কালাচাঁদকে লেখকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

হরফ উপন্যাস এই শ্রমিক জীবনের এবং জীবন-সংগ্রামের কাহিনী। মানব-আত্তির প্রেমের প্রসঙ্গও সুন্দর। মধ্যবিত্ত লেখক মানব কালাচাঁদের মেয়ে আত্তিকে তার জীবনসঙ্গিনী করে নিয়েছে। শ্রমিক বস্তীতে বাস করে তাদের জীবনকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে শিখেছে।

এই উপন্যাসে মানিকের মূল বক্তব্য হোল, কালাচাঁদের অনুভূতি দিয়ে তাদের জীবন সত্যকে রূপায়িত করতে পারলে তবেই যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়ে উঠবে। সামাজিক অবিচারের প্রতিবাদে, এই সাহিত্য শিল্পকে রূপায়িত করে তুলতে হবে। সংগ্রামী মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়ের স্পর্শেই তার সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে উঠবে।

হরফ উপন্যাসের পরিকল্পনাটি মহৎ হলেও কায়াগঠনে তা মাহাত্ম্য লাভ করতে পারেনি। মানিকের বলিষ্ঠ বক্তব্য সার্থক শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠেনি।

এই উপন্যাসে গল্প লেখার পদ্ধতি সম্পর্কে মানব কালাচাঁদকে বলে :

"চাদ্দিকে কি হচ্ছে না-হচ্ছে দেখে শুনে হদিশ পাই, কি নিয়ে লিখতে হবে। মানুষ কে আসবে কি ঘটনা ঘটবে ভেবে সাজিয়ে নিই—খেয়াল রাখি যাতে গল্প হয়।

কালাচাঁদ খালেককে প্রশ্ন করে, কবিতাও তাই ?

খালেক বলে, নিশ্চয়। কি নিয়ে কবিতা লিখব সেটা আগে ভাবি, তারপর ঠিক করি কিভাবে ভাবনাটা সাজালে কবিতা হবে।"

এর থেকে আমরা মাণিকের শিল্প-প্রকরণ সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে পারি।

বিনয়-বকুল, অনিল-কান্তা, অজিত-উমা আর সমীর-সুমতির প্রেমের মালা গাঁথা উপন্যাস **পরাধীন-প্রেম** (১৩৬২)। সংস্কার, পরিবেশ, অবস্থা প্রভৃতিকে প্রেম উপেক্ষা করতে পারে না। কখন যে কিভাবে তার প্রতিকূলতা দেখা দেয় মানুষ তা পূর্ব থেকে বুঝতেও পারেনা। এককথায় প্রেম বাস্তব অবস্থার পরাধীন। অনেক-গুলো জোড়া জোড়া কাহিনীর মধ্যে মানিকবাবু সেই কথাই বুঝাতে চেয়েছেন। এখানে প্রেম সম্বন্ধে রোমান্টিক ধারণার মূলে তীব্র আঘাত করা হয়েছে।

বকুলকে বিনয় জানে বাল্যকাল থেকে। বড় হলে যখন বিয়ের প্রস্তাব আসে তখন বিনয় বকুলকে ছোট বোন বলে বিয়ে করতে রাজী হোল না। কিন্তু কয়েকদিন পরেই বকুল যখন বিধবা হয়ে এল তখন থেকে বিনয় বকুলের জন্য দুর্বলতা বোধ

করল। বকুলদের বাড়ীর পাঁচীও বিধবা হয়ে এসেছিল কিন্তু তিন চার মাস পরে কার্তিকের সঙ্গে পাঁচীর আবার বিয়ে হয়ে গেল। বকুলও বিনয়ের প্রস্তাবে রাজী হোল। কিন্তু বকুলের দিদি মুকুল একেবারে ক্ষেপে গেল। মুকুলকে মিথ্যা কলঙ্কের অভিযোগে স্বামী পরিত্যাগ করে আবার বিয়ে করেছিল। মুকুল বকুলের শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে বকুলের বিয়ের সংবাদ দেয়। তারপর বকুলের শ্বশুরবাড়ী থেকে খবর এল সেখানে বকুলের স্বামীর নামেই সেই বাড়ী, তাছাড়াও স্বামী অনেক টাকা রেখে গিয়েছে। বকুলকে গিয়ে এখন গোটা সংসারের দায় ঘাড়ে নিতে হবে। বকুল সেই প্রস্তাবে রাজী হোল। তার মনে হচ্ছিল একটা পাপ থেকে সে বেঁচে গেল। বিনয় হতাশায় মদ আর মেয়ে মানুষ সঙ্গী করে নিজের পেটে আলসার ডেকে নিয়ে এল। কান্তা-অনিল তাকে সুপরামর্শ দেয়।

বকুলের দাদা অনিল। লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছে। স্কুলে কলেজে ইচ্ছা করে কান্তাকে ফার্স্ট করে দিয়েছে। এই কান্তারও বিয়ে হয়েছিল আট বৎসর বয়সে মাতাল অঘোরের সঙ্গে। অঘোর তাকে মারত অত্যাচার করত। একদিন মাতাল অঘোরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে হাসপাতালে পাঠিয়ে সে শ্বশুর বাড়ী থেকে চলে এল। সেদিন থেকে সে কুমারীর মত আবার লেখাপড়া করল। অনিলের সঙ্গে মিশল কিন্তু সেই অঘোরও টি, বি রোগে মারা না যাওয়া পর্যন্ত সে অনিলের কাছে ধরা দিল না। সে অনিলকে সব স্পষ্ট বলে দিয়েই দুজনের জীবন একসূত্রে বাঁধার ঠিক করে। কিন্তু নানা জটিলতার ফাঁদে ঘুরপাক খেতে খেতে কেবলি বাধা-বিপত্তির দেয়ালে কপাল ঠুকে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় আশা আনন্দের কল্পনা।

অজিত উমাকে ভালবাসে, উমা লেখাপড়ায় খুব ভাল। অজিতই খরচা দিয়ে তাকে পড়ায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উমার প্রতি অনুরাগ পোষণ করে না। সে অন্য মেয়েকে বিয়ে করে। উমাকে একটা ভাল চাকরী পরোক্ষে জুটিয়ে দেয়। উমাও অজিতের স্বপ্নে বিভোর থাকে না। আনন্দকে বিয়ে করবে ঠিক করে। কিন্তু বিয়ে করলে তার চাকরী থাকবে না সেজন্য তাদের বিয়ে হয় না। যেমন তারা চালিয়ে যাচ্ছিল তেমন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তই করে।

উমার ভাই সমীর পরীক্ষায় ফেল করে। বিড়ি বেঁধে জীবন চালায়। অনিলের বোন সুমতির তার উপর টান। উমা অনিল পরামর্শ করে তাদের বিয়ে দিবার ঠিক করে। এই উপন্যাসে একমাত্র সমীর সুমতির প্রেমই বিবাহে পরিণতি লাভ করে।

এই উপন্যাসে উচ্চ শিক্ষিত আদর্শবাদী সংস্কারমুক্ত অনিল আর কান্তাই স্বাভাবিক জীবন্ত চরিত্র। অনিলের শিক্ষা আছে, জেদ আছে, কর্তব্যবোধ আছে, বিরাট একটা

সংসারের দায়িত্ব পালন করে, নিজের সুখের জন্যও তা বিসর্জন দেয় না। আবার প্রয়োজন হলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। কান্তা তার উপযুক্ত সঙ্গিনী। সমাজে সমান না হলে সত্যিকার প্রেম হয় না। অনিল আর কান্তাই তার প্রমাণ। তাদের কোন বিকার নেই, প্রেমের ন্যাকামি নেই। বাস্তব দৃষ্টিতে জীবন ও জীবন সত্যকে উপলব্ধি করে। তাদের কেন্দ্র করেই অন্য চরিত্রগুলো দেখা দেয়, বিকাশ লাভ করে। কান্তা অনিলের ভাই ফেল-করা সুনীলকে আত্মহত্যার পথ থেকে বাঁচিয়ে তোলে। সে তার হাত থেকে সায়নাইডের মোড়াটা রেখে তাকে স্বচ্ছন্দে বাইরে চলে যেতে দেয়। তাতে সুনীলের ঘুরে ফিরে মনটা সুস্থ হয়ে উঠবে। কারণ কান্তার জানা ছিল, সুনীলের বিভ্রান্ত মস্তিষ্কের উদভ্রান্ত কল্পনা অন্য কোন উপায় খুঁজে পায়নি বলেই দাদাকে অন্তত পক্ষে তার দায় থেকে রেহাই দিতে আর নিজে সমস্ত লজ্জার হাত থেকে রেহাই পেতে একেবারে ইহজগৎ ছেড়ে চলে যাবার সঙ্কল্প করেছিল।

কান্তা অসুস্থ অনিলকে বলে, "বাঁচার জন্য বিষম লড়াই চালাতে হবে, প্রাণে আনন্দ চাই, হতাশা জাগলে কাটিয়ে দেবার মত মানুষ চাই।" এই উপন্যাসের সব কয়টি চরিত্রের মধ্যেই আছে এই কথা। এখানে আছে বাঁচার জন্য বিষম লড়াই আর হতাশাকে দূর করার জন্য মনের মত সুস্থ মানুষ। জীবন সংগ্রামে মানুষ যখন অনেক কিছুর পরাধীন তখন প্রেমও তো স্বাধীন হতে পারে না। প্রেম তো জীবনেরই এক সুস্থ এবং স্বাভাবিক বিকাশ।

'হলুদ নদী সবুজ বন' (১৩৬২) মানিকের অসুস্থ অবস্থায় রচিত এক শিথিল উপন্যাস। এ উপন্যাসের আদ্যন্ত সুসঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। হলুদ নদীর এপারে ওপারে আদিম অরণ্য। নদীর এপারের পাশাপাশি কয়েকটা গ্রামে কারখানাগুলো গড়ে উঠেছে। নদী আর বনের পরিবেশে এলোমেলো ভাবে ছড়ানো গ্রামগুলো কারখানাকে অবলম্বন করে গড়ে-ওঠা ছোট সহরটিকে ঘিরে আছে। ইংরেজী তিরিশ সালের পর দু তিন বছরের মধ্যে হুড়মুড় করে যখন কয়েকটা নতুন কারখানা গড়ে উঠেছিল তখন কিছু সাহেব আর গণ্যমান্য ধনী ও উচ্চপদস্থ বাবুরা মিলে প্ল্যান করে একটা ক্লাব-বাড়িও তৈরী করেছিল। উপন্যাসে আছে এই ক্লাব-জীবনের কাহিনী, কারখানার মালিক ও ম্যানেজারদের কার্যকলাপ। এদের সুখ নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন হয় ঈশ্বরের মত অসংখ্য গরীব মানুষের। বড় লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে গিয়ে নিজেরা নিঃস্ব রিক্ত হয়ে পড়ে। ঈশ্বরের ভাঙা বেড়া দিয়ে তার শিশু পুত্রকে শেয়ালে টেনে নিয়ে যায় আর ঈশ্বর বন্দুক

কাঁধে নিয়ে প্রভাসের উচ্ছৃঙ্খল নাচ গানের আসর পাহারা দেয়। এরা সাধারণ মানুষের সামর্থ্য কেবল কেড়ে নেয়নি এদের সাহস এবং কৃতিত্ব থেকেও বঞ্চিত করেছে। ঈশ্বর নিপুণ শিকারী। তার গুলিতেই বাঘ মরে। অথচ বাঘ মারার কৃতিত্বটা রবার্টসন এবং প্রভাসের চাই। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়াও বেধে যায়। তাদের বিবাদের মূল্যও দিতে হয় ঈশ্বরের মত অভাজনদের। ঈশ্বর প্রহৃত হয়, তার ঘর পুড়ে যায়। সহকর্মী শ্রমিকেরা ঈশ্বরের সাহায্যে এগিয়ে আসে। নিজেরা খেটে তার ঘর তুলে দেয়। ক্ষমতার অধিকারী যারা পুলিশ থানাও তাদের। সেজন্য এরা বিরূপ হলে থানাও বিরূপ হয় আবার এদের মেজাজ খুশী হলে তারাও সন্তুষ্ট হয়।

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে বিরোধী শ্রেণীগুলোর মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। সেই সম্পর্কের স্বরূপ মানিক এই উপন্যাসে বিবৃত করেছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী সংঘাতের চিত্রও এঁকেছেন। তবে তা জীবন্তরূপ গ্রহণ করেনি। হলুদ নদী আর সবুজ বনকে ঘিরে যে কল কারখানা আর শহর গড়ে উঠেছিল তাকে কেন্দ্র করে তিনি শ্রেণীবিভক্ত সমাজের এক সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে পারতেন। কিন্তু তা করেন নি। ঈশ্বরকে তিনি রবার্টসন আর প্রভাসের খেলার পুতুল করে সৃষ্টি করেছেন। এই ঈশ্বর বিচ্ছিন্ন একক। তার সহানুভূতিতে শ্রমিকেরা এগিয়ে আসলেও ঈশ্বর তাদের একজন হয়ে উঠতে পারে নি। উপন্যাসের শেষ আরও অস্পষ্ট। যখন ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে শ্রমিক মালিক উভয় পক্ষই সুসংহত এবং সুসংবদ্ধ, শ্রমিকের আসন্ন ধর্মঘটের সংবাদে মালিকেরা নিজেদের দ্বন্দ্ব আপোষে মিটিয়ে নেয়, তখন হঠাৎ বন্যা এসে ঈশ্বরের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। তবে বন্যা বা ভূমিকম্প যে কোন বিপর্যয়েই মানুষ ধ্বংস হবে না। সে আশ্রয় পাবেই এই প্রত্যয়ের মধ্যে কাহিনীর যবনিকা টানা হয়েছে। বন্যার চিত্র মানিকের বহু গল্প উপন্যাসে দেখা যায়। এখানেও সেই একই চিত্র। কিন্তু হলুদ নদীতে যেন মেঘ না উঠতেই বান ডাকল। আসলে উপন্যাসটা খাপছাড়া, শিথিল। জীবনের কতগুলো খণ্ড খণ্ড চিত্র সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো অবিচ্ছিন্নতা লাভ করতে পারে নি। ক্লাবে মদ্যপানের চিত্র খুব সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে। এই সুরাসক্তি মানিকের প্রায় সব উপন্যাসেই রয়েছে।

লখার মা চরিত্রটি খুব জীবন্ত। সে বাল বিধবা। কথকতা দ্বারা তার ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। ইচ্ছে করলে সেও রূপ যৌবনের পসরা নিয়ে লোক মজাতে পারত। তা কিন্তু সে করেনি। তার লোভ কম। প্রাণে আনন্দাবেগ আছে। সে লৌকিক সংস্কৃতির বাহক। নিছক অর্থের বিনিময়ে সে তার প্রতিভাকে বিক্রয় করতে স্বীকৃত

হয় নি। সেজন্য সিনেমা কোম্পানীর লোক তার কথকতা তুলতে এলে সে রাজী হয় নি। সাধারণ মানুষকে আনন্দ দিয়ে তাদের সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িয়েই তার আনন্দ। এ যেন মানিকের নিজের জীবনেরই কাহিনী। তিনি যখন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তখনো তিনি সরকারী বড় চাকুরির টোপ গিলে আত্মবিক্রয়ের পথ অবলম্বন করেন নি।

হলুদ নদী সবুজ বন উপন্যাস থেকেও মানিক বহু গল্প বাছাই করে স্বতন্ত্র রূপ দিয়ে প্রকাশিত করেছেন।

মাশুল (আশ্বিন, ১৩৬৩) মানিকের জীবিতকালে প্রকাশিত সর্বশেষ উপন্যাস। রমেন এবং ব্যোমকেশের দুটি শিক্ষিত বন্ধু পরিবারের একটি মেয়ে রাণী এবং একটি ছেলে সাধনকে নিয়ে এই গল্পের শুরু। সাধন এবং রাণীর স্বাভাবিক ভাবে ভালবাসা জন্মায়। কিন্তু ওদের বিয়ের জন্য কেউ উৎসাহী নয় দেখে তারা একদিন আফিম খেয়ে জীবন শেষ করার সঙ্কল্প করে। রাণীরই তা আনবার কথা ছিল। রাণী কিন্তু সাধনকে মারতে চাইল না। সেজন্য সে নিজের জন্য আফিমের বড়ি আর সাধনের জন্য খয়েরের বড়ি এনেছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা উল্টে যায়। সাধনের মর মর অবস্থায় নিজেই প্রতিবেশী রাজেনবাবুকে ডেকে সাধনের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করায়। রাণীর এই ভুলের মাশুল তাকে অনেক দিন ধরে দিতে হোল। সাধন মনে করল রাণী তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। সেজন্য রাণীর সঙ্গে সে তার মেলামেশা বন্ধ করে দিল।

রাণী এবং সাধনকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো ছেলেমেয়ের ভীড় হয়েছে কাহিনীতে। অবশেষে মমতা এবং রাণীর চেষ্টায় সাধন রাণীকে বিয়ে করতে সম্মত হয়। বিয়ের নেমন্তন্নের সংবাদ দিয়েই এই উপন্যাসের শেষ। রাণী আফিম দিতে যে ভুল করেছিল সেই ভুলের মাশুল তাকে অনেকদিন ধরে দিতে হয়েছিল। বরেন নমিতাকে অন্তঃসত্বা জেনেও তাকে বিয়ে না করে যে ভুল করল তার মাশুল জীবন-ভোর দিতে হোল। রসময় তার হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রী অবলাকে মাতাল এবং উত্তেজিত অবস্থায় লাথি মেরে যে ভুল করেছিল তার মাশুল হিসেবে তাকে চিরতরে স্ত্রীকে হারাতে হোল। অবলা আত্মহত্যা করল।

"একটা ভুল করে বসলে তার মাশুল দিতে হয়। এটা সংসারের অতি সাধারণ নিয়ম।...মাশুল গোনাই যেন মূল নীতি জীবনযাত্রার। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে বা প্রৌঢ় বয়সে শুধু নয়। বার্ধক্যে পর্যন্ত। ...একদিন দেখা যায়, যা ছিল বহুদিন ধরে অত্যন্ত সঠিক সেটা মিথ্যা হয়ে গেছে—বেঠিক নিয়মনীতি মানতে চেয়ে মানুষকে

দিতে হচ্ছে দুঃখ বেদনা গ্লানি অনুতাপের মাশুল।" রাণী-সাধন, বরেন-নমিতা, রসময়-অবলার কাহিনী এই মাশুলেরই কাহিনী।

এই উপন্যাসে অনেক মানুষের ভীড় আছে। কিন্তু তাদের বাস্তব জীবনের সামগ্রিক পরিচয় নেই। সবাই যেন প্রেম প্রেম খেলা করে। ওদের মধ্যে বৌদি মমতা এবং গয়লানী বালাকে জীবন্ত মনে হয়। আঙ্গিকের দিক থেকেও কাহিনীটি সামগ্রিকতা লাভ করতে পারে নি।

এই উপন্যাসের অনাদি-মিলনী-সুনীলের প্রসঙ্গ 'চালচলন' উপন্যাসেও হুবহু এক। মানিক বোধহয় স্মৃতিভ্রংশ কারণে একই কাহিনী-অংশ দুই উপন্যাসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এ ছাড়াও কিছু কিছু অসংগতি উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে। যেমন, অনাদিকে একবার বলা হয়েছে অবস্থাপন্ন, বিলেতের বড় বড় ডিগ্রিধারী আবার বলা হয়েছে তার অবস্থা ভাল নয়। বিয়ের পর শ্বশুরের অর্থে সে বিলেতে যায়।

॥ ১২ ॥

মানিকের মৃত্যুর পর তাঁর চারটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এ সবগুলো উপন্যাসই সুপরিণতি লাভ করতে পারে নি। অধিকাংশই অসমাপ্ত এবং অসংলগ্ন।

এদের মধ্যে **প্রাণেশ্বরের উপাখ্যানই** প্রথম। বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত শ্রীরামনাথ দেবশর্মার একমাত্র পুত্র প্রাণেশ্বর। জন্মলগ্নেই সে তার মা সরলাকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। সরলার পাশের বেডে ছিল মণিমালা। কয়েক দিন আগেই তার এক মেয়ে হয়েছিল। এই মণিমালার চেষ্টায়ই প্রাণেশ্বর সেদিন প্রাণে বেঁচেছিল। সেই সুবাদে বড় হয়েও প্রাণেশ্বর মণিমালাকে ডাকত মণিমা।

প্রাণেশ্বর ছোট বেলা থেকেই ছিল মেধাবী এবং জেদী। পণ্ডিত পিতার সঙ্গে সে সমানে তর্ক করত। নিজের নামটাই তার পছন্দ হয় নি। পিতার অকাল মৃত্যুতে প্রাণেশ্বরকে তার ডাক্তারী পড়া অসমাপ্ত রেখেই সংসারের গুরু দায়িত্ব নিতে হয়। ওদিকে মণিমালার সংসারে আসে নানা বিপর্যয়।

প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান এই দুইটি পরিবারের নানা সুখ দুঃখের কাহিনী। তবে কাহিনীটি শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে অগ্রসর হতে পারে নি। হঠাৎ সমাপ্তি টানা হয়েছে। উপন্যাসের গ্রন্থনও অসংলগ্ন। মানিকের বক্তব্যও স্পষ্ট নয়। প্রাণেশ্বরকে কেন্দ্র করে তিনি কতগুলো উদ্দেশ্যহীন চরিত্রের আমদানী করেছেন। তাও তিনি সুসমাপ্ত করতে পারেন নি।

'শান্তিলতা' উপন্যাস শান্তিলতারই কাহিনী। আশ্চর্য গড়ন পিটন সম্পন্ন সে এক কালো রংয়ের মেয়ে। তার পিতা চন্দ্রনাথ মারা গেল হার্টফেল করে। তারা থাকত এক বস্তীতে। সেখানে ছিল বিমল। পড়াশুনায় এবং কাজে তার তুলনা হয় না। 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', 'আনন্দমঠ', প্রভৃতি নানা বই সে পড়ে। শান্তিলতাকেও সে কিছু কিছু বই পড়তে দিত। বিমলের চেষ্টায় শান্তি একটি স্কুলে কাজ পায়। সুখেন্দু শান্তির পিতার বন্ধুর ছেলে। পরে এই একগুয়ে সুখেন্দুব সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

শান্তি সুখেন্দুর হাতে যেমন অসহ্য অত্যাচার সহ্য করে তেমনি সুখেন্দু কে তার স্নেহ দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে বিদ্রোহী শ্রমিক করে গড়ে তুলে। সুখেন্দু শান্তিকে মেরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। শান্তি তবু সুখেন্দুব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনা। শান্তির জন্যই বেপরোয়া সুখেন্দু যেন জীবনে পথ পায়। কারখানায় সে ভাল টার্ণার।

কারখানার বড় সাহেবের বে-আইনী হুকুম জারি করার প্রতিবাদে ধর্মঘট হয়ে যায়। ক্ষেপে গিয়ে বড় সাহেব গুণ্ডা বাবুরাজার দলকে এনে কারখানার মধ্যে ঢোকায়। সুখেন্দু ছিল সকলের সামনে। বাবুরাজার লাঠিতে সুখেন্দুর মাথা ফাটে। হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। শান্তিলতা ফুলশয্যার শাড়ী পরে লম্বা সিঁথিতে সিন্দুর পরে সুখেন্দুব সঙ্গে দেখা করতে যায়।

উপন্যাসের শেষ দিকটা অসলংগ্ন। গাঁথুনি শিথিল। তাড়াহুড়ো করে যেন শেষ করা হয়েছে। সেজন্য উপন্যাসটি সুপরিণত নয়। মতিলালের বিচার প্রসঙ্গটি সুন্দর হয়েছে।

এই উপন্যাসের ভাষা কাব্যিক সুষমামণ্ডিত। ব্যঞ্জনাপূর্ণ। যেমন:

মনোলতার বড় ছেলে ডাক্তার।
ছেলের বিয়ে দিয়েছে মনোলতা।
বৌ তার পছন্দ হয় নি।
একেবারে যেন খুসীমুখী খেয়াল-খুসী ইয়ার্কি-মারা মেয়ে।
এমনভাবে চলাফেরা করে যে মনে হয় তারাই বুঝি আকাশচারী
দেবতার সামিল।
দেবতা!
রক্তমাংসের মানুষ।
মানুষকে বোকা বুঝিয়ে দেবতা হতে চায়।
মানুষ এ ইয়ার্কি সহ্য করতে রাজী হয় না।

তাই বেধে যায় সংঘাত।

সংঘাতে সংঘাতে ফাটাফাটি বাধে।"

এই উপন্যাসেও শ্রমিকদের প্রতি গভীর ভালোবাসা তাদের অকৃত্রিমতার প্রতি আস্থা এবং নিষ্ঠা সুন্দর প্রকাশ লাভ করেছে। মানিকের উপন্যাস কাহিনীর জন্য নয়, বিচ্ছিন্ন জীবনদর্শনের সূত্রে গ্রথিত নানা মানুষের চরিত্র তাঁর উপজীব্য, বর্ণনার ভঙ্গী, তির্যক বাগ্‌বিন্যাস এবং সুগভীর প্রত্যয় তাঁর উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। এই উপন্যাসেও আছে তার পরিচয়।

মাঝির ছেলে (১৯৬০) মানিকের সর্বশেষ উপন্যাস। নাগা এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে মাঝির ছেলে, সর্বহারা। আপন বলতে তার কেউ নেই। হারু মাঝির কাছে সে প্রতিপালিত হয়েছে। তারপর চলে এসেছে জমিদার যাদববাবুর কাছে। তিনি লঞ্চ কিনে নিষিদ্ধ চোরাকারবারী মাল আনা নেওয়া করেন। নাগা তার প্রধান সাহায্যকারী। তার আত্মসম্মানবোধ ছিল টনটনে। ভদ্রলোকদের উপর ছিল তার গভীর অশ্রদ্ধা। কিন্তু যাদববাবুর সংস্পর্শে এসে নাগা যেন পূর্বের জীবনকে ভুলে যায়। সেজন্য তাকে কেন্দ্র করে এখানে মাঝি শ্রেণীর জীবন-সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেনি। ফুটে উঠেছে নাগার হৃদয়ালুতার কথা। যাদববাবুর প্রতি তার অগাধ প্রভুভক্তি। নকুল মাঝির মেয়ে রূপার প্রতি তার ঐকান্তিক ভালোবাসা। সে বিশ্বস্ত একান্ত অনুগত; সেজন্য পঙ্কু যাদববাবুর চোরাকারবারের খবর পুলিশের কাছে প্রকাশ করে দিলে সে ক্ষুব্ধ হয়। পঙ্কুর বিশ্বাসঘাতকতাকে সে ক্ষমা করতে পারেনি। যাদবের বাড়ীর অন্য চাকর পরেশ। সেও মাঝির ছেলে। কিন্তু সে মিথ্যেবাদী. রূপাকে বিয়ে করার জন্য সে যাদবের স্ত্রীর গহনা চুরি করে। নাগা অকপট সত্যবাদী। নাগা শেষ পর্যন্ত ঝড়ে লঞ্চ উল্টে যাওয়ায় ছিটকে পড়ল অকূল সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে।

এই উপন্যাসে মানিকের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়নি। নাগা চরিত্রের মধ্যদিয়ে মাঝিদের জীবন কথা রূপায়ণের পরিবর্তে তিনি নাগার ভাব, আবেগ, এবং প্রভুভক্তিকে প্রধান করে তুলেছেন। বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই। নাগাকে মাঝিদের থেকে তুলে এনে জমিদার পরিবেশে স্থাপিত করে তাকে স্বধর্মচ্যুত করা হয়েছে। সে মাঝিদের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র হয়ে উঠেনি। তবে মাধববাবুর মেয়ে কনিকার চেয়ে রূপাকে সে বেশী ভালবাসে। মানিক এই দু জনের মধ্যেও চারিত্রিক পার্থক্য তেমন দেখাননি। রূপাকে আমরা কেবল বেজী পুষতে এবং নাগার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করতেই দেখি। অবশ্য মাধববাবুর ব্যবহারের মধ্যে মনিব-চাকরের ব্যবধান কয়েক

জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। মাধব কনিকাকে নাগা চাকরকে বেশী প্রশ্রয় দিতে নিষেধ করে দিয়েছেন। সেজন্য নাগার জীবনেও নতুন কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয় নি। মানিক এই উপন্যাসটি কিশোর উপন্যাস হিসেবেই রচনা করেছিলেন।

'মাটি-ঘেঁষা মানুষ' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত উপন্যাস। একটি চাষীর মেয়ে কি করে কুলির বৌ-এ পরিণত হল তারই কাহিনী তিনি বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'চাষীর মেয়ে'র পর্ব শেষ করে কুলির বৌ-র একটি মাত্র কিস্তি তিনি লিখেছিলেন। তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করলেন শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রেবতীর। সে অঘোর চাষীর মেয়ে। কিন্তু আর পাঁচটা চাষীর মেয়ের থেকে পৃথক। তার সাহস আছে, তেজ আছ। গোবিন্দ কলের মজুর। একদিন তাকে বিষধর সাপে কাটলে এই রেবতী নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুখ দিয়ে বিষ চুষে নিয়ে অজানা অপরিচিত যুবক গোবিন্দের প্রাণ বাঁচিয়েছে। মানুষের বিপদে ব্যাকুল হয়ে সে বহুদিনের সংস্কার ভেঙ্গে সকলের সম্মুখে এক অসাধ্য সাধন করেছে। তার বাপ দাদা ভেবেছিল এ নিয়ে গ্রামে ঢি ঢি পড়ে যাবে। রেবতীর নামে নানা নিন্দা রটবে। কিন্তু দেশ কালের অবস্থা গেছে পাল্টে। সেজন্য রেবতীর এই সাহসের কাহিনী লোকের মনে শ্রদ্ধা জাগায়। রেবতীকে সভা করে সম্বর্ধনা জানান হয়। এর অন্যদিকও আছে। রেবতীর উপর নজর পড়েছে বখাটে ছেলেদের আর প্রসন্ন বাবুর। তিনি এ গ্রামের জমিদার; তার কৃপাদৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য রেবতীকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতে হোল ভিন্ন গ্রামে তার মামা বাড়িতে।

রেবতীকে নিয়ে যখন চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল তখন চাষীরা খেয়ে পরে বেঁচে থাকার দাবীতে সদরে গিয়েছিল শোভাযাত্রা করে। সেই শোভাযাত্রার সামনে ছিল মেয়েরা। কিন্তু কর্তাব্যক্তিরা সেই মেয়েদের সাহসের জন্য পুরস্কার দিলেন না। পুলিশের গুলি এসে লাগল গর্ভবতী পদ্মার পেটে আর বুনো সাঁতরার বিধবা মার বুকে। এ ঘটনায় রেবতীর চোখ খুলে যায়। ওদের জন্য যে শোভাযাত্রা হবে তাতে যোগ দেওয়ার সঙ্কল্প করে রেবতী। কিন্তু বাড়ীর শাসনের জন্য পদ্মাদের শোকসভায় যোগ দিতে সহরে যেতে পারে না। তার আগেই রেবতীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মামার বাড়িতে। কারণ রেবতীর উপর নজর পড়েছিল গ্রামের জমিদার বাবুর। "রেবতী ভাবে হায় রে! সে কালের লেঠেল-রাজা ডাকাত আজ পুলিশ-পোষা চোর হয়েছে। সেই চোরের ভয়ে ছ্যাচড়ার মত পালিয়ে আসতে হয়েছে মামা বাড়ী।"

মামাবাড়ি আসবার আগেই গোবিন্দের সঙ্গে রেবতীর আলাপ হয়। দুর্গাপূজার সময় গোবিন্দ মামাবাড়ি এসে রেবতীর কাছে তার দুর্বলতার কথা জানিয়ে যায়। তারপর নামল ভীষণ ঢল। "লক্ষকোটি মানুষের ঘাড় ভাঙ্গার অধিকার পাওয়া কিছু মানুষদের বিলাতী বিশেষজ্ঞ এনে অজস্র টাকা ঢেলে তৈরি করা বাঁধের হঠাৎ চুরমার হয়ে পড়া বন্যা।" চাষীর ভয়ঙ্কর সর্বনাশ হয়ে গেল। গোবিন্দ এল খোঁজ নিতে। মামী গিরির চোখে পড়ল গোবিন্দ রেবতীর মনের মিলের ঘটনা। ঠিক হোল গোবিন্দের সঙ্গে রেবতীর বিয়ে হবে। কিন্তু কলের হাঙ্গামায় বিয়ের নির্দিষ্ট দিনে গোবিন্দকে যেতে হলো হাসপাতালে। সে হোল বেকার। "দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, বড়ই এখন অসময়। কাজ নেই বলে গোবিন্দের একার নয়, সকলের অবস্থাই কাহিল।" রেবতী গোবিন্দের বুদ্ধির খুব তারিফ করে। বিয়ের সাধ তার মিটে গিয়েছে। তবু প্রমথের চেষ্টায় ওদের বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর গোবিন্দ নিজের সুখ-দুঃখ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। রেবতীর কিন্তু ভাল লাগে না। তার শ্রেণী চেতনা প্রখর। সে চায় আবার সভা হোক, মিছিল হোক। "রেবতী বুঝতে শিখেছে গরীব চাষাভুষো ঘরের মেয়েদের কথা, চাষীদের দুরবস্থার কথা, চাষীর লড়ায়ে মেয়েদের অংশ নেবার কথা।" এবার তাকে বুঝতে হবে কুলির ঘরের কথা, কুলির মেয়ে-বৌয়ের কথা, কলে খাটা মানুষের সুখ দুঃখের কথা। গোবিন্দ কোলকাতায় কলে কাজ নেয়। বস্তীতে ঘর ভাড়া করে। রেবতী-গোবিন্দ গ্রাম ছেড়ে রওনা হয় সহরের দিকে।

॥ ১৩ ॥

মানিকের মৃত্যুর অনেক পরে ১৩৭০ সালের শারদীয়া পরিচয়ে তাঁর দু খানি উপন্যাসের খসড়া প্রকাশিত হয়। 'ছ' পরিশিষ্টে তা সংযোজিত হোল। এই খসড়া দুটো থেকে মানিকের উপন্যাস লেখার পূর্ব প্রস্তুতি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যায়। মানিকের উদ্ভাবনী শক্তিতে মানব জীবনের যে সমস্যা প্রাধান্য লাভ করত তা তিনি লিখে রাখতেন। তারপর উপযুক্ত সময়ে তাকে তিনি বিকশিত করে শিল্প মণ্ডিত করতেন। ছক কেটে পরিকল্পনা করে যুক্তি এবং বাস্তব ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ কাজে হাত দিতেন। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় বা খেয়ালী কল্পনার উপর ভিত্তি করে কোন কাজ করা ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ।

প্রথম উপন্যাসটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "উপন্যাসের নাম সম্ভবত রাখিব—বিষ।

বদলাইতেও পারি। ভাগ্যের অপূর্ব যোগাযোগে বাঙালী ছেলেদের—ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে—কখনও পরের ইচ্ছায় কখনও নিজে সাধ করিয়া যে বিভিন্ন প্রকারের বিষ পান করিয়া জীবনকে বিষাক্ত করিতে হয় মোটামুটি তাহাই হইবে উপন্যাসে ভিত্তি। বিভিন্ন প্রকৃতির এবং জীবনের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে স্থাপিত কতগুলি যুবক হইবে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র।" এই উপন্যাসটিতে থাকবে দুটি প্রধান চরিত্র। একজন বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান, বড় হওয়ার পথে যার সুযোগের কোন অভাব নেই। তবু সামঞ্জস্যের অভাবে এবং বাস্তবের সঙ্গে বিকৃত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য জীবনে সে কিছু করতে পারে নি। আরেকটি হবে এক স্কুল কলেজে পড়া মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলে। "এযুগের ছেলেদের কি রকম খিচুড়ি পাকানো প্রকৃতি গড়িয়া ওঠে, নিজস্বতা বিসর্জন দিয়া কি ভাবে ধার করা টুকরা টুকরা চরিত্রে নিজেদের চরিত্র গড়িয়া তোলে, ডাঁটা-ছেঁড়া পদ্মের মত অবলম্বনহীন ভাবে কি ভাবে ভাসিয়া বেড়ায়—এই সমস্ত ফুটাইবার চেষ্টা করিব। ইহার পারিবারিক জীবনের উপর উপন্যাসের যবনিকা তুলিব।"

আরেকটি উপন্যাস হবে চৌদ্দটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত একটি সুসংবদ্ধ প্লটে বিন্যস্ত উপন্যাস। সেকেলে এক রাজা নায়েব ম্যানেজারের উস্কানিতে প্রজাদের চাষের জমি বেদখল করে এরোড্রেম গড়তে গিয়ে প্রজাদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধান। নিজেদের চাষের জমি রক্ষা করবার জন্য প্রজারা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। রাজা হাতি দিয়ে প্রজার ফসল নষ্ট করতে গেলে প্রজারা প্রতিবাদ করে, হাতিকে আঘাত করে। প্রজাদের বিদ্রোহী নেতাকে রাজা বন্দী করলে প্রজারা লাঠি বন্দুক অগ্রাহ্য করে বন্যার মত ছুটে গিয়ে নেতা এবং আপনজনকে মুক্ত করে নিয়ে আসে। মানিক এ উপন্যাসের কোন শিরোনাম দেন নি। মন্তব্যে লিখেছেন, "অতি অল্প সময়ে কল্পনা করা—অনেক অদল বদল পালিশ দরকার।"

মানিক উপন্যাস রচনা করবার জন্য, জীবনকে জানবার জন্য যে আজীবন শ্রম করে গিয়েছেন এই খসড়া উপন্যাসগুলোর মধ্যে তার প্রমাণ আছে। তাঁর সৃজন-শক্তি ছিল অপরিমেয়। জীবনের নিত্য নতুন সমস্যা তাঁকে ভাবিয়ে তুলত। সেজন্য তাঁর সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের চিন্তায় যখন এসেছে দৈন্য, কল্পনায় শ্লথতা এবং প্রকাশে রিক্ততা তখনো মানিক অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর। নিত্য নতুন সৃষ্টি কল্পনায় মশগুল। প্রায় আড়াই শ' গল্প এবং চল্লিশখানা উপন্যাস লিখেও তাঁর শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। আমৃত্যু নিত্য নতুন চিন্তার বিরাম নেই। এখানেই মানিকের মহৎ প্রতিভার পরিচয়।

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

কিশোর সাহিত্য

মানিক কিশোরদের জন্যও অনেক গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এগুলো ছড়িয়ে আছে। মানিকের মৃত্যুর পর অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির থেকে 'মানিক বন্দোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' (জুন, ১৯৫৮) নামে বারটি গল্পের এক সঙ্কলন* প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে 'সিদ্ধপুরুষ' 'মাটির মাশুল' গ্রন্থে এবং 'অসহযোগ' লাজুকলতা গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। সম্প্রতি গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিঃ থেকে 'কিশোর বিচিত্রা' নামে আরেকটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। এতে চারিটি নতুন গল্প আছে— বড়ো হওয়ার দায়; সনাতনী, কাণ্ড কারখানা এবং পোড়াছায়া। এছাড়াও মানিক অনেক গল্প কিশোরদের জন্য লিখেছেন যেগুলো এখনো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। (এসব গল্পের একটি তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে)। এদের মধ্যে আমরা কয়েকটি গল্প সংগ্রহ করেছি: 'দাঁড়ির গল্প', 'কোথায় গেল,' 'জব্দ করার প্রতিযোগিতা,' 'মহাদেও-এর যাত্রা শুরু', 'ভীরু', 'ম্যাজিক', 'সূর্য বাবুর ভিটামিন সমস্যা', এবং 'মাটির কাছের কিশোর কবি' নামে এক উপন্যাস।

এ গল্প-উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল তথাকথিত শিশু সাহিত্যিকদের ন্যায় মানিক নিছক ছেলে ভুলানো গল্প লেখেননি। তাঁর গল্পে আজগুবি কাহিনী নেই, অদ্ভুতত্ব নেই, অলৌকিকত্ব নেই, আছে গভীর মানবিক আবেদনের কাহিনী। বাংলা সাহিত্যে মানিক সর্বাপেক্ষা সমাজ সচেতন লেখক। কিশোরদের জন্য গল্প লিখতে বসে তিনি সে কথা ভুলে যাননি। মস্ত বড় আড়তদারের ছেলেকে ফাঁকা আদর্শবাদী করেই মানুষ করে তোলেননি। দুর্ভিক্ষ কবলিত সাধারণ মানুষদের সে বাপের গুদাম খুলে চাল বিলি করে দিয়েছিল। তার কাছে মনুষ্যত্বের বড় আদর্শ নেই এবং সে আদর্শের জন্য প্রয়োজন হলে পিতারও বিরোধিতা করা যায় (অসহযোগ)।

'অলৌকিক লৌকিকতা', 'বড়ো হওয়ার দায়' এবং 'আমার কান্না' মানিকের

---

*১। ভয় দেখানোর গল্প ২। শৈশব স্মৃতি যাচাই করার গল্প ৩। গল্পচুরির গল্প ৪। সিদ্ধ পুরুষ, ৫। তিনটি সাহসী-ভীরুর গল্প ৬। তৈলচিত্রের ভূত ৭। টিকিট নেই ৮। অসহযোগ ৯। চণ্ডীচরণের গান ১০। অলৌকিক লৌকিকতা ১১। পাশ ফেল ১২। আমার কান্না।

নিজেরই ছেলেবেলার কাহিনী। এর থেকে বুঝা যায় মানিক কত দুরন্ত, সাহসী, ধৈর্যশীল এবং সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। অলৌকিক লৌকিকতা গল্পটি আরম্ভ হয়েছিল প্রায় অলৌকিকতা দিয়ে কিন্তু শেষ হল অদ্ভুত মানবিক অনুভূতির মধ্যে। অন্য লেখকের হাতে পড়লে ঐ তিনবুড়ি রূপকথার জটি-বুড়ি হত কিন্তু মানিক এই বুড়ীদের জীবনের কারুণ্য ফুটিয়ে তুলেছেন অল্প কয়েকটি কথায়। লিখেছেন, 'এদের প্রতি আমার ভয় বা ঘৃণা জাগে না, জাগে সহানুভূতি।' এখানেই মানিকের শ্রেষ্ঠত্ব।

'ভয় দেখানোর গল্প'ও একটি ভাল গল্প। ছেলেদের ভয় দেখানোর পরিণাম যে কত মারাত্মক হতে পারে তারই কাহিনী এখানে আছে। দুজনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও খেলাচ্ছলে এক উদাস দূরত্ব তাদের মাঝখানে ঘনিয়ে আসার সুন্দর কাহিনী।

'শৈশব স্মৃতি যাচাই করার গল্প'—শৈশবে যা সহজ এবং সম্ভব বয়সকালে তা যে অসঙ্গত হয়ে পড়ে তারই এক কাহিনী। আর এই অসঙ্গতির মধ্যেই থাকে কারুণ্য এবং হাসিক খোরাক।

'গল্প চুরির গল্প'-ও একটি চমৎকার গল্প। একজন নতুন লেখকের অভিমান এবং গল্প চুরির রহস্য উন্মোচন মানিক অতি সুন্দর ভাবে করেছেন।

'তিনটি সাহসী-ভীরুর গল্প', তিনজন সাহসী-ভীরুর একটি চমৎকার গল্প। ভূষণ, গিরিশ এবং বীরেন্দ্র তিনজনেই সাহসী আবার তিনজনেরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভীরুতা। ভূষণের আছে ডাকাতের ভয়, গিরিশের ভূতের ভয় এবং বীরেন্দ্রের পতনের ভয়। ভয় এবং সাহস দুই প্রবণতাই মানুষের মনে এক সঙ্গে থাকে।

'তৈলচিত্রের ভূত'-ও একটি চমৎকার গল্প। মানিক ভূতের গল্প বলতে গিয়ে বিদ্যুতের রহস্য প্রকাশ করে দিয়েছেন। 'পোড়াছায়া'কে প্রথম মনে হবে ভূতের গল্প; আসলে এটি একটি চুরির গল্প। উড়িয়া চাকর মায়াধর কি করে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিজে এবং পয়সা নেই এমন কয়েকজন তার দেশী পুরুষ ও স্ত্রীলোককে বিনা টিকিটে কোলকাতা নিয়ে এসেছিল তারই এক সুন্দর গল্প 'টিকিট নেই'।

'চণ্ডীচরণের গানে' আছে চণ্ডীচরণের খেয়াল আর বিকার এবং 'পাশফেল' গল্পে আছে একটি গরীব ছাত্রের বড়লোক আত্মীয়ের কাছ থেকে তার পড়াশোনার খরচ আদায় করার কাহিনী। পাশফেল এক সুন্দর মানবিক আবেদনের গল্প। 'সনাতনী' গল্পও ন্যায় অন্যায়বোধের এক সনাতন গল্প।

'মহাদেও-এর যাত্রা শুরু' গল্পে এক কালে বড়লোক পিতার গরীব ছেলে কি করে ছ্যাচড়ামি করে বড় লোক হওয়ার মিথ্যা স্বপ্ন দেখে তার কাহিনী আছে। মহাদেও সমরেশের ছাপাখানায় কাজ করে। কিন্তু সমরেশ তাকে বিনা মাইনেয় তিন মাস ধরে

খাটাচ্ছিল। মহাদেও তাই সুযোগ বুঝে সমরেশের কাছ থেকে দশ টাকার নোট নিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসে না। যাকে পাওনা পয়সা না দিয়ে পারা যায় তাকে না দেওয়ার পলিসি আর খাটছে না। মহাদেও তার পথ দেখিয়ে দিল। 'কাণ্ড কারখানা' মানুষের বিবেকবোধের এক অদ্ভুত গল্প। ফুলগাছটা পেয়েও মালিক জনসন পুরস্কার তো দিলেনই না বরং গোকুলকে পুলিশে দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

দীনেশবাবু কি করে মুমূর্ষু ছেলেকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে তার বহুদিনের এ্যাকসিডেন্টের ভয় থেকে অব্যাহতি পেল তারই এক চমৎকার গল্প 'ভীরু'। দুর্ঘটনা দেখে দেখে দীনেশবাবু তার সাহস একদম হারিয়ে ফেলেছিলেন। সেই সাহস তিনি আবার ফিরে পেয়েছেন। অতএব সংসারের সব ভীরুই ভীরু নয়। অবস্থার গতিকে তারাও খুব সাহসী হয়ে ওঠে।

'ম্যাজিক' মানিকের পারিবারিক ঘটনার এক চমৎকার গল্পরূপ। হারানো চুড়ি খুঁজে পাওয়ার এক সুন্দর গল্প। 'মানুষের সব দিক—খুব সোজা দিক পর্যন্ত—খেয়াল হয় না বলেই ম্যাজিক সম্ভব হয়েছে।'

'সূর্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা' বিকার গ্রস্ত সূর্যবাবুর ভিটামিন খাওয়ার খুঁত খুঁতে স্বভাবের গল্প। ভিটামিনের অভাবে সূর্যবাবুর শরীর খারাপ হয়। ডাক্তারের এই কথা শুনে সূর্যবাবু নানা বই পড়ে ভিটামিন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান আহরণ করেন। বাড়িতে খাওয়ার ব্যাপারে তিনি সকলকে নাজেহাল করে ছাড়েন। কিন্তু তাতেও সূর্যবাবুর শরীর সারল না বরং মাস খানেক পরে আরও কাহিল হয়ে পড়ল। নিক্তি এনে পথ্য মেপে ভিটামিন বের করেও তিনি কোন কূল কিনারা করতে পারেন না। অবশেষে তিনি আবার গেলেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বুঝিয়ে দিল, বেড়ানো পর্যন্ত বাদ দিয়ে সারাদিন ঘরে বসে ভিটামিন সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা করলে এরকম হবেই।' সূর্যবাবুও যেন পথ পেয়ে গেলেন। তিনি হাসতে লাগলেন। একটি সুন্দর গল্প।

'এলো' বিমানের পুরানো হারানো সাথী গোরাকে স্বপ্নে দেখার এক সুন্দর গল্প। পুরানো বন্ধুর জন্য বিমানের কি গভীর দরদ! অনেকদিন পর নিজেদের বাসায় ফিরে আসার পর তাদের হিম-উদাসীন ব্যবহার কী ব্যথা দেয় বিমানের মনে গোরা, গোরার বাবা মা কেউ তা বুঝতে পারে না। একটি বালকের বন্ধুর জন্য উষ্ণ দরদের এক অনুপম গল্প।

দাড়ির গল্পও এক সুন্দর রূপকথা। ঠাকুর্দা গল্প বলছেন নাতি নাতনির কাছে। মা-মাসী বাবা-কাকারাও না-শোনার ভান করে বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছে।

ভূতের গল্প নয়। ঠাকুর্দা বলছিলেন এক প্রকাণ্ড দৈত্যের দাড়ির জঙ্গলে রাজকন্যার হারিয়ে যাওয়ার গল্প। অবশেষে আকাশের মেঘ-কাটা কাঁচি চেয়ে নিয়ে এসে রাজপুত্র আর মন্ত্রী পুত্র দৈত্যের দাড়ি কেটে নিয়ে পালিয়ে গেল তেপান্তরের মাঠে। অনেক কষ্টে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে দুই বন্ধু দেশে ফিরে এল। তারপর ঠাকুর্দা কানাইকে বললেন তার দাড়ির মধ্যেও লুকিয়ে আছে হাসিপুরের রাজকন্যা। তার পর দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলেন ঠাকুর্দার অতি সাধের দাড়ি কে রাত্রে কেটে নিয়েছে। ভাল গল্প বলায় আনন্দের চেয়ে তখন দাড়ি হারানোর দুঃখই ঠাকুর্দার বেশী বোধ হোল। একটি নির্মল হাসির অনাবিল গল্প।

'কোথায় গেল' এক ভদ্রলোকের অন্যমনস্কতার এক সুন্দর গল্প এবং "জব্দ করার প্রতিযোগিতা" দুই বন্ধুর একে অন্যকে জব্দ করার পরিণাম কি ভয়ঙ্কর হয়েছে তার কাহিনী।

'মাটির কাছের কিশোর কবি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত উপন্যাস। মানিকের মৃত্যুর পর প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এই উপন্যাস সমাপ্ত করে ১৩৬৫ সালের শারদীয়া আগামী পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

এই উপন্যাসের নাম দেখে স্বাভাবিকভাবে আমাদের স্মরণে আসে কবি সুকান্তের কথা। মাত্র একুশ বছর বয়স যার জীবনের ইতিহাস। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সে কবি হিসেবে বাংলা সাহিত্যে আশ্চর্য স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু পরিণতি লাভ করবার আগেই তার প্রতিভাকে আমরা হারিয়েছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুকান্তকে খুবই ভালবাসতেন। মানিক এবং সুকান্ত দুজনেই ছিলেন বাংলা সাহিত্যে রাজনীতিক শিল্পী। এদের দুজনের মধ্যেই জীবন ও রাজনীতি একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। মানিকের অনেক লেখায় সুকান্ত সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা রয়েছে। অতএব এই উপন্যাসের নামকরণের মধ্যে যে সুকান্ত স্মৃতি থাকবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

মানিক এই উপন্যাস লিখেছেন ছোটদের জন্য। উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্টই লিখেছেন, "গোড়ায় তোমাদের বলে রাখাই ভালো যে এটা আমাদের নতুন যুগের কবি সুকান্তের জীবনীও নয়, তার জীবন-কাহিনী ভিত্তি করে লেখা উপন্যাসও নয়। এটা স্রেফ উপন্যাস—চরিত্রই বলো আর কাহিনীই বলো সব আমার মগজের কারখানায় তৈরী। সুকান্ত অবশ্য এদেশে পুষে রাখা যক্ষ্মার অভিশাপে অল্প বয়সে প্রাণ দিয়েও কবি হিসাবে আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে আছে। আমার উপন্যাসের কবিকে কাহিনীর শেষে কবি আর রক্তমাংসের মানুষ দু'রকম হিসাবেই জীবন্ত দেখতে পাবে।

কিন্তু ঋণ স্বীকার না করে উপায় নেই। সুকান্ত সম্ভব না হলে, মাটির কাছের আরও অনেক কিশোর কবি সম্ভব না হ'লে, তোমাদের জন্যে আমার এই উপন্যাস লেখাও সম্ভব হ'ত না। যতই রং চড়াই আর কল্পনার রসে রসাই, মাটির মানুষকে আর মাটির মানুষের জীবনকে অন্ততঃ ভিত্তি হিসাবে অবলম্বন না করে আমি গল্প ফাঁদতেই পারি না, লিখব কি!

আমার নিজের জীবনের দু' একটা সত্য ঘটনা নিয়েও হয়তো ভিত গাঁথব। গাঁথব এই বানানো কাহিনী—মিশিয়ে দেব কাহিনীর সঙ্গে।"

উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে কিশোর নামে একটি বালককে কেন্দ্র করে। তার ছিল অদ্ভুত তেজ, জিদ আর ধারালো বুদ্ধি। অনেকেই তাকে অবশ্য মনে করত বোকা-হাবা। ছোটবেলা থেকেই তার খাতির ছিল গরীব দুঃখীদের সঙ্গে। বিধবা মুড়িওয়ালীর ছ' সাত বছরের ময়লা জামা পরা নোংরা মেয়েটার সঙ্গেই ছিল তার ভাব বেশী। এই মেয়েটাকে একদিন বাঁচাতে গিয়ে সে একটা পাগলা কুকুরকে ঠেলে দিতে ভয় পায়না, কুকুরের কামড়ানোর চিকিৎসা করতে সে বাবার সঙ্গে কলকাতা গিয়ে সন্ধ্যাবেলা হোটেলের ঘরে মায়ের জন্য মন কেমন করায় ছড়ার বই সামনে ধরে সুর করে ছড়া পড়ার ছলে কেঁদে নেয় ও চোখের জলে লেখা ঝাপসা হয়ে গেলে নিজেই ছড়া বানিয়ে কাঁদে। সেই তার প্রথম ছড়া বানানো। আসলে ছেলেবেলা থেকেই তার মধ্যে থই থই করতো প্রচণ্ড ভাবাবেগ। আবার মুন্সেফ অমূল্যবাবুর কীর্তন শুনে সেও কৃষ্ণের জন্য পাগল হয়। জ্যোৎস্নার আলোয় গাছের ডালে সে কৃষ্ণকে নিজের চোখে দেখতে পায়। "এমনি ছিল কিশোরের ছেলেবেলার ধাত। যেমন প্রাণময় ছিল তার আনন্দ উল্লাস, যেমন সে ছিল দুরন্ত আর ছোটলোক ছেলেদের সঙ্গে একাকার হয়ে মিলেমিশে ডাংগুলি খেলা থেকে যাচ্ছে তাই কথা বলার মত কাঠখোট্টা, তেমনি গভীর ছিল তার আবেগ, হতাশা ও বেদনাবোধ।" এ যেন মানিকেরই ছেলেবেলার কথা।

কিশোরের আরেকটা দিক ছিল। সে দিকটা হোল তার নালিশ আর আপসোসের দিক—রাগ আর ক্ষোভের দিক। ছেলেবেলা থেকে তার মধ্যে কত নালিশ জমে উঠেছে। তার ছিল জিজ্ঞাসু মন। শৈশবের অন্তহীন এলোমেলো জিজ্ঞাসার মধ্যে সবচেয়ে জোরালো জিজ্ঞাসা হোল, চারিদিকে এত অন্যায় অবিচার দুঃখ দুর্দশা হীনতা নীচতা কেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে দিন দিন বেড়ে চলেছে এই জিজ্ঞাসার পীড়ন।

কিশোর কেবল খেলতো নোংরা ছোট লোক ছেলেদের সঙ্গে। কিশোর জানত

ওরা ছোটলোক নয়, গরীব। দিনে দিনে লাবণ্যহীন রুক্ষ হলেও কিশোরের শরীর বেশ শক্ত আর জোরালো হয়ে উঠল।

তারপর কিশোরের প্রথম যখন বোন হোল তখন কিশোর লিখল প্রথম কবিতা। দ্বিতীয় কবিতা লিখল সে পাঁচীর শোচনীয় মৃত্যুতে। জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে উনুনের উপর পড়ে গিয়ে পাঁচী (মানিক অবশ্য ভুল করে লিখেছেন কালী। নামের এই অসংগতি মানিকের অনেক উপন্যাসে দেখা যায়) একেবারে জ্বলে পুড়ে মরে গেল। কিশোর লিখল :

এ তো দুর্ঘটনা নয় প্রতিকারহীন
তুমি তো মর না একা শুধু একদিন
যে আগুনে জীবনের একান্ত নির্ভর
চিতাতেও যে আগুন সার্থক সুন্দর।
একান্ত নিয়ম-নিষ্ঠা মানুষের দান
সে আগুন তোমারে তো করে নাই গ্রাস।
তোমারে করেছে হত্যা মানুষ খুনীরা।
দারিদ্র্যের দাবানল জ্বেলে রাখে যারা॥

তারপর কিশোরের সংসারে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। হঠাৎ একদিন ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে কিশোরের পিতা মনোহরবাবুর চাকরি গেল, জমানো সব টাকা গেল। তিনি ছিলেন সংসারের হাল ধরে। এবার তিনি হয়ে পড়লেন ভাইদের গলগ্রহ। দারিদ্র্যের এই নিষ্ঠুর পেষণে কিশোরের সব গেল। গেল আদর যত্ন, ভালকরে লেখাপড়া করা, কবিতা লেখা। তার মা তখন রুগ্ন, পিতা বেকার। তবু কিশোরের দুর্জয় সঙ্কল্প। সে ভাল করে পাশ করে। কত কষ্ট করে সে লেখাপড়া করে। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে কিশোরের পরিচয় হয়। কিশোর বুঝতে পারে টাকাই সব। কিশোরের মনে প্রশ্ন জাগে, "যাদের পয়সা আছে তারাই মানুষের মর্যাদা পাবে কেন?"

একদিন কিশোর দেখে, মোড়ের মাথায় একটি লোক ঢোল বাজাচ্ছে আর একটি ছ-সাত বছরের কালো ছেলে বাজি দেখাচ্ছে। ওরা পথে বেরিয়েছে বাঁচবার তাগিদে। কিশোরের মনে হয় সেও কিছু রোজগার করে তার মা বাপ ভাইবোনদের বাঁচাবে। কিশোরের কথা শুনে মনোহর বলে, "খাটতে চাইলেও কাজ পাওয়া

যায় না।" মনোহর যেন ভেঙে পড়েন। কিন্তু কিশোর ভেঙে পড়ে না। কয়েকটি কথা তার মনে কবিতার মত ভেসে উঠে—

চারিদিকে যত অত্যাচার
যত ব্যথা যত দুঃখ ভার
জমিয়াছে জঞ্জাল সমান
ঘুচাইয়া দিব নব প্রাণ।

এতো সুকান্তেরই ভাব। তবু কিশোর ভাবে, কথাগুলি ত তার। কিশোর অতি কষ্টে পড়াশুনায় মন বসায়। তবে সে এখন ঔচিত্য আর অনৌচিত্যের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারে।

একদিন ঝড়ে কুষ্ঠরোগী হরিশ বৈরাগীর ঘরখানা পড়ে যায়। বৈরাগীর বউ কর্তার কাছে যায় বাঁশ ভিক্ষে করতে। কর্তা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। কিশোর ক্ষেপে যায়। গরীব বলে বৈরাগীর বৌকে অপমান করা হোল কেন? দলবল জুটিয়ে কিশোর জোর করে বাঁশ কাটতে যায়। কর্তা পুলিশ আনিয়ে তাদের ধরিয়ে দেন। তারপর রাজনীতি করা বীরেনদা প্রভৃতির মধ্যস্থতায় আপোষ হয়। কর্তা চাটুয্যে মশাই বৈরাগীর বৌয়ের কাছে নিজের অন্যায় স্বীকার করেন। হরিশের ঘর তোলার জন্য বাঁশ দেন তখন কিশোররাও চাটুয্যের কাছে নিজেদের ঔদ্ধত্যের জন্য ক্ষমা চায়।

কিশোরের মুখে চোখে দৃঢ়তা আর উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। কিশোর ছেলেমেয়ে পড়ানোর কাজ নেয়। মনোহরও একটা ফুরনের কাজ নেয়। অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে গিয়ে মনোহর একদিন মাথা ঘুরে পড়ে যায়। চাটুয্যের ছেলে সতু ডাক্তার হয়ে এসে রিলিফ কমিটিতে কাজ করে। সে এসে বিনে পয়সায় মনোহরকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে যায়। কিশোর সতু চাটুয্যের ব্যবহারে অবাক হয়ে যায়। তার মনে হয় "কোথায় যেন ভাঙন ধরেছে।" নইলে যে চাটুয্যেরা কোনদিন কাউকে সাহায্য করে না তাদের বাড়ীর একজন বিনা পয়সায় রোগী দেখে ওষুধ দিচ্ছে!

মনোহরের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হয়ে পড়ায় মনোহরের ভাইয়েরা সব পৃথক হয়ে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। কিশোর নিজে কাজ করে আয় করার জন্য অস্থির হয়ে উঠে। সে জানে, চারিদিকে এই যে দারিদ্র্য তা তো মানুষেরই সৃষ্টি। সেজন্য সে মায়ের কথায় প্রতিবাদ করে বলে ভগবান কিছু করে নি। "মানুষই মানুষের এ দশা করেছে।" সমাজ না বদলালে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

কিশোর অনেক দূরে ভূটান সীমান্তে এক চাকরির সন্ধান পায়। কিন্তু সে সেখানে

যায়না। বাবা-মাকে রেখে সে যেতে পারেনা। এদিকে মনোহর পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলেন। অন্যদিকে খবর বেরুলো কিশোর দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে। কিশোর সঙ্কল্প করে সে পড়া এবং চাকরি একসঙ্গে চালিয়ে যাবে। মা তাকে আশীর্বাদ করেন। তার বুকে অফুরন্ত সাহস! এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য তার মনে প্রবল প্রতিজ্ঞা জাগে।

উপন্যাসটি এক কথায় চমৎকার। অন্যান্য লেখকদের মত মানিক শিশু সাহিত্য সৃষ্টি করতে বসে উদ্ভট কোন কাহিনী রচনা করেননি, কল্পনার ফানুস ওড়াননি। এই রুক্ষ কঠিন বাস্তব পথে একটি ভাবাবেগ প্রবণ কিশোর যে জীবন সংগ্রামে কি করে জড়িত হয়ে হতাশ না হয়ে তাকে জয় করার দুর্জয় সঙ্কল্পে সতেজ হয়ে ওঠে তার এক অদ্ভুত গল্পের প্রস্তাবনা করেছেন। তিনি তার কিশোর কবিকে কেবল ভাবাবেগ দিয়েই গড়েননি, রক্ত মাংসের মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন। এদিক দিয়ে মানিক অনন্য। গল্পটি সুসমাপ্ত হয়েছে তার কৃতিত্ব খগেন্দ্র নাথ মিত্রের।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

রচনা সাহিত্য

বিভিন্ন বিষয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কুড়িটি রচনা লিখেছিলেন। মানবতার বিচার[১], মহামানব স্তালিন,[২] সাহিত্যের কানমলা,[৩] কলকাতায় স্বাধীনতা দিবস[৪] (১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল) ছাড়া বাকীগুলো মানিকের মৃত্যুর পর 'লেখকের কথা' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রায় অধিকাংশ রচনাতেই মানিক নিজের লেখক জীবনের ইতিহাস, সমকালীন নানা বিষয়ে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। সেজন্য এগুলোকে সঠিক ভাবেই বলা যায় লেখকের কথা।

অতএব মানিকের রচনা সাহিত্যের মধ্যে মুখ্যত প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ব্যক্তি মানস এবং সাহিত্যের গতি প্রগতির কথা। গল্প উপন্যাস কবিতার অজস্র রচনার মধ্যে যে ব্যক্তি মানুষটি ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর চিন্তাধারা, প্রবণতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর সম্যক পরিচয়ের জন্য এই রচনা সাহিত্য খুব মূল্যবান। অজস্র লেখার মধ্যে লেখক লুকিয়ে থাকেন। তার মধ্যে আমরা তাঁকে বিচিত্র ভাবে অনুভব করি কিন্তু তাঁর নিজের কথা যেখানে বলেন সেখানেই আমরা তাকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি।

বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। সেই বিতর্কিত মানুষকে, তাঁর আদর্শকে উপলব্ধি করবার জন্য তাঁর এই রচনাগুলো যথেষ্ট সাহায্য করে। মানিকের জীবনী রচনায় এর প্রাসঙ্গিক অংশগুলো আমরা উল্লেখ করেছি। যথাসম্ভব পুনরুক্তি না করে সাহিত্য ও সাহিত্য-বিচার প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যগুলিই এখানে আলোচ্য।

বাংলা সাহিত্যে মানিকের আবির্ভাব উত্তর তিরিশের পর্বে আকস্মিক ভাবে। তখন কল্লোল-কালিকলমের আধুনিক-মার্কা হুল্লোড় প্রায় একটা বিপ্লব-মার্কা বিদ্রোহের রূপ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু বিপ্লব হয় নি। "সাহিত্যের চলতি সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যের বিক্ষোভ বিপ্লব এনে দিতে পারে না।" এমন কি বস্তুবাদকেও তারা সচেতনভাবে অবলম্বন করতে পারেন নি। সেই আধুনিকদের সম্পর্কে মানিক লিখেছেন, "অসীম আগ্রহ নিয়ে আধুনিকদের লেখা পড়ি। ভাষার

---

১ মানবতার বিচার, পরিচয়, মাঘ, ১৩৫৫। ২ মহামানব স্তালিন, পরিচয়, চৈত্র, ১৩৫৯। ৩ শারদীয়া মাসিক বসুমতী, ১৯৫৩। ৪ কালান্তর শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭০।

তীক্ষ্ণতা, ভঙ্গির নতুনত্ব, নতুন মানুষ ও পরিবেশের আমদানী, নরনারীর রোমান্টিক সম্পর্ককে বাস্তব করে তোলার দুঃসাহসী চেষ্টা আশা ও উল্লাস জাগায়—তারই পাশাপাশি হালকা নোংরা রোমান্টিক ন্যাকামি তীব্র বিতৃষ্ণা জাগায়।"

তবু এই আধুনিকতার আন্দোলনে যখন 'শৈলজানন্দের খাঁটি গ্রামের মানুষ আর কয়লাখনির কুলিদের' সাহিত্যে প্রতিফলিত দেখেন তখন তিনি আনন্দিত হয়ে ওঠেন। যদিও তিনি স্বীকার করেন, "শৈলজানন্দের গ্রাম্য জীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ—কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আসেনি। বস্তি জীবন এসেছে কিন্তু বস্তি জীবনের বাস্তবতা আসেনি—বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসেনি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম বাতিল হয়নি, ওই একই রোমান্স শুধু দেহকে আশ্রয় করে খানিকটা অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে।"

মানিকের জীবনে শরৎচন্দ্রের প্রভাব ছিল অসীম। শরৎচন্দ্রকেই কেবল মানিক আপনজন বলে অনুভব করতে পারতেন। কারণ, শরৎচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার প্রথম পথ প্রদর্শক। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে শ্রীকান্ত এবং চরিত্রহীনই তাঁকে বেশী অভিভূত করেছিল: শ্রীকান্তের "নরনারীর চরিত্র আর সম্পর্ক আমাকে অভিভূত করেছিল।" কিন্তু তখনও তাঁর মনে প্রশ্ন জাগতো সাহিত্যের প্রেম আর বাস্তব জীবনের প্রেম নিয়ে। "সাহিত্যের ছাঁকা প্রেম খুঁজে পেতাম না মধ্যবিত্তের জীবনে অথবা নীচের তলায়। মধ্যবিত্তের বাস্তব জীবনের প্রেমে যেটুকু ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য দেখতাম তার সন্ধান পেতাম না নীচের তলার জীবনে। আবার নীচের তলার প্রেমে ভাবৈশ্বর্যের রিক্ততা সত্ত্বেও যে সহজ বলিষ্ঠ উন্মাদনা দেখতাম, মধ্যবিত্তের জীবনে তার অভাবটা ধরা পড়তো।" তাঁর মনে হোত, 'বাংলা সাহিত্যে নারীত্ব অভিনব মর্যাদা পেলো, কিন্তু বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে কেন?'

চরিত্রহীন উপন্যাস মানিককে সবচেয়ে বেশী অভিভূত এবং বিচলিত করেছিল। তিনি আট দশবার তন্ন তন্ন করে বইখানা পড়েছিলেন। এই উপন্যাসেই বাংলা সাহিত্যের অনেক দৃঢ়মূল সংস্কার আর গোঁড়ামি চুরমার হয়ে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্রকে মানিকের ভালো লেগেছিল দুটো কারণে—এক, "শরৎচন্দ্রের বই পড়ে মনে হতো তিনি অন্যায় আর গোঁড়ামিকে আঘাত করেছেন কিন্তু অন্য কোন লেখক সম্পর্কেই এরকম ভাবা সম্ভব হতো না। মনে হতো, তারা যেন অনুচিত জেনেও গায়ের জোরে সেটা উচিত বলে সমর্থন করেছেন।" এবং দুই, "শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে পতিতা ও

অসতীরা চরিত্র হয়েছে, বড় হয়ে উঠেছে তাদের মনুষ্যত্ব, অনুচিত প্রেমও হয়েছে প্রেম। তখনকার অন্য কোন লেখক এটা পারেননি।"

লেখক ও তাঁর সমস্যা : এই পটভূমিকায় মানিকের বাংলা সাহিত্যে হঠাৎ আবির্ভাব 'অতসী মাসী' গল্পনিয়ে। কিন্তু মানিক বিশ্বাস করেন হঠাৎ একটা গল্প লিখে কেউ লেখক হতে পারে না। কারণ "সাহিত্য সাধনার জিনিষ।...হাত মক্স করতে হয়—কঠিন সাধনায় জীবনপাত পরিশ্রমে মক্স করতে হয়। হাতে কলমে না লিখেও চিন্তা জগতে এলোমেলো ছাড়া ছাড়া ভাবে যেন লেখা মক্স করার কাজটাই চলে, চিন্তাকে খানিকটা সাহিত্যের টেকনিকে সাজাবার অভ্যাস জন্মে যায়।" কেবল হাত মক্স করলেই আবার লেখক হওয়া যায় না। লেখক হবার জন্য অনেক কাল আগের থেকেই প্রস্তুতি চলে। "প্রস্তুতির কাজটা অবশ্য লেখক সচেতনভাবে নাও করতে পারেন। কি ভাবে যে প্রক্রিয়াটা ঘটছে এ সম্পর্কে তার কোনও ধারণা পর্যন্ত না থাকতে পারে। জীবন যাপনের সমগ্র প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকায় লেখক হবার আগে এই প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার বিশেষ তাৎপর্য ধরতে না পারাই স্বাভাবিক।"

"সাহিত্য করার আগে কয়েকটা বিষয়ে সকল হবু লেখকের মিল থাকে। যেমন, সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ, জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও জবাব খোঁজার তাগিদ, সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনকে বাস্তব জীবনে খুঁজে নেবার চেষ্টা, নতুন অভিজ্ঞতাকে চিন্তা জগতে সাহিত্যের টেকনিকে ঢেলে সাজা, ইত্যাদি—এ সমস্তই সাহিত্য জীবনের জন্য প্রস্তুতির প্রক্রিয়াটা ঘটাবার কারণ স্বরূপ হয়। দশজনের চেয়ে সাহিত্যকে ঘনিষ্ঠতর গভীরতর ভাবে নেওয়ার ফলে চিন্তা ও ভাব জগতে সাহিত্যের প্রভাব সঞ্চিত হয়ে চলে। তার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটে নিজের বাস্তব জীবনের সংঘাত ও পরিবেশের প্রভাব, আয়ত্ত করা জ্ঞানের প্রভাব আর সংস্কারের প্রভাব। মোটামুটি এই ভাবেই গড়ে ওঠে সাহিত্যিকের চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গী।...

সাহিত্যিক হতে হলে বাস্তব জীবনের মতো সাহিত্যকেও অবলম্বন করতে হয়। সাহিত্য না ঘেঁটে, নিজের জানা জীবন সাহিত্যে কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে নিজে যাচাই করে না জেনে এবং প্রতিফলনের কায়দা কানুন আয়ত্ত না করে সাহিত্যিক হওয়া যায় না।"

অবশ্য কেবল জীবনকে জানলেই চলবে না। "সাহিত্য কি এবং কেন সে তত্ত্ব শেখাও যথেষ্ট নয়। যে জীবনকে ঘনিষ্ট ভাবে জেনেছি বুঝেছি সেই জীবনটাই সাহিত্যে কি ভাবে কতখানি রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে সেটাও সাহিত্যিককে স্পষ্ট

ভাবে জানতে ও বুঝতে হবে, নইলে নতুন সৃষ্টির প্রেরণাও জাগবে না, পথও মুক্ত হবে না।"

সমাজ জীবনকে উপলব্ধি করতে হবে গভীর ভাবে। তবেই তাকে দীনতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত করে "পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রামের প্রেরণা জাগবে—সাহিত্যের মাধ্যমে এ সংগ্রাম চালাতে হলে ওই সমাজ জীবনটির সাহিত্যে কি আছে আর কি নেই, কি এসেছে আর কি আসছে সেটাও উপলব্ধি করতেই হবে সাহিত্যিককে।" (সাহিত্য করার আগে)

সাহিত্যিক এত গভীর ভাবে জীবনকে উপলব্ধি করেন বলেই তিনি তার অংশ ভাগ অন্যকে দেওয়ার জন্য, উপলব্ধি করানোর জন্য লিখেন। "পাওয়ার জন্য অন্যে যত না ব্যাকুল, পাইয়ে দেওয়ার জন্য লেখকের ব্যাকুলতা তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি।" (কেন লিখি) মানিকও এই উপলব্ধি থেকে লিখতেন। সেজন্য তিনি লেখককে বলেছেন 'কলম-পেষা মজুর।' 'কলম-পেষা যদি তার কাজে না লাগে তবে রাস্তার ধারে বসে যে মজুর খোয়া ভাঙে তার চেয়েও জীবন তার ব্যর্থ, বেঁচে থাকা নিরর্থক।'

লেখক কেবল নিজের মানসিক অভিজ্ঞতারই রূপদান করেন না। 'পিতার মতো যিনি দেশের মানুষকে সন্তানের মতো জীবনাদর্শ বুঝিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করার ব্রত নিয়েছেন' তিনিই লেখক। "পিতার মতো, গুরুর মতো জীবনের নিয়ম অনিয়ম, বাঁচার নিয়ম অনিয়ম শেখান বলেই অল্পবয়সী লেখক-শিল্পীও জাতির কাছে পিতার মতো, গুরুর মতো সম্মান পান। দেশের মানুষের মন যোগাতে চেয়েছিল বলে কি আমাদের কিশোর কবি সুকান্তকে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা এত ভালোবাসে এত সম্মান করে? দেশের মানুষকে সন্তানের মতো দেখে কাব্যের মারফতে তাদের মানুষ করার ব্রত নিয়েছিল বলেই কিশোর কবিকে জাতি পিতার আসনে বসিয়েছে।

এটাই আসল কথা। দেশের লোকের সস্তা খাতিরকে লেখক-শিল্পী খাতির করেন না। দরকার হলে দেশের মানুষকে কান মলে শাসন করে অধিকার খাটাতে লেখক-শিল্পীর দ্বিধা বা ভয় হবার কথা নয়। তেতো ওষুধ খেতে পছন্দ করবে না বলে বাপ কি রুগ্ন শিশুকে ওষুধ খাওয়ানো থেকে বিরত থাকেন? নানাভাবে মন ভুলিয়ে ধমক দিয়ে শাসন করে ওষুধ খাওয়ান।" (সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ)

বলা প্রয়োজন, লেখক বলতে মানিক এখানে শুধু সৎ ও আদর্শনিষ্ঠ লেখকদেরই ধরছেন "পুরস্কার ও সুবিধার বিনিময়ে অর্থাৎ সোজাসুজি ঘুষ খেয়ে যারা নাম ও প্রতিভা, জনসাধারণের শোষকদের স্বার্থে স্বেচ্ছায় কাজে লাগান তাদের নয়।" (লেখকের সমস্যা)

লেখকদের থাকে নিজস্ব একটা জীবন দর্শন। "সব সময় সর্বত্র জীবনকে দর্শন

করার বিরামহীন শ্রমও তাকে চালাতে হয়।…যে সমাজে লেখকের এই শ্রমের মূল্য দেবার ব্যবস্থা নেই, সে সমাজে লেখাকে পেশা করার অর্থ শুধু কলম চালিয়ে লেখার শ্রমটুকু পণ্য করা। জীবিকার জন্য লেখার শ্রমটার উপর নির্ভর করলে স্বভাবতঃই এই শ্রমটাই প্রধান হয়ে উঠবে, সাধনার শ্রমটা গুরুত্ব হারাবে।

যত বড় প্রতিভা থাক, সাধনায় ঢিল পড়ার অর্থ ই লেখক ও লেখার অধঃপতন।" (ঐ)

লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলে বা টাকার জন্য লিখতে হলে লেখার মান নীচু হওয়াই স্বাভাবিক। "সাহিত্যকে পেশা করা মাত্র সাহিত্যিক তার সাহিত্য চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা অনেকখানিই হারিয়ে ফেলেন। যথেষ্ট সময় দিয়ে এবং অন্য হিসাব না করে এবং নিজের জীবন দর্শনের সত্যটিকে রূপায়িত করার স্বাধীনতা সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। কতটা সময় দিলে কতটা লিখলে পেট চলবে শুধু এই হিসাব নয়, যারা তাকে পেট চালাবার টাকা দেবে তারা তার বক্তব্য কি ভাবে নেবে এই ভাবনাও ভাবতে হয়।" (ঐ)

কারণ লেখক হলো "বুদ্ধিজীবী উৎপাদক। বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি সাহিত্য উৎপাদন করেন এবং নিজেই হোক বা অংশীদার প্রকাশকের সাহায্যেই হোক তাকে সম্পূর্ণ পণ্যের রূপ দিয়ে বাজারে ছাড়েন।" (ঐ) পাঠক ও পাঠিকারাই সেই পণ্য গ্রহণ করেন। এই পাঠক শ্রেণীও আবার নানা স্তরে বিভক্ত।

সেজন্য বাংলার পেশাদার সাহিত্যিকের সমস্যা চরম। "সাময়িকপত্রের দক্ষিণা সামান্য। টাকার জন্য তাই অনেকগুলি কাগজে তাকে লিখতে হবে। বই বিক্রি হয় কম—সুতরাং বেশি বইও তাকে লিখতে হবে।" (ঐ) সুতরাং লেখকের সমস্যা দুটো—এক, পাঁচ রকম পাঁচ মিশেলী পাঠক ও পত্রিকার জন্য লিখতে গিয়ে লেখকের স্বাধীন সৃষ্টি স্বাধীনতার খর্বতা এবং দুই, অর্থের জন্য বেশি বেশি লিখতে বাধ্য হওয়া। সেজন্য বাংলা দেশে শুধু লিখে সাহিত্যিকের জীবিকা জোটানো খুবই মুস্কিল। সেজন্য অনেক সাহিত্যিককে অন্যভাবে জীবিকার জন্য পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয়। তবে সকলের উর্ধ্বে মনে রাখতে হবে লেখকের নীতি ও আদর্শকে। "স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ যাকে সহজে কাবু করবে, নীতি ও আদর্শের প্রতি তার নিষ্ঠার কোন প্রশ্নই তো ওঠে না।"

লেখকের এই সমস্যা মানিকের ব্যক্তিগত জীবনেও প্রকট হয়ে উঠেছিল। জীবিকার জন্য তাঁকে বহু পত্রিকায় এবং বহু বই লিখতে হয়েছিল। সেজন্য সর্বত্র তাঁর সাধনায় সিদ্ধি সম্ভব ছিল না। তবে সর্বত্র জীবনকে দর্শন করার বিরামহীন

শ্রম তিনি আজীবন চালিয়ে গিয়েছেন। নীতি ও আদর্শের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ছিল বলেই স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁর কখনো লোভ হয় নি।

প্রতিভা সম্পর্কে : জীবন সংগ্রামকে দেখা ও তাকে রূপায়ণ করা ছিল মানিকের কাছে সাধনার বস্তু। এই সাধনাই হোল শক্তি। 'প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে।' প্রতিভা বলতে সাধারণের ধারণা 'ওটা এক ঈশ্বর-দত্ত রহস্যময় জিনিস।' কিন্তু এ কথাটির অর্থ সব সময় এক নয়। যেমন, 'বৈজ্ঞানিকের বেলা প্রতিভার অর্থ বিশেষ ক্ষমতা, কবির বেলা প্রতিভার অর্থ দুর্বোধ্য একটা গুণ।' লেখক কবিরা তাঁদের সম্বন্ধে সাধারণের এই ধারণাকে গ্রহণ করে নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করে দূরে দূরে সরিয়ে রাখতেন। নিজেদের করে তুলেছিলেন রহস্যময়। 'অসাধারণ অলোকসামান্য কথাবার্তা চালচলন ব্যবহারের মধ্যে খানিক খানিক আত্মপ্রকাশ করে' জনতার মধ্যে একটি মিথ্যা মোহ সৃষ্টি করেছিলেন।

সেই যুগ আজ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। শুরু হয়েছে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার যুগ। "কাব্য সাহিত্যের আসরে পর্যন্ত বিজ্ঞান এসে জুড়ে বসছে, ঠুনকো রঙীন কাঁচের মতো ভেঙে পড়ছে ঈশ্বরের দুর্গের দেয়াল থেকে কাব্যলক্ষ্মীর অন্দরমহলের দেয়াল, জীবন থেকে ঝেঁটিয়ে সাফ করা হচ্ছে ভ্রান্তির জঞ্জাল, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া আজ আর কলম ধরার উপায় নেই।" (প্রতিভা) পুরানো সংস্কার সব ভেঙে যাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে নতুন ভিৎ। জনতার সংস্কারের বাঁধ ভেঙ্গে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লেখক-কবিরও পুরানো সংস্কার ভেঙে ফেলতে হবে। প্রথম প্রথম তাকে আঁকড়ানো সম্ভব হলেও আজ আর তা সম্ভব নয়। রাজা মহারাজা মালিকের পক্ষেও দেশভক্ত সেজে জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে জনতাকে খুশি করা সম্ভব হয়েছিল। "আজ আর সে অবস্থা নেই। আজ লেখক-কবিকে নিজের সম্পর্কে নিজেরই পুরনো ধারণা ও বিশ্বাস ছেঁটে ফেলতেই হবে, নতুবা তাঁর ব্যবসা চলে না।" (ঐ)

সেজন্য প্রতিভা অলৌকিক কোন শক্তি নয়। প্রতিভা হোল 'দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা।' "মানুষের সমাজে নিজেদের আজ মানুষ বলেই ভাবতে হবে, প্রতিভাকে দেখতে হবে প্রতিভা বলেই। আজ তাই লেখক-কবির পক্ষেও দরকার হয়ে পড়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে নিজেকে আর নিজের প্রতিভাকে যাচাই করা—সত্য যেমনি হোক অভিমানে কাতর না হয়ে তা মেনে নিতে হবে। মাথা নীচু করে এই মূল সত্যটিকে মেনে নিতে হবে যে, কবিতা লেখাও কাজ, ছবি আঁকাও কাজ, গান করাও কাজ, চাকা ঘোরানোও কাজ, তাঁত চালানোও কাজ এবং কাজের

দক্ষতা শুধু কাজেরই দক্ষতা— মানুষ হয়ে জন্মে কারো সাধ্য নেই অমানুষিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে অতিমানব হয়ে যাবে।" (ঐ)

অতএব বৈজ্ঞানিক ও কবির প্রতিভার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। "পার্থক্য শুধু বিকাশ আর প্রকাশে।··· বৈজ্ঞানিকের কাজে মনের চর্চাটা বেশি, লেখক-কবির হৃদয়ের চর্চা। প্রতিভার যা মূল কথা, মনোনিবেশের শক্তি, সেটা কারো কম নয়।" আসলে 'মনের কতকগুলি বিশেষ ব্যাপারকেই হৃদয় বলা হয়, হৃদয় বলে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নেই।'

সেজন্য আজ লেখক কবি এবং বৈজ্ঞানিকদের কেবল ঘনিষ্ঠ নয়, একাকার হয়ে যেতে হবে। "মানুষ আজ দাবি করতে শুরু করেছে, আণবিক বোমা নয়, তোমার ওই পরমাণুর শক্তি আমার কি কাজে লাগে বাৎলিয়ে দাও।···নিছক বৈজ্ঞানিক হয়ে থাকা আর চলবে না বেশি দিন, লেখক-কবির মতো মানুষকে ভালবাসতে শিখতে হবে, গবেষণার খাতিরে গবেষণা চালাতে হবে। আর লেখক-কবিও টের পাচ্ছেন যে, নিছক হাসি-কান্নার আরক আর ভূমার মূলধনে প্রেম চলবেনা মানুষের সঙ্গে, বৈজ্ঞানিকের মতো মানুষের রোগ উপবাস লড়াই নিয়ে গবেষণা করা ছাড়া উপায় নেই।"

সেজন্য আজ চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। "জনসাধারণ সাধারণ আর আমি অসাধারণ, কারণ আমি লেখক, এ ধারণা নিয়ে ভালবাসতে গেলে মানুষ কাছে ঘেঁষতে দেবেনা, মানবপ্রেমে বুক ফেটে যাওয়া বেদনার সৃষ্টিও গ্রহণ করবেনা। তাই সাহিত্যে প্রগতি আনার খাতিরে, গণসাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রাণের ছটফটানি মেটানোর জন্য অগত্যাই আজ সবার আগে লেখক কবিকে এই চিন্তাটা স্বভাবে পরিণত করতে হবে—আমি দশজনের একজন।

বর্তমানে প্রতিভাও পরিণত হয়েছে জনসাধারণের সম্পত্তিতে। কারণ জনসাধারণ না থাকলে কারখানার উৎপাদনের যেমন মানে হয় না, প্রতিভার উৎপাদনও তেমনি অর্থহীন হয়ে যায়।" এই নতুন মূল্যবোধের আলোকেই লেখক কবিদের তাদের সংস্কার এবং অহঙ্কারবোধকে ছেঁটে ফেলতে হবে।

উপন্যাস প্রসঙ্গে : সাহিত্যে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন উপন্যাসের ক্ষেত্রে। 'সরাসরি বিজ্ঞানের কিছু শিক্ষা পাওয়া নয়, উপন্যাস লেখার জন্য দরকার খানিকটা বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ।' বিজ্ঞান শাস্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও এই বিচারবোধ আয়ত্ত করা সম্ভব। কারণ সমাজ ও জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাব। মানুষের চিন্তাজগতেও তার প্রভাব কম নয়।

সেজন্য প্রত্যক্ষ হউক বা পরোক্ষ হউক উপন্যাস লেখার জন্য বিজ্ঞান প্রভাবিত মন অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন।

"সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপন্যাস হলো সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অবদান। বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের একটা স্তর পর্যন্ত সাহিত্য ছিল উপন্যাস ছিলনা। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি সমাজ জীবন ও মানুষের চেতনায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটানোর ফলেই সাহিত্যে উপন্যাসের আঙ্গিক প্রয়োজনীয় এবং আদরণীয় হয়।"

কাব্য নাটকের সঙ্গে উপন্যাসের একটা মূলগত পার্থক্য আছে। "কাব্য ও নাটকের আঙ্গিকে ভাববাদ অবাধে আত্মপ্রকাশ করেছে। কার্য ও কারণকে রাখা গিয়েছে ভাববাদেরই স্তরে, মানে খোঁজা সম্ভব হয়েছে জীবন ও জগতের। অধ্যাত্ম-বাদকে টেনে আনা গিয়েছে যতখানি প্রয়োজন।" কিন্তু উপন্যাসের ভিত্তি বস্তুবাদ। বাস্তবতা এবং যুক্তিবাদ এ দুটো হোল উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার জন্য প্রয়োজন নতুন চেতনার। তাকে সম্ভব করলো বিজ্ঞান। "নিত্য নতুন আবিষ্কারে বিজ্ঞান বদলে দিয়ে চলে সমাজ ও জীবনকে, বদলে দিয়ে চলে মানুষের চেতনাকে। এই চেতনায় জাগে সাহিত্যের কাছে নতুন চাহিদা এবং এই চেতনায় প্রতিফলিত হয় নতুন আঙ্গিকে উপন্যাস রচনায়।...

লেখক যে ভাব আর ভাবনাই সাজিয়ে দিন উপন্যাসে, ভিত্‌টা তাঁকে গাঁথতেই হবে খাঁটি বাস্তবতার। যতই খাপছাড়া উদ্ভট হোক উপন্যাসের চরিত্র, মাটির পৃথিবীর মানুষ হয়ে তাকে খাপছাড়া উদ্ভট হতে হবে। যত অসম্ভব ঘটনাই ঘটুক উপন্যাসে, সম্ভাব্য ঘটনাকে আশ্রয় করেই তাকে কাল্পনিক অসম্ভবতার স্তরে উঠতে হবে। উপন্যাসেও কাব্য সৃষ্টি করা যায়, কল্পনা পার হয়ে যেতে পারে বাস্তবতার সীমা, গড়ে উঠতে পারে এমন এক মানস জগৎ যার অস্তিত্ব লেখকের মন ছাড়া কোথাও নেই; কিন্তু বাস্তব মানুষ বাস্তব জীবন বাস্তব পরিবেশ অবলম্বন করেই এ সব ঘটাতে হবে।" (উপন্যাসের ধারা)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীবুদ্ধদেব বসুও স্বীকার করেছেন, "বাংলা কথা সাহিত্যের বৃহত্তম ধারাটি আজ পর্যন্ত বাস্তববাদের পরিপোষক; ব্যতিক্রম একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু উষ্ণ ও ঘনিষ্ঠ বাস্তবতাই বৃহত্তম ধারাটির মহত্তম উপজীব্য। উপন্যাস বলতে বাঙালি পাঠক বোঝে তথ্যের সজীব ও হৃদয়গ্রাহী প্রতিচিত্রণ, যে-সব তথ্য স্বভাবী মানুষের সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার অন্তর্ভূর্ত এবং অধিকাংশ বাঙালী লেখকও তাই বোঝেন।

বলা যেতে পারে, এই স্থল থেকে সব ঔপন্যাসিকই যাত্রা ক'রে থাকেন। অর্থাৎ,

স্বভাবী বা স্বাভাবিকের বর্ণনায় যাঁর কিছু মাত্র দক্ষতা নেই তিনি কখনো ঔপন্যাসিক হবেন না, যদিও কবি হ'তে পাবেন।" (কবিতা, পৌষ, ১৩৬৩)

লেখকের চেতনা ও অভিজ্ঞতা অর্থাৎ জীবনদর্শন অনুসারে উপন্যাসের রকমভেদ হয়। আবার এই রকমভেদের জন্য আঙ্গিকভেদও হয়। মানিক নিজেই তাঁর গল্প-উপন্যাসের রচনারীতির কথা উল্লেখ করেছেন। গল্প উপন্যাস আলোচনার সময় আমরা যথাস্থানে তার উল্লেখ করেছি। মানিক উপন্যাসের প্রধান নায়ক ও নায়িকাদের প্রধান করে বজায় রেখেও সংশ্লিষ্ট আরও অনেক চরিত্র আমদানি করে তিনি উপন্যাসের শ্রেণীগত সামাজিক বাস্তবতা রূপায়িত করেছেন। তা ছাড়া উপন্যাসে কোন চরিত্র আনলে তার একটা গতি ও পরিণতির সম্পূর্ণতা দেওয়ার পুরানো রীতি তিনি 'পুতুল নাচের ইতিকথায়'ই ভঙ্গ করেছেন।

তাঁর মতে "জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশ বাছাই করে শিল্পকলা খাটিয়ে সাজিয়ে গেঁথে দেওয়াই গল্প উপন্যাস লেখার আঙ্গিকের মোট কথা।...সমাজের খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন অংশের জীবন-সত্যই হোক, আর সমাজের বৃহত্তর জীবন-সত্যই হোক, সে সত্য কতটুকু রূপায়িত হবে তা নির্ভর করবে জীবনের খণ্ডগুলি বেছে নেওয়ার উপর। এই বেছে নেওয়ার কাজটা ঠিকমতো না হলে হাজার শিল্পকৌশল প্রয়োগ করেও লেখক সত্যকে রূপ দিতে পারবেন না।" আর সেই কাজ হবে লেখকের জীবনদর্শন বা অভিজ্ঞতা ও চেতনা অনুসারে। "জীবনসত্যকে রূপায়িত করার জন্য তাই প্রধান কথা হলো লেখকের ওই জীবন-সত্যটা ধরতে পারা। শুধু বুদ্ধি দিয়ে জানা নয় যে, সমাজ-জীবনে ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্গঠনের কাজও চলছে—ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়াটা কি ভাবে ঘটছে কেন ঘটছে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানা, চেতনায় উপলব্ধি করা।"[৭] (সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ)

মার্কসবাদ ও সাহিত্য-সমালোচনা : লেখকের এই জীবনদর্শন পরিচালিত হয় প্রধানত তাঁর মতাদর্শের দ্বারা। লেখক কোন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোন মতাদর্শের দ্বারা জীবনকে পর্যবেক্ষণ করছেন তার উপর ভিত্তি করেই জীবনের খণ্ডাংশগুলো চয়িত হয়। জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটলে তার সৃষ্টিরও রূপান্তর ঘটবে। মানিকের জীবনেও তা ঘটেছে। মধ্যবিত্ত জীবনের বিকৃতি এবং চাষী জেলের জীবনের সহজ স্বাভাবিকতা তিনি প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেন। ক্রমে তিনি এই নিম্নের শ্রেণীর মানুষের প্রতি পক্ষপাতও দেখাতে থাকেন। এই পক্ষপাতিত্বের ফলেই তিনি ধীরে ধীরে মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তিনি স্বীকার করেন, "মার্কসবাদই...মানবতাকে প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক

পথ বাতলাতে পারে, অতীত কি ছিল, বর্তমান কি হয়েছে এবং কি ভাবে কোন্ ভবিষ্যৎ আসবে জানিয়ে দিতে পারে।" (সাহিত্য করার আগে) মার্কসবাদের সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ ছিলেন বলেই তাঁর প্রথমদিকের সাহিত্যে সদিচ্ছা এবং নিষ্ঠা সত্ত্বেও তাঁর লেখায় 'অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি রয়ে গিয়েছে।' মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি বুঝতে পেরেছেন, উত্তর তিরিশের সমাজ জীবনে ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাতই প্রকট হয়ে উঠেছিল এবং কল্লোল, কালি কলমীয় বিদ্রোহী সাহিত্যে তাই প্রতিফলিত হয়েছে।

মার্কসবাদের মতে সমাজ জীবন শ্রেণী বিভক্ত—শোষক আর শোষিতে। তাই মানব সমাজের ইতিহাস হোল এই শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। মার্কসবাদীর কাছে এই শ্রেণীগত চেতনাই প্রধান। সাহিত্য সমালোচনার সময়ও মার্কসবাদী লক্ষ্য রাখেন, 'লেখক কোন শ্রেণীর দৃষ্টিতে চাষী শ্রেণীর জীবনকে দেখছেন।' লেখককে বাদ দিয়ে তারা লেখার বিচার করতে পারেন না। মানিকও বলেন, সমাজে আজ দুটো দল হয়ে গিয়েছে—"ব্যক্তিগতদের ব্যক্তিপ্রীতির দল এবং জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতি প্রীতির দল। দ্বিতীয় দলে গত না হলে প্রগতি হয় না।" (পাঠকগোষ্ঠীর আলোচনা)

সমাজে যেমন দুটো দল সাহিত্যেও তেমনি দুটো মতবাদ। দ্বিতীয় মতবাদকেই বলা হয় প্রগতিশীল। 'বর্তমান সমাজ এমন একটা যুগ পরিবর্তনের আবর্ত সংকুল সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে যে, তার আভ্যন্তরীণ শ্রেণীদ্বন্দ্ব একটা চরম রূপ নিয়ে উপস্থিত। শোষিত শ্রেণীসমূহ একটা শ্বাসরোধকারী সামাজিক অবস্থানের থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রতিনিয়ত প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত।' "বস্তুবাদী প্রগতিশীল লেখক বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন না। বস্তুবাদী লেখক বাস্তবতার রিপোর্টার নন, তিনি শিল্পী—তিনিও কল্পনার রঙে-রসেই তাঁর কাহিনী রূপায়িত করবেন, কিন্তু মিথ্যার সঙ্গে তাঁর কল্পনার কারবার থাকবে না।" সেজন্য তিনি বাস্তব জীবনের গতি প্রকৃতি ভালো করে লক্ষ্য করবেন যাতে তার লেখা বাস্তবতাকে অতিক্রম করে ফাঁকা আদর্শবাদিতার মিথ্যায় পরিণত না হয়, জীবন-বিরোধী না হয়ে উঠে। অনেক সময় জীবনবিরোধী মিথ্যা আদর্শবাদিতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রগতিশীল লেখক প্রচার ধর্মী হয়ে ওঠেন। এর দ্বারা বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবই সূচিত হয়। তবু মানিক বলেন, "মিথ্যাকে তুলে ধরার চেয়ে সাহিত্যে প্রচার ধর্মী হওয়া ঢের ভালো—সমাজ ও

সাহিত্যের রূপান্তর গ্রহণের বিশেষ স্তরে প্রচার ধর্মী হওয়াটাই তাই সাহিত্যের প্রগতির লক্ষণ এবং আশার কথা হয়ে দাঁড়ায়।" (সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ)

"প্রগতিশীল সমালোচনা, কাঁচা সমালোচনা পর্যন্ত, আজ তাই প্রথমেই খোঁজ করে স্বষ্ট সাহিত্য জীবনের এই সর্বাধিক সত্য, বাস্তবতার এই প্রধান সর্ত, সংগ্রামকে স্বীকার করেছে কি না।" (পাঠকগোষ্ঠীর আলোচনা) এই সংগ্রাম বলতে কেবল সম্মুখ যুদ্ধের লাঠালাঠি বোঝায় না, বোঝায় না চাষী কেবল লাঠি নিয়ে তার জমির জন্য লড়ছে, মরছে। "জীবনে ও চেতনায় ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে আছে বলেই সংগ্রাম সত্য। চাষী শুধু তেভাগা করে না আজ, সে নিজেই ভাবে আর বলে, আগের মতো বৌকে মারধোর করা চলবে না। মন্দির মসজিদ পুরুত মোল্লার কাছে আজও সে মাথা নোয়ায়, কিন্তু তেমন আর অভিভূত হয় না। কবিয়ালের মুখে রামায়ণের যুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্রের গানের বদলে আজকের মানুষের মুক্তি-লড়ায়ের গানে তার রোমাঞ্চ হয় বেশি। তার প্রেম, বাৎসল্য, ঘৃণা লজ্জা ভয় ক্রোধ আজ মাটির নরম সহিষ্ণুতায় গড়া নয়, তাতে কাস্তের কাঠিন্য ও ধার আছে।" (ঐ)

এ সংগ্রামকে সাহিত্যে রূপদান করা, 'বাংলার চাষী গরীবদের জীবন সাহিত্যগত করার দায়িত্ব সোজা নয়।' অত্যন্ত কঠিন কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রগতিশীল লেখকরা সেই অসাধ্য সাধনের ব্রত নিয়েছেন। তার জন্য "সাহিত্য পাঠের সহক্ষমতা শুধু নয়, মিলেমিশে নিজেদের চেতনা পুনর্গঠনের আত্মকেন্দ্রিতা, ভ্রান্তি সংস্কার ও সংকীর্ণতা অপনোদনের এবং আরোও অনেক কিছুর জন্য কি বিরামহীন অনলস সংঘবদ্ধ সাধনা চলছে।" কিন্তু বেনোজলের সঙ্গে আবর্জনাও ঢুকে পড়ে। শোষিত মানুষ যখন আজ চারিদিকে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, যখন তাদের কথা বর্ত্তমানে সর্বত্র সোচ্চার হয়ে উঠেছে তখন তাদের নিয়ে গল্প উপন্যাস লেখাও ফ্যাসানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সেই সব গল্প উপন্যাসে তাদের জীবনের প্রধান সত্যই ঢাকা পড়ে যায়, মুখ্য হয় মধ্যবিত্তের রোমান্টিক ভাববিলাস।

সেজন্য মানিক লিখেছেন, "প্রগতির প্রচেষ্টাতে খুশি হওয়া বরং ভালো, প্রচেষ্টার অভাবকে বরণ করার প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মচ্যুতির চেয়ে। চাষা ভুষো নিয়ে গল্প লিখবো বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য, যারা দেহরক্ষার ব্যাপার অনেকটা সহজ করে মন নিয়ে কারবার করার অবসর পায়, এবং ওই অবসর-সোহাগী মনের খাতিরে একেবারে চেপে যাব চাষা ভুষো পুরুষটা ও নারীটার অবসরহীন অকথ্য কঠোর দেহরক্ষার সংগ্রাম, অথচ রসসৃষ্টি করবো, একমাত্র ওই দুটি ভুখা দেহের যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে— সাহিত্য সৃষ্টির এ ফাঁকি আজ অচল না হয়ে গেলেও ধরা পড়ে গিয়েছে। চাষীমজুরদের

দেহ নিয়ে সাহিত্যের হাটে এ ব্যবসা চালানোর সহজ সরল মানেই হলো, পশু পাখীর প্রেমলীলা দর্শনে যে মনের বিকার তৃপ্ত হয়, সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে সেই মনের বিকারকেই তৃপ্তি দান। 'মুচি বায়েন' সত্যিই তাই অশ্লীল।" (ঐ) কারণ "দেহ তো আর অশ্লীল নয়, দেহের চেতনাও নয়—ঐ চেতনার বিকৃতিই শুধু অশ্লীলতা।"

অতএব সমাজ-জীবনের বাস্তবতার দিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী সম্পর্কের বর্তমান রূপ ও ঐতিহাসিক গতি-প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্যে সেই জীবনসত্য কিভাবে কতটুকু রূপায়িত হচ্ছে তার বিচার করা প্রয়োজন। "সেই জন্যই আজ লেখকের প্রয়োজন জীবনের ঐতিহাসিক গতি-প্রকৃতির মূল নিয়ম জানার সঙ্গে বাস্তব জীবনকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানা এবং তার গতি-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করা।" (সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ)

প্রগতি লেখক আন্দোলনের ত্রুটিঃ প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীরা সাহিত্যের এই নতুন চিন্তাধারাকেই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। সেজন্য বাংলা দেশে স্থাপিত হয়েছিল প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এর সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত। কখনো সভাপতি, কখনো সম্পাদক রূপে। স্বভাবতই এই চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্বও ছিল অনেকখানি তাঁর। মানিক তাঁর অজস্র গল্প উপন্যাস কবিতায় তাকে রূপদানও করেছেন সার্থকভাবে। বাংলা সাহিত্যে সমাজসচেতন এবং শ্রেণীসচেতন সাহিত্যিক হিসেবে তিনিই শ্রেষ্ঠ। এ কাজে তাঁর সততা এবং নিষ্ঠা ছিল প্রশ্নাতীত। সেজন্য তিনি উপলব্ধি করলেন সংঘবদ্ধ ভাবে একাজ যতটা অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। সেই ত্রুটিগুলোই তিনি ১৯৪৯ সালে তাঁর সম্পাদকীয় রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বর্তমান জগতের বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের দ্বিধা সংশয়হীন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। আদর্শগত দ্বিধাসংশয় দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল শক্তির বিরাট অভ্যুত্থান সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আমরা প্রগতির ক্রমবিকাশের পক্ষে এগিয়ে এনেছি সত্য, কিন্তু এগিয়েছি আমরা দ্বিধাগ্রস্তভাবে, বাস্তবতার দ্রুত রূপান্তরের অনেকখানি পিছনে।" (প্রগতি সাহিত্য)

মার্কসবাদের বিজ্ঞান সম্মত বিচারের ভিত্তিতে প্রগতি আন্দোলনের নির্ভুল ও সর্বাঙ্গীন আদর্শ স্থির করার জন্য ব্যাপক অভিযানের সৃষ্টি হয়। "আর্ট ও সমাজ সম্পর্কে সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার এই অভিযানের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এক নিষ্ঠুর সত্য—বিদেশী শাসক কত যত্ন আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে তার পদানত

দেশের মানুষগুলির চিন্তাজগতে, পুরনো মৃত যুগের কত বিভ্রান্তির জঞ্জালকে, কত অন্ধ সংস্কারকে জীইয়ে রাখে।" সেই সংস্কার ও বিশ্বাসকে উপড়ে ফেলতে হবে। এদিকে তাদের লক্ষ্য থাকলেও 'দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার যে দ্রুত রূপান্তর ঘটছিল, প্রতি পদক্ষেপে সেই বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে না দিলে আদর্শগত বিভ্রান্তি বা মোহ থেকে যে মুক্ত হওয়া যায় না'—এই সহজ সত্যের উপলব্ধিতেই তখন ভুল হয়েছিল। 'শ্রেণী সংগ্রাম, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা এবং সোভিয়েটের নেতৃত্বে জগতে ধনতন্ত্রের অবসান ও নূতন সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, এদেশে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার শিবিরে যোগদান' সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ সব সত্য বাস্তব অভিব্যক্তি লাভ করতে পারে নি। "সমস্ত জগৎ দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যে তার প্রতিফলন ঘটবে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার একই রূপ আপোষহীন সংঘাতের মধ্যে, প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে চেপে মারার বহুরূপী প্রত্যক্ষ এ প্রচ্ছন্ন অভিযান প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকবে—এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন হতে পারি নি।

আমরা তাই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পুরনো ধারার জের টেনে এসেছি। শ্রমিক ও বিপ্লবী জনসাধারণের নূতন সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে এগোতে এগোতেও বজায় রাখতে চেয়েছি বুর্জোয়া জগতের সঙ্গে ভাবগত আত্মীয়তা। আমরা যে সচেতনভাবে, সক্রিয়ভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবী জনসাধারণের পক্ষে, সোভিয়েটের পক্ষে,—দৃঢ় কণ্ঠে একথা ঘোষণা করতে আমরা ইতস্তত করেছি।" ফলে সংঘের কাজকর্ম অগ্রসর হয়েছে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে। তার চরম প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৪৭-এর পনেরোই আগষ্ট ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট হলে। সেখানে সর্বদলীয় শিল্পী সাহিত্যিকদের ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হোল। "শ্রেণী স্বার্থে বিভক্ত জগতে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবাস্তব ও অসম্ভব সর্বদলীয় ঐক্যের প্রতি মোহের পরিচয় সংঘ দিয়েছিল।" এর কারণ হোল প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েও তারা 'বুর্জোয়া ভাবধারার মোহ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে' পারেন নি। প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলনের বেগেও দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। "বর্তমান যুগে শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের বিপ্লবী চেতনা যখন যতদূর অগ্রসর হয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধারার ততখানি শক্তিশালী হবার সম্ভাবনাও সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়ে যায়। বাংলার শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নূতন সংস্কৃতির দুর্বার জোয়ার আনার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে আছে বহুমুখী বিক্ষিপ্ত প্রগতিশীল ধারাগুলির মধ্যে। আমরাই গাফিলতি করে এতদিন ধারাগুলিকে একত্র করে জোয়ার সৃষ্টি করতে পারি নি।"

আত্ম-সমালোচনা মানুষকে দুর্বল করে না। ত্রুটিমুক্ত হয়ে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার প্রেরণা জাগায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিয়ে নতুন প্রেরণা লাভ করলেন। তিনি জনসাধারণের বিপ্লবী চেতনাকে রূপদানে তৎপর ছিলেন। তবু তিনি কামনা করতেন, "প্রশ্ন উঠুক, সমালোচনা হোক, দশজনে আমার বিচার বিবেচনার ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিন। সাহিত্যিকের পক্ষে সেটা পরম সৌভাগ্যের কথা।" (নিজের কথা) কারণ তিনি জানতেন আলোচনা ও সমালোচনার দ্বারা "সাহিত্য ও সমাজপ্রীতির আদর্শ যত জোরালো হবে পথ ততই প্রশস্ত ও দীর্ঘ হবে।" (নতুন জীবন)

পরিশিষ্ট-'ক'

মানিক-জীবনের ঘটনাপঞ্জী

১৯০৮—১৯শে মে সাঁওতাল পরগণার ডুমকা শহরে মানিকের জন্ম হয়। বাংলা ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫। পৈত্রিক নিবাস মালবদিয়া, বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তখন ডুমকার এ্যাসিস্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট অফিসার ছিলেন। মাতার নাম নীরদাসুন্দরী দেবী।

১৯২২—মানিকের মাতৃবিয়োগ ঘটে। মানিক তখন সপ্তম/অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র।

১৯২৬—মেদিনীপুর থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন।

১৯২৮—বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ন মিশন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই-এস-সি পাশ করেন। অঙ্কে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এস-সি ক্লাসে ভর্তি হন। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে প্রথম গল্প লিখলেন 'অতসীমাসী'। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ) প্রকাশিত।

১৯৩৫—প্রথম গ্রন্থ 'জননী' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। একই বছরে প্রকাশিত হয় 'অতসীমাসী ও অন্যান্য গল্প' এবং 'দিবারাত্রির কাব্য'।

১৯৩৬—'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং 'জীবনের জটিলতা' প্রকাশিত হয়। প্রথম মৃগীরোগ দেখা দেয়।

১৯৩৭—'প্রাগৈতিহাসিক' প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহ সম্পাদকের পদে নিযুক্ত।

১৯৩৮—'অমৃতস্য পুত্রাঃ' এবং 'মিহি ও মোটা কাহিনী' প্রকাশিত হয়। ময়মনসিংহের গভর্ণমেণ্ট গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ৺সুরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা কমলা দেবীর সহিত বিবাহ।

১৯৩৯—বঙ্গশ্রীর চাকুরী ত্যাগ। 'সরীসৃপ' প্রকাশিত। ছোট ভাই সুবোধ কুমারের সঙ্গে 'উদয়াচল প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউস' নামে একটি ছাপাখানা ও প্রকাশন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। '১৩৪৫-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলনে প্রথম কবিতা 'উত্তর দক্ষিণ' প্রকাশিত হয়।

১৯৪০—'সহরতলী' (১ম পর্ব) প্রকাশিত।

১৯৪১—'অহিংসা', বৌ', এবং 'ধরাবাঁধা জীবন' প্রকাশিত হয়।

১৯৪৩—'সমুদ্রের স্বাদ' এবং 'প্রতিবিম্ব' প্রকাশিত হয়। ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টের চাকুরী ত্যাগ।

১৯৪৪—ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান। আমৃত্যু তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। 'পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে' সভাপতি।

১৯৪৫—'দর্পণ', 'হলুদপোড়া' প্রকাশিত হয়। 'দর্পণ' উপন্যাসে মানিকের বিশেষ মতবাদের প্রথম প্রকাশ।

১৯৪৬—'সহরবাসের ইতিকথা', 'আজ কাল পরশুর গল্প', 'ভিটেমাটি', 'চিন্তামণি' এবং 'পরিস্থিতি' প্রকাশিত হয়।

১৯৪৭—রসিদ আলি দিবসের স্মৃতি নিয়ে লেখা 'চিহ্ন' উপন্যাস এবং 'খতিয়ান', 'আদায়ের ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। বোম্বেতে অনুষ্ঠিত 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান।

১৯৪৮—'মাটির মাশুল', 'ছোট বড়', 'চতুষ্কোণ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯৪৯—কলেজ স্কোয়ারে ছাত্রদের উপর পুলিশের নির্মম গুলিবর্ষণ এবং অত্যাচারের প্রতিবাদে লিখলেন, 'মানবতার বিচার' শীর্ষক নিবন্ধ। কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার অপরাধে বহু প্রকাশকের দরজা তাঁর কাছে রুদ্ধ হয়ে যায়। 'তেভাগা আন্দোলনের' পরিপ্রেক্ষিতে লিখলেন 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'।

১৯৫০—'জীয়ন্ত', 'শ্রেষ্ঠগল্প', মানিক গ্রন্থাবলী প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়।

১৯৫১—'পেশা', 'স্বাধীনতার স্বাদ', 'সোনার চেয়ে দামী', 'ছন্দপতন' প্রকাশিত হয়।

১৯৫২—'সোনার চেয়ে দামী (২য় পর্ব)', 'ইতিকথার পরের কথা', 'পাশাপাশি-, 'সার্বজনীন' এবং মানিক গ্রন্থাবলী ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়। মানিকের দারিদ্র্য তখন চরম অবস্থায়। অক্টোবরে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

১৯৫৩—চিহ্ন উপন্যাসের চেক অনুবাদের চুক্তি সম্পাদিত। চেকোশ্লাভাক সাংস্কৃতিক উৎসবে মানিকের অবদানের জন্য চেক দূতাবাসের ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

৫ই মার্চ জোসেফ স্তালিনের দেহাবসান। ৪ঠা এপ্রিল প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ আয়োজিত স্তালিন শোকসভায় সভাপতি। প্রগতি লেখক সম্মেলনের সভাপতি। জুলাই মাসে এক পয়সা ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধিতে দারুণ বিক্ষোভ। 'ছড়া' প্রকাশ। 'আরোগ্য', 'তেইশ বছর আগে পরে', 'নাগপাশ' 'ফেরিওয়ালা' প্রকাশিত হয়।

১৯৫৪—'লাজুকতা', 'হরফ' এবং 'শুভাশুভ প্রকাশিত হয়।

১৯৫৫—অসুস্থতা বৃদ্ধি। প্রথমে ইসলামিয়া হাসপাতালে এবং পরে লুম্বিনী পার্কে চিকিৎসা। 'পরাধীন প্রেম' প্রকাশিত হয়।

১৯৫৬—'হলুদ নদী সবুজ বন', 'মাশুল' এবং 'স্বনির্বাচিত গল্প' প্রকাশিত হয়।

৩০শে নভেম্বর সকালে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন। ২রা ডিসেম্বর রাত দশটায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে স্থানান্তরিত। ৩রা ডিসেম্বর ভোর চারটেয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।

পরিশিষ্ট খ

মানিকের মোট গল্প সংখ্যা

১। **অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প ঃ** আগষ্ট ১৯৩৫—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

অতসীমামী, নেকী, বৃহত্তর-মহত্তর, শিপ্রার অপমৃত্যু, সর্পিল, পোড়াকপালী, আগন্তুক, মাটির সাকী, মহাসঙ্গম, আত্মহত্যার অধিকার। মোট ১০টি গল্প।

২। **প্রাগৈতিহাসিক ঃ** এপ্রিল ১৯৩৭—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

প্রাগৈতিহাসিক, চোর, মাটির সাকী, যাত্রা, প্রকৃতি, ফাঁসি, ভূমিকম্প, অন্ধ, চাকরী ও মাথার রহস্য। অতসীমামীতে পূর্বপ্রকাশিত 'মাটির সাকী' কে বাদ দিয়ে মোট ৯টি গল্প

৩। **মিহি ও মোটা কাহিনী ঃ** সেপ্টেম্বর ১৯৩৮—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

টিকটিকি, বিপত্নীক, ছায়া, হাত, বিড়ম্বনা, রকমারি, কবি ও ভাস্করের লড়াই, আশ্রয়, শৈলজশিলা, খুকী, অবগুণ্ঠিত এবং সিঁড়ি। মোট ১২টি গল্প

৪। **সরীসৃপ ঃ** আগষ্ট ১৯৩৯—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

মহাজন, বন্যা, মমতাদি, মহাকালের জটার জট, গুপ্তধন, প্যাক, বিষাক্ত প্রেম, দিক পরিবর্তন, নদীর বিদ্রোহ, মহাবীর ও অবলার কথা, দুটি ছোট্ট গল্প, সরীসৃপ। ('দুটি ছোট্ট গল্প'কে একটি গল্প ধরা হয়েছে।) মোট ১২টি গল্প

৫। **বৌ ঃ** ১৯৪৩—উদয়াচল পাবলিশিং হাউস।

দোকানীর বৌ, কেরাণীর বৌ, সাহিত্যিকের বৌ, বিপত্নীকের বৌ, তেজী বৌ,

কুষ্ঠরোগীর বৌ, পূজারীর বৌ, রাজার বৌ, উদারচরিতানামের বৌ, প্রৌঢ়ের বৌ, সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ, অন্ধের বৌ, জুয়াড়ীর বৌ।

মোট ১৩টি গল্প

৬। **সমুদ্রের স্বাদ ঃ** ১৯৪৩—বেঙ্গল পাবলিশার্স

সমুদ্রের স্বাদ, ভিক্ষুক, পূজা কমিটি, আপিম, গুণ্ডা, কাজল, আততায়ী, বিবেক, ট্র্যাজেডির পর, মালী, সাধু, একটি খোয়া, মানুষ হাসে কেন।

মোট ১৩টি গল্প

৭। **ভেজাল ঃ** ১৯৪৪—সিগনেট প্রেস

ভয়ঙ্কর, রোমান্স, ধনজন গৌরব, মুখে ভাত, মেয়ে, দিশেহারা হরিণি, মৃতজনে দেহ প্রাণ, যে বাঁচায়, বিলাসসন, বাস, স্বামী স্ত্রী। মোট ১১টি গল্প

৮। **হলুদপোড়া ঃ** ১৯৪৫—কমলা পাবলিশিং হাউস

হলুদপোড়া, বোমা, তোমরা সবাই ভালো, চুরি চুরি খেলা, ধাক্কা, ওমিল নাইন, জন্মের ইতিহাস, ফাঁদ, ভাঙাঘর, 'অন্ধ ও ধাঁধা'। মোট ১০টি গল্প

৯। **আজ কাল পরশুর গল্প ঃ** এপ্রিল-মে ১৯৪৬—সংকেত-ভবন

আজ কাল পরশুর গল্প, দুঃশাসনীয়, নমুনা, বুড়ী, গোপাল শাসমল, মঙ্গলা, নেশা, বেড়া, তারপর, স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই, শত্রুমিত্র, রাঘব মালাকার, যাকে ঘুষ দিতে হয়, কৃপাময় সামন্ত, নেড়ী, সামঞ্জস্য। মোট ১৬টি গল্প

১০। **পরিস্থিতি ঃ** অক্টোবর ১৯৪৬—অগ্রণী বুক ক্লাব

প্যানিক, সাড়ে সাত সের চাল, প্রাণ, রাসের মেলা, মাসি-পিসি, অমানুষিক পেটব্যথা, শিল্পী, কংক্রীট, রিক্সাওয়ালা, প্রাণের গুদাম, ছেঁড়া।

মোট ১২টি গল্প

১১। **খতিয়ান ঃ** ১৯৪৭—ভারতী-ভবন

খতিয়ান, ছাঁটাই রহস্য, চক্রান্ত, কানাই তাঁতি, ভণ্ডামি, চোরাই, চালক, টিচার, ছিনিয়ে খায় নি কেন, একান্নবর্তী। মোট ১০টি গল্প

১২। **ছোটবড় ঃ** ১৯৪৮—পূরবী পাবলিশার্স লিমিটেড

ভালবাসা, তথাকথিত, চালক, ছেলেমানুষি, স্থানে ও স্থানে, স্টেশন রোড, পেরাণটা, দীঘি, হারাণের নাতজামাই, ধান, সাথী, গায়েন, নব আলপনা, ব্রিজ, (খতিয়ান গ্রন্থে পূর্বে প্রকাশিত 'চালক' বাদে) মোট ১৩টি গল্প

১৩। **মাটির মাশুল :** ১৯৪৮—বিমলারঞ্জন প্রকাশন

মাটির মাশুল, বক্তা, ঘর ও ঘরামি, পারিবারিক, ট্রামে, ধর্ম, দেবতা, নব-আলপনা, ব্রিজ, ভয়ঙ্কর, আপদ, পথান্তর, সিদ্ধপুরুষ, হ্যাংলা, বাগদীপাড়া দিয়ে। ('ভেজাল' গ্রন্থে 'ভয়ঙ্কর' এবং ছোটবড় গ্রন্থে 'নব-আলপনা' এবং 'ব্রিজ' বাদে) মোট ১২টি গল্প

১৪। **ছোট বকুলপুরের যাত্রী :** ১৯৪৯—ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিঃ

ছোট বকুলপুরের যাত্রী, বাগদীপাড়া দিয়ে, মেজাজ, প্রাণাধিক, ঘর করলাম বাহির, সখী, নীচু চোখে দু আনা দু পয়সা, নীচু চোখে মেয়েলি সমস্যা। (মাটির মাশুল গ্রন্থে পূর্বে প্রকাশিত 'বাগদীপাড়া দিয়ে' বাদে) মোট ৭টি গল্প

১৫। **ফেরিওয়ালা :** মে ১৯৫৩—ক্যালকাটা পাবলিশার্স

ফেরিওয়ালা, সখি, সংঘাত, সতী, লেভেল ক্রসিং, খাত, ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই, চুরি চামারি, দাম্বিক, মহাবর্কটবটিকা, আর না কান্না, মরব না সস্তায়, এক বাড়ীতে। (ছোট বকুলপুরের যাত্রী গ্রন্থের 'সখী' বাদে) মোট ১২টি গল্প

১৬। **লাজুকলতা :** জানুয়ারি ১৯৫৪—রীডার্স কর্ণার

লাজুকলতা, উপদলীয়, এদিক ওদিক, এপিঠ ওপিঠ, পাশ ফেল, কলহান্তরিত, গুণ্ডা, বাহিরে ঘরে, চিকিৎসা, মীমাংসা, সুবালা, অসহযোগী, আপদ, স্বাধীনতা, নিরুদ্দেশ, পাষণ্ড। মোট ১৬টি গল্প

(শেষাংশের কিছু ভিন্নতাসহ 'আপদ' 'মাটির মাশুল' গ্রন্থে প্রকাশিত। বর্তমান গ্রন্থের 'গুণ্ডা' এবং সমুদ্রের স্বাদ গ্রন্থের গুণ্ডা স্বতন্ত্র)

১৭। **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প :** ১৯৫০—বেঙ্গল পাবলিশার্স।

প্রথম সংস্করণে নতুন গল্প 'বিচার' এবং নতুন সম্পাদিত সংস্করণে নতুন গল্প 'কে বাঁচায় কে বাঁচে'। 'কে বাঁচায় কে বাঁচে' শ্রীপরিমল গোস্বামীর সম্পাদনায় 'মহামন্বন্তর' (মার্চ ১৯৪৪) গল্প সকলনে প্রথম প্রকাশিত হয়। মোট ২টি গল্প

১৮। **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প :** জুন ১৯৫৬—ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

নতুন গল্প—'প্রাক শারদীয়া কাহিনী' এবং 'রক্ত নোনৃতা'। মোট ২টি গল্প

১৯। **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ :** ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

নতুন গল্প : বড় দিন, শান্তিলতার কথা, সশস্ত্র প্রহরী, মাছের ল্যাজ ও মাংসের খাঁজ, সবার আগে চাই, হাসপ্রাতালে, জল মাটি দুধ ভাত, খাটাল,

দুর্ঘটনা, গলায় দড়ির কেন, কালো বাজারের প্রেমের দর, মানুষ হতবাক নয়, ঢেউ। মোট ১৩টি গল্প

২০। **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ :** ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

নতুন গল্প : একটি বকাটে ছেলের কাহিনী, উপায় এবং কোনদিকে।

মোট ৩টি গল্প

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত যে গল্পের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে :

(১) গেঁয়ো (২) রত্নাকর (৩) শিল্পী (৪) ঘাসে কত পুষ্টি (৫) ষ্টুডিও (৬) ভোঁতা (৭) বিষ (৮) কলমে হরফে (৯) সমানুভূতি (১০) অগ্নিশুদ্ধি (১১) মতিগতি (১২) দিনের পর দিন (১৩) তারপর (১৪) মায়া নয় দায় (১৫) ঘটক। মোট ২২২টি গল্প

পরিশিষ্ট 'গ'

উপন্যাস থেকে মানিক যে গল্প নিয়েছেন

(যথাক্রমে গল্প, গল্প সংগ্রহ এবং উপন্যাসের নাম দেওয়া হোল। ১৮ সংখ্যা থেকে কেবল গল্প এবং উপন্যাসের উল্লেখ আছে।)

১। বিলাসমন। ভেজাল। হলুদ নদী সবুজ বন। (গল্পটি পূর্বে রচিত)

২। মাটির মাশুল। মাটির মাশুল। ইতিকথার পরের কথা (গল্পটি পূর্বে রচিত)

৩। লেভেল ক্রসিং। ফেরিওলা। আরোগ্য।

৪। বাহিরে ঘরে। লাজুকলতা। সার্বজনীন।

৫। চিকিৎসা। লাজুকলতা। আরোগ্য।

৬। মীমাংসা। লাজলকতা। পাশাপাশি।

৭। পাষণ্ড। লাজুকলতা। সার্বজনীন।

৮। বড়দিন। গল্প সংগ্রহ। হলুদ নদী সবুজ বন।

৯। শান্তিলতার কথা। গল্প সংগ্রহ। শান্তিলতা। (গল্পটি পূর্বে লিখিত)

১০। সশস্ত্র প্রহরী। গল্প সংগ্রহ। হলুদ নদী সবুজ বন।

১১। প্রাক শারদীয় কাহিনী। স্বনির্বাচিত গল্প। হলুদ নদী সবুজ বন।

১২। হাসপাতালে। গল্প সংগ্রহ। প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান।
১৩। দুর্ঘটনা। গল্প সংগ্রহ। শাস্তিলতা।
১৪। মানুষ হতবাক নয়। গল্প সংগ্রহ। মাশুল।
১৫। বিচার। শ্রেষ্ঠ গল্প। শাস্তিলতা। (গল্পটি পূর্বে রচিত)
১৬। একটি বখাটে ছেলের কাহিনী। গল্প সংগ্রহ। শুভাশুভ।
১৭। কোনদিকে। গল্প সংগ্রহ। সার্বজনীন।
১৮। শিল্পী। আরোগ্য।
১৯। ঘাসে কত পুষ্টি। 'আশালতা' নামক পরিকল্পিত, অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত উপন্যাসের অংশ।
২০। ষ্টুডিও। আরোগ্য।
২১। রত্নাকর। তেইশ বছর আগে পরে।
২২। ভোঁতা। পাশাপাশি।
২৩। কলমে হরফে। হরফ।
২৪। অগ্নিশুদ্ধি। তেইশ বছর আগে পরে।
২৫। মতি গতি। প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান।
২৬। তারপর। মাশুল।

পরিশিষ্ট 'ঘ'

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো মানিকের রচনা

জোতদার	সম্প্রতি	শারদীয়া ১৩৫১
ডুবুরি	ইস্পাত	শ্রাবণ, ১৩৫৬
বিয়ে	অন্যান্য	শারদীয় ১৩৫৯
তোমরা সবাই ভালো	সঞ্চয়ন	মাঘ ১৩৫১
বাজার	চলন্তিকা	শারদীয়, ১৩৫৪ (?)
প্রেমিক	ভারত	শারদীয়, ১৩৫৩ (?)
ধানের গোলার ধান	স্বরাজ	শারদীয়, ১৩৫৪ (?)
ছেলেমানষি	ভারত	শারদীয়, ১৩৫৪ (?)
রাস্তায়	?	?

স্নায়ু	পূর্বাশা	১৩৫৬
চোখ	নতুন পত্র	?
কলহের জের	বৈজয়ন্তী	?
সঞ্চয়েষ্বীর অভিযান	আনন্দবাজার	?
শান্তির সমস্যা (নাটিকা)	?	?
অকর্মণ্য	নবশক্তি	শারদীয় ১৩৪৭
প্রতিক্রিয়া	নরনারী	আশ্বিন ১৩৪৭
গৃহিণী	পত্রিকা	কার্তিক, ১৩৪৭
পুত্রার্থে	সংস্কৃতি	?
অপর্ণার ভুল	নরনারী	?
খুনী	নতুন জীবন	পৌষ, ১৩৫০
রাঙা মাটির চাষী	পূর্বাশা	আশ্বিন ১৩৫০ থেকে
প্লট : জয়দ্রথ	সোনার বাংলা	১৯৪৭
চৈতালি আশা	স্বাধীনতা	রবিবার ১৯৪৭
শ্রমবঞ্চিতা শিকারিণী (কবিতা)	পূর্বাশা,	বৈশাখ, ১৩৪৬
দেবতা	পূর্বাশা,	১৩৪৪
ভূতের গল্প	মৌচাক	১৯৪৮ (?)
পশুর বিদ্রোহ	বিশ্ববার্তা	১৯৪৮
বাঘের বংশরক্ষা	হিন্দুস্থান	শারদীয় ১৯৪৮
দুটি যাত্রী	বর্ষবাণী	১৯৫০
বন্ধু	অশনি	১৯৫০
অন্ন	নির্দেশ	১৯৫০
ভীরু	সত্যযুগ	১৯৫০
বিপদ ও বন্ধু	দেবসাহিত্য	?
রূপান্তর	গল্প ভারতী	শারদীয় ১৩৫৯
মরতে পারবনা	মধ্যবিত্ত	শারদীয়, ১৩৫৯
ধাত	?	১৯৫৩
ছোট একটি গল্প	শারদী	?
ঠাকুরমার গোলা	আগামী	১৯৫৩
দুর্ঘটনা	ক্রান্তি	?

রোমাঞ্চকর	মেদিনীপুর ছাত্র	?
গল্প	সাহিত্যপত্র	১৯৫৬
সামঞ্জস্য	গল্প ভারতী	শীতের অর্ঘ্য, ১৩৫৪
ভুল ধারণা	নরনারী	শ্রাবণ, ১৩৪৭
পাশফেল	হালখাতা	১৩৪৮
ফাঁদ	বৈশাখী	বৈশাখ, ১৩৪৮
ভাঙ্গাঘর	নতুন পত্র	আশ্বিন, ১৩৪৭
ধনজন যৌবন	চতুরঙ্গ	শারদীয়া, ১৩৪৮
সন্ধ্যা তারা	?	?
গুণ্ডামি	নতুন লেখা	১৯৪৬

পরিশিষ্ট—'ঙ'

মানিকের উপন্যাস

১। জননী, মার্চ ১৯৩৫—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২। দিবারাত্রির কাব্য, ডিসেম্বর ১৯৩৫—ডি, এম, লাইব্রেরী
৩। পুতুল নাচের ইতিকথা, ১৯৩৬—ডি, এম, লাইব্রেরী
৪। পদ্মানদীর মাঝি, ২৮-৫-১৯৩৬—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
৫। জীবনের জটিলতা, নভেম্বর ১৯৩৬—ফাইন আর্ট পাবলিসিং হাউস
৬। অমৃতস্য পুত্রাঃ, জুলাই ১৯৩৮—কাত্যায়নী বুক ষ্টল
৭। সহরতলী ১ম পর্ব, ১৯৪০—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
৮। সহরতলী ২য় পর্ব, ১৯৪১—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
৯। অহিংসা, ১৯৪১—ডি, এম, লাইব্রেরী
১০। ধরাবাঁধা জীবন (১৩৪৮ শারদীয়া নরনারীতে প্রকাশিত)
ফাইন আর্ট পাবলিসিং হাউস, বিডন ষ্টীট, কলিকাতা
১১। প্রতিবিম্ব ১৯৪৩—বেঙ্গল পাবলিশার্স
১২। দর্পণ, জুন ১৯৪৫—বুক এম্পোরিয়াম

১৩। সহরবাসের ইতিকথা, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬—ডি, এম, লাইব্রেরী
১৪। চিন্তামণি, জুলাই ১৯৪৬—বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৫। চিহ্ন, জানুয়ারী ১৯৪৭—বসুমতী সাহিত্য-মন্দির
১৬। আদায়ের ইতিহাস, ১৯৪৭—এম, সি সরকার এণ্ড সন্স
১৭। চতুষ্কোণ, ১৯৪৮—ডি, এম, লাইব্রেরী
১৮। জীয়ন্ত, জুলাই ১৯৫০—বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৯। পেশা, ১৯৫১—ডি, এম, লাইব্রেরী
২০। স্বাধীনতার স্বাদ, জুন ১৯৫১—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২১। সোনার চেয়ে দামী, জুন ১৯৫১—বেঙ্গল পাবলিশার্স
২২। ছন্দপতন, ১৯৫১—নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড
২৩। সোনার চেয়ে দামী (২য়) ১৯৫২—বেঙ্গল পাবলিশার্স
২৪। ইতি কথার পরের কথা, ভাদ্র ১৩৫৯—বেঙ্গল পাবলিশার্স
২৫। পাশাপাশি, ১৯৫২—বেঙ্গল পাবলিশার্স
২৬। সার্বজনীন, ১৯৫২—ডি, এম, লাইব্রেরী
২৭। আরোগ্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০—ক্যালকাটা বুক ক্লাব
২৮। তেইশ বছর আগে পরে, ১৯৫৩—ক্যালকাটা পাবলিশার্স
২৯। নাগপাশ, ১৯৫৩—সাহিত্য জগৎ
৩০। চলাচল, ১৯৫৩—ডি, এম, লাইব্রেরী
৩১। শুভাশুভ, অক্টোবর ১৯৫৪—ডি, এম, লাইব্রেরী
৩২। হরফ, মে ১৯৫৫—সাহিত্য জগৎ
৩৩। পরাধীন প্রেম, মে ১৯৫৫—রীডার্স কর্ণার
৩৪। হলুদ নদী সবুজ বন, ১৯৫৬—নিউ এজ পাবলিশার্স লিঃ
৩৫। মাশুল, অক্টোবর ১৯৫৬—সাহিত্য জগৎ

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত

১। প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান, ডিসেম্বর ১৯৫৬—বেঙ্গল পাবলিশার্স
২। মাটি ঘেঁষা মানুষ (অসমাপ্ত), ১৯৫৭—ডি, এম, লাইব্রেরী
৩। শান্তিলতা,—শারদীয়া এলোমেলো, ১৯৫৯ ; শ্রাবণ, ১৩৬৭—সাহিত্য জগৎ
৪। মাঝির ছেলে, ১৯৬০—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত

১। মাটির কাছে কিশোর কবি

২। মশাল

পরিশিষ্ট—'চ'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের গ

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

ভয় দেখানোর গল্প, শৈশব স্মৃতি যাচাইয়ের গল্প, গল্প চুরির গল্প, সিদ্ধপুরুষ, তিনটি সাহসী ভীরুর গল্প, তৈল চিত্রের ভূত, টিকিট নেই, অসহযোগ, চণ্ডীচরণের গান, অলৌকিক লৌকিকতা, পাশফেল, আমার কান্না। মোট ১২টি গল্প

২। কিশোর বিচিত্রা—

মাঝির ছেলে উপন্যাস এবং ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্পে সঙ্কলিত 'আমার কান্না, চণ্ডীচরণের গান, অলৌকিক লৌকিকতা, অসহযোগ, তৈল চিত্রের ভূত বাদে বড়ো হওয়ার দায়, সনাতনী, কাণ্ডকারখানা এবং পোড়াছায়া মোট চারটি গল্প নতুন সঙ্কলিত হয়েছে।

৩। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গল্পঃ দাড়ির গল্প, এলো, মহাদেও-এর যাত্রা শুরু, ভীরু, ম্যাজিক, সূর্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা, কোথায় গেল, জব্দ করার প্রতিযোগিতা।

মোট ২৪টি গল্প

পরিশিষ্ট—'ছ'

দুটি অপ্রকাশিত উপন্যাসের খসড়া

উপন্যাসের নাম সম্ভবত রাখিব—বিষ। বদলাইতেও পারি। ভাগ্যের অপূর্ব যোগাযোগে বাঙালী ছেলেদের—ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে—কখনও পরের ইচ্ছায় কখনও নিজে সাধ করিয়া যে বিভিন্ন প্রকারের বিষ পান করিয়া জীবনকে বিষাক্ত করিতে হয় মোটামুটি তাহাই হইবে উপন্যাসের ভিত্তি। বিভিন্ন প্রকৃতির এবং জীবনের বিভি ন্ন

পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে স্থাপিত কতগুলি যুবক হইবে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। ইহাদের মধ্যে দুটি চরিত্রের উপর বিশেষভাবে জোর দিব। একজন বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান ছেলে, বড় হইবার সুযোগেরও তাহার কোন অভাব নাই—না অর্থের, না পৃষ্ঠপোষকতার, না ইচ্ছার। জীবনে সে কিছু করিতে চায়—বড় কিছু। সেজন্য চেষ্টাও করে। তবু কিছুই করিতে পারে না। জীবনের বৃহত্তর মহত্তর বিকাশের বিপুল কামনা মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়া সে ব্যর্থ নিরর্থক জীবন যাপন করে। রাজমিস্ত্রী গৃহনির্মাণের কৌশল না জানিলে যেমন বিরাট রাজপ্রসাদ নির্মাণের উপকরণ লইয়া ছোট একটি একতলা বাড়িও গড়িয়া তুলিতে পারে না—তাহাকে কেবল অর্থহীন সৃষ্টির ভাঙাগড়া লইয়াই থাকিতে হয়—এই ছেলেটিও তেমনভাবে কোনো-দিকে নিজেকে কাজে লাগাইতে পারে না। কেন এমন হয়, মাটিতে পা পাতিয়া দাঁড়াইতে না পারিলে মস্ত পালোয়ানের গায়ের জোর যেমন নিরর্থক হইয়া থাকে তেমনিভাবে এই ছেলেটির শক্তিমান মনটিও কেন অশক্ত হইয়া যায়—ইহার চরিত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে উপন্যাসে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা থাকিবে। অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দু-একটির উল্লেখ করিতে পারি। একটি কারণ, হৃদয়মনের গঠনে সঙ্গতির অভাব, সামঞ্জস্যের অভাব। নিজের মধ্যেই তাহার এমনি ভিন্নমুখী বিপরীত শক্তি আছে যাহা পরস্পরকে সংহত করিয়া রাখে। দ্বিতীয় কারণ, শিক্ষার দোষে, দুষ্ট শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংস্পর্শের দোষে, বাস্তবতার সহিত বিকৃত সম্বন্ধ। এমনি অনেক কিছু।

আরেকটি প্রধান চরিত্র মধ্যবিত্ত সংসারের একটি ছেলে। যে অ আ শিখিবার সময় জানিয়া রাখে এক বি, এ, পাশ করিয়া খুব মোটা মাহিনায়—একশ দেড়শ টাকায় চাকরি করিয়া সুখে দিন কাটাইবে। ইহার চরিত্র অনেকটা হইবে বাংলার অধিকাংশ স্কুল-কলেজে-পড়া ছেলেদের চরিত্রের প্রতিচ্ছবির মত। তবে ইহার জীবনের কথা লিখিতে বসিয়া যে বেকার সমস্যাই বড় করিয়া দিব তাহা নহে—এ যুগের ছেলেদের কিরকম খিচুড়ি-পাকানো প্রকৃতি গড়িয়া ওঠে, নিজস্বতা বিসর্জন দিয়া কিভাবে ধার-করা টুকরো টুকরো চরিত্রে নিজেদের চরিত্র গড়িয়া তোলে, ডাঁটা-ছেঁড়া পদ্মের মত অবলম্বনহীনভাবে কিভাবে ভাসিয়া বেড়ায়—এই সমস্ত ফুটাইবার চেষ্টা করিব। ইহার পারিবারিক জীবনের উপর উপন্যাসের যবনিকা তুলিব। একটি ঠাকুরদাদা (সেকেলে বৃদ্ধের টাইপ), বাপ মা ভাইবোন, সুখ দুঃখ ভাল মন্দ জড়ানো সংসার। ঠাকুরদাদার চরিত্র একটু বিশিষ্ট হইবে, কারণ নাতির প্রতি গভীর মমতার সূত্রে তাহার ও নাতিটির চরিত্রের কতগুলি বিস্ময়কর বিরুদ্ধতা ফুটাইবার সুযোগ গ্রহণ করিব।

আরও অনেক চরিত্র থাকিবে। বর্তমান বাঙালী সমাজের একটু ছায়াপাত হইবে

—উপন্যাসের পরিপূর্ণতার জন্য যে সমস্ত প্রয়োজন। কয়েকটি স্বাভাবিক নারী চরিত্র থাকিবে। ঘটনা ইত্যাদি তো থাকিবেই।

দুই

১। গল্পের মূল বিষয়—সেকেলে ধরণের এক রাজার নায়েব ম্যানেজার বা দেওয়ানের উস্কানিতে রাজার বিরাট এক এরোড্রাম গড়ে তোলার জন্য প্রজার চাষের জমি বেদখলের চেষ্টার ফলে প্রজাদের সঙ্গে সংঘর্ষ।

২। রাজার সেকেলে জাব্বাজোব্বা-পরিহিত গদিতে আসীন দেওয়ান দুগ্ধ পান করলে—গদীতে গুটিসুটি পাকিয়ে মরে আছেন দেখা গেল—"ক" দেওয়ান-পদপ্রার্থী—এ তার ষড়যন্ত্র—রাজবাড়িতে বিষদান গুম খুন ইত্যাদি কত কাণ্ড চলে তার একটা ইঙ্গিত।

৩। "ক" দেওয়ানের গদিতে বসতে যাবে সব ঠিকঠাক, দূরে ব্রিটিশ প্রতিনিধি একটু আঙুল নাড়ল—"ক" বাতিল হল—এল সায়েব ম্যানেজার "খ"—ব্যর্থতার জ্বালায় "ক" প্রতিহিংসার মতলব ভাঁজে—ক্রমাগত পায়চারি করে ঘরের মধ্যে—নতুন ম্যানেজার "খ"র জন্য হল চেয়ার টেবিলের আধুনিক আপিসের ব্যবস্থা—"ক" প্রজাদের তলে তলে ক্ষেপিয়ে তোলে—

৪। 'খ'র ইঞ্জিনিয়ার লোকজন নিয়ে এরোড্রামের জমির সীমানা মাপতে যায়—প্রজারা লাঙল নিয়ে জমিতে এসেছে—তাদের বলা হয় জমি চষা বন্ধ করতে—তারা প্রস্তুত হয়েই এসেছে—একসঙ্গে প্রতিবাদ করে…

৫। জমি বিক্রির খতে কেউ সই বা টিপসই দেবে না—"ক" তাদের পক্ষে তো আছেই আর আছে তাদেরই নায়ক 'গ'—যার জমি বাড়িও এরোড্রামের এলাকার মধ্যে পড়ে—'ক'কে পক্ষে পেয়ে সকলে উৎসাহী কিন্তু 'গ'র ওপরেই তাদের আসল বিশ্বাস—

৬। 'ক'কে ডাকিয়ে 'খ' ঘুষ দেয় এরোড্রাম সংক্রান্ত মোটা টাকার একটা contract—সঙ্গে সঙ্গে 'ক' মত বদলায়—অনুগত হয় রাজার—বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রজাদের উস্কায় জমি বেচতে—তাকে বাতিল করে এবার প্রজারা 'গ'কে নেতা করে—(একজন প্রজা খতে সই করে—অন্য বিদ্রোহী প্রজাদের সঙ্গে contrast হিসাবে এই ভীরু কাপুরুষ চোরের মত চেহারা ও প্রকৃতির চরিত্রটি গল্পে সামান্য অংশ নেবে)

৭। এদিকে প্রজারা জমি তৈরী করে চলেছে চাষের জন্য—জীবনধারা বয়ে চলেছে নিজস্ব ধারায়—'গ'র সুন্দরী অল্পবয়সী স্ত্রী 'অ' শিশু নিয়ে সংসারের কাজ—বুড়ো শ্বশুরের সেবা করছে—রাজার হাতির মাহুত 'ঘ'র মেয়ে তার সই 'আ'র সঙ্গে হাসিতামাসা করছে…

৮। 'গ'কে লোভ দেখানো ভয় দেখানো হল—জমি সে বেচবে না—রাত্রে আগুন লাগল 'গ'র বাড়িতে—মোটা মাটির দেওয়ালের ঘরে 'গ' সপরিবারে বন্দী—এদিকে 'ক' ও 'খ'র ষড়যন্ত্র আগে থেকে ঠিক হয়েছিল—ভাড়া করা একদল লোক হৈ হৈ করে ছুটে গিয়ে 'গ'র জলন্ত বাড়ি ঘিরে ফেলেছে আগুন নেভাবার ছুতায়—

লোক দেখিয়ে জল এনে ঢেলে দিচ্ছে মাটিতে—প্রজারা কেউ ঘেঁষতে পারছেনা কাছে, "হট যাও—হট যাও" করে তাদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আগুন নেভাবার মিথ্যা চেষ্টা ও ছুটোছুটি আরও বাড়িয়ে দিয়ে—ঘরের মধ্যে কাস্তে খন্তি যা আছে নিয়ে 'গ'রা পাগলের মত চেষ্টা করছে পাথরের মত শক্ত দেওয়াল খুঁড়তে, বাইরে থেকে বন্ধ করা দরজা ভাঙতে—চালায় লক লক করছে আগুনের শিখা—দূরে রাজপ্রাসাদে রাজা ও 'খ' ও 'ক' মদের গ্লাস হাতে চেয়ে দেখছে আগুন—'খ' পিঠ চাপড়ে দিল রাজা ও 'ক'র—রাজা শুয়ে পড়ল অনুগতের মত—'ক' আরও বেশী—

'আ' তার বাপ 'ঘ'র সাহায্যে ছুটল বড় হাতিটা নিয়ে—হাতি দেওয়াল ভেঙে উদ্ধার করল 'গ'কে···

৯। 'ঘ' পেল প্রচণ্ড নির্যাতন—দূর করে দেওয়া হল তাকে—হাতি 'ঘ'র প্রাণের দোসর—আজ কতকাল সে ওদের মাহুত—কেঁদে কেঁদে শেষে বিদায় নিয়ে সে চলে গেল মেয়েকে সাথে করে—

১০। ক্ষেতে চারা বড় হয়েছে—আগামী ফসলের স্বপ্ন দেখছে প্রজা—'গ'কে আবার বোঝাবার চেষ্টা হল—জমি বেচতে সে রাজী হোক—সকলকে রাজী করাক—ফসল কাটা পর্যন্ত এরোড্রোমের কাজ বন্ধ থাকবে—জমির উপযুক্ত মূল্য সবাই পাবে——'গ' রাজী নয়।

'গ' বাড়ি নেই নতুন মাহুত রাতের অন্ধকারে হাতি নিয়ে এল 'গ'র ক্ষেতের ফসল তছনছ করতে—'গ'র বাবা টাঙ্গি নিয়ে ছুটে গেল···আঘাত করল মদ্দা হাতিটার মাথায় দিশেহারা হয়ে—শেষে গেল হাতির পায়ে—আঘাতের বেদনায় ছুটল হাতি—সামনে পড়ল শিশু কোলে 'অ'—শুঁড়ে জড়িয়ে তাকে ছুঁড়ে দিল—শিশুটি মরল··· (হাতি দূরে পুরানো মাহুতের কাছে চলে গেল, এটাও দেখানো চলে—মিলনের আনন্দ উল্লাস)

১১। 'খ'র লোক কুড়িয়ে নিয়ে গেল 'অ'কে···

১২। 'গ' ফিরে এল···প্রতিবেশীরা মূক···বাড়ি শূন্য

১৩। রাতের আঁধারে 'গ' গিয়েছে 'অ'কে খুঁজতে—খুঁজে না পাক 'ক' বা 'খ'কে খুন করবে সঙ্গের ছোরা বসিয়ে—সে ধরা পড়ল—বন্দী হল প্রাসাদের পুরানো অংশের এক ঘরে—কানে এল 'অ'র ক্ষীণ কান্না—পাগলের মত মুক্তির চেষ্টা করতে পেল গুপ্ত পথ—ওপরে আরেক ঘরে এল—সে ঘরেও একজন বন্দী—রাজার আত্মীয় —পাগল—ঘর থেকে বার হবার পথ নেই—পাশের ঘরে 'অ' আর্তনাদ করছে—'খ' অত্যাচার করতে উদ্যত—কয়েক ইঞ্চি এক ঘুলঘুলির ফাঁকে ওঘরের একটু অংশ চোখে পড়ে মাত্র—

১৪। 'গ' কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে খবর ছড়িয়েছিল প্রজাদের মধ্যে—দল বেঁধে তারা কিছুক্ষণ পরেই অনুসরণ করেছে তাকে। হাতি ফিরিয়ে নিয়ে 'আ' ও তার বাবা। বন্ধ গেটের সামনে প্রজারা 'গ' ও 'অ'র মুক্তি চায়—সে শব্দ পৌঁছায় 'গ'র কাছে—বন্দুক নিয়ে 'খ' ও রক্ষীরা ভেতরে প্রস্তুত—মাথা দিয়ে হাতি গেট ভাঙতে চেষ্টা করে—'খ'র গুলিতে মরতে হয় তাকে—কিন্তু গেট তখন ভেঙ্গে গেছে—বন্যার মত প্রজারা ছুটেছে লাঠি বন্দুক অগ্রাহ্য করে—'ক' 'খ' ভেসে যায় কুটোর মত —'গ' ও 'অ'কে মুক্ত করে আনে প্রজারা…

অতি অল্প সময়ে কল্পনা করা—অনেক অদল বদল পালিশ দরকার।